রবীন্দ্র-রচিত ভূমিকা

রবীন্দ্র-রচিত ভূমিকা

সংকলন ও সম্পাদনা

বারিদবরণ ঘোষ

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ

কলকাতা

সম্পাদকের নিবেদন

১৩৮৩ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ-আশ্বিন সংখ্যার 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি' পত্রিকায় আমার একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ "ভূমিকা : অন্যের প্রয়োজনে রবীন্দ্রনাথ" নামে প্রকাশিত হয়। তাতে বাংলা-ইংরেজি মিলিয়ে অন্যের গ্রন্থে সংযুক্ত রবীন্দ্র-রচিত প্রায় চল্লিশটি ভূমিকার অংশবিশেষসহ প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি সন্নিবেশ করি। এ কাজে আমাকে বহু অনুসন্ধান করতে হয়। এর অনেক বছর পরে 'দেশ' পত্রিকার ২০ আগস্ট ১৯৮৩ সংখ্যায় শ্রীআদিত্য ওহদেদার "অন্যের গ্রন্থে ভূমিকা-লেখক রবীন্দ্রনাথ" নামে রবীন্দ্র-রচিত ভূমিকা সমূহের একটি তালিকা প্রদান করেন। এর অনুষঙ্গ হিসেবে 'দেশ' পত্রিকার পরবর্তী কয়েকটি সংখ্যায় কয়েকজন ওয়াকিবহাল রবীন্দ্রানুরাগী আরো কয়েকটি ভূমিকার খোঁজ-খবর দেন। ঘটনাক্রমে এই তালিকার অধিকাংশই আমার প্রকাশিত প্রবন্ধে উল্লিখিত হয়েছিল, তবে নতুন কিছু ভূমিকারও আমি সন্ধান পাই। যাঁরা 'দেশ'-এ চিঠিপত্র লিখেছিলেন তাঁদের মধ্যে শ্রীবিশ্বনাথ রায়ের (বর্তমানে আমার সহকর্মী অধ্যাপক) চিঠিগুলি সব চেয়ে তথ্যমূলক ছিল। তা ছাড়া শ্রীওহদেদার তাঁর প্রবন্ধে "এই রবীন্দ্রনাথের প্রতি এ যাবৎ কোনো আলোকপাত করা হয় নি" বলে যে দাবি করেছিলেন— শ্রীরায় তার সংগত প্রতিবাদ করেছিলেন।

প্রবন্ধটি রচনার আগে অজ্ঞতাবশত আমি জানতাম না যে রবীন্দ্রতত্ত্বাচার্য পুলিনবিহারী সেন এ-বিষয়ে আগেই 'শনিবারের চিঠি' পত্রিকার বৈশাখ ১৩৬৭ সংখ্যায় একটি নিবন্ধ পত্রস্থ করেছিলেন "রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা সম্বলিত গ্রন্থ" নামে। এই অজ্ঞতা আমার কাছে আশীর্বাদস্বরূপ হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে শ্রীওহদেদার-এর প্রবন্ধটি প্রকাশের পর পুনশ্চ আমি এই বিষয়ে তৎপর হয়ে পড়ি এবং আরো তথ্য সংগ্রহে সমর্থ হই। সব-কিছু সংগৃহীত হয়েছে এমন দাবি করা হয়তো সংগত হবে না।

এমনতরো একটি বিষয়কে প্রবন্ধ রচনাতেই সমাপ্ত না রেখে ভূমিকাগুলি ক্রমাগত সংগ্রহ করতে থাকি। কারণ আমার মনে হয়েছিল এগুলি থেকে ভিন্ন এক রবীন্দ্রনাথকে আবিষ্কার করা সম্ভব হবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রচনাগুলি মূল গ্রন্থাদি থেকেই সংকলিত হয়েছে, ক্বচিৎ দ্বিতীয় উৎসের সাহায্য নিয়েছি।

এই সংকলনের পর গ্রন্থাকারে এটি প্রকাশের জন্য বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগের তৎকালীন অধ্যক্ষ জগদিন্দ্র ভৌমিকের কাছে জমা দিই। তিনি এটিকে শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতী গবেষণা প্রকাশন সমিতির দপ্তরে পাঠিয়ে দেন। কিছু কালক্ষেপের পর তাঁরা এটি মুদ্রণের আয়োজন করেন এবং বস্তুত মুদ্রণকর্ম প্রায় সমাপ্তও হয়ে যায়। কিন্তু প্রধানত প্রকাশক, প্রেস এবং সম্পাদকের মধ্যে প্রয়োজনীয় সংযোগের অভাবে যে-সমস্ত ত্রুটি দেখা দেয় তা সংশোধন করে গ্রন্থটি প্রচার করা সম্ভব হয় নি।

পরিশেষে প্রধানত বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগের প্রাক্তন অধ্যক্ষ স্বপন মজুমদারের প্রবর্তনা ও ব্যক্তিগত উদ্যোগে গ্রন্থনবিভাগ এটি প্রকাশের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এই পর্যায় পর্যন্ত যাঁদের সঙ্গে আমার সংযোগ ঘটেছে, তাঁদের সকলের কাছেই আমি কৃতজ্ঞ।

গ্রন্থ প্রকাশে বিলম্বের ফলে আরো কিছু গ্রন্থের ও পত্র-পত্রিকার ভূমিকা সংগৃহীত হতে পেরেছে। বইটির মুদ্রণের শেষ পর্যায়ে সম্পাদনাকর্মে শ্রীশঙ্খ ঘোষ এবং শ্রীসুবিমল লাহিড়ীর সহায়তা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি।

বইটিকে আমি বাংলা ও ইংরেজি দুটি ভাষাখণ্ডে বিভক্ত করেছি। ইংরেজি বিভাগে কোনো উপবিভাগ করি নি। বাংলা বইয়ের ভূমিকাগুলি বিন্যাসে আমি চারটি পর্যায় গ্রহণ করেছি—১. যেগুলি প্রত্যক্ষ ভূমিকা হিসেবে রচিত ; ২. যেগুলি মুখ্যত রবীন্দ্রনাথের অভিমত, তবে ভূমিকা হিসেবে ব্যবহৃত (অধিকাংশ ক্ষেত্রে কবির অনুমতি নিয়ে ভূমিকা হিসেবে মুদ্রিত) ; ৩. নানা চিঠিপত্রে বা পত্রিকায় উল্লিখিত রবীন্দ্রনাথের মতামত ভূমিকা হিসেবে গৃহীত এবং ৪. দৈনিক বা সাময়িক পত্রের জন্য রবীন্দ্রনাথের লেখা ভূমিকা বা আশীর্বাণী। হিন্দি ভাষাতে রচিত গ্রন্থের ভূমিকাও সংকলিত হয়েছে।

রবীন্দ্র-রচিত এই-সব ভূমিকাগুলি সম্পর্কে 'প্রসঙ্গ-নির্দেশ' অংশে প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি যথাসংক্ষেপে বিন্যাসানুসারে সন্নিবেশ করেছি। শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবনে এই-সব লেখক-লেখিকার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পত্র-ব্যবহারের যে-সব ফাইল সংরক্ষিত আছে—সেগুলি থেকে আরো বহু তথ্য পাঠক জানতে পারবেন ; আমি যথা প্রয়োজন উল্লেখ করেছি মাত্র। কোথাও কোথাও নিজস্ব মতামতও প্রকাশ করেছি। পরবর্তী গবেষকগণ 'প্রসঙ্গ-নির্দেশ' থেকে নানা তথ্য সংগ্রহ করতে পারবেন। অবশ্য সবগুলিকেই পাঠক 'ভূমিকা' হিসেবে গ্রহণ নাও করতে পারেন ; আমিও সে বিষয়ে যথাস্থানে মতামত প্রকাশ করেছি।

রোজভিলা, বর্ধমান
জানুয়ারি ২০০২

বিনীত
বারিদবরণ ঘোষ

সূচীপত্র

প্রথম বিভাগ : প্রথম অধ্যায়

১. মেয়েলি ব্রত ১
২. রামায়ণী কথা ২
৩. গুরুদক্ষিণা ৮
৪. শিক্ষার আন্দোলন ১৫
৫. সংস্কৃত প্রবেশ ২০
৬. ঠাকুরমা'র ঝুলি ২১
৭. সরল কৃত্তিবাস অর্থাৎ কৃত্তিবাস-প্রণীত সপ্তকাণ্ড রামায়ণ ২৩
৮. কাদম্বরী ২৫
৯. শিবাজী ও মারাঠা জাতি ৩৪
১০. শিখগুরু ও শিখজাতি ৩৭
১১. খৃষ্ট ৪৫
১২. বসন্ত-প্রয়াণ ৫৪
১৩. দ্বিজেন্দ্রলাল ৬০
১৪. রামেন্দ্রসুন্দর জীবন-কথা ৬১
১৫. বাগগুহা ও রামগড় ৬২
১৬. কান্তকবি রজনীকান্ত ৬৪
১৭. বেড়াল ঠাকুরঝি ৬৪
১৮. কাঠের কাজ ৬৫
১৯. সরোজনলিনী ৬৬
২০. রায়তের কথা ৬৭
২১. রাগশ্রেণী ৭৫
২২. হারামণি ৭৫
২৩. সরল কৃষি শিক্ষা ৭৮
২৪. ইন্দ্রধনু ৭৯
২৫. উদিতা ৮০
সংযোজন ৮১
২৬. বাতায়ন ৮৩
২৭. ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা ৮৪
২৮. কালিদাসের গল্প ৮৫
২৯. জাতীয় ভিত্তি ৮৬
৩০. হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমালা ৮৯
৩১. জাতীয় সাহিত্য ৯১
৩২. প্রিয় পুষ্পাঞ্জলি ৯২
৩৩. বঙ্গবীণা ৯৩
৩৪. দাদু ৯৪
৩৫. হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ ১০১
৩৬. দিনেন্দ্র-রচনাবলী ১০২
৩৭. গল্প সঞ্চয় ১০৩
৩৮. চম্পা ও পাটল ১০৪
৩৯. প্রাচীন হিন্দুস্থান ১০৪
৪০. ভারতীয় ব্যাধি ও আধুনিক চিকিৎসা ১০৫
৪১. পাগলা দাশু ১০৭
৪২. পৃথ্বী-পরিচয় ১০৮
৪৩. গল্পসংগ্রহ ১০৮
৪৪. ঘরোয়া ১০৯
৪৫. শ্যামকান্তের পত্রাবলী ১১০
৪৬. সুন্দর গ্রন্থাবলী ১১১

প্রথম বিভাগ : দ্বিতীয় অধ্যায়

৪৭. মেয়েলি ব্রতকথা ১১৫
৪৮. সুরধুনী ১১৫
৪৯. শিশুভারতী ১১৬
৫০. বঙ্গীয় শব্দকোষ ১১৬
৫১. জলধর-কথা ১১৬
৫২. বঙ্গীয় মহাকোষ ১১৭
৫৩. সপ্তপর্ণ ১১৭
৫৪. শ্রীরামকৃষ্ণ কাব্যলহরী ১১৮
৫৫. জ্ঞানভারতী ১১৮
৫৬. বাংলার কথাসাহিত্য ১১৮
৫৭. মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস ১১৯
৫৮. পথ্যে পরমায়ু ১১৯
৫৯. মন্দির ১২১
৬০. জগদীশচন্দ্রের পত্রাবলী ১২২

প্রথম বিভাগ : তৃতীয় অধ্যায়

৬১. যুগলাঞ্জলি ১২৭
৬২. রাক্ষস রহস্য ১২৭
৬৩. রোবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম ১২৮
৬৪. ময়নামতীর চর ১২৯

৬৫. ব্যাকরণিকা ১২৯
৬৬. মৌন ও মুখর ১৩০
৬৭. দ্বীপময় ভারতের প্রাচীন সাহিত্য ১৩০
৬৮. কাদম্বরী ১৩১
৬৯. শতপর্ণী ১৩২
৭০. প্রেমাঞ্জলি ১৩২
৭১. দেহলি ১৩৩
৭২. রবীন্দ্র সাহিত্যের পরিচয় ১৩৩
৭৩. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ১৩৪
৭৪. আহার ও আহার্য ১৩৫
৭৫. বাংলা সাহিত্যের ভূমিকা ১৩৫

প্রথম বিভাগ : চতুর্থ অধ্যায়

৭৬. ঐতিহাসিক চিত্র ১৪৩
৭৭. সুপ্রভাত ১৪৫
৭৮. ভূমিলক্ষ্মী ১৪৮
৭৯. ধূমকেতু ১৫১
৮০. লাঙ্গল ১৫১
৮১. উপায় ১৫২
৮২. বিচিত্রা ১৫৩
৮৩. পরিচয় ১৫৬
৮৪. বঙ্গদর্শন ১৬২
৮৫. সংহতি ১৬২
৮৬. উত্তরা ১৬৫
৮৭. বঙ্গলক্ষ্মী ১৬৫
৮৮. উদয়ন ১৬৬
৮৯. অভ্যুদয় ১৬৬
৯০. বেতার জগৎ ১৬৭
৯১. মৎস্যজীবী ১৬৮
৯২. নিরুক্ত ১৬৮
৯৩. বিজ্ঞান পরিচয় ১৬৯
৯৪. পুষ্পপাত্র ১৬৯
৯৫. ছন্দা ১৭০
৯৬. ভারত ১৭০
৯৭. প্রচারক ১৭০
৯৮. চৈতালী ১৭১
৯৯. জয়শ্রী ১৭১

দ্বিতীয় বিভাগ : ইংরেজি

1. Thirty Songs from The Punjab & Kashmir ১৭৫
2. Shantiniketan ১৭৭
3. The Bengali Book of English Verse ১৮০
4. The Web of Indian Life ১৮৩
5. To the Nations ১৮৫
6. The Divine Songs of Zarathustra ১৯০
7. The Philosophy of the Upanisads ১৯৬
8. India in Bondage ২০২
9. Medieval Mysticism ২০২
10. Voiceless India ২০৪
11. Woodcuts ২০৬
12. The Golden Book of Tagore ২০৭
13. Reconstruction and Education in Rural India ২০৭
14. The Li Sao ২১৩
15. Sakuntala ২১৪
16. Glimpses of India ২২১
17. Thakore Sahib Daulat Sing ২২১
18. Twentyfive Linocuts ২২২
19. Islam's Contribution to Science and Civilisation ২২২
20. Hindu Scriptures ২২৩
21. When Peacocks Called ২২৫
22. Preparation for Citizenship ২২৬
23. A Primer of Modern Japanese Language ২২৬
24. Sermon on the Mount ২২৭
25. The Deliverance ২৩১
26. Behula ২৩২
প্রসঙ্গ-নির্দেশ ২৩৫-৩২৯

প্রথম বিভাগ

প্রথম অধ্যায়

মেয়েলি ব্রত : অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়

সাধনা পত্রিকা সম্পাদন কালে আমি ছেয়ে ভুলাইবার ছড়া এবং মেয়েলি ব্রত সংগ্রহ ও প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত ছিলাম। ব্রতকথা সংগ্রহে অঘোরবাবু আমার প্রধান সহায় ছিলেন, সেজন্য আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ আছি।

অনেকের নিকট এই-সকল ব্রতকথা ও ছড়া নিতান্ত তুচ্ছ ও হাস্যকর মনে হয়। তাঁহারা গম্ভীর প্রকৃতির লোক এবং এরূপ দুঃসহ গাম্ভীর্য বর্তমান কালে বঙ্গসমাজে অতিশয় সুলভ হইয়াছে।

বালকদিগের এমন একটি বয়স আসে যখন তাহারা বাল্যসম্পর্কীয় সকলপ্রকার বিষয়কেই অবজ্ঞার চক্ষে দেখে, অথচ পরিণত বয়সোচিত কার্যসকলও তাহাদের পক্ষে স্বাভাবিক হয় না। তখন তাহারা সর্বদা ভয়ে ভয়ে থাকে, পাছে কোনো সূত্রে কেহ তাহাদিগকে বালক মনে করে। বঙ্গসমাজের গম্ভীর-সম্প্রদায়েরও সেই দুর্গতি উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহারা বঙ্গভাষা, বঙ্গসাহিত্য, বঙ্গদেশ-প্রচলিত সর্বপ্রকার ব্যাপারের প্রতি অবজ্ঞামিশ্রিত কৃপাকটাক্ষপাত করিয়া আপন প্রকৃতির অতলস্পর্শ গাম্ভীর্য এবং পরিণতির প্রমাণ দিতে প্রয়াস পাইয়া থাকেন। অথচ তাঁহারা আপন অভ্রভেদী মহিমার উপযোগী আর যে কিছু মহৎ কীর্তি রাখিয়া যাইবেন, এমন কোনো লক্ষণও প্রকাশ পাইতেছে না।

য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ দর্শন বিজ্ঞান ইতিহাসে যথেষ্ট মনোযোগ করিয়া থাকেন এবং ছড়া রূপকথা প্রভৃতি সংগ্রহেও সংকোচ বোধ করেন না। তাঁহাদের এ আশঙ্কা নাই পাছে লোক সাধারণের নিকট তাঁহাদের মর্যাদা নষ্ট হয়। প্রথমত, তাঁহারা জানেন যে, যে-সকল কথা ও গাথা সমাজের অন্তঃপুরের মধ্যে চিরকাল স্থান পাইয়া আসিয়াছে, তাহারা দর্শন, বিজ্ঞান ও ইতিহাসের মূল্যবান উপকরণ না হইয়া যায় না— দ্বিতীয়ত, যাহারা স্বদেশকে অন্তরের সহিত ভালোবাসে তাহারা স্বদেশের সহিত সর্বতোভাবে অন্তরঙ্গরূপে পরিচিত হইতে চাহে এবং ছড়া রূপকথা ব্রতকথা প্রভৃতি ব্যতিরেকে সেই পরিচয় কখনো সম্পূর্ণতা লাভ করে না।

সাধনায় যখন আমি এগুলি সংগ্রহ ও প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম তখন আমার কোনোপ্রকার মহৎ উদ্দেশ্য ছিল না। সমাজের সুধাভাণ্ডার যে অন্তঃপুর, তাহারই প্রতি স্বাভাবিক মমত্ববশত আকৃষ্ট হইয়া আমাদের মাতা মাতামহী আমাদের স্ত্রী কন্যা সহোদরাদের কোমল হৃদয়-পালিত মধুর কণ্ঠলালিত চিরন্তন কথাগুলিকে স্থায়ীভাবে একত্র করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম এবং অঘোরবাবুকে এই-সমস্ত মেয়েলি ব্রত গ্রন্থ আকারে রক্ষা করিতে উৎসাহী করিয়াছি, সেজন্য গম্ভীর প্রকৃতি পাঠকদের

নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। এবং সেইসঙ্গে এ কথাও বলিয়া রাখি যে, এই-সকল সংগ্রহের দ্বারা ভবিষ্যতে যে কোনোপ্রকার গম্ভীর উদ্দেশ্য সাধিত হইবে না এমনও মনে করি না।

এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্তবাবু দীনেন্দ্রকুমার রায় মহাশয়ের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি। তিনি বাংলাদেশের জনসাধারণ প্রচলিত পার্বণগুলির উজ্জ্বল ও সুন্দর চিত্র সাধনায় প্রকার করিয়া সাধনা-সম্পাদকের প্রিয় উদ্দেশ্য সাধনে সহায়তা করিয়াছেন। সে চিত্রগুলি বঙ্গসাহিত্যে স্থায়ীভাবে রক্ষা করিবার যোগ্য এবং আশা করি দীনেন্দ্রকুমারবাবু সেগুলি গ্রন্থ আকারে প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

কার্সিয়াং
৭ কার্তিক ১৩০৩

২

রামায়ণী কথা : দীনেশচন্দ্র সেন

রামায়ণ-মহাভারতকে যখন জগতের অন্যান্য কাব্যের সহিত তুলনা করিয়া শ্রেণীবদ্ধ করা হয় নাই তখন তাহাদের নাম ছিল ইতিহাস। এখন বিদেশীয় সাহিত্যভাণ্ডারে যাচাই করিয়া তাহাদের নাম দেওয়া হইয়াছে এপিক। আমরা "এপিক" শব্দের বাংলা নামকরণ করিয়াছি মহাকাব্য। এখন আমরা রামায়ণ-মহাভারতকে মহাকাব্যই বলিয়া থাকি।

মহাকাব্য নামটি ভালোই হইয়াছে। নামের মধ্যেই যেন তাহার সংজ্ঞাটি পাওয়া যায়। ইহাকে আমরা কোনো বিদেশী শব্দের অনুবাদ বলিয়া এখন যদি না স্বীকার করি তাহাতে ক্ষতি হয় না।

অনুবাদ বলিয়া স্বীকার করিলে পরদেশীয় অলংকারশাস্ত্রের "এপিক" শব্দের লক্ষণের সহিত আগাগোড়া না মিলিলেই মহাকাব্যনামধারীকে কৈফিয়ত দিতে হয়। এরূপ জবাবদিহির মধ্যে থাকা অনাবশ্যক বলিয়া মনে করি।

মহাকাব্য বলিতে কী বুঝি আমরা তাহার আলোচনা করিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু এপিকের সঙ্গে তাহাকে আগাগোড়া মিলাইয়া দিব এমন পণ করিতে পারি না। কেমন করিয়াই বা করিব? প্যারাডাইস লস্টকেও তো সাধারণে এপিক বলে, তা যদি হয় তবে রামায়ণ-মহাভারত এপিক নহে— উভয়ের এক পঙ্‌ক্তিতে স্থান হইতেই পারে না।

মোটামুটি কাব্যকে দুই ভাগ করা যাক। কোনো কাব্য বা একলা কবির কথা, কোনো কাব্য বা বৃহৎ সম্প্রদায়ের কথা।

একলা কবির কথা বলিতে এমন বুঝায় না যে তাহা আর কোনো লোকের অধিগম্য নহে, তেমন হইলে তাহাকে পাগলামি বলা যাইত। তাহার অর্থ এই যে, কবির মধ্যে সেই ক্ষমতাটি আছে, যাহাতে তাহার নিজের সুখদুঃখ, নিজের কল্পনা, নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া বিশ্বমানবের চিরন্তন হৃদয়াবেগ ও জীবনের মর্মকথা আপনি বাজিয়া উঠে।

এই যেমন এক শ্রেণীর কবি হইল, তেমনি আর-এক শ্রেণীর কবি আছে, যাহার রচনার ভিতর দিয়া একটি সমগ্র দেশ, একটি সমগ্র যুগ, আপনার হৃদয়কে— আপনার অভিজ্ঞতাকে ব্যক্ত করিয়া তাহাকে মানবের চিরন্তন সামগ্রী করিয়া তোলে।

এই দ্বিতীয় শ্রেণীর কবিকে মহাকবি বলা যায়। সমগ্র দেশের সমগ্র জাতির সরস্বতী ইঁহাদিগকে আশ্রয় করিতে পারেন— ইঁহারা যাহা রচনা করেন তাহাকে কোনো ব্যক্তিবিশেষের রচনা বলিয়া মনে হয় না। মনে হয়, যেন তাহা বৃহৎ বনস্পতির মতো দেশের ভূতল-জঠর হইতে উদ্ভূত হইয়া সেই দেশকেই আশ্রয়চ্ছায়া দান করিয়াছে। কালিদাসের শকুন্তলা-কুমারসম্ভবে বিশেষভাবে কালিদাসের নিপুণ হস্তের পরিচয় পাই— কিন্তু রামায়ণ-মহাভারতকে মনে হয় জাহ্নবী ও হিমাচলের ন্যায় তাহারা ভারতেরই, ব্যাস বাল্মীকি উপলক্ষ মাত্র।

বস্তুত ব্যাস বাল্মীকি তো কাহারো নাম ছিল না। ও তো একটা উদ্দেশে নামকরণ মাত্র। এত বড়ো বৃহৎ দুইটি গ্রন্থ; আমাদের সমস্ত ভারতবর্ষ জোড়া দুইটি কাব্য, তাহাদের নিজের রচয়িতা কবিদের নাম হারাইয়া বসিয়া আছে— কবি আপন কাব্যে এতই অন্তরালে পড়িয়া গেছে।

আমাদের দেশে যেমন রামায়ণ-মহাভারত, প্রাচীন গ্রীসে ও রোমে তেমনি ইলিয়ড এনিড ছিল। তাহারা সমস্ত গ্রীস ও রোমের হৃৎপদ্মসম্ভব ও হৃৎপদ্মবাসী ছিল। কবি হোমর ও ভর্জিল আপন আপন দেশকালের কণ্ঠে ভাষা দান করিয়াছিলেন। সেই বাক্য উৎসের মতো স্ব-স্ব দেশের নিগূঢ় অন্তস্তল হইতে উৎসারিত হইয়া চিরকাল ধরিয়া তাহাকে প্লাবিত করিয়াছে।

আধুনিক কোনো কাব্যের মধ্যেই এমন ব্যাপকতা দেখা যায় না। মিল্টনের প্যারাডাইস লস্টের ভাষার গাম্ভীর্য, ছন্দের মাহাত্ম্য, রসের গভীরতা যতই থাক্-না-কেন, তথাপি তাহা দেশের ধন নহে— তাহা লাইব্রেরির আদরের সামগ্রী।

অতএব এই গুটিকয়েক মাত্র প্রাচীন কাব্যকে এক কোঠায় ফেলিয়া এক নাম দিতে হইলে মহাকাব্য ছাড়া আর কী নাম দেওয়া যাইতে পারে? ইঁহারা প্রাচীনকালের দেবদৈত্যের ন্যায় মহাকায় ছিলেন— ইঁহাদের জাতি এখন লুপ্ত হইয়া গেছে।

প্রাচীন আর্য সভ্যতার এক ধারা য়ুরোপে এবং এক ধারা ভারতে প্রবাহিত হইয়াছে। য়ুরোপের ধারা দুই মহাকাব্যে এবং ভারতের ধারা দুই মহাকাব্যে আপনার কথা ও সংগীতকে রক্ষা করিয়াছে।

আমরা বিদেশী, আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি না গ্রীস ও রোম তাহার সমস্ত প্রকৃতিকে তাহার দুই কাব্যে প্রকাশ করিতে পারিয়াছে কি না, কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে ভারতবর্ষ রামায়ণ-মহাভারতে আপনাকে আর কিছুই বাকি রাখে নাই।

এইজন্যই, শতাব্দীর পর শতাব্দী যাইতেছে কিন্তু রামায়ণ-মহাভারতের স্রোত ভারতবর্ষে আর লেশমাত্র হইতেছে না। প্রতিদিন গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে তাহা পঠিত হইতেছে— মুদির দোকান হইতে রাজার প্রাসাদ পর্যন্ত সর্বত্রই তাহার সমান সমাদর। ধন্য সেই কবিযুগলকে, কালের মহাপ্রান্তরের মধ্যে যাঁহাদের নাম হারাইয়া গেছে, কিন্তু যাঁহাদের বাণী বহু কোটি নরনারীর দ্বারে দ্বারে আজিও অজস্রধারায় শক্তি ও শান্তি বহন করিতেছে, শত শত প্রাচীন শতাব্দীর পলি-মৃত্তিকা অহরহ আনয়ন করিয়া ভারতবর্ষের চিত্তভূমিকে আজিও উর্বরা করিয়া রাখিতেছে।

এমন অবস্থায় রামায়ণ-মহাভারতকে কেবলমাত্র মহাকাব্য বলিলে চলিবে না, তাহা ইতিহাসও বটে। ঘটনাবলীর ইতিহাস নহে ; কারণ সেরূপ ইতিহাস সময় বিশেষকে অবলম্বন করিয়া থাকে— রামায়ণ-মহাভারত ভারতবর্ষের চিরকালের ইতিহাস। অন্য ইতিহাস কালে কালে কতই পরিবর্তিত হইল, কিন্তু এ ইতিহাসের পরিবর্তন হয় নাই। ভারতবর্ষের যাহা সাধনা, যাহা আরাধনা, যাহা সংকল্প তাহারই ইতিহাস এই দুই বিপুল কাব্যহর্ম্যের মধ্যে চিরকালের সিংহাসনে বিরাজমান।

এই কারণে, রামায়ণ-মহাভারতের যে সমালোচনা তাহা অন্য কাব্যসমালোচনার আদর্শ হইতে স্বতন্ত্র। রামের চরিত্র উচ্চ কি নীচ, লক্ষ্মণের চরিত্র আমার ভালো লাগে কি মন্দ লাগে, এই আলোচনাই যথেষ্ট নহে। স্তব্ধ হইয়া শ্রদ্ধার সহিত বিচার করিতে হইবে সমস্ত ভারতবর্ষ অনেক সহস্র বৎসর ইহাদিগকে কীরূপভাবে গ্রহণ করিয়াছে। আমি যত বড়ো সমালোচকই হই-না-কেন, একটি সমগ্র প্রাচীন দেশের ইতিহাসপ্রবাহিত সমস্ত কালের বিচারের নিকট যদি আমার শির নত না হয়, তবে সেই ঔদ্ধত্য লজ্জারই বিষয়।

রামায়ণে ভারতবর্ষ কী বলিতেছে, রামায়ণে ভারতবর্ষ কোন্ আদর্শ মহৎ বলিয়া স্বীকার করিয়াছে, ইহাই বর্তমান ক্ষেত্রে আমাদের সবিনয়ে বিচার করিবার বিষয়।

বীররসপ্রধান কাব্যকেই এপিক বলে এইরূপ সাধারণের ধারণা, তাহার কারণ যে দেশে যে কালে বীররসের গৌরব প্রাধান্য পাইয়াছে, সে দেশে সে কালে স্বভাবতই এপিক বীররসপ্রধান হইয়া পড়িয়াছে। রামায়ণেও যুদ্ধ ব্যাপার যথেষ্ট আছে, রামের বাহুবলও সামান্য নহে, কিন্তু তথাপি রামায়ণে যে রস সর্বাপেক্ষা প্রাধান্য লাভ করিয়াছে তাহা বীররস নহে। তাহাতে বাহুবলের গৌরব ঘোষিত হয় নাই— যুদ্ধ ঘটনাই তাহার মধ্যে মুখ্য বর্ণনার বিষয় নহে।

দেবতার অবতার লীলা লইয়াই যে এ কাব্য রচিত তাহাও নহে। কবি বাল্মীকির কাছে রাম অবতার ছিলেন না, তিনি মানুষই ছিলেন, পণ্ডিতেরা ইহার প্রমাণ করিবেন।

এই ভূমিকায় পাণ্ডিত্যের অবকাশ নাই। এখানে এইটুকু সংক্ষেপে বলিতেছে যে কবি যদি রামায়ণে নরচরিত্র বর্ণনা না করিয়া দেবচরিত্র বর্ণনা করিতেন, তবে তাহাতে রায়ামণের গৌরব হ্রাস হইত— সুতরাং তাহা কাব্যাংশে ক্ষতিগ্রস্ত হইত। মানুষ বলিয়াই রামচরিত্র মহিমান্বিত।

আদিকাণ্ডের প্রথম সর্গে বাল্মীকি তাঁহার কাব্যের উপযুক্ত নায়ক সন্ধান করিয়া যখন বহুগুণের উল্লেখ করিয়া নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"সমগ্রা' রূপিণী লক্ষ্মী' কমেকং সংশ্রিতা নরং।"

কোন্ একটি মাত্র নরকে আশ্রয় করিয়া সমগ্রা লক্ষ্মী রূপ গ্রহণ করিয়াছেন?— তখন নারদ কহিলেন—

"দেবেষ্বপ ন পশ্যামি কশ্চিদেভির্গুণৈর্যুতং।
শ্রূয়তাং তু গুণৈরেভির্যো যুক্তো নরচন্দ্রমাঃ॥"

এত গুণযুক্ত পুরুষ তো দেবতাদের মধ্যেও দেখি না, তবে যে নরচন্দ্রমার মধ্যে এই-সকল গুণ আছে তাঁহার কথা শুন।

রামায়ণ সেই নরচন্দ্রমারই কথা, দেবতার কথা নহে। রামায়ণে দেবতা নিজেকে খর্ব করিয়া মানুষ করেন নাই, মানুষই নিজগুণে দেবতা হইয়া উঠিয়াছেন।

মানুষের চরম আদর্শ স্থাপনার জন্য ভারতের কবি মহাকাব্য রচনা করিয়াছেন। এবং সেদিন হইতে আজ পর্যন্ত মানুষের এই আদর্শ চরিতবর্ণনা ভারতের পাঠকমণ্ডলী পরমাগ্রহের সহিত পাঠ করিয়া আসিতেছে।

রামায়ণের প্রধান বিশেষত্ব এই যে, তাহা ঘরের কথাকেই অত্যন্ত বৃহৎ করিয়া দেখাইয়াছে। পিতা-পুত্রে ভ্রাতায়-ভ্রাতায়, স্বামী-স্ত্রীতে যে ধর্মের বন্ধন, যে প্রীতি ভক্তির সম্বন্ধ, রামায়ণ তাহাকে এত মহৎ করিয়া তুলিয়াছে যে, তাহা সহজেই মহাকাব্যের উপযুক্ত হইয়াছে। শত্রুবিনাশ, দুই প্রবল বিরোধী পক্ষের প্রচণ্ড আঘাত সংঘাত এই সমস্ত ব্যাপারই সাধারণত মহাকাব্যের মধ্যে আন্দোলন ও উদ্দীপনার সঞ্চার করিয়া থাকে। কিন্তু রামায়ণের মহিমা রাম-বারণের যুদ্ধকে আশ্রয় করিয়া নাই— সে যুদ্ধঘটনা রাম ও সীতার দাম্পত্য প্রীতিকেই উজ্জ্বল করিয়া দেখাইবার উপলক্ষ মাত্র ; পিতার প্রতি পুত্রের বশ্যতা, ভ্রাতার জন্য ভ্রাতার আত্মত্যাগ, পতি-পত্নীর মধ্যে পরস্পরের প্রতি নিষ্ঠা ও প্রজার প্রতি রাজার কর্তব্য কতদূর পর্যন্ত যাইতে পারে রামায়ণ তাহাই দেখাইয়াছে। এইরূপ ব্যক্তিবিশেষের প্রধানত ঘরের সম্পর্কগুলি কোনো দেশের মহাকাব্যে এমনভাবে বর্ণনীয় বিষয় বলিয়া গণ্য হয় নাই।

ইহাতে কেবল কবির পরিচয় হয় না, ভারতবর্ষের পরিচয় হয়। গৃহ ও গৃহধর্ম যে ভারতবর্ষের পক্ষে কতখানি ইহা হইতে তাহা বুঝা যাইবে। আমাদের দেশে গার্হস্থ্য আশ্রমের যে উচ্চস্থান ছিল এই কাব্য তাহা সপ্রমাণ করিতেছে। গৃহাশ্রম আমাদের নিজের সুখের জন্য সুবিধার জন্য ছিল না— গৃহাশ্রম আমাদের সমস্ত সমাজকে ধারণ

করিয়া রাখিত ও মানুষকে যথার্থভাবে মানুষ করিয়া তুলিত। গৃহাশ্রম ভারতবর্ষীয় আর্যসমাজের ভিত্তি। রামায়ণ সেই গৃহাশ্রমের কাব্য। এই গৃহাশ্রম-ধর্মকেই রামায়ণ বিসদৃশ অবস্থার মধ্যে ফেলিয়া বনবাস-দুঃখের মধ্যে বিশেষ গৌরব দান করিয়াছে। কৈকেয়ী-মন্থরার কুচক্রান্তের কঠিন আঘাতে অযোধ্যার রাজগৃহকে বিশ্লিষ্ট করিয়া দিয়া তৎসত্ত্বেও এই গৃহধর্মের দুর্ভেদ্য দৃঢ়তা রামায়ণ ঘোষণা করিয়াছে। বাহুবল নহে, জিগীষা নহে, রাষ্ট্রগৌরব নহে, শান্তরসাস্পদ গৃহধর্মকেই রামায়ণ করুণার অশ্রুজলে অভিষিক্ত করিয়া তাহাকে সুমহৎ বীর্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

শ্রদ্ধাহীন পাঠকেরা বলিতে পারেন, এমন অবস্থায় চরিত্রবর্ণনা অতিশয়োক্তিতে পরিণত হইয়া উঠে। যথাযথের সীমা কোন্‌খানে এবং কল্পনার কোন্ সীমা লঙ্ঘন করিলে কাব্যকলা অতিশয়ে গিয়া পৌঁছে, এক কথায় তাহার মীমাংসা হইতে পারে না। বিদেশী যে-সমালোচক বলিয়াছেন যে রামায়ণে চরিত্র বর্ণনা অতিপ্রাকৃত হইয়াছে তাঁহাকে এই কথা বলিব যে, প্রকৃতিভেদে একের কাছে যাহা অতিপ্রাকৃত, অন্যের কাছে তাহাই প্রাকৃত। ভারতবর্ষ রামায়ণের মধ্যে অতিপ্রাকৃতের আতিশয্য দেখে নাই।

যেখানে যে আদর্শ প্রচলিত তাহাকে অতিমাত্রায় ছাড়াইয়া গেলে সেখানকার লোকের কাছে তাহা গ্রাহ্যই হয় না। আমাদের শ্রুতিযন্ত্রে আমরা যতসংখ্যক শব্দতরঙ্গের আঘাত উপলব্ধি করিতে পারি তাহার সীমা আছে, সেই সীমার উপরের সপ্তকে সুর চড়াইলে আমাদের কর্ণ তাহাকে গ্রহণই করে না। কাব্যে চরিত্র এবং ভাব উদ্ভাবনসম্বন্ধেও সে কথা খাটে।

এ যদি সত্য হয়, তবে এ কথা সহস্র বৎসর ধরিয়া প্রমাণ হইয়া গিয়াছে যে, রামায়ণ-কথা ভারতবর্ষের কাছে কোনো অংশে অতিমাত্র হয় নাই। এই রামায়ণ-কথা হইতে ভারতবর্ষের আবালবৃদ্ধবনিতা আপামর সাধারণ কেবল যে শিক্ষা পাইয়াছে তাহা নহে— আনন্দ পাইয়াছে, কেবল যে ইহাকে শিরোধার্য করিয়াছে তাহা নহে— ইহাকে হৃদয়ের মধ্যে রাখিয়াছে, ইহা যে কেবল তাহাদের ধর্মশাস্ত্র তাহা নহে— ইহা তাহাদের কাব্য।

রাম যে একই কালে আমাদের কাছে দেবতা এবং মানুষ, রামায়ণ যে একই কালে আমাদের কাছে ভক্তি এবং প্রীতি পাইয়াছে, ইহা কখনোই সম্ভব হইত না, যদি এই মহাগ্রন্থের কবিত্ব ভারতবর্ষের পক্ষে কেবল সুদূর কল্পলোকেরই সামগ্রী হইত, যদি তাহা আমাদের সংসার-সীমার মধ্যেও ধরা না দিত।

এমন গ্রন্থকে যদি অন্যদেশী সমালোচক তাঁহাদের কাব্যবিচারের আদর্শ অনুসারে অপ্রাকৃত বলেন, তবে তাঁহাদের দেশের সহিত তুলনায় ভারতবর্ষের একটি বিশেষত্ব আরো পরিস্ফুট হইয়া উঠে। রামায়ণে ভারতবর্ষ যাহা চায়, তাহা পাইয়াছে।

রামায়ণ এবং মহাভারতকেও আমি বিশেষত এইভাবে দেখি। ইহার সরল অনুষ্টুপ্ ছন্দে ভারতবর্ষের সহস্র বৎসরের হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হইয়া আসিয়াছে।

সুহৃদ্‌বর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় যখন তাঁহার এই রামায়ণচরিত্র সমালোচনার একটি ভূমিকা লিখিয়া দিতে আমাকে অনুরোধ করেন, তখন আমার অস্বাস্থ্য ও অনবকাশ সত্ত্বেও তাঁহার কথা আমি অমান্য করিতে পারি নাই। কবিকথাকে ভক্তের ভাষায় আবৃত্তি করিয়া তিনি আপন ভক্তির চরিতার্থতা সাধন করিয়াছেন। এইরূপ পূজার আবেগমিশ্রিত সমালোচনাই আমার মতে প্রকৃত সমালোচনা— এই উপায়েই এক হৃদয়ের ভক্তি আর-এক হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়। অথবা যেখানে পাঠকের হৃদয়েও ভক্তি আছে, সেখানে পূজাকারকের ভক্তির হিল্লোল-তরঙ্গ জাগাইয়া তোলে। আমাদের আজকালকার সমালোচনা বাজারদর যাচাই করা— কারণ সাহিত্য এখন হাটের জিনিস; পাছে ঠকিতে হয় বলিয়া চতুর যাচনদারের আশ্রয় গ্রহণ করিতে সকলে উৎসুক। এরূপ যাচাই ব্যাপারের উপযোগিতা অবশ্য আছে, কিন্তু তবু বলিব যথার্থ সমালোচনা পূজা— সমালোচক পূজারী পুরোহিত— তিনি নিজের অথবা সর্বসাধারণের ভক্তিবিগলিত বিস্ময়কে ব্যক্ত করেন মাত্র।

ভক্ত দীনেশচন্দ্র সেই পূজামন্দিরের প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া আরতি আরম্ভ করিয়াছেন। আমাকে হঠাৎ তিনি ঘণ্টা নাড়িবার ভার দিলেন। এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আমি সেই কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আমি অধিক আড়ম্বর করিয়া তাঁহার পূজা আচ্ছন্ন করিতে কুণ্ঠিত। আমি কেবল এই কথাটুকুমাত্র জানাইতে চাহি যে, বাল্মীকির রামচরিতকথাকে পাঠকগণ কেবলমাত্র কবির কাব্য বলিয়া দেখিবেন না, তাহাকে ভারতবর্ষের রামায়ণ বলিয়া জানিবেন। তাহা হইলে রামায়ণের দ্বারা ভারতবর্ষকে ও ভারতবর্ষের দ্বারা রামায়ণকে যথার্থভাবে বুঝিতে পারিবেন। ইহা স্মরণ রাখিবেন যে, কোনো ঐতিহাসিক গৌরবকাহিনী নহে, পরন্তু পরিপূর্ণ মানবের আদর্শ চরিত ভারতবর্ষ শুনিতে চাহিয়াছিল, এবং আজ পর্যন্ত তাহা অশ্রান্ত আনন্দের সহিত শুনিয়া আসিতেছে। এ কথা বলে নাই যে, বড়ো বাড়াবাড়ি হইতেছে— এ কথা বলে নাই যে, এ কেবল কাব্যকথা মাত্র। ভারতবাসীর ঘরের লোক এত সত্য নহে— রাম লক্ষ্মণ সীতা তাহার যত সত্য।

পরিপূর্ণতার প্রতি ভারতবর্ষের একটি প্রাণের আকাঙ্ক্ষা আছে। ইহাকে সে বাস্তব-সত্যের অতীত বলিয়া অবজ্ঞা করে নাই, অবিশ্বাস করে নাই। ইহাকেই সে যথার্থ সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছে এবং ইহাতেই সে আনন্দ পাইয়াছে। সেই পরিপূর্ণতার আকাঙ্ক্ষাকেই উদ্‌বোধিত ও তৃপ্ত করিয়া রামায়ণের কবি ভারতবর্ষের ভক্ত-হৃদয়কে চিরদিনের জন্য কিনিয়া রাখিয়াছেন।

যে জাতি খণ্ড-সত্যকে প্রাধান্য দেন, যাঁহারা বাস্তব-সত্যের অনুসরণে ক্লান্ত বোধ করেন না, কাব্যকে যাঁহারা প্রকৃতির দর্পণমাত্র বলেন, তাঁহারা জগতে অনেক কাজ করিতেছেন— তাঁহারা বিশেষভাবে ধন্য হইয়াছেন— মানবজাতি তাঁহাদের কাছে ঋণী। অন্যদিকে, যাঁহারা বলিয়াছেন "ভূমৈব সুখং। ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ" যাঁহারা পরিপূর্ণ পরিমাণের মধ্যে সমস্ত খণ্ডতার সুষমা, সমস্ত বিরোধের শান্তি উপলব্ধি করিবার জন্য

সাধনা করিয়াছেন, তাঁহাদেরও ঋণ কোনো কালে পরিশোধ হইবার নহে। তাঁহাদের পরিচয় বিলুপ্ত হইলে, তাঁহাদের উপদেশ বিস্মৃত হইলে মানবসভ্যতা আপন ধূলিধূম্রসমাকীর্ণ কারখানা-ঘরের জনতা-মধ্যে নিশ্বাসকলুষিত বদ্ধ আকাশে পলে পলে পীড়িত হইয়া কৃশ হইয়া মরিতে থাকিবে। রামায়ণ সেই অখণ্ড অমৃতপিপাসুদের চিরপরিচয় বহন করিতেছে। ইহাতে যে সৌভ্রাত্র, যে সত্যপরতা, যে পাতিব্রত্য, যে প্রভুভক্তি বর্ণিত হইয়াছে, তাহার প্রতি যদি সরল শ্রদ্ধা ও অন্তরের ভক্তি রক্ষা করিতে পারি, তবে আমাদের কারখানা-ঘরের বাতায়ন-মধ্যে মহাসমুদ্রের নির্মলবায়ু প্রবেশের পথ পাইবে।

ব্রহ্মচর্যাশ্রম। বোলপুর
৫ পৌষ ১৩১০

৩

গুরুদক্ষিণা : সতীশচন্দ্র রায়

জীবনে যে ভাগ্যবান পুরুষ সফলতা লাভ করিতে পারিয়াছে, মৃত্যুতে তাহার পরিচয় উজ্জ্বলতর হইয়া উঠে। তাহাকে যেমন হারাই, তেমনি লাভও করি। মৃত্যু তাহার চারি দিকে যে অবকাশ রচনা করিয়া দেয়, তাহাতে তাহার চরিত্র, তাহার কীর্তি, মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত দেবপ্রতিমার মতো সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

কিন্তু যে জীবন দৈবশক্তি লইয়া পৃথিবীতে আসিয়াছিল, অথচ অমরতালাভের পূর্বেই মৃত্যু যাহাকে অকালে আক্রমণ করিয়াছে, সে আপনার পরিচয় আপনি রাখিয়া যাইতে পারিল না। যাহারা তাহাকে চিনিয়াছিল, তাহার বর্তমান অসম্পূর্ণ আরম্ভের মধ্যে ভাবী সফল পরিণাম পাঠ করিতে পারিয়াছিল, যাহারা তাহার বিকাশের জন্য অপেক্ষা করিয়াছিল, তাহাদের বিচ্ছেদবেদনার মধ্যে একটা বেদনা এই যে, আমার শোককে সকলের সামগ্রী করিতে পারিলাম না। মৃত্যু কেবল ক্ষতিই রাখিয়া গেল।

সতীশচন্দ্র সাধারণের কাছে পরিচিত নহে। সে তাহার যে অল্পকয়টি লেখা রাখিয়া গেছে, তাহার মধ্যে প্রতিভার প্রমাণ এমন নিঃসংশয়ে হইয়া উঠে নাই যে, অসংকোচে তাহা পাঠকদের কৌতূহলী দৃষ্টির সম্মুখে আত্মমহিমা প্রকাশ করিতে পারে। কেহ-বা তাহার মধ্যে গৌরবের আভাস দেখিতেও পারেন, কেহ-বা না'ও দেখিতে পারেন, তাহা লইয়া জোর করিয়া আজ কিছু বলিবার পথ নাই।

কিন্তু লেখার সঙ্গে সঙ্গে যে ব্যক্তি লেখকটিকেও কাছে দেখিবার উপযুক্ত সুযোগ পাইয়াছে, সে ব্যক্তি কখনো সন্দেহমাত্র করিতে পারে না যে, সতীশ বঙ্গসাহিত্যে যে প্রদীপটি জ্বালাইয়া যাইতে পারিল না, তাহা জ্বলিলে নিভিত না।

আপনার দেয় সে দিয়া যাইতে সময় পাই নাই, তাহার প্রাপ্য তাহাকে এখন কে দিবে? কিন্তু আমার কাছে সে যখন আপনার পরিচয় দিয়া গেছে, তখন তাহার অকৃতার্থ মহত্ত্বের উদ্দেশে সকলের সমক্ষে শোকসন্তপ্তচিত্তে আমার শ্রদ্ধার সাক্ষ্য না দিয়া আমি থাকিতে পারিলাম না। তাহার অনুপম হৃদয়-মাধুর্য, তাহার অকৃত্রিম কল্পনাশক্তির মহার্ঘতা, জগতে কেবল আমার একলার মুখের কথার উপরই আত্মপ্রমাণের ভার দিয়া গেল, এ আক্ষেপ আমার কিছুতেই দূর হইবে না। তাহার চরিত্রের মহত্ত্ব কেবল আমারই স্মৃতির সামগ্রী করিয়া রাখিব, সকলকে তাহার ভাগ দিতে পারিব না, ইহা আমার পক্ষে দুঃসহ।

সতীশ যখন প্রথম আমরা কাছে আসিয়াছিল, সে অধিক দিনের কথা নহে। তখন সে কিশোরবয়স্ক, কলেজে পড়িতেছে— সংকোচসম্ভ্রমে বিনম্রমুখে অল্পই কথা।

কিছুদিন আলাপ করিয়া দেখিলাম, সাহিত্যের হাওয়াতে পক্ষবিস্তার করিয়া দিয়া সতীশের মন একেবারে উধাও হইয়া উড়িয়াছে। এ বয়সে অনেক লোকের সঙ্গে আমার আলাপ হইয়াছে, কিন্তু এমন সহজ অন্তরঙ্গতার সহিত সাহিত্যের মধ্যে আপনার সমস্ত আন্তঃকরণকে প্রেরণ করিবার ক্ষমতা আমি অন্যত্র দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

সাহিত্যের মধ্যে ব্রাউনিং তখন সতীশকে বিশেষভাবে আবিষ্ট করিয়া ধরিয়াছিল। খেলাচ্ছলে ব্রাউনিং পড়িবার জো নাই। যে লোক ব্রাউনিংকে লইয়া ব্যাপৃত থাকে, সে হয় ফ্যাশানের খাতিরে, নয়, সাহিত্যের প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগবশতই এ কাজ করে। আমাদের দেশে ব্রাউনিঙের ফ্যাশান বা ব্রাউনিঙের দল প্রবর্তিত হয় নাই, সুতরাং ব্রাউনিং পড়িতে যে অনুরাগের বল আবশ্যক হয়, তাহা বালক সতীশেরও প্রচুর পরিমাণে ছিল। বস্তুত সতীশ সাহিত্যের মধ্যে প্রবেশ ও সঞ্চরণ করিবার অস্বাভাবিক অধিকার লইয়া আসিয়াছিল।

যে সময়ে সতীশের সহিত আমার আলাপের সূত্রপাত হইয়াছিল, সেই সময়ে বোলপুর স্টেশনে আমার পিতৃদেবের স্থাপিত 'শান্তিনিকেতন'. নামক আশ্রমে আমি একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলাম। ভারতবর্ষে প্রাচীনকালে দ্বিজবংশীয় বালকগণ যেভাবে, যে প্রণালীতে শিক্ষালাভ করিয়া মানুষ হইত, এই বিদ্যালয়ে সেই ভাব, সেই প্রণালী অবলম্বন করিয়া বর্তমান-প্রচলিত পাঠ্যবিষয়গুলিকে শিক্ষা দিব, এই আমার ইচ্ছা ছিল। গুরুশিষ্যের মধ্যে আমাদের দেশে যে আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ ছিল, সেই সম্বন্ধের মধ্যে থাকিয়া ছাত্রগণ ব্রহ্মচর্যপালনপূর্বক শুদ্ধ শুচি সংযত শ্রদ্ধাবান হইয়া মনুষ্যত্বলাভ করিবে, এই আমার সংকল্প ছিল।

বলা বাহুল্য, এখনকার দিনে এ কল্পনা সম্পূর্ণভাবে কাজে খাটানো সহজ নহে। এমন অধ্যাপক পাওয়াই কঠিন যাঁহারা অধ্যাপনাকার্যকে যথার্থ ধর্মব্রতস্বরূপে গ্রহণ করিতে পারেন। অথচ বিদ্যাকে পণ্যদ্রব্য করিলেই গুরুশিষ্যের সহজ সম্বন্ধ নষ্ট হইয়া যায় ও তাহাতে এরূপ বিদ্যালয়ের আদর্শ ভিত্তিহীন হইয়া পড়ে।

এই কথা লইয়া একদিন খেদ করিতেছিলাম— তখন সতীশ আমার ঘরের এক কোণে চুপ করিয়া বসিয়াছিল। সে হঠাৎ লজ্জায় কুণ্ঠিত হইয়া বিনীতস্বরে কহিল— "আমি বোলপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ে শিক্ষাদানকে জীবনের ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু আমি কি এ কাজের যোগ্য?"

তখনো সতীশের কলেজের পড়া সাঙ্গ হয় নাই। সে আর-কিছুর জন্যই অপেক্ষা করিল না, বিদ্যালয়ের কাজে আত্মসমর্পণ করিল।

ভাবী সাংসারিক উন্নতির সমস্ত আশা ও উপায় এইরূপে বিসর্জন করাতে সতীশ তাহার আত্মীয়বন্ধুদের কাছ হইতে কীরূপ বাধা পাইয়াছিল, তাহা পাঠকগণ কল্পনা করিতে পারিবেন। এই সংগ্রামে সতীশের হৃদয় অনেকদিন অনেক গুরুতর আঘাত সহিয়াছিল, কিন্তু পরাস্ত হয় নাই।

কল্পনাক্ষেত্র হইতে কর্মক্ষেত্রে নামিয়া আসিলেই অনেকের কাছে সংকল্পের গৌরব চলিয়া যায়। প্রতিদিনের খণ্ডতা ও অসম্পূর্ণতার মধ্যে তাহারা বৃহৎকে, দূরকে, সমগ্রকে দেখিতে পায় না— প্রাত্যহিক চেষ্টার মধ্যে যে-সমস্ত ভাঙাচোরা, জোড়াতাড়া, বিরোধ, বিকার, অসামঞ্জস্য অনিবার্য, তাহাতে পরিপূর্ণ পরিণামের মহত্ত্বচ্ছবি আচ্ছন্ন হইয়া যায়। যে-সকল কাজের শেষ ফলকটিকে লাভ করা দূরে থাক্, চক্ষেও দেখিবার আশা করা যায় না, যাহার মানসী মূর্তির সহিত কর্মরূপের প্রভেদ অত্যন্ত অধিক, তাহার জন্য জীবন উৎসর্গ করা, তাহার প্রতিদিনের স্তূপাকার বোঝা কাঁধে লইয়া পথ খুঁজিতে খুঁজিতে চলা সহজ নহে— যাহারা উৎসাহের জন্য বাহিরের দিকে তাকায়, এ কাজ তাহাদের নহে— কাজও করিতে হইবে নিজের শক্তিতে, তাহার বেতনও জোগাইতে হইবে নিজের মনের ভিতর হইতে, নিজের মধ্যে এরূপ সহজ সম্পদের ভাণ্ডার সকলের নাই।

বিধাতার বরে সতীশ অকৃত্রিম কল্পনাসম্পদ লাভ করিয়াছিল। তাহার প্রমাণ এই যে, সে ক্ষুদ্রের ভিতর বৃহৎকে, প্রতিদিনের মধ্যে চিরন্তনকে সহজে দেখিতে পাইত। যে ব্যক্তি ভিখারী শিবের কেবল বাঘছাল এবং ভস্মলেপটুকুই দেখিতে পায়, সে তাঁহাকে দীন বলিয়া অবজ্ঞা করিয়া ফিরিয়া যায়— সংসারে শিব তাঁহার ভক্তদিগকে ঐশ্বর্যের ছটা বিস্তার করিয়া আহ্বান করেন না— বাহ্যদৈন্যকে ভেদ করিয়া যে লোক এই ভিক্ষুকের রজতগিরিসন্নিভ নির্মল ঈশ্বরমূর্তি দেখিতে পান, তিনিই শিবকে লাভ করেন— ভুজঙ্গবেষ্টনকে তিনি বিভীষিকা বলিয়া গণ্য করেন না এবং এই পরমকাঙালের রিক্তভিক্ষাপাত্রে আপনার সর্বস্ব সমর্পণ করাকেই চরমলাভ বলিয়া জ্ঞান করেন।

সতীশ প্রতিদিনের ধূলিভস্মের অন্তরালে, কর্মচেষ্টার সহস্র দীনতার মধ্যে শিবের শিবমূর্তি দেখিতে পাইত, তাহার সেই তৃতীয় নেত্র ছিল। সেইজন্য এত অল্পবয়সে এই শিশু অনুষ্ঠানের সমস্ত দুর্বলতা-অপূর্ণতা, সমস্ত দীনতার মধ্যে তাহার উৎসাহ উদ্যম অক্ষুণ্ণ ছিল— তাহার অন্তঃকরণ লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় নাই। বোলপুরের এই প্রান্তরের মধ্যে গুটিকয়েক বালককে প্রত্যহ পড়াইয়া যাওয়ার মধ্যে কোনো উত্তেজনার বিষয় ছিল না; লোকচক্ষুর বাহিরে, সমস্ত খ্যাতি প্রতিপত্তি ও আত্মনামঘোষণার মদমত্ততা হইতে বহুদূরে একটি নির্দিষ্ট কর্মপ্রণালীর সংকীর্ণতার মধ্য দিয়া আপন তরুণ জীবনতরী যে শক্তিতে সতীশ প্রতিদিন বাহিয়া চলিয়াছিল, তাহা খেয়ালের জোর নয়, প্রবৃত্তির বেগ নয়, ক্ষণিক উৎসাহের উদ্দীপনা নয়— তাহা তাহার মহান আত্মার স্বতঃস্ফূর্ত আত্মপরিতৃপ্ত শক্তি।

বোলপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ের সম্বন্ধেই সতীশকে আমি নিকটে পাইয়াছিলাম, তাহার অন্তরাত্মার সহিত আমার যথার্থ পরিচয় ঘটিতেছিল। এই বিদ্যালয়ের কল্পনা আমার মনের মধ্যে যে কী ভাবের ভিত্তি অবলম্বন করিয়া উঠিয়াছে, তাহা ব্যক্ত করিয়া না বলিলে এ রচনা অসম্পূর্ণ থাকিবে। কয়েক বৎসর পূর্বে আমার কোনো বন্ধুকে আমি এই বিদ্যালয় সম্বন্ধে যে পত্র লিখিয়াছিলাম এখানে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে—

'মাঝে মাঝে আমি কল্পনা করি, পূর্বকালে ঋষিরা যেমন তপোবনে কুটির রচনা করিয়া পত্নী বালকবালিকা ও শিষ্যদের লইয়া অধ্যয়ন-অধ্যাপনে নিযুক্ত থাকিতেন, তেমনি আমাদের দেশের জ্ঞানপিপাসু জ্ঞানীরা যদি এই প্রান্তরের মধ্যে তপোবন রচনা করেন, তাহারা জীবিকা-যুদ্ধ ও নগরের সংক্ষোভ হইতে দূরে থাকিয়া আপন-আপন বিশেষ জ্ঞানচর্চায় রত থাকেন, তবে বঙ্গদেশ কৃতার্থ হয়। অবশ্য, অশনবসনের প্রয়োজনকে খর্ব করিয়া জীবনের ভারকে লঘু করিতে হইবে। উপকরণের দাসত্ব হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া সর্বপ্রকার-বেষ্টন-হীন নির্মল আসনের উপর তপোনিরত মনকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। যেমন শাস্ত্রে কাশীকে বলে পৃথিবীর বাহিরে, তেমনি সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে এই একটুখানি স্থান থাকিবে— যাহা রাজা ও সমাজের সকলপ্রকার বন্ধনপীড়নের বাহিরে। ইংরাজ রাজা হউক, বা রুশ রাজা হউক, এই তপোবনের সমাধি কেহ ভঙ্গ করিতে পারিবে না। এখানে আমরা খণ্ডকালের অতীত; আমরা সুদূর ভূতকাল হইতে সুদূর ভবিষ্যৎকাল পর্যন্ত ব্যাপ্ত করিয়া বাস করি; সনাতন যাজ্ঞবল্ক্য এবং অনাগত যুগান্তর আমাদের সমসাময়িক, কে আমাদের স্টেট্‌সেক্রেটারি, কে আমাদের ভাইস্‌রয়, কে কোন্ আইন করিল এবং কে সে আইন উল্টাইয়া দিল, আমরা সে খবর রাখি না। আকাশ তাহার গ্রহতারকা-মেঘ-রৌদ্রে এবং তাহার তৃণগুল্মে ও ঋতুপর্যায়ে আমাদের প্রাত্যহিক খবরের কাগজ। আমাদের তপোবনবাসীদের জন্মমৃত্যুবিবাহের অনুষ্ঠানপরম্পরা, এখানকার নিভৃতশান্তি ও সরল

সৌন্দর্যের চিরন্তন সমারোহে সম্পন্ন হইতে থাকে। আমাদের বালকেরা হোমধেনু চরাইয়া আসিয়া পড়া লইতে বসে এবং বালিকারা গোদোহনকার্য সারিয়া কুটির-প্রাঙ্গণে, গৃহকার্যে শুচিস্নাত কল্যাণময়ী মাতৃদেবীর সহিত যোগ দেয়।

'জানি, আলোকের সঙ্গে ছায়া আসে, স্বর্গোদ্যানেও শয়তানেরর গুপ্তসঞ্চার হইয়া থাকে, কিন্তু তাই বলিয়াই কি আলোককে রোধ করিয়া রাখিব এবং স্বর্গের আশা একেবারেই পরিত্যাগ করিতে হইবে? যদি বৈদিককালে তপোবন থাকে, যদি বৌদ্ধযুগে 'নালন্দা' অসম্ভব না হয়, তবে আমাদের কালেই কি শয়তানের একাধিপত্য হইবে এবং মঙ্গলময় উচ্চ আদর্শমাত্রই 'মিলেনিয়ামে'র দুরাশা বলিয়া পরিহসিত হইতে থাকিবে? আমি আমার এই কল্পনাকে নিভৃতে পোষণ করিয়া প্রতিদিন সংকল্প আকারে পরিণত করিয়া তুলিতেছি। ইহাই আমাদের একমাত্র মুক্তি, আমাদের স্বাধীনতা, ইহাই আমাদের সর্বপ্রকার অবমাননা হইতে নিষ্কৃতির একমাত্র উপায়। নহিলে আমরা আশ্রয় লইব কোথায়, আমরা বাঁচিব কী করিয়া? আমাদের মাথা তুলিবার স্থান তো নাই-ই, মাথা রাখিবারও স্থান প্রত্যহ সংকীর্ণ হইয়া আসিতেছে। প্রবল য়ুরোপ বন্যার মতো আসিয়া আমাদের সমস্তই পলে পলে তিলে তিলে অধিকার করিয়া লইল। এখন নিরাসক্ত চিত্ত, নিষ্কাম কর্ম, নিঃস্বার্থ জ্ঞান এবং নির্বিকার অধ্যাত্মক্ষেত্রে আমাদিগকে আশ্রয় লইতে হইবে। সেখানে সৈনিকদের সহিত আমাদের বিরোধ নাই, বণিকদের সহিত আমাদের প্রতিযোগিতা নাই, রাজপুরুষদের সহিত আমাদের সংঘর্ষ নাই— সেখানে আমরা সকল আক্রমণের বাহিরে, সকল অগৌরবের উচ্চে।'

আমার এই চিঠি পড়িয়া অনেকের মনে অনেক বির্তক উঠিতে পারে, তাহা আমি জানি। তাঁহারা বলিবেন, বর্তমানকাল যদি আমাদিগকে আক্রমণ করিয়া থাকে, তবে অতীতকালের মধ্যে পলায়ন করিয়া আমরা বাঁচিব, ইহা কাপুরুষের কথা।

এ প্রবন্ধে কেবলমাত্র প্রসঙ্গক্রমে এরূপ প্রশ্নের সদুত্তর দেওয়া চলে না। সংক্ষেপে এইটুকু বলিব, ভারতবর্ষের নিত্যপদার্থটি যে কী, বাহির হইতে প্রবল আঘাত খাইয়া তবে তাহা আবিষ্কার করিতে পারিতেছি। এমন অবস্থায় সেই নিত্য আদর্শের দিকে আমাদের অন্তরের একান্ত যে-একটা আকর্ষণ জন্মে, তাহাকে উপেক্ষা করে কাহার সাধ্য!

আর একটিমাত্র কথা আছে। আমি যে তপোবনের আদর্শকে অতীতকাল হইতে সঞ্চয় করিয়া মনের মধ্যে দাঁড় করাইতেছি, সে তপোবনে সমস্ত ভারতবর্ষ আশ্রয় লইতে পারে না— ত্রিশকোটি তপস্বী কোনো দেশে হওয়া সম্ভবপর নহে, হইলেও বিপদ আছে। এ কথা সত্য বটে। কিন্তু সকল দেশের আদর্শই সে দেশের তপস্বীর দলই রক্ষা করিয়া থাকেন। ইংরাজেরা যাহাকে স্বাধীনতা বলিয়া জানেন, তাহার সাধনা ইংলন্ডের শ্রেষ্ঠ কয়েকজনেই করিয়া থাকেন, বাকি অধিকাংশই আপন-আপন কর্মে লিপ্ত। অথচ কয়েক জনের সাধনাই সমস্ত দেশকে সিদ্ধিদান করে। ভারতবর্ষও

আপন শ্রেষ্ঠ সন্তানের মুক্তিতেই মুক্তিলাভ করিবে— কয়েকটি তপোবন সমস্ত দেশের অন্তরের দাসত্বরজ্জু মোচন করিয়া দিবে।

যাহাই হউক, আমার সংকল্পটিকে এতক্ষণ কেবলমাত্র কল্পনার দিক হইতে দেখা গেল। বলা বাহুল্য, কাজের দিক হইতে যাহা প্রকাশ পাইতেছে, তাহা এরূপ মনোরম এবং সুষমাবিশিষ্ট নহে। কোথায় তপস্বী, কোথায় তপস্বীর শিষ্যদল, কোথায় সার্থক ব্রহ্মজ্ঞানের অপরিমেয় শান্তি, কোথায় একনিষ্ঠ ব্রহ্মচর্যের সৌম্যনির্মলজ্যোতিঃপ্রভা? তবু ভারতবর্ষের আহ্বানকে কেবল বাণীরূপে নহে, কর্ম-আকারে কোথাও বদ্ধ করিতেই হইবে। বোলপুরের প্রান্তরের প্রান্তে সেই চেষ্টাকে আমি স্থান দিয়াছি। এখনো ইহা রূপান্তরিত বাক্যমাত্র, ইহা আহ্বান।

সতীশ অনাঘ্রাত পুষ্পরাশির ন্যায়, তাহার তরুণ হৃদয়ের সমস্ত শ্রদ্ধা বহন করিয়া এই নিভৃত শান্তিনিকেতনের আশ্রমে আসিয়া আমার সহিত মিলিত হইল। কলেজ হইতে বাহির হইয়া জীবনযাত্রার আরম্ভকালেই সে যে ত্যাগস্বীকার করিয়াছিল, তাহা লইয়া একদিনের জন্যেও সে অহংকার অনুভব করে নাই— সে প্রতিদিন নম্র মধুর প্রফুল্লভাবে আপনার কাজ করিয়া যাইত, সে যে কী করিয়াছিল তাহা সে জানিত না।

এই শান্তিনিকেতন-আশ্রমে চারি দিকে অবারিত তরঙ্গায়িত মাঠ— এ মাঠে লাঙলের আঁচড় পড়ে নাই মাঝে মাঝে এক-এক জায়গায় খর্বায়তন বুনো খেজুর, বুনো জাম, দুই একটা কাঁটাগুল্ম এবং উইয়ের ঢিপিতে মিলিয়া এক একটা ঝোপ বাঁধিয়াছে। অদূরে ছায়াময় ভুবনডাঙা-গ্রামের প্রান্তে একটি বৃহৎ বাঁধের জলরেখা দূর হইতে ইস্পাতের ছুরির মতো ঝলকিয়া উঠিতেছে এবং তাহার দক্ষিণ পাড়ির উপর প্রাচীন তালগাছের সার কোনো ভগ্ন দৈত্যপুরীর স্তম্ভশ্রেণীর মতো দাঁড়াইয়া আছে। মাঠের মাঝে মাঝে বর্ষার জলধারায় বেলেমাটি ক্ষইয়া গিয়া নুড়িবিছানো কঙ্করস্তূপের মধ্যে বহুতর গুহা-গহ্বর ও বর্ষাস্রোতের বালু-বিকীর্ণ জলতলরেখা রচনা করিয়াছে। জনশূন্য মাঠের ভিতর দিয়া একটি রক্তবর্ণ পথ দিগন্তবর্তী গ্রামের দিকে চলিয়া গেছে— সেই পথ দিয়া পল্লীর লোকেরা বৃহস্পতিবার-রবিবারে বোলপুর শহরে হাট করিতে যায়, সাঁওতাল নারীরা উলুখড়ের আঁটি বাঁধিয়া বিক্রয় করিতে চলে এবং ভার মন্থর গোরুর-গাড়ি নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নের রৌদ্রে আর্তশব্দে ধুলা উড়াইয়া যাতায়াত করে। এই জনহীন তরুশূন্য মাঠের সর্বোচ্চ ভূখণ্ডে দূর হইতে ঋজুদীর্ঘ একসারি শালবৃক্ষের পল্লবজালের অবকাশ-পথ দিয়া একটি লৌহমন্দিরের চূড়া ও একটি দোতলা কোঠার ছাদের অংশ চোখে পড়ে— এইখানেই আমলকী ও আম্রবনের মধ্যে মধূক ও শালতরুর তলে শান্তিনিকেতন আশ্রম।

এই আশ্রমের এক প্রান্তে বিদ্যালয়ের মৃন্ময় কুটিরে সতীশ আশ্রয় লইয়াছিল। সম্মুখের শালতরুশ্রেণীতলে যে কঙ্করখচিত পথ আছে, সেই পথে কতদিন সূর্যাস্তকালে তাহার সহিত ধর্ম সমাজ সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করিতে করিতে সন্ধ্যার অন্ধকার

ঘনীভূত হইয়া আসিয়াছে, এবং জনশূন্য প্রান্তরের নিবিড় নিস্তব্ধতার ঊর্ধ্বদেশে আকাশের সমস্ত তারা উন্মীলিত হইয়াছে। এখানকার এই উন্মুক্ত আকাশ ও দিগন্ত-প্রসারিত প্রান্তরের মাঝখানে আমি তাহার উদ্‌ঘাটিত উন্মুখ হৃদয়ের অন্তর্দেশে দৃষ্টিক্ষেপ করিবার অবকাশ পাইয়াছিলাম। এই নবীন হৃদয়টি তখন প্রকৃতির সমস্ত ঋতুপরম্পরার রসস্পর্শে, সাহিত্যের বিচিত্র ভাবান্দোলনের অভিঘাতে ও কল্যাণসাগরে আপনাকে সম্পূর্ণ জলাঞ্জলি দিবার আনন্দে অহরহ স্পন্দিত হইতেছিল।

এই সময়ে সতীশ ব্রহ্মবিদ্যালয়ের বালকদের জন্য উতঙ্কের উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া 'গুরুদক্ষিণা' নামক কথাটি রচনা করিয়াছিল। এই ক্ষুদ্র কথাগ্রন্থটির মধ্যে সতীশ তাহার ভক্তিনিবেদিত তরুণ হৃদয়ের সমস্ত অসমাপ্ত আশা ও আনন্দ রাখিয়া গেছে— ইহা শ্রদ্ধার রসে সুপরিণত ও নবজীবনের উৎসাহে সমুজ্জ্বল— ইহার মধ্যে পূজাপুষ্পের সুকুমার শুভ্রতা অতি কোমলভাবে অম্লান রহিয়াছে। এই গ্রন্থটুকুকে সে শিল্পীর মতো রচনা করে নাই— এই আশ্রমের আকাশ বাতাস ছায়াও সতীশের সদ্যউদ্‌বোধিত প্রফুল্লনবীন হৃদয়ে মিলিয়া গানের মতো করিয়া ইহাকে ধ্বনিত করিয়া তুলিয়াছে।

গ্রন্থ-সমালোচনা করিতে বসিয়া গ্রন্থের কথা অতি অল্পই বলিলাম, এমন অনেকে মনে করিতে পারেন। বস্তুত তাহা নহে। সতীশের জীবনের যে অংশটুকু আমি জানি সেই অংশের পরিচয় এবং গ্রন্থের আলোচনা, একই কথা। এই বুঝিয়া পাঠকগণ যখন 'গুরুদক্ষিণা' পাঠ করিবেন, তখনি তাঁহারা এই গদ্যকাব্যটির সৌন্দর্য সম্পূর্ণরূপে ধারণা করিতে পারিবেন। গ্রন্থে যাহা আছে গ্রন্থই তাহার পরিচয় দিবে, গ্রন্থের বাহিরে যাহা ছিল তাহাই আমি বিবৃত করিলাম।

সতীশের জীবনের শেষ রচনাটি মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্বে একখানি পত্রের সহিত আমার নিকট প্রেরিত হইয়াছিল। সেই পত্রে অন্যান্য কথার মধ্যে তাহার ভাবী জীবনের আশা, তাহার বর্তমান জীবনের সাধনার কথা সে লিখিয়াছিল— সে-সব কথা এখন ব্যর্থ হইয়াছে— সেগুলি কেবল আমারই নিকটে সত্য— অতএব সেই কথা কয়টি কেবল আমি রাখিলাম, তাহার পত্রের অবশিষ্ট অংশ এইখানে প্রকাশ করিতেছি।[১]

সতীশের শেষ রচনাটি 'তাজমহল' নামক একটি কবিতা। কিছুদিন হইল, সে পশ্চিমে বেড়াইতে গিয়াছিল। আগ্রার তাজমহল-সমাধির মধ্যে সে মমতাজের অকালমৃত্যুর সৌন্দর্য দেখিয়াছিল। অসমাপ্তির মাঝখানে হঠাৎ সমাপ্তি— ইহারও একটা গৌরব আছে। ইহা যেন একটা নিঃশেষবিহীনতা রাখিয়া যায়। পৃথিবীতে সকল সমাপনের মধ্যেই জরা এবং বিকারের লক্ষণ দেখা দেয়, সম্পূর্ণতা আমাদের কাছে ক্ষুদ্র সসীমতারই প্রমাণ দিয়া থাকে। অতুল সৌন্দর্যসম্পদও আমাদের কাছে মায়া বলিয়া প্রতিভাত হয়; কারণ, আমরা তাহার বিকৃতি, তাহার শেষ দেখিতে পাই।

১. এ বিষয়ে প্রসঙ্গ নির্দেশ দ্রষ্টব্য।

মম্‌তাজের সৌন্দর্য এবং প্রেম অপরিতৃপ্তির মাঝখানে শেষ হইয়াই অশেষ হইয়া উঠিয়াছে— তাজমহলের সুষমাসৌষ্ঠবের মধ্যে কবি সতীশ সেই অন্তরের সৌন্দর্য অনুভব করিয়া তাহার জীবনের শেষ কবিতা লিখিয়াছিল।

সতীশের তরুণ জীবন ও সম্মুখবর্তী উজ্জ্বল লক্ষ্য, নবপরিস্ফুট আশা ও পরিপূর্ণ আত্মবিসর্জনের মাঝখানে অকস্মাৎ ১৩১০ সালের মাঘী পূর্ণিমার দিনে ২১ বৎসর বয়সে সমাপ্ত হইয়াছে। এই সমাপ্তির মধ্যে আমরা শেষ দেখিব না, এই মৃত্যুর মধ্যে আমরা অমরতাই লক্ষ্য করিব। সে যাত্রাপথের একটি বাঁকের মধ্যে অদৃশ্য হইয়াছে, কিন্তু জানি, তাহার পাথেয় পরিপূর্ণ— সে দরিদ্রের মতো রিক্তহস্তে জীর্ণশক্তি লইয়া যায় নাই।

বোলপুর
১৩১১ সাল

৪

শিক্ষার আন্দোলন : কেদারনাথ দাশগুপ্ত

সমাজকে বিদ্যা শিখাইবার জন্য আমাদের দেশ কোনোদিন স্বদেশী বা বিদেশী রাজার আইনের বাঁধনে ধরা দেয় নাই। নিজের শিক্ষার ব্যবস্থা সমাজের লোক নিজেরাই করিয়াছে। সেই শিক্ষার ব্যবস্থা বলিতে যে কেবল টোল এবং পাঠশালাই বুঝাইত তাহা নহে, পৃথিবীর সর্বপ্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় এই ভারতবর্ষেই স্থাপিত হইয়াছিল। প্রাচীন ভারতে নালন্দা এবং তক্ষশিলায় যে বিদ্যালয়তন ছিল, তেমন বৃহৎ ব্যাপার এখনো কোথাও আছে কি না সন্দেহ। মিথিলা কাশী নবদ্বীপে ভারতের প্রাচীন বিদ্যার বিশ্ববিদ্যালয় রাজসাহায্য ব্যতিরেকেই চিরদিন চলিয়াছে।

বর্তমানকালে নানা কারণে শিক্ষালাভের জন্য আমাদিগকে বহুল পরিমাণে রাজার অধীনতা স্বীকার করিতে হইয়াছে। ইহাতে আমাদের যথোচিত শিক্ষা লাভের কী পরিমাণ ব্যাঘাত ঘটিতেছে, তাহা আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই; কিন্তু সমাজ আত্মহিত-সাধনের শক্তি হইতে যে প্রত্যহ ভ্রষ্ট হইতেছে, ইহাই আমি সর্বাপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় বলিয়া জ্ঞান করি। আমাদের যে পাঠশালা যে টোল অনায়াসে স্বদেশের মাটি হইতে রস আকর্ষণ করিয়া দেশকে চিরদিন ফলদান করিয়া আসিয়াছে— সেই আমাদের স্বকীয় পাঠশালা ও টোলগুলিও ক্রমশই রাজার গলগ্রহ হইয়া উঠিয়া আত্মপোষণের স্বাধীন শক্তি হারাইতেছে। মোগল সাম্রাজ্য-সূর্য যখন অস্তমিত হইল,

তখন সঙ্গে সঙ্গে দেশের বিদ্যার ব্যবস্থা বিলুপ্ত হয় নাই। স্বভাবের নিয়মে একদিন ইংরেজকেও নিশ্চয় এদেশ হইতে বিদায় হইতে হইবে, তখন তাঁহাদের অন্নজীবী টোল পাঠশালাগুলি ভিক্ষান্নের জন্য আবার কাহার দ্বারে হাত পাতিতে যাইবে।

শক্তিলাভই সকল লাভের শ্রেষ্ঠ, কারণ, তাহা কেবলমাত্র খাদ্যলাভ নহে, বিদ্যা-লাভ নহে, তাহাই মনুষ্যত্বলাভ। নিজের হিতসাধনের শক্তি যখন অভ্যাসের অভাবে, সুযোগের অভাবে, সামর্থ্যের অভাবে সমাজ হারাইতে বসে, তখন সে ক্ষতি কোনো প্রকার বাহ্য সমৃদ্ধির দ্বারা পূরণ করা যায় না। দেশে কতখানি রেল পাতা হইয়াছে, টেলিগ্রাফের তার বসানো হইয়াছে, কলের চিম্‌নি উঠিয়াছে, তাহা লইয়া দেশের গৌরব নহে। সেই রেল, সেই তার, সেই চিম্‌নির সঙ্গে দেশের শক্তির কতটুকু সম্বন্ধ তাহাই বিচার্য। ইংরেজের আমলে ভারতবর্ষে আজ যতগুলি ব্যাপার চলিতেছে, তাহার ফল আমরা যেমনই ভোগ করি-না-কেন, সেই চালনায় আমাদের স্বকীয় অধিকার কতই যৎসামান্য! সুতরাং ইহার অধিকাংশই আমাদের পক্ষে স্বপ্নমাত্র; যখনি জাগ্রত হইব, তখনি সমস্ত বিলুপ্ত হইবে।

কিন্তু আমাদের বর্তমান অবস্থায় দেশের সকল কর্ম করিবার স্বাধীনতা দেশের লোকের থাকিতে পারে না। বিদেশী রাজার কর্তৃত্ব স্বভাবতই কতকগুলি বিষয়ে আমাদের শক্তিকে সংকীর্ণ করিবেই। ইংরেজ আমাদের অস্ত্র হরণ করিয়াছে, সুতরাং অস্ত্র প্রয়োগ করিবার অভ্যাস ও শক্তি ভারতবর্ষের লোককে হারাইতে হইতেছে। বিদেশী আক্রমণ হইতে দেশকে রক্ষা করিবার শক্তি ইংরেজ এদেশের লোকের হাতে রাখিবে না। এমন আরো অনেকগুলি শক্তি আছে, যাহার উৎকর্ষসাধনে ইংরেজ স্বভাবতই আমাদিগকে সাহায্য করিবে না, বরঞ্চ বাধা দিবে।

তথাপি, স্বদেশের মঙ্গল সাধন করিবার স্বাধীনতা আমাদের হাত হইতে সম্পূর্ণ হরণ করা কাহারো সাধ্য নাই। যে যে স্থানে আমাদের সেই স্বাধীনতার ক্ষেত্র আছে, সেই সকল স্থানেও আমরা যদি জড়ত্ববশত বা ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকারের অনিচ্ছাবশত নিজের স্বাধীন শক্তিকে প্রতিষ্ঠিত না করি, এমন-কি, আমাদের বিধিদত্ত স্বাতন্ত্র্যকে গায়ে পড়িয়া পরের হাতে সমর্পণ করি, তবে দেবে মানবে কোনো দিন কেহ আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবে না।

এই কথা লইয়া বাংলাদেশে কিছুদিন আলোচনা চলিতেছিল— এমন-কি, দেশের বিদ্যাশিক্ষাকে স্বাধীনতা দিবার চেষ্টা কেহ কেহ নিজের সাধ্যমতো সামান্যভাবে আরম্ভ করিয়াছিলেন। সেই আলোচনা ও সেই চেষ্টা সম্বন্ধে সাধারণের মনের ভাব ও আনুকূল্য কীরূপ ছিল, তাহা কাহারো অগোচর নাই।

ইতিমধ্যে বঙ্গবিভাগ লইয়া একটা আন্দোলনের ঝড় উঠিল। রাগের মাথায় অনেকে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, যে পর্যন্ত না পার্টিশন রহিত হইবে, সে পর্যন্ত তাঁহারা বিলাতি দ্রব্য কেনা রহিত করিবেন। সে সময়ে কেহ কেহ বলিয়াছিলেন— পরের উপরে রাগ করিয়া নিজের হিত করিবার চেষ্টা স্থায়ী হয় না; আমরা পরাধীন জাতির

মজ্জাগত-দুর্বলতাবশত মুগ্ধভাবে বিলাতি জিনিসের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছি, যদি মোহপাশ বিচ্ছিন্ন করিয়া স্বদেশী বস্তুর অভিমুখে ফিরিতে পারি, তবে স্বদেশ একটি নূতন শক্তি লাভ করিবে। যে-সকল দ্রব্য ত্যাগ করিব, তাহা অপেক্ষা যে শক্তি লাভ করিব তাহার মূল্য অনেক বেশি। এক শক্তি আর-এক শক্তিকে আকর্ষণ করে— বলিষ্ঠভাবে ত্যাগ করিবার শক্তি বলিষ্ঠভাবে অর্জন করিবার শক্তিকে আকর্ষণ করিয়া আনে। এ-সকল কথা যদি সত্য হয়, তবে পার্টিশনের সঙ্গে বিদেশী-বর্জনকে জড়িত করা শ্রেয় নহে। মনে আছে এই আলোচনাও তখন অনেকের পক্ষে বিরক্তির কারণ হইয়াছিল।

তাহার পরে মফস্বল বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষদের প্রতি কর্তৃপক্ষ এক ন্যায়বিগর্হিত সুবুদ্ধিবিবর্জিত সার্কুলর জারি করিলেন। তখন ছাত্রমণ্ডলী হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া পণ করিতে বসিলেন যে আমরা বর্তমান যুনিভার্সিটিকে 'বয়কট' করিব, আমরা এ বিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিব না, আমাদের জন্য অন্য বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হউক।

অবশ্য এ কথা আমরা অনেকদিন হইতে বলিয়া আসিতেছি যে, দেশের বিদ্যালয় সম্পূর্ণ দেশীয়ের আয়ত্তাধীন হওয়া উচিত। গম্ভীরভাবে দৃঢ়ভাবে সেই ঔচিত্য বুঝিয়া দেশের শিক্ষাকে স্বাধীন করিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হওয়া দরকার। কিন্তু এই চেষ্টা যদি কোনো সাময়িক উত্তেজনা বা ক্ষণিক রাগারাগির দ্বারা প্রবর্তিত হয়, তবে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না।

অনেক সময়ে প্রবর্তক কারণ নিতান্ত তুচ্ছ এবং সাময়িক হইলেও তাহার ফল বৃহৎ ও স্থায়ী হইয়া থাকে। জগতের ইতিহাসে অনেক বিশাল ব্যাপারের প্রারম্ভ দীর্ঘকাল ধরিয়া একটি আকস্মিক ক্ষণিক আঘাতের অপেক্ষা করিয়া থাকে ইহা দেখা গেছে। শিক্ষাসম্বন্ধে ও অন্যান্য নানা অভাবের প্রতিকার সম্বন্ধে এ দেশের স্বাধীন শক্তি ও স্বাধীন চেষ্টার উদ্‌বোধন সম্ভবত বর্তমান আন্দোলনের প্রতীক্ষায় ছিল, অতএব এই উপলক্ষকে অবজ্ঞা করিতে পারা যায় না।

তথাপি স্থায়ী মঙ্গল যে উদ্যোগের লক্ষ্য, আকস্মিক উৎপাতকে সে আপনার সহায় করিতে আশঙ্কা বোধ না করিয়া থাকিতে পারে না। যে দেশ আপনার প্রাণগত অভাব অনুভব করিয়া কোনো ত্যাগসাধ্য ক্লেশসাধ্য মঙ্গল অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতে পারে নাই, পরের প্রতি রাগ করিয়া আজ সেই দেশ যে স্থায়ীভাবে কোনো দুষ্কর তপশ্চরণে নিযুক্ত হইবে, এরূপ শ্রদ্ধা রক্ষা করা বড়োই কঠিন। রাগারাগির স্টিম চিরদিন জ্বালাইয়া রাখিবে কে এবং রাখিলেই বা মঙ্গল কী? গ্যাস ফুরাইলেই যদি বেলুন মাটিতে আছাড় খাইয়া পড়ে, তবে সেই বেলুনে বাস্তবাড়ি স্থাপনের আশা করা চলে না। আজ যাঁহারা অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া বলিতেছেন আমাদের এখনি আস্ত একটি বিশ্ববিদ্যালয় চাই, কালই সেখানে পরীক্ষা দিতে যাইব তাঁহাদিগকে দেশীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার স্থায়ী সহায় বলিয়া মনে করিতে সাহস হয় না। এমন-কি, তাঁহারা ইহার বিঘ্নস্বরূপও হইতে পারেন।

কারণ, তাঁহারা স্বভাবতই অসহিষ্ণু অবস্থায় রহিয়াছেন। তাঁহারা কোনো মতেই ধৈর্য ধরিতে পারিতেছেন না। প্রবল ক্ষমতাশালী পক্ষের প্রতি রাগ করিয়া যখন মনে জেদ জন্মে তখন অতি সত্বর যে অসাধ্য সাধন করিবার ইচ্ছা হয়, তাহা ইন্দ্রজালের দ্বারাই সম্ভব। সেই ইন্দ্রজাল ক্ষণকালের জন্য, একটা বৃহৎ বিভ্রম বিস্তার করে মাত্র, তাহার উপর নির্ভর করা যায় না।

কিন্তু মায়ার ভরসা ছাড়িয়া দিয়া যদি যথার্থ কাজের প্রত্যাশা করা যায়, তবে ধৈর্য ধরিতেই হইবে। ভিত্তি হইতে আরম্ভ করিতে হইবে, ছোটো হইতে বড়ো করিতে হইবে। অনিবার্য বিলম্বকর হইলেও কাজের নিয়মকে স্বীকার করিতেই হইবে।

ছোটো আরম্ভের প্রতি ধৈর্য রক্ষা করা যথার্থ প্রীতির লক্ষণ। সেইজন্য শিশুকে মানুষ করিয়া তুলিতে পিতৃমাতৃস্নেহের প্রয়োজন হয়। যথার্থ স্বদেশ প্রীতির প্রবর্তনায় যখন আমরা কোনো কাজ আরম্ভ করি, তখন ক্ষুদ্র আরম্ভের প্রতিও আমরা অন্তরের সমস্ত স্নেহ ঢালিয়া দিতে পারি। তখন কেবল এই ভয় হইতে থাকে, পাছে অতিরিক্ত প্রলোভনের তাগিদে তাড়াহুড়া করিয়া সমস্ত নষ্ট হইয়া যায়।

কিন্তু বিপক্ষপক্ষের প্রতি স্পর্ধা করিয়া যখন আমরা কোনো উদ্যোগে প্রবৃত্ত হই তখন আমাদের বিলম্ব সয় না। তখন আমরা এক মুহূর্তেই শেষকে দেখিতে চাই, আরম্ভকে দুই চক্ষে দেখিতে পারি না। সেইজন্য আরম্ভকে আমরা কেবলই বার বার আঘাত করিতে থাকি।

দেশীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগে প্রথম হইতেই আমাদের এই যে আঘাতকর অধৈর্যের লক্ষণ দেখা যাইতেছে, ইহাই আমাদের আশঙ্কার বিষয়। কাজের সূত্রপাত হইতেই আমরা বিবাদ শুরু করিয়াছি। আমাদের যাঁহার যতটুকু মনের মতো না হইতেছে, যাঁহার যে পরিমাণ কল্পনাবৃত্তি অপরিতৃপ্ত থাকিতেছে, তিনি তাঁহার চতুর্গুণ আক্রোশের সহিত এই উদ্যোগকে আঘাত করিতেছেন। এ কথা বলিতেছেন না 'আচ্ছা হউক, পাঁচজনে মিলিয়া কাজটা আরম্ভ হউক,— কোনো জিনিস যে আরম্ভেই একেবারেই নিখুঁত সুন্দর এবং সর্ববাদীসম্মত হইয়া উঠিবে, এরূপ আশা করা যায় না ; কিন্তু এমন কোনো ব্যাপারকে যদি খাড়া করিয়া তোলা যায়, যাহা চিরদিনের মতো জাতীয় সম্বল হইয়া উঠে, তবে সমস্ত জাতির সুবুদ্ধি নিশ্চয়ই ক্রমে ক্রমে তাহাকে নিজের সম্পূর্ণ উপযোগী করিয়া তুলিবে।'

বাংলাদেশে স্বদেশী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য যে-সকল সভা-সমিতি বসিয়াছে, তাহার মধ্যে নানা মতের, নানা বয়সের, নানা দলের লোক সমবেত হইয়াছেন। ইঁহারা সকলে মিলিয়া যাহা-কিছু স্থির করিতেছেন, তাহা ইঁহাদের প্রত্যেকেরই সম্পূর্ণ মনঃপূত হইতে পারে না। এই-সকল সমিতির সঙ্গে বর্তমান লেখকেরও যোগ ছিল। প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ের যে শিক্ষাপ্রণালী ও নিয়ম নির্ধারিত হইয়াছে, লেখকের যদি সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকিত, তবে ঠিক সেরূপ হইত না সন্দেহ নাই ; কিন্তু তাহা লইয়া

লেখক বিবাদ করিতে প্রস্তুত নহেন। তিনি কাজ আরম্ভ হওয়াকেই সকলের চেয়ে বেশি মনে করেন। যদি তাঁহার মনোমতো প্রণালীই বাস্তবিক সর্বোৎকৃষ্ট হয়, তবে কাজ আরম্ভ হইলে পর সে প্রণালীর প্রবর্তন যথাকালে সম্ভবপর হইবে এ ধৈর্য তাঁহাকে রক্ষা করিতেই হইবে।

সাধারণের সম্মানভাজন শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ের আদর্শ রচনা সমিতির সভাপতি ছিলেন। তিনি যেরূপ চিন্তা, শ্রম, ও বিচক্ষণতাসহকারে আদর্শ রচনা কার্যে সহায়তা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেই হইবে। সর্ববিষয়ে তাঁহার সহিত মতের মিল হউক বা না হউক, তাঁহার দ্বারা পরিচালিত হইতে অন্তত আমার তো কোনো আপত্তি নাই।

কারণ, কাজের বেলা, একজনকে মানিতেই হইবে।— পাঠশালার ডিবেটিং ক্লাবকে সর্বত্র বিস্তার করা চলে না। সকলে মিলিয়া বাদবিতণ্ডা এবং পরস্পরের প্রত্যেক কথার অন্তহীন সমালোচনা এ কেবল সেই প্রকার বৈঠকেই শোভা পায়, যাহার পরিণাম কেবল তর্ক। আমাদের তর্কের দিন যদি গিয়া থাকে, আমাদের কাজের সময় যদি উপস্থিত হইয়া থাকে, তবে প্রত্যেককেই প্রধান হইবার চেষ্টা না করিয়া বিনয়ের সহিত একজনের নায়কতা স্বীকার করিতেই হইবে।

শিক্ষাচালনার নায়কপদ দেশ কাহাকে দিবে তাহা এখনো স্থির হয় নাই, কিন্তু তাহা অনুমান করা দুঃসাধ্য নহে। বর্তমান লেখকের মনে সন্দেহ নাই যে এই শিক্ষা ব্যাপারের কাণ্ডারীপদ হইতে যদি কোনো কারণে গুরুদাসবাবু অবসর গ্রহণ করেন, তবে ইহার উপর হইতে দেশের শ্রদ্ধা চলিয়া যাইবে। নূতন বিদ্যালয়ের প্রবর্তন ব্যাপারে গুরুদাসবাবুকে প্রধান স্থান দিবার নানা কারণ আছে, তাহার মধ্যে একটি গুরুতর কারণ এই যে, দেশের বর্তমান আন্দোলন ব্যাপারে তাঁহাকে একেবারে অভিভূত করিতে পারে নাই। তিনি এই আন্দোলনের সুবিধাটুকুর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ইহার আঘাতের প্রতি অমনোযোগী হইবেন না। কোটালের জোয়ারে নৌকাকে কেবল অগ্রসর করে তাহা নহে, ডুবাইতেও পারে। প্রবল জোয়ারের বেগ হইতে আত্মরক্ষার জন্য সবলে হাল বাগাইয়া ধরা চাই। ভাসিয়া যাওয়াই লক্ষ্য নহে গম্যস্থানে পৌঁছানোই লক্ষ্য— আন্দোলনের উত্তেজনায় এ কথা আমরা বারংবার ভুলিয়া থাকি। আপাতত কর্তৃপক্ষের প্রতি স্পর্ধা প্রকাশ করিয়া আমাদের ক্ষুব্ধ হৃদয়ের পরিতৃপ্তি হইতে পারে, কিন্তু কার্যসিদ্ধিতেই আমাদের চিরন্তন কল্যাণ এ কথা যাঁহারা এক মুহূর্ত ভোলেন না, দেশের সংকটের সময় তাঁহাদের হাতেই হার ছাড়িয়া দিতে হয়। যখন রাগের মাথায় সর্বস্ব খোয়াইয়া মকর্দমা জিতিবারই জেদ জন্মায়, তখনই শান্তচিত্ত প্রবীণ অভিভাবকের প্রয়োজন। সম্প্রতি আমরা সমস্ত স্বীকার করিয়া স্বর্ধা প্রকাশ করাকেই আমাদের চরম লক্ষ্য বলিয়া মনে করিতেছি, এমন অবস্থায় যদি দেশের কোনো স্থায়ী মঙ্গলকর কর্মকে সফলতার দিকে লইয়া যাইতে হয়, তবে গুরুদাসবাবুর মতো লোকের

প্রয়োজন। স্পর্ধা প্রকাশের জন্য সভা উত্তম, সংবাদপত্রও উত্তম, কিন্তু জাতীয়বিদ্যালয় নৈব নৈব চ।

যাহাই হউক, আমাদের সংকল্পিত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে অথবা তাহা ভাঙিয়া চুরিয়া যাইবে তাহা জানি না। যদি দেশ যথার্থভাবে এ কাজের জন্য প্রস্তুত না হইয়া থাকে, যদি আমরা এক উদ্দেশ্য করিয়া আর-একটা জিনিস গড়িবার আয়োজন করিয়া থাকি, তবে আমাদের জল্পনা কল্পনা বৃথা হইয়া যাইবে। সেজন্য ক্ষোভ করা বৃথা। ইহা নিঃসন্দেহ, দেশ যদি বাঁচিতে চায়, তবে আজ না হউক কাল পুনরায় এই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইবে। এখন যদি আমাদের আয়োজন পণ্ডও হয়, তবে যথাকালে ভবিষ্যৎ উদ্যোগের সময় এই প্রয়াসের ইতিহাস শিক্ষাপ্রদ হইবে মনে করিয়া বর্তমান শিক্ষাসম্বন্ধীয় আন্দোলনের সমস্ত ঘটনা পরে পরে বিবৃত করা যাইতেছে।[১]

৫

সংস্কৃত প্রবেশ : হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদকের নিবেদন

ভাষার সহিত কিছুমাত্র পরিচয় হইবার পূর্বেই শিশুদিগকে তাহার ব্যাকরণ শিখাইতে আরম্ভ করা, ভাষা শিক্ষার সদুপায় বলিয়া আমি গণ্য করি না।

এইজন্য আমার গৃহে বালক-বালিকাদিগকে যখন সংস্কৃত শিখাইবার সময় উপস্থিত হইল, তখন আর কোনো সুবিধা না দেখিয়া নিজে একটি সংস্কৃতপাঠ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম।

তাহাতে গোড়া হইতে প্রয়োগ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই ভাষা শিক্ষা ও ভাষার সহিত পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ ব্যাকরণ শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় আমার যে স্বল্পমাত্র অধিকার আছে, তাহাতে আমার কিছুদূর পর্যন্ত প্রণালী নির্দেশ করিয়া দেওয়াই শোভা পায়— সংকটের আশঙ্কা করিয়া তাহার অধিক অগ্রসর হইতে পারি নাই।

বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপিত হইলে পর, সেখানকার ছাত্রদের যখন সংস্কৃত শিক্ষার সুপ্রণালী অনুসরণ করা আবশ্যক বোধ করিলাম, তখন আদর্শস্বরূপ 'সংস্কৃত প্রবেশ' প্রথম কিয়দংশ লিখিয়া, ব্রহ্মচর্যাশ্রমের সুযোগ্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের হস্তে উহা শেষ করিবার জন্য সমর্পণ করিয়া দিলাম।

---

১. এ বিষয়ে আরও দ্রষ্টব্য প্রসঙ্গ-নির্দেশ অংশ।

তিনি এই প্রণালী অনুসারে অধ্যয়ন করাইতে গিয়া, ইহার সফলতার প্রমাণ পাইয়াছেন এবং উৎসাহের সহিত এই গ্রন্থ রচনা সমাধা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

বয়স্ক লোকের মধ্যে যাঁহারা ঘরে বসিয়া অল্পকালের মধ্যে শিক্ষকের সাহায্য ব্যতীত সংস্কৃত ভাষা শিখিতে ইচ্ছা করেন, এই গ্রন্থে তাঁহাদেরও বিশেষ উপকার হইবে, আশা করিয়া, ইহা সাধারণের নিকট প্রকাশ করিলাম।[১]

৬

ঠাকুরমা'র ঝুলি : দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার

ঠাকুরমার ঝুলিটির মতো এত বড়ো স্বদেশী জিনিস আমাদের দেশে আর কি আছে? কিন্তু হায় এই মোহন ঝুলিটিও ইদানীং ম্যাঞ্চেস্টারের কল হইতে তৈরি হইয়া আসিতেছিল। এখানকার কালে বিলাতের 'Fairy Tales' আমাদের ছেলেদের একমাত্র গতি হইয়া উঠিবার উপক্রম করিয়াছে। স্বদেশের দিদিমা কোম্পানি একেবারে দেউলে। তাঁদের ঝুলি ঝাড়া দিলে কোনো কোনো স্থলে মার্টিনের এথিক্স এবং বার্কের ফরাসি বিপ্লবের নোট বই বাহির হইয়া পড়িতে পারে, কিন্তু কোথায় গেল— রাজপুত্র পাত্তরের পুত্র, কোথায় বেঙ্গমা-বেঙ্গমী, কোথায়— সাত সমুদ্র তেরো নদী পারের সাত রাজার ধন মানিক!

পাল পার্বণ যাত্রা গান কথকতা— এ সমস্তও ক্রমে মরা নদীর মতো শুকাইয়া আসাতে, বাংলাদেশের পল্লীগ্রামে যেখানে রসের প্রবাহ নানা শাখায় বহিত, সেখানে শুষ্ক বালু বাহির হইয়া পড়িয়াছে। ইহাতে বয়স্ক লোকদের মন কঠিন স্বার্থপর এবং বিকৃত হইবার উপক্রম হইতেছে। তাহার পরে দেশের শিশুরাও কোন্ পাপে আনন্দের রস হইতে বঞ্চিত হইল। তাহাদের সায়ংকালীন শয্যাতল এমন নীরব কেন? তাহাদের পড়াঘরের কেরোসিন্-দীপ্ত টেবিলের ধারে যে গুঞ্জনধ্বনি শুনা যায় তাহাতে কেবল

---

১. প্রথম সংস্করণে এর পর আরো ছিল : এই গ্রন্থের পাঠ্য অংশ এবং পাঠচর্চা রহিয়াছে, ইহার শেষাংশে শিক্ষকভাগে সমস্ত বুঝাইয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এই অংশের সহিত মিলাইয়া প্রতিদিন আধঘণ্টা করিয়া চর্চা করিয়া গেলে শিক্ষিত ব্যক্তিগণ অল্পকালের মধ্যে সংস্কৃত ভাষায় প্রবেশ লাভ করিতে পারিবেন. এই আমাদের বিশ্বাস। সংস্কৃত এমন দুরূহ ভাষা যে, তাহাতে শিশুপাঠ্য প্রণয়ন করিতে গেলেও ভুল ত্রুটির হাত এড়াইয়া চলা কঠিন। এইজন্য পাঠকগণের নিকট বিনয়ের সহিত আমরা সংসোধনের সহায়তা প্রার্থনা করি। উত্তর সংস্করণে যাহাতে এই গ্রন্থ বিশুদ্ধতর ও সম্পূর্ণতর হইয়া উঠে, পণ্ডিতমাত্রের নিকট আমরা সে সম্বন্ধে আনুকূল্যের ভিক্ষা নিবেদন করিয়া রাখিলাম।

আমরা পরবর্তী সংস্করণের ভূমিকাটিই গ্রহণ করেছি, কারণ এখানেই হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে রচয়িতা হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে।—সম্পাদক।

বিলাতি বানান-বহির বিভীষিকা। মাতৃদুগ্ধ একেবারে ছড়াইয়া লইয়া কেবলই ছোলার ছাতু খাওয়াইয়া মানুষ করিলে ছেলে কি বাঁচে।

কেবলই বইয়ের কথা! স্নেহময়ীদের মুখের কথা কোথায় গেল! দেশলক্ষ্মীর বুকের কথা কোথায়!

এই যে আমাদের দেশের রূপকথা বহুযুগের বাঙালি বালকের চিত্তক্ষেত্রের উপর দিয়া অশ্রান্ত বহিয়া কত বিপ্লব, কত রাজ্য পরিবর্তনের মাঝখান দিয়া অক্ষুণ্ণ চলিয়া আসিয়াছে, ইহার উৎস সমস্ত বাংলাদেশের মাতৃস্নেহের মধ্যে। সে স্নেহ দেশের রাজেশ্বর রাজা হইতে দীনতম কৃষককে পর্যন্ত বুকে করিয়া মানুষ করিয়াছে, সকলকেই শুক্ল সন্ধ্যায় আকাশে চাঁদ দেখাইয়া ভুলাইয়াছে এবং ঘুমপাড়ানি গানে শান্ত করিয়াছে, নিখিল বঙ্গদেশের সেই চির পুরাতন গভীরতম স্নেহ হইতে এই রূপকথা উৎসারিত।

অতএব বাঙালির ছেলে যখন রূপকথা শোনে তখন কেবল যে গল্প শুনিয়া সুখী হয়, তাহা নহে— সমস্ত বাংলাদেশের চিরন্তন স্নেহের সুরটি তাহার তরুণ চিত্তের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, তাহাকে যেন বাংলার রসে রসাইয়া লয়।

দক্ষিণারঞ্জনবাবুর ঠাকুরমা'র ঝুলি বইখানি পাইয়া, তাহা খুলিতে ভয় হইতেছিল। আমার সন্দেহ ছিল, আধুনিক বাংলার কড়া ইস্পাতের মুখে ঐ সুরটা পাছে বাদ পড়ে। এখনকার কেতাবি ভাষায় ঐ সুরটি বজায় রাখা বড়ো শক্ত। আমি হইলে তো এ কাজে সাহসই করিতাম না। ইতিপূর্বে কোনো কোনো গল্পকুশলা অথচ শিক্ষিতা মেয়েকে দিয়া আমি রূপকথা লিখাইয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছি— কিন্তু হউক মেয়েলি হাত, তবুও বিলাতি কলমের যাদুতে রূপকথায় কথাটুকু থাকিলেও সেই রূপটি ঠিক থাকে না; সেই চিরকালের সামগ্রী এখনকার কালের হইয়া উঠে।

কিন্তু দক্ষিণাবাবুকে ধন্য। তিনি ঠাকুরমা'র মুখের কথাকে ছাপার অক্ষরে তুলিয়া পুঁতিয়াছেন তবু তাহার পাতাগুলি প্রায় তেমনি সবুজ, তেমনি তাজাই রহিয়াছে; রূপকথার সেই বিশেষ ভাষা, বিশেষ রীতি, তাহার সেই প্রাচীন সরলতাটুকু, তিনি যে এতটা দূর রক্ষা করিতে পারিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার সূক্ষ্ম রসবোধ ও স্বাভাবিক কলানৈপুণ্য প্রকাশ পাইয়াছে।

এক্ষণে আমার প্রস্তাব এই যে, বাংলাদেশের আধুনিক দিদিমাদের জন্য অবিলম্বে একটা স্কুল খোলা হউক এবং দক্ষিণাবাবুর এই বইখানি অবলম্বন করিয়া শিশু-শয়ন-রাজ্যে পুনর্বার তাঁহারা নিজেদের গৌরবের স্থান অধিকার করিয়া বিরাজ করিতে থাকুন।

বোলপুর
২০ ভাদ্র ১৩১৪

সরল কৃত্তিবাস অর্থাৎ কৃত্তিবাস-প্রণীত সপ্তকাণ্ড রামায়ণ : যোগীন্দ্রনাথ বসু

ভূমিকা

এককালে আমাদের দেশের যে কেহ অক্ষরমাত্র পড়িতে জানিত, সেও কৃত্তিবাসের রামায়ণ এবং কাশীরাম দাসের মহাভারত না পড়িয়া ছাড়িত না ; যাহার অক্ষরবোধ ছিল না, সে অন্যের মুখ হইতে শুনিত। এই রামায়ণ, মহাভারত আমাদের সমস্ত জাতির মনের খাদ্য ছিল ; এই দুই মহাগ্রন্থই আমাদের মনুষ্যত্বকে দুর্গতি হইতে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। আজকাল আমরা যাহাকে শিক্ষিত সম্প্রদায় বলি, সেই সমাজে এই দুই গ্রন্থ এখন আর কেহ পড়ে না। অথচ জনসাধারণের মধ্যে এখনো এই দুই গ্রন্থের আদর রহিয়াছে।

এমন অবস্থায় সাধারণ লোকের সঙ্গে ইংরাজি বিদ্যালয়ের ছাত্রদের একটা অপরিচয়ের বিচ্ছেদ না ঘটিয়া থাকিতে পারে না। যে শিক্ষায় এ দেশের লোককে নিজের দেশকে চিনিতে দেয় না, সে যে নিতান্তই অসম্পূর্ণ শিক্ষা এ কথা অধিক করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই।

মহানদী যেমন সকল দেশে নাই, তেমনি মহাকাব্য পৃথিবীর অল্প জাতির ভাগ্যেই জুটিয়াছে। আবার যে দেশের মহাকাব্য রামায়ণ মহাভারত সে দেশের সৌভাগ্যের অন্ত নাই। এই সৌভাগ্যের ফল যে কত সুদূর-বিস্তৃত, তাহা আমাদের স্বাভাবিক ঔদাসীন্যবশতই, আমরা চিন্তা করিয়া দেখি না। এ কথা আমাদের নিশ্চিত জানা উচিত যে, ভাগীরথী ও ব্রহ্মপুত্রের শাখা-প্রশাখা যেমন আমাদের বঙ্গভূমিকে জলে ও শস্যে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে, ঘরে ঘরে চিরদিন ধরিয়া যেমন আমাদের ক্ষুধার অন্ন ও তৃষ্ণার জল জোগাইয়া আসিতেছে— কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরামের মহাভারতও তেমনি করিয়া চিরদিন আমাদের মনের অন্ন, পানের অক্ষয়-ভাণ্ডার হইয়া রহিয়াছে। এ দুটি গ্রন্থ না থাকিলে আমাদের মানস-প্রকৃতিতে কীরূপ শুষ্কতা ও চির-দুর্ভিক্ষ বিরাজ করিত, তাহা আজ আমাদের পক্ষে কল্পনা করাও কঠিন।

অতএব বিশেষভাবে এই দুই গ্রন্থের সহিত পরিচয় প্রত্যেক বাঙালি ছাত্রের শিক্ষার অঙ্গ হওয়া উচিত। অবশ্য এই দুই মহাকাব্যে এমন অনেক কথা আছে, যাহা ছোটো ছেলে-মেয়েদের পাঠের উপযুক্ত নহে ; তাহা ছাড়া এত বৃহৎ দুটি গ্রন্থ বিদ্যালয়ে পাঠ্য হইলে পড়াইয়া শেষ করিবার সময় পাওয়া যাইবে না।

এইজন্য আমি কৃত্তিবাসের রামায়ণকে সংক্ষিপ্ত করিয়া লইয়া বিদ্যালয়ের উপযোগী করিয়া তুলিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইতেছিলাম। এমন সময় শুনিতে পাইলাম, শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ও এই কার্যে নিযুক্ত আছেন।

যোগীন্দ্রবাবুর মতো লোক এই কাজের ভার লইয়াছেন শুনিয়া আমি নিজেকে দায়মুক্ত জ্ঞান করিলাম। বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার সকল চেষ্টাই সফল হইয়াছে, এ চেষ্টাও ব্যর্থ হইবে না। এখন কেবল অপেক্ষা করিয়া রহিলাম, তিনি কাশীরামের মহাভারত, কবিকঙ্কণের চণ্ডী প্রভৃতি প্রাচীন কাব্যগুলিকে সংক্ষিপ্ত আকারে পরিণত করিয়া বাংলার শিশু-সাহিত্যের পুষ্টিসাধন করিতে থাকিবেন।

এইখানে একটি কথার আলোচনা আবশ্যক। অনেকে এমন কথা বলিতে পারেন যে, বাল্মীকির রামায়ণ ও ব্যাসের মহাভারতই বিশুদ্ধ আদিকাব্য। কৃত্তিবাস ও কাশীরামের বাংলার মূল কাব্যের অনেক বিকার ঘটিয়াছে। অতএব ছাত্রদিগকে উক্ত বিশুদ্ধ মূল কাব্যেরই অনুবাদ পড়ানো উচিত।

মূল কাব্যের বিশুদ্ধ অনুবাদ ছাত্রেরা পাঠ করে, সে তো ভালোই, কিন্তু কৃত্তিবাস ও কাশীরাম দাসের কাব্য কেবল মূল রামায়ণ ও মহাভারতের আখ্যানভাগ জানাইবার জন্যই ব্যবহার্য, এমন কথা আমরা বলি না।

রামায়ণ, মহাভারত, বাংলা সাহিত্যের এবং বিশেষভাবে বাঙালির সামগ্রী। মূল আখ্যানকে অবলম্বন করিয়া বাঙালির হাতে তাহারা স্বতন্ত্র মহাকাব্য হইয়া উঠিয়াছে। এই বাংলা মহাকাব্যে কবি বাল্মীকির বা বেদব্যাসের সময়ের সামাজিক আদর্শ রক্ষিত হয় নাই, ইহার মধ্যে প্রাচীন বাংলাসমাজেরই হৃদয় আপনাকে ব্যক্ত করিয়াছে।

বাল্মীকির রামায়ণের সহিত কৃত্তিবাসের রামায়ণের তুলনা করিলে দেখা যাইবে, বাল্মীকি তাঁহার রামচন্দ্রকে বিশেষভাবে মানব মহত্ত্বের আদর্শস্থল করিয়া তুলিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, তাঁহার রাম, সীতা, লক্ষ্মণ, হনুমান প্রভৃতি সকলেই সকলপ্রকার মানব সম্বন্ধের মাহাত্ম্যকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছেন। পিতার সহিত পুত্রের, ভ্রাতার সহিত ভ্রাতার, পতির সহিত পত্নীর, প্রভুর সহিত ভৃত্যের, রাজার সহিত প্রজার সম্বন্ধগুলিকে, দুর্বহ করিয়া তুলিয়াও, কবি তাঁহার কাব্যের পাত্রগুলিকে সমস্ত বাধার উপর জয়ী করিয়াছেন।

কৃত্তিবাসের রামায়ণে এই মানব-ধর্মের উপরেই দেবধর্মই বিশেষরূপে প্রকাশ পাইয়াছে। ভক্তকে লইয়া ভক্তবৎসলের লীলাই বাংলা রামায়ণে বিশেষ রস সঞ্চার করিয়াছে। সংস্কৃত রামায়ণে কবি বাল্মীকির ও কৃত্তিবাসের রামায়ণে দস্যু-রত্নাকরের রামচরিত রচনায় প্রবৃত্ত হইবার যে দুই আখ্যান আছে, তাহা তুলনা করিয়া দেখিলেই দুই রামায়ণের মূলগত ভাবের পার্থক্য স্পষ্ট দেখা যাইবে। করুণাপূর্ণ হৃদয়ের স্বাভাবিক মহত্ত্বে বাল্মীকিকে এবং ভক্তির অলৌকিক শক্তিতে রত্নাকরকে কবি করিয়া তুলিয়াছে। পাপিষ্ঠ রত্নাকর রামচরিত গান করিয়া পরিত্রাণ পাইয়াছে, পুণ্যবান মহর্ষি রামচরিত অবলম্বন করিয়া নিজের মহোচ্চ কাব্যশক্তিকে যথার্থভাবে সফল করিয়া তুলিয়াছেন। বাংলাদেশে যে এক সময়ে সমস্ত জনসাধারণকে একটা ভক্তির প্লাবনে প্লাবিত করিয়া তুলিতেছিল; সেই ভক্তিধারার অভিষেকে উচ্চ-নীচ, জ্ঞানী-মূর্খ, ধনী-দরিদ্র

সকলেই এক আনন্দের মহাযজ্ঞে সম্মিলিত হইয়াছিল— বাংলা রামায়ণ, বিশেষভাবে বাংলাদেশের সেই ভক্তিযুগের সৃষ্টি। বাংলাদেশে সেই যে, এক সময়ে একটি নবোৎসাহের নব-বসন্ত আসিয়াছিল, সেই উৎসবকালের কাব্যগুলি বাঙালির ছেলে যদি শ্রদ্ধাপূর্বক পাঠ করে, তবে দেশের যথার্থ ইতিহাসকে সজীবভাবে উপলব্ধি করিতে পারিবে।

বাঙালি সকল দিক হইতে আপন বাঙালিত্বের দ্বারা পরিপুষ্ট হইলেই তবে যথার্থভাবে সার্বজাতীয় মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারিবে। স্বদেশের ভূমি হইতে তাহার হৃদয়ের শিকড়গুলিকে বিচ্ছিন্ন করিলেই সে যে উদার মনুষ্যত্বের অধিকারী হইবে, তাহা কখনোই নহে। এইজন্য বাঙালির ছেলেকে বাংলা-সাহিত্য হইতে বঞ্চিত করা কোনো মতেই চলিবে না।

অতএব যোগীন্দ্রবাবু বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন ধারাকে আধুনিক বিদ্যালয়ের মধ্যে যে আবাহন করিয়া আনিতেছেন, ইহাতে আমাদের মৃত শিক্ষা প্রাণ পাইয়া উঠিবে এবং যোগীন্দ্রবাবুর এই কীর্তি দেশে স্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

৩০ শ্রাবণ ১৩১৪

কাদম্বরী : চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় -সম্পাদিত

ভূমিকা

প্রাচীন ভারতবর্ষের অনেক বিষয়ে অসামান্যতা ছিল সন্দেহ নাই। অন্যদেশে নগর হইতে সভ্যতার সৃষ্টি, আমাদের দেশে অরণ্য হইতে। বসনভূষণ ঐশ্বর্যের গৌরব— সর্বত্রই আছে, আর বিবসন নির্ভূষণ ভিক্ষাচর্যের গৌরব ভারতবর্ষেরই। অন্যান্য দেশ ধর্মবিশ্বাসে শাস্ত্রের অধীন, আহার বিহার আচারে স্বাধীন ; ভারতবর্ষ বিশ্বাসে বন্ধনহীন, আহার বিহার আচারে সর্বতোভাবে শাস্ত্রের অনুগত। এমন অনেক দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখানো যাইতে পারে, সাধারণ মানবপ্রকৃতি হইতে ভারতবর্ষীয় প্রকৃতি অনেক বিষয়ে স্বতন্ত্র। সেই অসামান্যতার আর-একটি লক্ষণ এই দেখা যায় যে, পৃথিবীর প্রায় সকল জাতিই গল্প শুনিতে ভালোবাসে ; কিন্তু কেবল প্রাচীন ভারতবর্ষেই গল্প শুনিতে কোনো ঔৎসুক্য ছিল না। সকল সভ্যদেশই আপন সাহিত্যে ইতিহাস, জীবনী ও উপন্যাস আগ্রহের সহিত সঞ্চয় করিয়া থাকে, ভারতবর্ষীয় সাহিত্যে তাহার চিহ্ন দেখা যায় না ;

যদি-বা ভারতসাহিত্যে ইতিহাস উপন্যাস থাকে, তাহার মধ্যে আগ্রহ নাই। বর্ণনা তত্ত্বালোচনা ও অবান্তর প্রসঙ্গে তাহার গল্পপ্রবাহ পদে পদে খণ্ডিত হইলেও প্রশান্ত ভারতবর্ষের ধৈর্যচ্যুতি দেখা যায় না। এগুলি মূল কাব্যের অঙ্গ না প্রক্ষিপ্ত, সে আলোচনা নিষ্ফল। কারণ, প্রক্ষেপ সহ্য করিবার লোক না থাকিলে প্রক্ষিপ্ত টিঁকিতে পারে না। পর্বতশৃঙ্গ হইতে নদী যদি-বা শৈবাল বহন করিয়া না আনে, তথাপি তাহার স্রোত ক্ষীণবেগ না হইলে তাহার মধ্যে শৈবাল জন্মিবার অবসর পায় না। ভগবদ্‌গীতার মাহাত্ম্য কেহ অস্বীকার করিতে পারিবে না। কিন্তু যখন কুরুক্ষেত্রের তুমুল যুদ্ধ আসন্ন তখন সমস্ত ভগবদ্‌গীতা অবহিত হইয়া শ্রবণ করিতে পারে, ভারতবর্ষ ছাড়া এমন দেশ জগতে আর নাই। কিষ্কিন্ধ্যা এবং সুন্দরকাণ্ডে সৌন্দর্যের অভাব নাই এ কথা মানি, তবু রাক্ষস যখন সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া গেল তখন গল্পের উপর অত বড়ো একটা জগদ্দল পাথর চাপাইয়া দিলে সহিষ্ণু ভারতবর্ষই কেবল তাহা মার্জনা করিতে পারে। কেনই-বা সে মার্জন করে? কারণ, গল্পের শেষ শুনিবার জন্য তাহারা কিছুমাত্র ক্লান্তি বোধ করে না।

আবার, গল্প শুনিবার আগ্রহ-অনুসারে গল্পের প্রকৃতিও ভিন্নরূপ হইয়া থাকে। ছয়টি কাণ্ডে যে গল্পটি বেদনা ও আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে একটি-মাত্র উত্তরকাণ্ডে তাহাকে অসংকোচে চূর্ণ করিয়া ফেলা কি সহজ ব্যাপার! আমরা লঙ্কাকাণ্ড পর্যন্ত এই দেখিয়া আসিলাম যে, অধর্মাচারী নিষ্ঠুর রাক্ষস রাবণই সীতার পর শত্রু। অসাধারণ শৌর্যে ও বিপুল আয়োজনে সেই ভয়ংকর রাবণের হাত হইতে সীতা যখন পরিত্রাণ পাইলেন তখন আমাদের সমস্ত চিন্তা দূর হইল; আমরা আনন্দের জন্য প্রস্তুত হইলাম। এমন সময় মুহূর্তের মধ্যে কবি দেখাইয়া দিলেন, সীতার চরম শত্রু অধার্মিক রাবণ নহে, সে শত্রু ধর্মনিষ্ঠ রাম; নির্বাসনে তাঁহার তেমন সংকট ঘটে নাই, যেমন তাঁহার রাজাধিরাজ স্বামী গৃহে। যে সোনার তরণী দীর্ঘকাল যুঝিয়া ঝড়ের হাত হইতে উদ্ধার পাইল, ঘাটের পাষাণে ঠেকিবামাত্র এক মুহূর্তে তাহা দুইখানা হইয়া গেল। গল্পের উপর যাহার কিছুমাত্র মমতা আছে সে কি এমন আকস্মিক উপদ্রব সহ্য করিতে পারে? যে বৈরাগ্য প্রভাবে আমরা গল্পের নানাবিধ প্রাসঙ্গিক ও অপ্রাসঙ্গিক বাধা সহ্য করিয়াছি সেই বৈরাগ্যই গল্পটির অকস্মাৎ অপঘাতমৃত্যুতে আমাদের ধৈর্য রক্ষা করিয়া থাকে।

মহাভারতেও তাই। এক স্বর্গারোহণ-পর্বেই কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধটার স্বর্গপ্রাপ্তি হইল। গল্পপ্রিয় ব্যক্তির কাছে গল্পের অবসান যেখানে মহাভারত সেখানে থামিলেন না, অত বড়ো গল্পটাকে বালুকানির্মিত খেলাঘরের মতো এক মুহূর্তে ভাঙিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন। সংসারের প্রতি এবং গল্পের প্রতি যাহাদের বৈরাগ্য তাহারা ইহার মধ্য হইতে সত্য লাভ করিল, এবং ক্ষুব্ধ হইল না। মহাভারতকে যে লোক গল্পের মতো করিয়া পড়িতে চেষ্টা করে সে মনে করে অর্জুনের শৌর্য অমোঘ, সে মনে করে শ্লোকের উপর শ্লোক গাঁথিয়া মহাভারতকার অর্জুনের জয়স্তম্ভ অভ্রভেদী করিয়া তুলিয়াছেন।

কিন্তু সমস্ত কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের পর হঠাৎ একদিন এক স্থানে অতি অল্প কথার মধ্যে দেখা গেল, এক দল সামান্য দস্যু কৃষ্ণের রমণীদিগকে অর্জুনের হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া গেল, নারীগণ কৃষ্ণসখা পার্থকে আহ্বান করিয়া আর্তস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন— অর্জুন গাণ্ডীব তুলিতে পারিলেন না। অর্জুনের এমন অভাবনীয় অবমানা যে মহাভারতকারের কল্পনায় স্থান পাইতে পারে তাহা পূর্ববর্তী অতগুলো পর্বের মধ্যে কেহ সন্দেহ করিতে পারে নাই। কিন্তু কাহারো উপর কবির মমতা নাই। যেখানে শ্রোতা বৈরাগী, লৌকিক শৌর্য বীর্য মহত্ত্বের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম স্মরণ করিয়া নিরাসক্ত, সেখানে কবিও নির্মম এবং কাহিনীও কেবলমাত্র কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য সর্বপ্রকার ভার মোচন করিয়া দ্রুতবেগ অবলম্বন করে না।

তাহার পর মাঝখানে সুদীর্ঘ বিচ্ছেদ পার হইয়া কাব্যসাহিত্যে একেবারে কালিদাসে আসিয়া ঠেকিতে হয়। ইতিপূর্বে ভারতবর্ষ চিত্তরঞ্জনের জন্য কী উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না। উৎসবে যে মাটির প্রদীপের সুন্দর দীপমালা রচনা হয় পরদিন তাহা কেহ তুলিয়া রাখে না ; ভারতবর্ষে আনন্দ-উৎসবে নিশ্চয়ই এমন অনেক মাটির প্রদীপ, অনেক ক্ষণিক সাহিত্য, নিশীথে আপন কর্ম সমাপন করিয়া প্রত্যুষে বিস্মৃতিলোক লাভ করিয়াছে। কিন্তু প্রথম তৈজস প্রদীপ দেখিলাম কালিদাসের ; সেই পৈতৃক প্রদীপ এখনো আমাদের ঘরে রহিয়া গেছে। আমাদের উজ্জয়িনীবাসী পিতামহের প্রাসাদ শিখরে তাহা প্রথম জ্বলিয়াছিল, এখনো তাহাতে কলঙ্ক পড়ে নাই। কেবল আনন্দদানকে উদ্দেশ্য করিয়া কাব্যরচনা সংস্কৃত সাহিত্যে কেবল কালিদাসে প্রথম দেখা গেল। (এখানে আমি খণ্ডকাব্যের কথা বলিতেছি, নাটকের কথা নহে)। মেঘদূত তাহার এক দৃষ্টান্ত। এমন দৃষ্টান্ত সংস্কৃত-সাহিত্যে বোধ করি আর নাই। যাহা আছে তাহা মেঘদূতেরই আধুনিক অনুকরণ, যথা পদাঙ্কদূত প্রভৃতি এবং তাহাও পৌরাণিক। কুমারসম্ভব রঘুবংশ পৌরাণিক বটে, কিন্তু তাহা পুরাণ নহে, কাব্য। তাহা চিত্তবিনোদনের জন্য লিখিত, তাহার পাঠফলে স্বর্গপ্রাপ্তির প্রলোভন নাই। ভারতবর্ষীয় আর্যসাহিত্যের ধর্মপ্রাণতা সম্বন্ধে যিনি যেমন মতবাদ প্রচার করুন, আশা করি, ঋতুসংহার পাঠে মোক্ষলাভের সহায়তা হইবে এমন উপদেশ কেহ দিবেন না।

কিন্তু তথাপি কালিদাসের কুমারসম্ভবে গল্প নাই, যেটুকু আছে সে সূত্রটি অতি সূক্ষ্ম এবং প্রচ্ছন্ন, এবং তাহাও অসমাপ্ত। দেবতারা দৈত্যহস্ত হইতে কোনো উপায়ে পরিত্রাণ পাইলেন কি না-পাইলেন সে সম্বন্ধে কবির কিছুমাত্র ঔৎসুক্য দেখিতে পাই না ; তাঁহাকে তাড়া দিবার লোক কেহ নাই। অথচ বিক্রমাদিত্যের সময় শক-হুন-রূপী শত্রুদের সঙ্গে ভারতবর্ষের খুব একটা দ্বন্দ্ব চলিতেছিল এবং স্বয়ং বিক্রমাদিত্য তাহার একজন নায়ক ছিলেন ; দেবদৈত্যের যুদ্ধ এবং স্বর্গের পুনরুদ্ধার-প্রসঙ্গ তখনকার শ্রোতাদের নিকট বিশেষ ঔৎসুক্যজনক হইবে এমন আশা করা যায়। কিন্তু কই?

রাজসভার শ্রোতাগণ দেবতাদের বিপৎপাতে উদাসীন। মদনভস্ম, রতি-বিলাপ, উমার তপস্যা, কোনোটাতেই ত্বরান্বিত হইবার জন্য কোনো উপরোধ দেখি না। সকলেই যেন বলিতেছেন, গল্প থাক্, এখন ঐ বর্ণনাটাই চলুক। রঘুবংশও বিচিত্র বর্ণনার উপলক্ষ মাত্র।

রাজশ্রোতারা যদি গল্পলোলুপ হইতেন তবে কালিদাসের লেখনী হইতে তখনকার কালের কতকগুলি চিত্র পাওয়া যাইত। হায়, অবন্তী-রাজ্যের নববর্ষার দিনে উদয়নকথাকোবিদ গ্রামবৃদ্ধেরা যে গল্প করিতেন, সে-সমস্ত গেল কোথায়? আসল কথা গ্রামবৃদ্ধেরা তখন গল্প করিতেন, কিন্তু সে গ্রামের ভাষায়, সে ভাষায় যে কবিরা রচনা করিয়াছেন, তাঁহারা যথেষ্ট আনন্দ দান করিয়াছেন, কিন্তু তাহার পরিবর্তে অমরতা লাভ করেন নাই। তাঁহাদের কবিত্ব অল্প ছিল বলিয়া যে তাঁহারা বিনাশ পাইয়াছেন এমন কথা বলি না। নিঃসন্দেহে তাঁহাদের মধ্যে অনেক মহাকবি জন্মিয়াছিলেন। কিন্তু গ্রাম্যভাষা প্রদেশবিশেষে বদ্ধ, শিক্ষিত-মণ্ডলী কর্তৃক উপেক্ষিত এবং কালে কালে তাহা পরিবর্তিত হইয়া আসিয়াছে। সে ভাষায় যাঁহারা রচনা করিয়াছেন তাঁহারা কোনো স্থায়ী ভিত্তি পান নাই; নিঃসন্দেহে অনেক বড়ো বড়ো সাহিত্যপুরী চলনশীল পলিমৃত্তিকার মধ্যে নিহিত হইয়া একেবারে অদৃশ্য হইয়া গেছে।

সংস্কৃতভাষা কথিত ভাষা ছিল না বলিয়াই সে ভাষায় ভারতবর্ষের সমস্ত হৃদয়ের কথা সম্পূর্ণ করিয়া বলা হয় নাই। ইংরেজি অলংকারে যে শ্রেণীর কবিতাকে Lyrics বলে তাহা মৃত ভাষায় সম্ভবে না। কালিদাসের বিক্রমোবর্শীতে যে সংস্কৃত গান আছে তাহাতেও গানের লঘুতা সরলতা ও মাধুর্যটুকু পাওয়া যায় না। বাঙালি জয়দেব সংস্কৃত ভাষাতে গান রচনা করিতে পারিয়াছেন, কিন্তু বাঙালি বৈষ্ণব কবিদের বাংলা পদাবলীর সহিত তাহার তুলনা হয় না।

মৃতভাষায়, পরের ভাষায় গল্পও চলে না; কারণ গল্পে লঘুতা এবং গতিবেগ আবশ্যক। ভাষা যখন ভাসাইয়া লইয়া যায় না, ভাষাকে যখন ভারের মতো বহন করিয়া চলিতে হয়, তখন তাহাতে গান এবং গল্প সম্ভব হয় না।

কালিদাসের কাব্য ঠিক স্রোতের মতো সর্বাঙ্গ দিয়া চলে না। তাহার প্রত্যেক শ্লোক আপনাতে আপনি সমাপ্ত; একবার থামিয়া দাঁড়াইয়া সেই শ্লোকটিকে আয়ত্ত করিয়া লইয়া তবে পরের শ্লোকে হস্তক্ষেপ করিতে হয়। প্রত্যেক শ্লোকটি স্বতন্ত্র হীরকখণ্ডের ন্যায় উজ্জ্বল, এবং সমস্ত কাব্যটি হীরকহারের ন্যায় সুন্দর, কিন্তু নদীর ন্যায় তাহার অখণ্ড কলধ্বনি এবং অবিচ্ছিন্ন ধারা নাই।

তা ছাড়া সংস্কৃত ভাষার এমন স্বরবৈচিত্র্য, ধ্বনিগাম্ভীর্য, এমন স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে— তাহাকে নিপুণরূপে চালনা করিতে পারিলে তাহাতে নানা যন্ত্রের এমন কন্সর্ট বাজিয়া উঠে, তাহার অন্তর্নিহিত রাগিণীর এমন একটি অনির্বচনীয়তা আছে যে কবিপণ্ডিতেরা বাঙ্‌নৈপুণ্য দ্বারা পণ্ডিত শ্রোতাদিগকে মুগ্ধ করিবার প্রলোভন সংবরণ

করিতে পারিতেন না। সেইজন্য যেখানে বাক্যকে সংযুক্ত করিয়া বিষয়কে দ্রুত অগ্রসর করিয়া দেওয়া আবশ্যক সেখানেও ভাষার প্রলোভন সংবরণ করা দুঃসাধ্য হয় এবং বাক্য বিষয়কে প্রকাশিত না করিয়া পদে পদে আচ্ছন্ন করিয়া দাঁড়ায়; বিষয়ের অপেক্ষা বাক্যই অধিক বাহাদুরি লইতে চেষ্টা করে এবং তাহাতে সফলও হয়। ময়ূরপুচ্ছনির্মিত এমন অনেক সুন্দর ব্যজন আছে যাহাতে ভালো বাতাস হয় না, কিন্তু বাতাস করিবার উপলক্ষ মাত্র লইয়া রাজসভায় কেবল তাহা শোভার জন্য সঞ্চালন করা হয়। রাজসভার সংস্কৃত কাব্যগুলিও ঘটনাবিন্যাসের জন্য তত অধিক ব্যগ্র হয় না; তাহার বাগ্‌বিস্তার উপমাকৌশল, বর্ণনানৈপুণ্য রাজসভাকে প্রত্যেক সঞ্চালনে চমৎকৃত করিতে থাকে।

সংস্কৃত সাহিত্যে গদ্যে যে দুই-তিনখানি উপন্যাস আছে তাহার মধ্যে কাদম্বরী সর্বাপেক্ষা প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। যেমন রমণীর তেমনি পদ্যেরও অলংকারের প্রতি টান বেশি; গদ্যের সাজসজ্জা স্বভাবতই কর্মক্ষেত্রের উপযোগী। তাহাকে তর্ক করিতে হয়, অনুসন্ধান করিতে হয়, ইতিহাস বলিতে হয়, তাহাকে বিচিত্র ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হয়— এইজন্য তাহার বেশভূষা লঘু, তাহার হস্তপদ অনাবৃত। দুর্ভাগ্যক্রমে সংস্কৃত গদ্য সর্বদা-ব্যবহারের জন্য নিযুক্ত ছিল না, সেইজন্য বাহ্যশোভার বাহুল্য তাহার অল্প নহে। মেদস্ফীত বিলাসীর ন্যায় তাহার সমাসবহুল বিপুলায়তন দেখিয়া সহজেই বোধ হয় সর্বদা চলা-ফেরার জন্য সে হয় নাই; বড়ো বড়ো টীকাকার ভাষ্যকার পণ্ডিত বাহকগণ তাহাকে কাঁধে করিয়া না চলিলে তাহার চলা অসাধ্য। অচল হোক কিন্তু কিরীটে কুণ্ডলে কঙ্কণে কণ্ঠমালায় সে রাজার মতো বিরাজ করিতে থাকে।

সেইজন্য বাণভট্ট যদিচ স্পষ্টত গল্প করিতে বসিয়াছেন, তথাপি ভাষার বিপুল গৌরব লাঘব করিয়া কোথাও গল্পকে দৌড় করান নাই। সংস্কৃত ভাষাকে অনুচরপরিবৃত সম্রাটের মতো অগ্রসর করিয়া দিয়া গল্পটি তাহার পশ্চাতে প্রচ্ছন্নপ্রায়ভাবে ছত্র বহন করিয়া চলিয়াছে মাত্র। ভাষার রাজমর্যাদা-বৃদ্ধির জন্য গল্পটির কিঞ্চিৎ প্রয়োজন আছে বলিয়াই সে আছে, কিন্তু তাহার প্রতি কাহারো দৃষ্টি নাই।

শূদ্রক রাজা কাদম্বরী গল্পের নায়ক নহেন— তিনি গল্প শুনিতেছেন মাত্র, অতএব তাঁহার পরিচয় সংক্ষিপ্ত হইলে কোনো ক্ষতি ছিল না। আখ্যায়িকার বহিরংশ যদি যথোপযুক্ত হ্রস্ব না হয়, তবে মূল আখ্যানের পরিমাণ সামঞ্জস্য নষ্ট হয়। আমাদের দৃষ্টিশক্তির ন্যায় আমাদের কল্পনা-শক্তিও সীমাবদ্ধ; আমরা কোনো জিনিসের সমস্তটা এক সঙ্গে সমান করিয়া দেখিতে পাই না— সম্মুখটা বড়ো দেখি, পশ্চাৎটা ছোটো দেখি, পৃষ্ঠদেশটা দেখি না, অনুমান করিয়া লই; এইজন্য শিল্পী তাঁহার সাহিত্যশিল্পের যে অংশটা প্রধানত দেখাইতে চান সেটাকে বিশেষরূপে গোচরবর্তী করিয়া বাকি অংশগুলিকে পার্শ্বে পশ্চাতে এবং অনুমান ক্ষেত্রে রাখিয়া দেন। কিন্তু কাদম্বরীকার

মুখ্য গৌণ ছোটো বড়ো কোনো কথাকেই কিছুমাত্র বঞ্চিত করিতে চান নাই। তাহাতে যদি গল্পের ক্ষতি হয়, মূল প্রসঙ্গটি দূরবর্তী হইয়া পড়ে তাহাতে তিনি বা তাঁহার শ্রোতারা কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নহেন, তথাপি কথা কিছু বাদ দিলে চলিবে না, কারণ কথা বড়ো সুনিপুণ, বড়ো সুশ্রাব্য ; কৌশলে, মাধুর্যে, গাম্ভীর্যে ধ্বনি ও প্রতিধ্বনিতে পূর্ণমান।

অতএব মেঘমন্দ্র মৃদঙ্গধ্বনির মতো কথা আরম্ভ হইল— অসীদ্ অশেষ-নরপতিশিরসমভর্চিতশাসনঃ পাকশাসন ইবাপরঃ— কিন্তু হায় আমার দুরাশা! কাদম্বরী হইতে সমগ্র পদ উদ্ধার করিয়া কাব্যরস আলোচনা করিব আমার ক্ষুদ্রায়তন প্রবন্ধের এমন শক্তি নাই। আমরা যে কালে জন্মিয়াছি, এ বড়ো ব্যস্ততার কাল— এখন সকল কথার সমস্তটা বলিবার প্রলোভন পদে পদে সংযত করিতে হয়। কাদম্বরীর সময়ে কবি কথা বিস্তারের বিচিত্র কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন, এখন আমাদিগকে কথা সংক্ষেপের সমুদয় কৌশল শিক্ষা করিতে হয়। তখনকার কালের মনোরঞ্জনের জন্য যে বিদ্যার প্রয়োজন ছিল, এখানকার কালের মনোরঞ্জনের জন্য ঠিক তাহার উল্‌টা বিদ্যা আবশ্যক হইয়াছে।

কিন্তু এককালের মধুলোভী যদি অন্যকাল হইতে মধু সংগ্রহ করিতে ইচ্ছা করেন, তবে নিজকালের প্রাঙ্গণের মধ্যে বসিয়া বসিয়া তিনি তাহা পাইবেন না, অন্যকালের মধ্যে তাঁহাকে প্রবেশ করিতে হইবে। কাদম্বরী যিনি উপভোগ করিতে চান তাঁহাকে ভুলিতে হইবে যে, আপিসের বেলা হইতেছে, মনে করিতে হইবে যে, তিনি বাক্যরস বিলাসী রাজ্যেশ্বর বিশেষ, রাজসভা মধ্যে সমাসীন এবং 'সমানবয়োবিদ্যালঙ্কারৈঃ অখিলকলাকলাপালোচনকঠোরমতিভিঃ অতিপ্রগল্‌ভৈঃ অগ্রাম্যপরিহাসকুশলৈঃ কাব্য-নাটকাখ্যানাখ্যায়িকালেখ্যব্যাখ্যানাদিক্রিয়ানিপুণৈঃ বিনয়ব্যবহারিভিঃ আত্মনঃ প্রতিবিম্বৈরিব রাজপুত্রৈঃ সহ রমমাণঃ।' এইরূপ রসচর্চায় রসিকপরিবৃত হইয়া থাকিলে লোকে প্রতিদিনের সুখদুঃখ সমাকুল যুধ্যমান ঘর্মসিক্ত কর্মনিরত সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। মাতাল যেরূপ আহার ভুলিয়া মদ্যপান করিতে থাকে, তাহারাও সেইরূপ জীবনের কঠিন অংশ পরিত্যাগ করিয়া ভাবের তরল রস পানে বিহ্বল হইয়া থাকে ; তখন সত্যের যাথাতথ্য ও পরিমাণের প্রতি দৃষ্টি থাকে না, কেবল আদেশ হইতে থাকে, ঢালো, ঢালো আরো ঢালো। এখনকার দিনে মনুষ্যের প্রতি আমাদের আকর্ষণ বেশি হইয়াছে, লোকটা কে, এবং সে কী করিতেছে ইহার প্রতি আমাদের অত্যন্ত কৌতূহল, এইজন্য ঘরে বাহিরে চতুর্দিকে মানুষের ক্রিয়াকলাপ জীবনবৃত্তান্ত আমরা তন্ন তন্ন করিয়া পর্যালোচনা করিয়াও পরিতৃপ্ত হই না। কিন্তু সেকালে পণ্ডিতই বল, রাজাই বল, মানুষকে বড়ো বেশি কিছু মনে করিতেন না, বোধ করি স্মৃতিবিহিত নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াকর্মে এবং একান্তে অবহিতভাবে শাস্ত্রাদি আলোচনায় তাঁহারা জগৎ সংসারে অনেকটা বেশি নির্লিপ্ত ছিলেন। বোধ করি বিধি বিধান নিয়ম সংযমের শাসনে ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের বড়ো একটা প্রশ্রয় ছিল না। এইজন্য রামায়ণ-মহাভারতের

পরবর্তীকালীন সংস্কৃত-সাহিত্যে লোকচরিত্র সৃষ্টি এবং সংসার বর্ণনার প্রাধান্য দেখা যায় না। ভাব এবং রস তাহার প্রধান অবলম্বন। রঘুর দিগ্বিজয় ব্যাপারে অনেক উপমা এবং সরস বর্ণনা প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু রঘুর বীরত্বের বিশেষ একটা চরিত্রগত চিত্র পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা দেখা যায় না। অজ-ইন্দুমতী ব্যাপারে অজ এবং ইন্দুমতী উপলক্ষ মাত্র— তাহাদের ব্যক্তিগত বিশেষ মূর্তি সুস্পষ্ট নহে, কিন্তু পরিণয় প্রণয় ও বিচ্ছেদ শোকের একটি সাধারণ ভাব ও রস সেই সর্গে উচ্ছলিত হইতেছে। কুমারসম্ভবে হরপার্বতীকে অবলম্বন করিয়া প্রেম, সৌন্দর্য, উপমা, বর্ণনা তরঙ্গিত হইয়া উঠিয়াছে। মনুষ্য ও সংসারের বিশেষত্বের প্রতি সেকালের সেই অপেক্ষাকৃত ঔদাসীন্য থাকাতে ভাষা বর্ণনা মনুষ্যকে ও ঘটনাকে সর্বত্র আচ্ছন্ন রাখিয়া আপন রস বিস্তার করিয়াছে, সেই কথাটি স্মরণ করিয়া আধুনিক কালের বিশেষত্ব বিস্মৃত হইয়া কাদম্বরীর রসাস্বাদনে প্রবৃত্ত হইলে আনন্দের সীমা থাকিবে না।

কল্পনা করিয়া দেখো— গায়ক গান গাহিতেছে 'চ-ল-ত-রা-আ-আ-আ-আ' ফিরিয়া পুনরায় 'চল-তরা আ আ আ আ' সুদীর্ঘ তাল— শ্রোতারা সেই তালের মেলায় উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে, এদিকে গানের কথায় আছে, 'চলত রাজকুমারী', কিন্তু তাদের উপদ্রবে বেলা বাহিয়া যায়, রাজকুমারীর আর চলাই হয় না; সমজদার শ্রোতাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলে, রাজকুমারী না চলে তো নাই চলুক, কিন্তু তানটা চলিতে থাক্। অবশ্য রাজকুমারী কোন্ পথে চলিতেছেন সে সংবাদের জন্য যাহার বিশেষ উদ্‌বেগ আছে তাহার তানটা দুঃসহ; কিন্তু উপস্থিত ক্ষেত্রে যদি রস উপভোগ করিতে চাও, তবে রাজকুমারীর গম্যস্থান নির্ণয়ের জন্য নিরতিশয় অধীন না হইয়া তানটা শুনিয়া লও। কারণ যে জায়গায় আসিয়া পড়িয়াছে এখানে কৌতূহলে অধীর হইয়া ফল নাই, ইহা রসে মাতোয়ারা হইবার স্থান। অতএব স্নিগ্ধ জলদ নির্ঘোষে আপাতত শূদ্রক রাজার বর্ণনা শোনা যাক্। সে বর্ণনায় আমরা শূদ্রক রাজার চরিতচিত্র প্রত্যাশা করিব না। কারণ চরিত্রচিত্রে একটা সীমারেখা অঙ্কিত করিতে হয়— ইহাতে সীমা নাই— ভাষা বলগর্জিত সমুদ্রের বন্যার ন্যায় যতদূর উদ্‌বেল হইয়াছে তাহার বাধা দিবার কেহ নাই। যদিও সত্যের অনুরোধে বলিতে হইয়াছে, শূদ্রক বিদিশা নগরীর রাজা, কিন্তু অপ্রতিহতগামী ভাষা ও ভাবের অনুরোধে বলিতে হইয়াছে, তিনি 'চতুরুদধিমালামেখলয়া ভুবো ভর্তা।' শূদ্রকের মহিমা কতটুকু ছিল সেই ব্যক্তিগত তুচ্ছ-তথ্যালোচনায় প্রয়োজন নাই, কিন্তু রাজকীয় মহিমা কতদূর পর্যন্ত যাইতে পারে, সেই কথা যথোচিত সমারোহসহকারে ঘোষিত হউক।

সকলেই জানেন ভাব সত্যের মতো কৃপণ নহে। সত্যের নিকট যে ছেলে কানা, ভাবের নিকট তাহার পদ্মলোচন হওয়া কিছুই বিচিত্র নহে। ভাবের সেই রাজকীয় অজস্রতার উপযোগী ভাষা সংস্কৃত ভাষা। সেই স্বভাববিপুল ভাষা কাদম্বরীতে পূর্ণবর্ষার নদীর মতো আবর্তে তরঙ্গে গর্জনে আলোকচ্ছটায় বিচিত্র হইয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু কাদম্বরীর বিশেষ মাহাত্ম্য এই যে, ভাষা ও ভাবের বিশাল বিস্তার রক্ষা করিয়াও তাহার চিত্রগুলি জাগিয়া উঠিয়াছে। সমস্ত প্লাবিত হইয়া একাকার হইয়া যায় নাই। কাদম্বরীর প্রথম আরম্ভ চিত্রটিই তাহার প্রমাণ।

তখনো ভগবান মরীচিমালী অধিক দূরে উঠেন নাই; নূতন পত্রপুট ভেদ করিয়া যেমন কিঞ্চিৎ উন্মুক্ত পাটল আভাটি দেখা যায় তখন সূর্যের বর্ণটি তেমনি।

এই বলিয়া বর্ণনা আরম্ভ হইল। এই বর্ণনার আর-কোনো উদ্দেশ্য নাই, কেবল শ্রোতার চক্ষে একটি কোমল রঙ মাখাইয়া দেওয়া এবং তাহার সর্বাঙ্গে একটি স্নিগ্ধ সুগন্ধ ব্যজন দুলাইয়া দেওয়া একদা তু নাতিদূরোদিতে নবনলিনদলসম্পুটভিদি কিঞ্চিদুন্মুক্তপাটলিম্নি ভগবতি মরীচিমালিনি'— কথার কী মোহ! অনুবাদ করিতে গেলে শুধু এইটুকু ব্যক্ত হয় যে, তরুণ সূর্যের বর্ণ ঈষৎ রক্তিম, কিন্তু ভাষার ইন্দ্রজালে, কেবল মাত্র ঐ বিশেষ্য বিশেষণের বিন্যাসে একটি সুরম্য সুগন্ধ সুবর্ণ সুশীতল প্রভাতকাল অনতিবিলম্বে হৃদয়কে আচ্ছন্ন করিয়া ধরে। এ যেমন প্রভাত, তেমন একটি কথায় তপোবনে সন্ধ্যা সমাগমের বর্ণনা উদ্ধৃত করি :— 'দিবাবসানে লোহিততারকা তপোবনধেনুরিব কপিলা পরিবর্তমানা সন্ধ্যা'— দিনশেষে রক্তচক্ষু তপোবনের ধেনুটি যেমন গোষ্ঠে ফিরিয়া আসে, কপিলবর্ণা সন্ধ্যা তেমনি তপোবনে অবতীর্ণা। কপিলা ধেনুর সহিত সন্ধ্যার রঙের তুলনা করিতে গিয়া সন্ধ্যার সমস্ত শান্তি এবং শ্রান্তি এবং ধূসরচ্ছায়া বাণী মুহূর্তেই মনের মধ্যে ঘনাইয়া তুলিয়াছেন। সকালের বর্ণনায় যেমন কেবলমাত্র তুলনাচ্ছলে উন্মুক্তপ্রায় নবপদ্মপুটের সুকোমল আভাসটুকুর বিকাশ করিয়া মায়াবী চিত্রকর সমস্ত প্রভাতকে সৌকুমার্যে এবং সুস্নিগ্ধতায় পরিপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছেন তেমনি বর্ণের উপমাচ্ছলে তপোবনের গোষ্ঠে ফেরা অরুণচক্ষু কপিলবর্ণ ধেনুটির কথা তুলিয়া সন্ধ্যার মতো কিছু ভাব সমস্ত নিঃশেষে বলিয়া লইয়াছেন।

এমন বর্ণসৌন্দর্যবিকাশের ক্ষমতা সংস্কৃত কোনো কবি দেখাইতে পারেন নাই। সংস্কৃত কবিগণ লাল রঙকে লাল রঙ বলিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন, কিন্তু কাদম্বরীকারের লাল রঙ কত রকমের তাহার সীমা নাই। কোনো লাল লাক্ষালোহিত, কোনো লাল পারাবতের পদতলের মতো, কোনো লাল রক্তাক্ত সিংহনখের সমান 'একদা তু প্রভাতসন্ধ্যারাগলোহিতে গগনতলে কমলিনীমধুরক্তপক্ষসংপুটে বৃদ্ধহংসে ইব মন্দাকিনীপুলিনাদ্‌পরজলনিধিতটমবতরতি চন্দ্রমসি, পরিণতরঙ্কুরোমপাণ্ডুনি-ব্রজতি বিশালতাম্‌ আশাচক্রবালে, গজরুধিররক্তহরিসটালোমলোহিনীভিঃ আতপ্তলাক্ষিকতন্তু-পাটলাভিঃ, আয়ামিনীভিরশিশিরকিরণ দীধিতিভিঃ, পদ্মরাগশলাকা-সম্মার্জনীভিরিব সমুৎসার্যমানে গগনকুট্টিমকুসুমপ্রকরে তারাগণে'— একদিন আকাশ যখন প্রভাত সন্ধ্যারাগে লোহিত, চন্দ্র তখন পদ্মমধুর জাত রক্তবর্ণ পক্ষপুটশালী বৃদ্ধহংসের ন্যায় মন্দাকিনী পুলিন হইতে পশ্চিম সমুদ্রতটে অবতরণ করিতেছেন, দিকচক্রবালে বৃদ্ধ

রঙ্কুমৃগের রোমের মতো একটি পাণ্ডুতা ক্রমশ বিস্তীর্ণ হইতেছে, গজরুধিররক্ত সিংহজটার লোমের ন্যায় লোহিত, ঈষৎ তপ্ত লাক্ষাতন্তুর ন্যায় পাটলবর্ণ সুদীর্ঘ সূর্যরশ্মিগুলি যেন পদ্মরাগশলাকার সম্মার্জনীর গগনকুট্টিম হইতে তারাপুষ্প সকলকে সমুৎসারিত করিয়া দিতেছে।

রঙ ফলাইতে কবির কী আনন্দ! যেন শ্রান্তি নাই, তৃপ্তি নাই। সে রঙ শুধু চিত্রপটের রঙ নহে, তাহাতে কবিত্বের রঙ ভাবের রঙ আছে। অর্থাৎ কোন্ জিনিসের কী রঙ শুধু সেই বর্ণনা মাত্র নহে, তাহার মধ্যে হৃদয়ের অংশ আছে, তাহার একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিলে কথাটা পরিষ্কার হইবে। কথাটা এই যে ব্যাধ গাছের উপর চড়িয়া নীড় হইতে পক্ষীশাবকগুলিকে পাড়িতেছে সেই অনুপজাত উৎপতনশক্তি শাবকগুলির কেমন রঙ? কাংশ্চিদল্পদিবসজাতান্, গর্ভচ্ছবিপাটলান্-শাল্মলিকুসুমশঙ্কামুপজনয়তঃ, কাংশ্চিদুদ্ভিদ্যমানপক্ষতয়া নলিনসংবর্তিকানুকারিণঃ, কাংশ্চিদর্কোপলসদৃশান্, কাংশ্চিল্লো হিতায়মানচঞ্চুকোটীন, ঈষদ্‌বিঘটিতদলপুটপাটলমুখানাং কমলমুকুলানাং শ্রিয়মুদ্‌বহতঃ, কাংশ্চিদনবরতশিরঃকম্পব্যাজেন নিবারয়ত ইব, প্রতিকারাসমর্থান্ একৈকশঃ ফলানীবতস্য বনস্পতেঃ শাখাসন্ধিভ্যঃ কোটরাভ্যন্তরেভ্যশ্চ শুকশাবকানগ্রহীৎ, অপগতাসূংশ্চ কৃত্বা ক্ষিতাবপাতয়ৎ। কেহ-বা অল্পদিবসজাত, তাহাদের নবপ্রসূত কমনীয় পাটলকান্তি যেন শাল্মলিকুসুমের মতো, কাহারো পদ্মের নূতন পাপড়ির মতো, অল্প অল্প ডানা উঠিয়াছে, কাহারো-বা পদ্মরাগের মতো বর্ণ, কাহারো-বা লোহিতায়মান চঞ্চুর অগ্রভাগ ঈষৎ-উন্মুক্তমুখ কমলের মতো, কাহারো-বা মস্তক অনবরত কম্পিত হইতেছে যেন ব্যাধকে নিবারণ করিতেছে— এই সমস্ত প্রতিকারে অসমর্থ শুক শিশুগুলিকে বনস্পতির শাখাসন্ধি ও কোটরাভ্যন্তর হইতে এক-একটি ফলের মতো গ্রহণপূর্বক গতপ্রাণ করিয়া ক্ষিতিতলে নিক্ষেপ করিতে লাগিল।

ইহার মধ্যে কেবল বর্ণবিন্যাস নহে তাহার সঙ্গে করুণা মাখানো রহিয়াছে অথচ কবি তাহা স্পষ্টত বা হুতাশ করিয়া বর্ণনা করেন নাই, বর্ণনার মধ্যে কেবল তুলনাগুলির সৌকুমার্যে তাহা আপনি ফুটিয়া উঠিয়াছে। সংস্কৃত কবিদের মধ্যে চিত্রাঙ্কনে বাণভট্টের সমতুল্য কেহ নাই এ কথা আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি। সমস্ত কাদম্বরী কাব্য একটি চিত্রশালা। সাধারণত লোকে ঘটনা বর্ণনা করিয়া গল্প করে, বাণভট্ট পরে পরে চিত্র সজ্জিত করিয়া গল্প বলিয়াছেন সেইজন্য তাহার গল্প গতিশীল নহে, তাহা বর্ণচ্ছটায় অঙ্কিত। চিত্রগুলিও যে ঘনসংলগ্ন ধারাবাহিক, তাহা নহে, এক-একটি ছবির চারি দিকে প্রচুর কারুকার্যবিশিষ্ট বহুবিস্তৃত ভাষার সোনার ফ্রেম দেওয়া, ফ্রেমসমেত সেই ছবিগুলির সৌন্দর্য আস্বাদনে যে বঞ্চিত সে দুর্ভাগ্য।

শিবাজী ও মারাঠা জাতি : শরৎকুমার রায়

ভারতবর্ষের যে ইতিহাস আমরা বিদ্যালয়ে পড়িয়া থাকি তাহা রাজাদের জীবনবৃত্তান্ত, দেশের ইতিবৃত্ত নহে।

দেশের লোকের সমগ্র চিত্তে যখন কোনো-একটি অভিপ্রায় জাগিয়া উঠে এবং সর্বসাধারণে সচেষ্ট হইয়া সেই অভিপ্রায়কে সার্থক করিতে চায় ও সেই অভিপ্রায়কে প্রতিকূল আঘাত হইতে বাঁচাইবার জন্য ব্যূহবদ্ধ হইয়া উঠে, তখনই সে দেশ যথার্থভাবে ইতিহাসের ক্ষেত্রে আসিয়া দাঁড়ায়।

এইরূপ কোনো-একটি এক-অভিপ্রায়কে লইয়া ভারতবর্ষের কোনো-একটি প্রদেশ আপনাকে একচিত্ত বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছে, এরূপ অবস্থা ভারতবর্ষের ভাগ্যে অধিক ঘটে নাই।

কোনো দেশের লোক যখন এইরূপে ঐক্য উপলব্ধি করে তখন তাহারা স্বভাবতই সেই উপলব্ধিকে ইতিহাসে প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারে না। যে-সকল ঘটনা বিচ্ছিন্ন, যাহা আকস্মিক, দেশের লোকের চিত্তে যাহার কোনো অখণ্ড তাৎপর্য নাই, দেশের লোক তাহাকে সহজেই ইতিহাসরূপে গাঁথিয়া রাখে না, কারণ গাঁথিয়া রাখার কোনো-একটি সূত্র তাহারা নিজেদের মনের মধ্যে পায় না।

এইজন্য আধুনিক ভারতের রাজকীয় বৃত্তান্ত অধিকাংশই বিদেশীর লেখা। দেশের সাধারণ লোকে এই-সকল বৃত্তান্ত স্মরণীয় করিয়া রাখিবার জন্য কোনো উৎসাহ বোধ করে নাই।

সমগ্র দেশের কোনো বিশেষ কালের ইতিহাসকে রক্ষা করিবার স্বতঃপ্রবৃত্ত চেষ্টা দেশের লোকের দ্বারা যদি ভারতবর্ষের কোথাও ঘটিয়া থাকে, সে মহারাষ্ট্র দেশে। মহারাষ্ট্রের 'বখর'গুলি তাহার নিদর্শন।

যে সময় লইয়া এই-সকল জাতীয় ইতিবৃত্ত রচিত হইতেছিল সেই সময়ে দেশের লোকে যে আপনাকে একটি অঙ্গবদ্ধ স্পষ্টসত্তা অনুভব করিয়াছিল, তাহা এই ইতিহাস লিখিবার প্রবৃত্তির দ্বারাই নিশ্চিত সপ্রমাণ হইতেছে।

রাজপুতনাতেও ইতিহাসের টুক্‌রা পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা এক-একটি দলের, এক-একটি খণ্ড রাজ্যের ইতিহাস ; সমস্ত রাজপুত জাতির ইতিহাস নহে। কিন্তু মারাঠাদের সম্মিলিত পরিচয় আছে; তাহা কেবল এক-একটি গোত্রবিশেষের গৌরবকীর্তন নহে।

শিখগুরুদের ইতিহাসের মধ্যে শিখদের জাতীয় ইতিহাস রচিত হইয়াছে, কিন্তু মারাঠার ইতিহাসের মতো এমন ব্যাপক এবং সাঙ্গোপাঙ্গ হইয়া উঠে নাই। শিখের

ইতিহাসে বীরত্বের ও মহত্ত্বের অনেক পরিচয় আছে, কিন্তু তাহাতে সুপরিণত রাষ্ট্রগঠনের ইতিবৃত্ত পাওয়া যায় না। মারাঠারা কেবলমাত্র বীরত্ব করে নাই, তাহারা রাষ্ট্রের সৃষ্টি করিয়াছিল।

অতএব আধুনিক ভারতের যদি কোনো প্রদেশের ইতিহাস থাকে, এবং সেই ইতিহাস হইতে যদি ঐতিহাসিক তত্ত্ব কিছু শিক্ষা করা যাইতে পারে, তবে তাহা মারাঠার ইতিহাস হইতে।

ইংলন্ডে এক সময়ে বৃটনেরা ছিল— ডেন্‌দের সহিত স্যাক্‌সনদের সহিত তাহাদের লড়াই চলিত। মাঝে হইতে রোমানেরা কিছুদিন তাহাদের উপর আধিপত্য করিয়া গেল। তাহার পরে নর্মানেরা এই দ্বীপ অধিকার করিয়া লইল। এই-সকল কাড়াকাড়ি ছেঁড়াছেঁড়ির বৃত্তান্তে ইতিহাসের মূর্তি প্রস্ফুট নহে। কিন্তু ইংলন্ডে যখন হইতে জাতি গড়িয়া উঠিতে লাগিল, নানা শক্তির মন্থনে যখন হইতে দেশের চিত্ত সজাগ হইয়া আপনার লক্ষ্য নির্ণয় ও তাহার পথ পরিষ্কার করিতে প্রবৃত্ত হইল, তখন হইতে ইংলন্ডের ইতিহাস যেন দেহ ধারণ করিল এবং এই ইতিহাস মানুষের শিক্ষার বিষয় হইয়া উঠিল।

ভারতবর্ষেও মোগল পাঠানে মিলিয়া রক্তবর্ণ নাট্যমঞ্চে যে অভিনয় করিয়া গিয়াছে তাহাতে রসের অভাব নাই, কিন্তু তাহাতে ইতিহাস জমিয়া উঠে নাই। সুতরাং তাহা পড়িয়া আমাদের কৌতূহল চরিতার্থ হইতে পারে, কিন্তু আমাদের ঐতিহাসিক শিক্ষা লাভ হয় না।

ভারতবর্ষে কেবল মারাঠা জাতির ও শিখজাতির কিছুকালের ইতিহাসে যথার্থ ঐতিহাসিকতা আছে। কী নিয়মে কিসের প্রেরণায় জাতি গড়িয়া উঠে, কিসের শক্তিতে তাহার উন্নতি হয় এবং কিসের অভাবে তাহার পতন ঘটে, ঘরের দৃষ্টান্ত লইয়া যদি কেহ সেই তত্ত্বের আলোচনা ভারতবর্ষে করিতে চায়, তবে কেবলমাত্র মারাঠা ও শিখের ইতিহাস তাহার সম্বল।

অথচ বাংলার বিদ্যালয়ে ভারতবর্ষের যে ইতিহাস পড়ানো হয় তাহাতে মোগল-পাঠানের বৃত্তান্ত সকলের চেয়ে বড়ো জায়গা জুড়িয়া আছে; সেই বৃত্তান্ত দেশের লোকের বৃত্তান্ত নহে; সেই বৃত্তান্তে ভারতবর্ষ কেবল উপলক্ষ মাত্র; অর্থাৎ ভারতবর্ষ এই বৃত্তান্তের ফ্রেম মাত্র, ছবি নহে। এই বিদেশী রাজাদের কীর্তি-কাহিনীর সংস্রবে মারাঠা ও শিখের যেটুকু ইতিহাস আমাদের ছাত্রেরা পড়িতে পায় তাহা অতি অকিঞ্চিৎকর। অথচ আধুনিক ভারতবর্ষের কেবল এই অংশমাত্রেই দেশের লোকের ইতিহাস বলিতে যদি কিছু থাকে তাহা আছে।

প্রায়ই জাতীয় অভ্যুত্থানের মূলে এক বা একাধিক মহাপুরুষ আমরা দেখিতে পাই। কিন্তু এ কথা মনে রাখিতে হইবে, সেই-সকল মহাপুরুষ আপন শক্তিকে প্রকাশ করিতেই পারিতেন না, যদি দেশের মধ্যে মহৎ ভাবের ব্যাপ্তি না হইত। চারি দিকে আয়োজন অনেকদিন হইতেই হয়; সেই আয়োজনে ছোটো বড়ো অনেকেরও যোগ

থাকে ; অবশেষে শক্তিশালী লোক উঠিয়া সেই আয়োজনকে ব্যবহারে প্রয়োগ করেন।

মারাঠার ইতিহাসে আমরা শিবাজীকেই বড়ো করিয়া দেখিতে পাই। কিন্তু শিবাজী বড়ো হইয়া উঠিতে পারিতেন না, যদি সমস্ত মারাঠা জাতি তাঁহাকে বড়ো করিয়া না তুলিত। বহুদিন হইতে বহু ধর্মবীর দেশের উচ্চ-নীচের, ব্রাহ্মণ-শূদ্রের কৃত্রিম ব্যবধান ভেদ করিয়া পরস্পরের মধ্যে যোগ-সাধন করিতেছিলেন। ভক্তির রাজপথকে তাঁহারা ইতর ও বিশিষ্ট সকলেরই জন্য উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। এক ভগবানের অধিকারে তাঁহারা দেশের সকলকে সমান গৌরবের অধিকারী করিয়াছিলেন। মারাঠায় ধর্মান্দোলনে দেশের সমস্ত লোক একত্র মথিত হইতেছিল। শিবাজীর প্রতিভা সেই মন্থন হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। তাহা সমস্ত দেশের ধর্মোদ্‌বোধনের সহিত জড়িত, এইজন্যই দেশের শক্তিতে তিনি ধন্য ও তাঁহার শক্তিতে দেশ ধন্য হইয়াছে।

যদি এ কথা সত্য হইত যে, শিবাজী প্রতিভাশালী দস্যু মাত্র, তিনি নিজের স্বার্থসাধন ও ক্ষমতাবিস্তারের জন্য অসামান্য কৌশল প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তবে তাঁহার সেই দস্যুতাকে অবলম্বন করিয়া কখনোই সমস্ত মারাঠা জাতি এক হইয়া উঠিত না। বিশেষত, শিবাজী যখন অওরঙ্গজেবের জালে জড়িত হইয়া বন্দী হইয়াছিলেন এবং দীর্ঘকাল তাঁহাকে রাজ্য হইতে দূরে যাপন করিতে হইয়াছিল তখনো যে তাঁহার কীর্তি ভাঙিয়া ভূমিসাৎ হয় নাই তাহার একমাত্র কারণ, সমস্ত দেশের ধর্মবুদ্ধির সহিত তাঁহার চেষ্টার যোগ ছিল। বস্তুত, তাঁহার সাধনা সমস্ত দেশেরই ধর্মসাধনার একটি বিশেষ প্রকাশ। এই ধর্মসাধনার আহ্বানেই খণ্ড খণ্ড মারাঠা আপনার বিচ্ছিন্ন শক্তিকে একত্র সম্মিলিত করিয়া মঙ্গল-উদ্দেশ্যের নিকট নিবেদন করিতে পারিয়াছিল ; লুণ্ঠনের ভাগ লইয়া, ক্ষমতার ভাগ লইয়া, পরস্পর মারামারি কাটাকাটি করে নাই।

অবশেষে যখন একদিন এই ধর্মসাধনা স্বার্থসাধনে বিকৃত হইয়া গেল, যখন সমস্ত দেশের শক্তি আর একত্র মিলিতে পারিল না, তখন পরস্পর অবিশ্বাস ঈর্ষা বিশ্বাসঘাতকতা বটগাছের কুটিল শিকড়জালের মতো মারাঠা-প্রতাপের বিশাল হর্ম্যকে ভিত্তিতে ভিত্তিতে দীর্ণ বিদীর্ণ করিয়া দিল। ধর্ম সমস্ত জাতিকে এক করিয়াছিল, এবং স্বার্থই তাহাকে বিশ্লিষ্ট করিয়া দিয়াছে— ইহাই মারাঠা-অভ্যুত্থান ও পতনের ইতিহাস। ব্যক্তিগত মহাশক্তির সঙ্গে দেশের শক্তিকে মিলাইতে পারে ধর্মের যোগ ; কিন্তু ব্যক্তিগত শক্তি যখন স্বার্থকে অবলম্বন করে তখন সমস্ত দেশের শক্তি কখনোই তাহার সঙ্গে এক হইয়া মিলিতে পারে না।

ধর্মের উদার ঐক্য দেশের ভেদবুদ্ধিকে নিরস্ত করিয়া দিলে তবেই দেশের অন্তর্নিহিত সমস্ত শক্তি একত্র মিলিত হইয়া অভাবনীয় সফলতা লাভ করে, ইহাই মহারাষ্ট্র-ইতিহাসের শিক্ষা, ইহার ব্যতিক্রম ঘটিলে প্রবল প্রতাপও আপনাকে রক্ষা করিতে পারে না।

শিখগুরু ও শিখজাতি : শরৎকুমার রায়

শিখ-ইতিহাসের সহিত মারাঠা-ইতিহাসের প্রধান প্রভেদ এই যে, যিনি-মারাঠা-ইতিহাসের প্রথম ও প্রধান নায়ক সেই শিবাজী হিন্দুরাজ্য স্থাপনের উদ্দেশ্যকে মনের মধ্যে সুপরিস্ফুট করিয়া লইয়াই ইতিহাসের রঙ্গক্ষেত্রে মারাঠা জাতির অবতারণা করিয়াছিলেন ; তিনি দেশজয়, শত্রু-বিনাশ, রাজ্যবিস্তার প্রভৃতি যাহা-কিছু করিয়াছেন সমস্তই ভারতব্যাপী একটি বৃহৎ সংকল্পের অঙ্গ ছিল।

আর, গোড়ায় ধর্মের ইতিহাসরূপে শিখ-ইতিহাসের আরম্ভ হইয়াছিল। বাবা নানক যে স্বাধীনতা অন্তরে উপলব্ধি করিয়াছিলেন তাহা রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা নহে ; যে দেবপূজা কেবল দেশবিশেষের, জাতিবিশেষের কল্পনা ও অভ্যাসের দ্বারা সীমাবদ্ধ, পৃথিবীর সকল মানুষের চিত্ত যাহার মধ্যে অধিকার পায় না এবং বাধা পায়, নানকের ধর্মবুদ্ধি তাহার মধ্যে আপনাকে সংকুচিত করিতে পারে নাই ; এই-সকল সংকীর্ণ পৌরাণিক ধর্মের বন্ধন হইতে তাঁহার হৃদয় মুক্তিলাভ করিয়াছিল এবং সেই মুক্তি তিনি সকলের কাছে প্রচার করিবার জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

নানকের উপদেশে আকৃষ্ট হইয়া যাহারা তাঁহার নিকটে ধর্মদীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিল তাহারাই শিখ অর্থাৎ শিষ্য বলিয়া গণ্য হইয়াছিল।

জাতিনির্বিচারে সকলেই শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে পারিত। অতএব নানকের অনুবর্তীদিগকে লইয়া কোনো জাতিগত ইতিহাস যে গড়িয়া উঠিবে, এরূপ লক্ষণ প্রথমে দেখা যায় নাই।

কিন্তু মোগলদিগের নিকট হইতে অত্যাচার পাইয়া এই নানক-শিষ্যের দল একটি বিশেষ সম্প্রদায়ে সংহত হইয়া দাঁড়াইল এবং সেই কারণেই সর্বসাধারণের নিকট ধর্মপ্রচার অপেক্ষা আত্মদলকেই বিনাশ ও উপদ্রব হইতে রক্ষা করাই তাহাদের প্রধান চেষ্টা হইল। এইরূপে বাহির হইতে চাপ পাইয়াই শিখ একটি ঘনিষ্ঠ জাতি হইয়া দাঁড়াইল।

শিখদের যিনি শেষ গুরু ছিলেন এই কাজেই তিনি বিশেষভাবে লাগিলেন। সর্বমানবের মধ্যে ধর্মপ্রচার কার্যকে সংহৃত করিয়া লইয়া শিখদিগকে বলিষ্ঠ করিয়া তোলাই তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল।

এ কাজ প্রকৃতপক্ষে ধর্মপ্রচারকের নহে ; ইহা প্রধানত সেনানায়ক এবং রাজনীতিজ্ঞের কাজ। গুরু গোবিন্দের মধ্যে সেই গুণ ছিল। তিনি অসাধারণ অধ্যবসায়ে দল বাঁধিয়া তুলিয়া বৈরনির্যাতনের উপযুক্ত যোদ্ধা ছিলেন। তিনিই ধর্মসম্প্রদায়কে বৃহৎ সৈন্যদলে পরিণত করিলেন এবং ধর্মপ্রচারক গুরুর আসনকে শূন্য করিয়া দিলেন।

গুরু নামক যে মুক্তির উপলব্ধিকে সকলের চেয়ে বড়ো করিয়া জানিয়াছিলেন, গুরু গোবিন্দ তাহার প্রতি লক্ষ স্থির রাখিতে পারেন নাই। শত্রুহস্ত হইতে মুক্তিকামনাকেই তিনি তাঁহার শিষ্যদের মনে একান্তভাবে মুদ্রিত করিয়া দিলেন।

ইহাতে ক্ষণকালের জন্য ইতিহাসে শিখদের পরাক্রম উজ্জ্বল হইয়াছিল সন্দেহ নাই, ইহাতে তাহাদিগকে রণনৈপুণ্য দান করিয়াছে তাহাও সত্য, কিন্তু বাবা নানক যে পাথেয় দিয়া তাহাদিগকে একটি উদার পথে প্রেরণ করিয়াছিলেন সেই পাথেয় তাহারা এইখানেই খরচ করিয়া ফেলিল এবং তাহাদের যাত্রাও তাহারা এইখানেই অবসান করিয়া দিল।

ইহার পর হইতে কেবল লড়াই এবং রাষ্ট্রবিস্তারের ইতিহাস। এদিকে মোগল শক্তিও ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল এবং শিখদল তাহাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে যতই কৃতকার্য হইতে লাগিল ততই আত্মরক্ষার চেষ্টা ঘুচিয়া গিয়া ক্ষমতাবিস্তারের লোলুপতা বাড়িয়া উঠিতে লাগিল।

যতদিন বিরুদ্ধপক্ষ প্রবল থাকাতে আত্মরক্ষার চেষ্টাই একান্ত হইয়া উঠে ততদিন এক বিপদের তাড়নায় নিজেদের মধ্যে ঐক্যবন্ধন দৃঢ় থাকে। বাহিরের সেই চাপ সরিয়া গেলে এই বিজয়মদমত্ততাকে কিসে ধারণ করিয়া রাখিতে পারে? আত্মরক্ষাচেষ্টায় যে যুদ্ধশক্তি সঞ্চিত হইয়া উঠে অন্যকে আঘাত করিবার উদ্যম হইতে নিবৃত্ত করিয়া নিজেকে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টায় সেই শক্তিকে কে নিযুক্ত করিতে পারে?

যে শক্তি তাহা পারিত আশু-প্রয়োজন-সাধনের অতিলোলুপতায় গুরু গোবিন্দ তাহাকে খর্ব করিয়াছিলেন। গুরুর পরিবর্তে তিনি শিখদিগকে তরবারি দান করিলেন। তিনি যখন চলিয়া গেলেন তখন নানকের প্রচারিত মহাসত্য গ্রন্থসাহেবের মধ্যে আবদ্ধ হইল, তাহা গুরুপরম্পরায় জীবনপ্রবাহে ধাবিত হইয়া মানবসমাজকে ফলবান্ করিবার জন্য অপ্রতিহত গতিতে সম্মুখে অগ্রসর হইতে থাকিল না; এক জায়গায় তাহা অবরুদ্ধ হইয়া গেল।

শক্তি তখন দেখিতে দেখিতে লুব্ধ এবং অসংযত হইয়া উঠিল। তখন দেবতার তিরোধানে অপদেবতার প্রাদুর্ভাব হইল, কাড়াকাড়ি ও দলাদলি উদ্দাম হইয়া উঠিল।

এই উচ্ছৃঙ্খল আত্মঘাতসাধনের মধ্যে রণজিৎ সিংহের অভ্যুদয় হইল। তিনি কিছুদিনের জন্য বিচ্ছিন্ন শিখদিগকে এক করিয়াছিলেন, কিন্তু সে কেবলমাত্র বলের দ্বারা। তিনি সকলের চেয়ে বলশালী বলিয়া সকলকে দমন করিয়াছিলেন।

বলের দ্বারা যে লোক এক করে সে অন্যকে দুর্বল করিয়াই এক করে; শুধু তাই নয়, ঐক্যের যে চিরন্তন মূলতত্ত্ব প্রেম তাহাকেই পরাস্ত করিয়া পঙ্গু করিয়া নিজের প্রয়োজন সাধন করে। রণজিৎ সিংহ স্বার্থপুষ্টির জন্যই সমস্ত শিখকে ছলে-বলে-কৌশলে নিবিড় করিয়া বাঁধিয়াছিলেন।

শিখ সম্প্রদায়ের চিত্তে তিনি এমন কোনো মহৎ ভাবের সঞ্চার করেন নাই যাহাতে তাঁহার অবর্তমানেও তাহাদিগকে একত্র ধারণ করিয়া রাখিতে পারে। কেবলমাত্র

অপ্রতিহত চাতুরী-প্রভাব এবং স্বার্থসাধন সম্বন্ধে সতর্ক অধ্যবসায়ের দৃষ্টান্ত তিনি দেখাইয়াছিলেন।

তাঁহার লোভের সীমা ছিল না এবং তাঁহার ভোগস্পৃহা অসংযত ছিল। একটিমাত্র তাঁহার প্রশংসার বিষয় এই যে, তিনি যাহা চাহিয়াছিলেন তাহা পাইয়াছিলেন, কিছুতেই তাঁহাকে ঠেকাইতে পারে নাই। একটিমাত্র স্থানে তিনি আপনার দুর্গম ইচ্ছাকে সংযত করিয়াছিলেন— অত্যন্ত লুব্ধ হইয়াও ভারত-মানচিত্রে তিনি ইংরাজের রক্তগণ্ডিকে লঙ্ঘন করেন নাই, তাঁহার স্বার্থবুদ্ধি এইখানে তাঁহাকে টানিয়া রাখিয়াছিল।

যাহা হউক, তিনি কৃতকার্য হইয়াছিলেন। কৃতকার্যতার দৃষ্টান্ত মানুষকে যত বিপদে ফেলিয়াছে এমন আর কিছুতেই না। এই দৃষ্টান্তে মানুষের মঙ্গলবুদ্ধিকে পরাস্ত এবং তাহার লুব্ধ প্রবৃত্তিকে অশান্ত করিয়া তোলে— ইহা অপঘাত মৃত্যুরই পথ।

যাঁহা হইতে শিখ সম্প্রদায় আরম্ভ হইয়াছিল সেই নানক অকৃতকার্যতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এইজন্য তিনি তাঁহার বণিক্‌পিতার কাছে যথেষ্ট লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছিলেন। লবণের কারবারে নানক কীরূপ লাভ করিয়াছিলেন সে কথা সকলেরই জানা আছে। তিনি দরিদ্র ছিলেন, কিন্তু যে শক্তিতে জাঠ কৃষকেরা প্রাণকে তুচ্ছ করিয়া দুঃখকে অবজ্ঞা করিয়া বড়ো হইয়া উঠিয়াছিল সে শক্তি এই কাণ্ডজ্ঞানহীন অকিঞ্চন তাপসই সঞ্চার করিয়াছিলেন।

আর, যে মহারাজ কৃতকার্যতার আদর্শস্থল— শিখদের চিরন্তন শত্রুকে যিনি দমন করিয়াছিলেন, কোনো পরাভবেই যাঁহার ইচ্ছাকে নিরস্ত করিতে পারে নাই— একদিকে মোগলরাজ্যাবসান ও অন্যদিকে ইংরেজ-অভ্যুদয়ের সন্ধ্যাকাশকে যাঁহার আকস্মিক প্রতাপ রক্তরশ্মিতে রঞ্জিত করিয়া তুলিয়াছিল, তিনি শিখদের মধ্যে কী রাখিয়া গেলে? অনৈক্য, অবিশ্বাস, উচ্ছৃঙ্খলতা।

শিখদের যাহারা নায়ক ছিল তাহারা এই কৃতকার্য রাজার দৃষ্টান্তে ইহাই শিখিয়াছিল, জোর যার মুলুক তার। তাহারা ত্যাগ শিখিল না, আত্মসমর্পণ শিখিল না, 'যতোধর্মস্ততোজয়ঃ' এ মন্ত্র ভুলিয়া গেল, অর্থাৎ দীনহীন নানক যে শক্তি-দ্বারা তাহাদিগকে বাঁধিয়াছিলেন, মহাপ্রতাপশালী মহারাজ তাহাতে আগুন লাগাইয়া দিলেন এবং ইতিহাসের আকাশে শিখ-জ্যোতিষ্ক ক্ষণকালের জন্য জ্বলিয়া ক্ষণকালের মধ্যে নিবিয়া গেল।

আজ শিখের মধ্যে আর কোনো অগ্রসর-গতি নাই। তাহারা একটি ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ে বাঁধিয়া গেছে; তাহারা আর বাড়িতেছে না; তাহাদের মধ্যে বহু শতাব্দকালেও আর কোনো মানবগুরুর আবির্ভাব হইল না— জ্ঞানে ধর্মে কর্মে মানবের ভাণ্ডারে তাহারা কোনো নূতন সম্পদ সঞ্চিত করিল না।

নানক-শিষ্যেরা আজ যুদ্ধ করিতে পারে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহার শিষ্যদল ফৌজে ঢুকিয়া কখনো কাবুলে, কখনো চীনে, কখনো আফ্রিকায় লড়াই

করিয়া বেড়াইবে, নানকের ধর্মতেজে উদ্দীপ্ত উত্তর-বংশীয়দের এই পরিণামই যে গৌরবজনক, এমন কথা আমরা মনে করিতে পারি না। মনুষ্যত্বের উদার ক্ষেত্রে তাহারা কেবল বারিকে বসিয়া কুচকাওয়াজ করিবে এজন্য নানক জীবন উৎসর্গ করেন নাই।

নানক তাঁহার শিষ্যদিগকে স্বার্থপরতা হইতে, ধর্মবোধের সংকীর্ণতা হইতে, আধ্যাত্মিক অসাড়তা হইতে মুক্ত হইবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন— তিনি তাহাদের মনুষ্যত্বকে বৃহদ্‌ভাবে সার্থক করিতে চাহিয়াছিলেন। গুরু গোবিন্দ এই শিখদিগকে বিশেষ একটি প্রয়োজনের উপযোগী করিয়া বাঁধিয়া দিলেন, এবং যাহাতে তাহারা সেই প্রয়োজনকে কিছুতে বিস্মৃত না হয় সেইজন্য তাহাদের নামে বেশে ভূষায় আচারে নানা প্রকারে সেই প্রয়োজনটিকে তাহাদের চিত্তের মধ্যে বিশেষরূপে মুদ্রিত করিয়া দিলেন। এইরূপে শিখদের মনুষ্যত্বের উদ্যমধারাকে অন্য সকল দিক হইতে প্রতিহত করিয়া তিনি একটা বিশেষ দিকে প্রবাহিত করিলেন। ইহার দ্বারা একটা প্রয়োজনের ছাঁচের মধ্যে শিখ জাতি বদ্ধ হইয়া শক্ত হইয়া তৈরি হইল।

যখন শিখেরা মুক্ত মানুষ না হইয়া বিশেষ প্রয়োজনযোগ্য মানুষ হইল তখন প্রবল রাজা তাহাদিগকে নিজের প্রয়োজনে লাগাইলেন এবং এইরূপে আজ পর্যন্তও তাহারা প্রবলকর্তৃক বিশেষ প্রয়োজনেই লাগিতেছে। স্পার্টায় গ্রীস যখন নিজের মানবত্বকে বিশেষ প্রয়োজনের অনুসারে সংকুচিত করিয়াছিল তখন সে যুদ্ধ করিতে পারিত বটে, কিন্তু আপনাকে খর্ব করিয়াছিল ; কারণ যুদ্ধ করিতে পারাই মানুষের শেষ লক্ষ্য নহে। এইরূপে মানুষ আশু প্রয়োজনের জন্য নিজের শ্রেয়কে নষ্ট করে এমন উদাহরণ অনেক আছে, এবং আজ পর্যন্ত এই অদূরদর্শী লুব্ধতার তাড়নায় সকল সমাজেই মনুষ্যবলি চলিতেছে। যে নররক্তপিপাসু অপদেবতা এই বলি গ্রহণ করে সে কখনো সমাজ, কখনো রাষ্ট্র, কখনো ধর্ম এবং কখনো তৎকালপ্রচলিত কোনো-একটা সর্বজনমোহকর নাম ধরিয়া মানুষকে নষ্ট করিয়া থাকে।

শিখ-ইতিহাসের পরিণাম আমার কাছে অত্যন্ত শোকাবহ ঠেকে। যে নদী সমুদ্রে যাইবে বলিয়া অভ্রভেদী পর্বতের পবিত্র শুভ্রশিখর হইতে নিঃসৃত হইয়াছিল সে যখন পথের মধ্যে বালুকারাশির অভ্যন্তরে লুপ্ত হইয়া তাহার গতি হারায়, তাহার গান ভুলিয়া যায়, তখন সেই ব্যর্থতা যেমন শোচনীয়, তেমনি ভক্তের হৃদয় হইতে যে শুভ্র নির্মল শক্তিধারা বিশ্বকে পবিত্র ও উর্বর করিতে বাহির হইয়াছিল আজ তাহা যখন সৈন্যের বারিকে রক্তবর্ণ পঙ্কের মধ্যে পরিশোষিত হইয়া গেল তখন মানুষ ইহার মধ্যে কোনো গৌরব বা আনন্দ অনুভব করিতে পারে না।

এই শিখ-ইতিহাস একদিন প্রতিজিঘাংসা অথবা অন্য কোনো সংকীর্ণ অভিপ্রায়ের আকর্ষণে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া মানব-সফলতার ক্ষেত্র হইতে স্খলিত হইয়াছে, কিন্তু তাহা অপেক্ষা নিম্নতর যে জাতীয় সফলতার ক্ষেত্র সেখানেও কোনো গৌরবলাভ করিতে

পারে নাই। রণজিৎ সিংহ যে রাজ্য বাঁধিয়াছিলেন তাহা রণজিৎ সিংহেরই রাজ্য, গোবিন্দ সিংহ মোগলদের সঙ্গে যে সংগ্রাম করিয়াছিলেন তাহা কেবলমাত্র শিখ সম্প্রদায়েরই সংগ্রাম। নিজের শিষ্যদলের বাহিরে তিনি সংকল্পকে প্রসারিত করেন নাই।

এইখানে মারাঠা-ইতিহাসের সঙ্গে শিখ-ইতিহাসের প্রভেদ লক্ষিত হয়। শিবাজী যে চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাহা কোনো ক্ষুদ্র দলের মধ্যে আবদ্ধ ছিল না। তাহার প্রধান কারণ, তিনি যে হিন্দুজাতি ও হিন্দুধর্মকে মুসলমান-শাসন হইতে মুক্তিদান করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন তাহা আয়তনে শিখ জাতি ও ধর্ম অপেক্ষা অনেক বেশি ব্যাপক, সুতরাং সমগ্র ভারতের ইতিহাসকেই নূতন করিয়া গড়িয়া তোলাই তাঁহার লক্ষ্যের বিষয় ছিল ইহাতে সন্দেহ নাই।

গুরু গোবিন্দ এবং শিবাজী উভয়েই প্রায় সমসাময়িক। তখন আকবরের উদার রাষ্ট্রনীতির অবসান হইয়াছিল এবং সেইজন্যই মোগল-শাসন তখন ভারতবর্ষের অমুসলমান ধর্ম ও সমাজকে আত্মরক্ষায় জাগরূক করিয়া তুলিয়াছিল।

বস্তুত তখন ভিতরে বাহিরে আঘাত পাইয়া সমস্ত ভারতবর্ষে নানা স্থানেই একটা যেন ধর্মচেষ্টার উদ্‌বোধন হইয়াছিল। হিন্দুধর্মসমাজে তখন যে-একটি জীবনচাঞ্চল্য ঘটিয়াছিল, বিশেষভাবে দাক্ষিণাত্যে তাহা নানা সাধুভক্তকে আশ্রয় করিয়া নব নব ধর্মোৎসাহে প্রকাশ পাইয়াছিল। সেইরূপ সচেতন অবস্থায় ঔরঙ্গজেবের অত্যাচারে শিবাজীর ন্যায় বীরপুরুষ যে ভারতবর্ষে স্বধর্মকে জয়যুক্ত করিবার জন্য ব্রত্য গ্রহণ করিবেন, ইহা স্বাভাবিক।

আবার ভারতবর্ষের পশ্চিমপ্রান্তে এই সময়ে নবভাবোদ্দীপ্ত শিখধর্মের প্রভাবে শিখ সম্প্রদায়ের চিত্ত ও প্রাণ পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। সেই কারণেই মোগল-শাসনের পীড়ন তাহাকে দমন করিতে পারে নাই, বরঞ্চ তাড়নাপ্রাপ্তি অগ্নির ন্যায় তাহাকে উদ্যত করিয়া তুলিয়াছিল।

কিন্তু যদিচ ভিতরকার প্রভাব ও বাহিরের আঘাত উভয়েরই পক্ষে একই-রকম ছিল, তথাপি তাহার ক্রিয়া গুরু গোবিন্দ এবং শিবাজীর মধ্যে একভাবে প্রকাশ পায় নাই।

গুরু গোবিন্দ মোগলদের সঙ্গে অনেক লড়াই করিয়াছেন, কিন্তু তাহা কেমন খাপছাড়া-মতো। প্রতিহিংসা এবং আত্মরক্ষা-সাধনই তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল।

কিন্তু শিবাজী যে-সকল যুদ্ধবিগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাহা সোপানপরম্পরার মতো ; তাহা রাগারাগি লড়ালড়ি মাত্র নহে। তাহা সমস্ত ভারতবর্ষকে এবং দূর কালকে লক্ষ্য করিয়া একটি বৃহৎ আয়োজন বিস্তার করিতেছিল, তাহার মধ্যে একটি বিপুল আনুপূর্বিকতা ছিল তাহা কোনো সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার প্রকাশ নহে, তাহা একটি বৃহৎ অভিপ্রায়-সাধনের উদ্‌যোগ।

কিন্তু তৎসত্ত্বেও দেখা যাইতেছে, শিখ ও মারাঠা উভয় জাতিরই ইতিহাস একই সময়ে একই প্রকার ব্যর্থতার মধ্যে সমাপ্ত হইয়াছে।

ইহার কারণ কী? কারণ এই যে, যে উদ্দেশ্য সমস্ত দেশকে অধিকার করিতে চাহে তাহা কেবল একজন বা কয়েকজন মাত্র মনস্বী লোককে আশ্রয় করিয়া সফল হইতে পারে না। স্ফুলিঙ্গকে শিখা করিয়া তুলিতে হইলে কেবল প্রবল শক্তিতে চক্‌মকি ঠুকিলেই চলে না, উপযুক্ত পলিতারও আবশ্যক হয়। শিবাজীর চিত্ত সমস্ত দেশের লোকের সহিত আপনার যোগ স্থাপন করিতে পারে নাই। এইজন্য শিবাজীর অভিপ্রায় যাহাই থাক্-না, তাঁহার চেষ্টা সমস্ত দেশের চেষ্টারূপে জাগ্রত হইতে পারে নাই। এইজন্যই মারাঠার এই উদ্‌যোগ পরিণামে ভারতের অন্যান্য জাতির পক্ষে বর্গির উপদ্রব-রূপে নিদারুণ হইয়া উঠিয়াছিল।

যে মঙ্গল সকলের তাহাকে সকলের চিত্তের মধ্যে যদি প্রতিষ্ঠিত না করা হয়, যদি তাহা কেবল আমার বা আমার দলের কয়েক জনের মধ্যেই বদ্ধ থাকে, তবে তাহার মঙ্গলরূপ ঘুচিয়া যায় এবং অন্যের পক্ষে ক্রমে তাহা উৎপাত হইয়া উঠে।

শিবাজীর মনে যাহা বিশুদ্ধ ছিল, পেশওয়াদের মধ্যে তাহা ক্রমে ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা-রূপে কলুষিত হইয়া উঠিল। এমন বিকার কদাচ ঘটিত না যদি এই ভাবটি দেশের সর্বসাধারণের মনে প্রসারিত হইবার পথ প্রশস্ত থাকিত। তাহা হইলে বৃহৎ আধারের মধ্যে বৃহৎ ভাব আপনার স্থান এবং খাদ্য পাইত; তাহা হইলে একটা কাঠ যখন নিবিবার মতো হইত তখন কোথা হইতে আর-একটা কাঠ আপনি জ্বলিয়া উঠিত।

আমাদের দেশে বারংবার ইহাই দেখা গিয়াছে যে, এখানে শক্তির উদ্ভব হয় কিন্তু তাহার ধারাবাহিকতা থাকে না। মহাপুরুষেরা আসেন এবং তাঁহারা চলিয়া যান— তাঁহাদের আবির্ভাবকে ধারণ করিবার, পালন করিবার, তাহাকে পূর্ণ পরিণত করিয়া তুলিবার স্বাভাবিক সুযোগ এখানে নাই।

ইহার কারণ আমাদের বিচ্ছিন্নতা। যে মাটিতে আঠা একেবারেই নাই সেখানেও বায়ুর বেগে বা পাখির মুখে বীজ আসিয়া পড়ে, কিন্তু তাহা অঙ্কুরিত হয় না, অথবা দু-চারটি পাতা বাহির হইয়া মুষড়িয়া যায়। কারণ, সেখানকার আলগা মাটির রস ধারণ করিয়া রাখিতে পারে না। আমাদের সমাজের মধ্যে বিচ্ছিন্নতার আর অন্ত নাই; ধর্মে কর্মে, আহারে বিহারে, আদানে প্রদানে সর্বত্রই বিচ্ছিন্নতা। এইজন্য ভাবের বন্যা নামে, কিন্তু বালুর মধ্যে শুষিয়া যায়; তেজের স্ফুলিঙ্গ পড়ে, কিন্তু ইতস্তত সামান্য ধোঁওয়া জাগাইয়া নিবিয়া যায়। এইজন্য মহৎ চেষ্টা বৃহৎ চেষ্টা হইয়া উঠে না এবং মহাপুরুষ দেশের সর্বসাধারণের অক্ষমতাকে সমুজ্জলভাবে সপ্রমাণ করিয়া নির্বাণ লাভ করেন।

যাহা হউক, মারাঠা ও শিখের অভ্যুত্থান ও পতনের কারণ সম্বন্ধে তুলনা করিয়া বলিতে হইলে এই বলা যায় যে, শিখ একদা একটি অত্যন্ত বৃহৎ ভাবের আহ্বানে একত্র হইয়াছিল— এমন একটি সত্যধর্মের বার্তা তাহারা শুনিয়াছিল যাহা কোনো স্থানবিশেষের চিরাগত প্রথার মধ্যে বদ্ধ নহে এবং যাহা কোনো সময়বিশেষের উত্তেজনা হইতে প্রসূত হয় নাই— যাহা চিরকালের এবং সকল মানবের, যাহা ছোটো বড়ো সকলেরই অধিকারকে প্রশস্ত করে, চিত্তকে মুক্তি দেয় এবং যাহাকে স্বীকার

করিলে প্রত্যেক মানুষই মনুষ্যত্বের পূর্ণতম গৌরবকে উপলব্ধি করে। নানকের এই উদার ধর্মের আহ্বানে বহু শতাব্দী ধরিয়া শিখ বহু দুঃখ সহ্য করিয়া ক্রমশ প্রসার লাভ করিতেছিল। এই ধর্মবোধ ও দুঃখভোগের গৌরবে শিখদের মধ্যে অলক্ষ্যে একটি মহৎ ঐক্যের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছিল।

গুরু গোবিন্দ শিখদের এই ধর্মবোধের ঐক্যানুভূতিকে কর্মসাধনার সুযোগে পরিণত করিয়া তুলিলেন। তিনি একটি বিশেষ সাময়িক প্রয়োজনের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ধর্মসমাজের ঐক্যকে রাষ্ট্রীয় উন্নতি-লাভের উপায়রূপে খর্ব করিলেন। কিন্তু এই উপলক্ষে সম্প্রদায়কে সংকীর্ণ করিয়া লইয়া তিনি তাঁহার ঐক্যকে ঘনিষ্ঠ করিয়া লইলেন ; যে জাতিভেদ তাহার প্রবল অন্তরায় ছিল তাহাকে সমূলে উৎপাটিত করিলেন।

গুরু গোবিন্দ তাঁহার শিষ্যসমাজের মধ্য হইতে এই যে ভেদবিভাগকে এক কথায় দূর করিতে পারিয়াছিলেন তাহার প্রধান কারণ এই যে, নানকের উদার ধর্মের প্রভাবে পরস্পরের মধ্যে ভেদবুদ্ধির ব্যবধান আপনিই তলে তলে ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছিল। গুরু গোবিন্দ তাহাকে আঘাত করিবামাত্র তাহা শতখণ্ড হইয়া পড়িয়া গেল। পূর্ব হইতে গভীরতররূপে যদি ইহার আয়োজন না থাকিত তবে সহস্র প্রয়োজন হইলেও গুরু গোবিন্দ কিছুই করিতে পারিতেন না। শুধু তাহাই নয়, সকল কর্মনাশা এই ভেদকে দূর করিতে হইবে এই সংকল্পমাত্রও তাঁহার মনে আকার গ্রহণ করিতে পারিত না।

কিন্তু গুরু গোবিন্দ কী করিলেন? ঐক্যকেই পাকা করিলেন, অথচ যে মহাভাবের শক্তির সহায়তায় তাহা করা সম্ভব হইল তাহাকে সিংহাসনচ্যুত করিলেন, অন্তত তাহার সিংহাসনে আর-একজন প্রবল শরিক বসাইয়া দিলেন।

ঐক্যই ভাবের বাহন। এই কারণে মহৎ ভাব মাত্রই সেই বাহনকে সৃষ্টি করিবার জন্য আপনার শক্তিকে নিযুক্ত করে। বাহনের গৌরব তাহার আরোহীর মাহাত্ম্যে! গুরু গোবিন্দ সাময়িক ক্রোধের উত্তেজনায় ও প্রয়োজন-বোধে বাহনকে প্রবল করিয়া তুলিলেন বটে, কিন্তু আরোহীকে খর্ব করিয়া দিলেন।

তাহা হইতে ফল এই হইল, উপস্থিতমতো কিছু কিছু কার্যসিদ্ধি ঘটিল, কিন্তু যাহা মুক্তির দিকে অগ্রসর হইতেছিল তাহা বন্ধনে পড়িল ; শিখদের মধ্যে পরস্পরকে নিবিড় করিবার ব্যবস্থা রহিল, কিন্তু অগ্রসর করিয়া দিবার বেগ রহিল না। এইজন্য বহু শতাব্দী ধরিয়া যে শিখ পরম গৌরবে মানুষ হইবার দিকে চলিয়াছিল তাহারা হঠাৎ এক সময়ে থামিয়া সৈন্য হইয়া উঠিল— এবং ঐখানেই তাহাদের ইতিহাস শেষ হইয়া গেল।

শিবাজী যে উদ্দেশ্য সাধনে তাঁহার জীবন প্রয়োগ করিয়াছিলেন তাহা কোনো সংকীর্ণ সাময়িক প্রয়োজন-মূলক ছিল না এবং পূর্ব হইতেই দাক্ষিণাত্যের ধর্মগুরুদের

প্রভাবে তাঁহার ক্ষেত্র কতকটা প্রস্তুত হইয়াছিল। এইজন্য তাঁহার উৎসাহ কিছুকালের জন্য যেন সমস্ত মারাঠা জাতির মধ্যেই সঞ্চারিত হইতে পারিয়াছিল।

ফুটা পাত্রে জল ভরিয়া উঠিতে পারে, কিন্তু তাহাতে জল থাকে না। ক্ষণকালের ভাবোচ্ছ্বাসের প্রাবল্যে মনে হয় সমস্ত বুঝি ছাপাইয়া এক হইয়া গেল, কিন্তু ছিদ্রের কাজ ভিতর ভিতরে চলিতে থাকে। ভারতবর্ষের সমাজ ছিদ্রে পূর্ণ, কোনো ভাবকে তাহা ধরিয়া রাখিতে পারে না, এইজন্য সমাজে প্রাণময় ভাবের পরিবর্তে শুষ্ক নির্জীব আচারের এমন নিদারুণ প্রাদুর্ভাব।

শিবাজী তাঁহার সমসাময়িক মারাঠা-হিন্দু সমাজে একটা প্রবল ভাবের প্রবর্তন এতটা পর্যন্ত করিয়াছিলেন যে, তাঁহার অভাবেও কিছুদিন পর্যন্ত তাহার বেগ নিঃশেষিত হয় না। কিন্তু শিবাজী সেই ভাবের আধারটিকে পাকা করিয়া তুলিতে পারেন নাই, এমন-কি, চেষ্টামাত্র করেন নাই। সমাজের বড়ো বড়ো ছিদ্রগুলির দিকে না তাকাইয়া তাহাকে লইয়া ক্ষুব্ধ সমুদ্রে পাড়ি দিলেন। তখনই পাড়ি না দিলে নয় বলিয়া এবং পাড়ি দিবার আর-কোনো উপায় ছিল না বলিয়াই যে অগত্যা এই কাজ করিয়াছেন তাহা নহে। এই ছিদ্রকেই পার করা তাঁহার লক্ষ্য ছিল। শিবাজী যে হিন্দু-সমাজকে মোগল-আক্রমণের বিরুদ্ধে জয়যুক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, আচারবিচারগত বিভাগ-বিচ্ছেদ সেই সমাজেরই একেবারে মূলের জিনিস। সেই বিভাগমূলক ধর্মসমাজকেই তিনি সমস্ত ভারতবর্ষে জয়ী করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহাকেই বলে বালির বাঁধ বাধা, ইহাই অসাধ্য সাধন।

শিবাজী এমন কোনো ভাবকে আশ্রয় ও প্রচার করেন নাই যাহা হিন্দু সমাজের মূলগত ছিদ্রগুলিকে পরিপূর্ণ করিয়া দিতে পারে। নিজের ধর্ম বাহির হইতে পীড়িত অপমানিত হইতেছে এই ক্ষোভ মনে লইয়া তাহাকে ভারতবর্ষের সর্বত্র বিজয়ী করিবার ইচ্ছা স্বাভাবিক হইলেও তাহা সফল হইবার নহে ; কারণ, ধর্ম যেখানে ভিতর হইতেই পীড়িত হইতেছে, যেখানে তাহার ভিতরই এমন-সকল বাধা আছে যাহাতে মানুষকে কেবলই বিচ্ছিন্ন ও অপমানিত করিতেছে, সেখানে সেদিকে দৃষ্টিপাতমাত্র না করিয়া, এমন-কি, সেই ভেদবুদ্ধিকেই মুখ্যত ধর্মবুদ্ধি বলিয়া জ্ঞান করিয়া সেই শতদীর্ণ ধর্মসমাজের স্বারাজ্য এই সুবৃহৎ ভারতবর্ষে স্থাপন করা কোনো মানুষেরই সাধ্যায়ত্ত নহে ; কারণ, তাহা বিধাতার বিধানসংগত হইতে পারে না। কেবল আঘাত পাইয়া, ক্রুদ্ধ হইয়া, অভিমান করিয়া, কোনো জাতি বড়ো হইতে, জয়ী হইতে পারে না— যতক্ষণ তাহার ধর্মবুদ্ধির মধ্যেই অখণ্ডতার তত্ত্ব কাজ করিবার স্থান না পায়, যতক্ষণ মিলনের শক্তি কোনো মহৎভাবের অমৃতরসে চিরসঞ্জীবিত হইয়া সকল দিক দিয়াই অন্তরে বাহিরে তাহাকে এক করিবার অভিমুখে না লইয়া যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত বাহিরের কোনো আঘাতে ও প্রতিভাশালী ব্যক্তিবিশেষের কোনো বীরত্বেই তাহাকে দৃঢ়ঘনিষ্ঠ, তাহাকে সজীবসচেতন করিয়া তুলিতে পারে না।

১১

খৃষ্ট   অজিতকুমার চক্রবর্তী

বাউল সম্প্রদায়ের একজন লোককে একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, 'তোমরা সকলের ঘরে খাও না?' সে কহিল, 'না'। কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সে কহিল, 'যাহারা আমাদের স্বীকার করে না আমরা তাহাদের ঘরে খাই না।' আমি কহিলাম, 'তারা স্বীকার না করে নাই করিল, তোমরা স্বীকার করিবে না কেন?' সে লোকটি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সরলভাবে কহিল, 'তা বটে, ঐ জায়গাটাতে আমাদের একটু প্যাঁচ আছে।'

আমাদের সমাজে যে ভেদবুদ্ধি আছে তাহারই দ্বারা চালিত হইয়া কোথায় আমরা অন্ন গ্রহণ করিব আর কোথায় করিব না তাহারই কৃত্রিম গণ্ডিরেখা-দ্বারা আমরা সমস্ত পৃথিবীকে চিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছি। এমন-কি, যে-সকল মহাপুরুষ সমস্ত পৃথিবীর সামগ্রী, তাঁহাদিগকেও এইরূপ কোনো-না-কোনো একটা নিষিদ্ধ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ করিয়া পর করিয়া রাখিয়াছি। তাঁহাদের ঘরে অন্ন গ্রহণ করিব না বলিয়া স্থির করিয়া বসিয়া আছি। সমস্ত জগৎকে অন্ন বিতরণের ভার দিয়া বিধাতা যাহাদিগকে পাঠাইয়াছেন আমরা স্পর্ধার সঙ্গে তাঁহাদিগকেও জাতে ঠেলিয়াছি।

মহাত্মা যিশুর প্রতি আমরা অনেকদিন এইরূপ একটা বিদ্বেষভাব পোষণ করিয়াছি। আমরা তাঁহাকে হৃদয়ে গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক।

কিন্তু এজন্য একলা আমাদিগকেই দায়ী করা চলে না। আমাদের খৃস্টের পরিচয় প্রধানত সাধারণ খৃস্টান মিশনারিদের নিকট হইতে। খৃস্টকে তাঁহারা খৃস্টানি দ্বারা আচ্ছন্ন করিয়া আমাদের কাছে ধরিয়াছেন। এ পর্যন্ত বিশেষভাবে তাঁহাদের ধর্মমতের দ্বারা আমাদের ধর্মসংস্কারকে তাঁহারা পরাভূত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সুতরাং আত্মরক্ষার চেষ্টায় আমরা লড়াই করিবার জন্যই প্রস্তুত হইয়া থাকি।

লড়াইয়ের অবস্থায় মানুষ বিচার করে না। সেই মত্ততার উত্তেজনায় আমরা খৃস্টানকে আঘাত করিতে গিয়া খৃস্টকেও আঘাত করিয়াছি। কিন্তু যাঁহারা জগতের মহাপুরুষ, শত্রু কল্পনা করিয়া তাঁহাদিগকে আঘাত করা আত্মঘাতেরই নামান্তর। বস্তুত শত্রুর প্রতি রাগ করিয়া আমাদেরই দেশের উচ্চ আদর্শকে খর্ব করিয়াছি— আপনাকে ক্ষুদ্র করিয়া দিয়াছি।

সকলেই জানেন ইংরাজি শিক্ষার প্রথমাবস্থায় আমাদের সমাজে একটা সংকটের দিন উপস্থিত হইয়াছিল। তখন সমস্ত সমাজ টলমল, শিক্ষিতের মন আন্দোলিত। ভারতবর্ষে পূজার্চনা সমস্তই বয়ঃপ্রাপ্ত শিশুর খেলামাত্র— এ দেশে ধর্মের কোনো উচ্চ আদর্শ, ঈশ্বরের কোনো সত্য উপলব্ধি কোনো কালে ছিল না— এই বিশ্বাসে তখন আমরা নিজেদের সম্বন্ধে লজ্জা অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। এইরূপে

হিন্দু সমাজের কূল যখন ভাঙিতেছিল, শিক্ষিতদের মন যখন ভিতরে ভিতরে বিদীর্ণ হইয়া দেশের দিক হইতে ধসিয়া পড়িতেছিল, স্বদেশের প্রতি অন্তরের অশ্রদ্ধা যখন বাহিরের আক্রমণের সম্মুখে আমাদিগকে দুর্বল করিয়া তুলিতেছিল, সেই সময়ে খৃস্টান মিশনরি আমাদের সমাজে যে বিভীষিকা আনয়ন করিয়াছিল তাহার প্রভাব এখনো আমাদের হৃদয় হইতে সম্পূর্ণ দূর হয় নাই।

কিন্তু সেই সংকট আজ আমাদের কাটিয়া গিয়াছে। সেই ঘোরতর দুর্যোগের সময় রামমোহন রায় বাহিরের আবর্জনা ভেদ করিয়া আমাদের দেশের নিত্য সম্পদ সংশয়াকুল স্বদেশবাসীর নিকট উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিলেন। এখন ধর্মসাধনায় আমাদের ভিক্ষাবৃত্তির দিন ঘুচিয়াছে। এখন হিন্দুধর্ম কেবলমাত্র কতকগুলি অদ্ভুত কাহিনী এবং বাহ্য-আচার-রূপে আমাদের নিকট প্রকাশমান নহে। এখন আমরা নির্ভয়ে সকল ধর্মের মহাপুরুষদের মহাবাণী-সকল গ্রহণ করিয়া আমাদের পৈতৃক ঐশ্বর্যকে বৈচিত্র্যদান করিতে পারি।

কিন্তু দুর্গতির দিনে মানুষ যখন দুর্বল থাকে তখন সে একদিকের আতিশয্য হইতে রক্ষা পাইলে আর-একদিকের আতিশয্যে গিয়া উত্তীর্ণ হয়। বিকারের জ্বরে মানুষের দেহের তাপ যখন উপরে চড়ে তখনো ভয় লাগাইয়া দেয় আবার যখন নীচে নামিতে থাকে তখনো সে ভয়ানক। আমাদের দেশের বর্তমান বিপদ আমাদের পূর্বতন বিপদের উল্‌টা দিকে উন্মত্ত হইয়া ছুটিতেছে।

আমাদের দেশের মহত্ত্বের মূর্তিটি প্রকাশ করিয়া দিলেও তাহা গ্রহণ করিবার বাধা আমাদের শক্তির জীর্ণতা। আমাদের অধিকার পাকা হইল না, কিন্তু আমাদের অহংকার বাড়িল। পূর্বে একদিন ছিল যখন আমরা কেবল সংস্কারবশত আমাদের সমাজ ও ধর্মের সমস্ত বিকারগুলিকে পুঞ্জীভূত করিয়া তাহার মধ্যে আবদ্ধ হইয়া বসিয়াছিলাম। এখন অহংকারবশতই সমস্ত বিকৃতিকে জোর করিয়া স্বীকার করাকে আমরা বলিষ্ঠতার লক্ষণ বলিয়া মনে করি। ঘরে ঝাঁট দিব না, কোনো আবর্জনাকেই বাহিরে ফেলিব না, যেখানে যাহা-কিছু আছে সমস্তকেই গায়ে মাখিয়া লইব, ধুলামাটির সঙ্গে মণিমাণিক্যকে নির্বিচারে একত্রে রক্ষা করাকেই সমন্বনীতি বলিয়া গণ্য করিব— এই দশা আমাদের ঘটিয়াছে। ইহা বস্তুত তামসিকতা। নির্জীবতাই যেখানে যাহা-কিছু আছে সমস্তকেই সমান মূল্যে রক্ষা করে। তাহার কাছে ভালোও যেমন মন্দও তেমন, ভুলও যেমন সত্যও তেমনি।

জীবনের ধর্মই নির্বাচনের ধর্ম। তাহার কাছে নানা পদার্থের মূল্যের তারতম্য আছেই। সেই অনুসারে সে গ্রহণ করে, ত্যাগ করে। এবং যাহা তাঁহার পক্ষে যথার্থ শ্রেয় তাহাকেই সে গ্রহণ করে এবং বিপরীতকেই বর্জন করিয়া থাকে।

পশ্চিমের আঘাত খাইয়া আমাদের দেশে যে জাগরণ ঘটিয়াছে তাহা মুখ্যত জ্ঞানের দিকে। এই জাগরণের প্রথম অবস্থায় আমরা নিজের সম্বন্ধে বার বার ইহাই

লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিলাম যে, আমরা জ্ঞানে যাহা বুঝি ব্যবহারে তাহার উল্‌টা করি। ইহাতে ক্রমে যখন আত্মধিক্‌কারের সূত্রপাত হইল তখন নিজের বুদ্ধির সঙ্গে ব্যবহারের সামঞ্জস্য-সাধনের অতি সহজ উপায় বাহির করিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। আমাদের যাহা-কিছু সমস্তই ভালো, তাহার কিছুই বর্জনীয় নহে, ইহাই প্রমাণ করিতে বসিয়াছি।

একদিকে আমরা জাগিয়াছি। সত্য আমাদের দ্বারে আঘাত করিতেছেন তাহা আমরা জানিতে পারিয়াছি কিন্তু দ্বার খুলিয়া দিতেছি না— সাড়া দিতেছি, কিন্তু পাদ্য-অর্ঘ্য আনিয়া দিতেছি না। ইহাতে আমাদের অপরাধ প্রতিদিন কেবল বাড়িয়া চলিতেছে। কিন্তু সেই অপরাধকে ঔদ্ধত্যের সহিত অস্বীকার করিবার যে অপরাধ সে আরো গুরুতর। লোকভয়ে এবং অভ্যাসের আলস্যে সত্যকে আমরা যদি দ্বারের কাছে দাঁড় করাইয়া লজ্জিত হইয়া বসিয়া থাকিতাম তাহা হইলেও তেমন ক্ষতি হইত না, কিন্তু তুমি সত্য নও— যাহা অসত্য তাহাই সত্য ইহাই প্রাণপণ শক্তিতে প্রমাণ করিবার জন্য যুক্তির কুহক বিস্তার করার মতো এত বড়ো অপরাধ আর কিছুই হইতে পারে না। আমরা ঘরের পুরাতন জঞ্জালকে বাঁচাইতে গিয়া সত্যকে বিনাশ করিতে কুণ্ঠিত হইতেছি না।

এই চেষ্টার মধ্যে যে দুর্বলতা প্রকাশ পায় তাহা মূলত চরিত্রের দুর্বলতা। চরিত্র অসাড় হইয়া আছে বলিয়াই আমরা কাজের দিকটাতে আপনাকে ও সকলকে ফাঁকি দিতে উদ্যত। যে-সকল আচার বিচার বিশ্বাস পূজাপদ্ধতি আমাদের দেশের শতসহস্র নরনারীকে জড়তা মূঢ়তা ও নানা দুঃখে অভিভূত করিয়া ফেলিতেছে, যাহা আমাদিগকে কেবলই ছোটো করিতেছে, ব্যর্থ করিতেছে, বিচ্ছিন্ন করিতেছে, জগতে আমাদিগকে সকলের কাছে অপমানিত ও সকল আক্রমণে পরাভূত করিতেছে, কোনোমতেই আমরা সাহস করিয়া স্পষ্ট করিয়া তাহাদের অকল্যাণরূপ দেখিতে এবং ঘোষণা করিতে চাহি না ;— নিজের বুদ্ধির চোখে সূক্ষ্ম ব্যাখ্যার ধুলা ছড়াইয়া নিশ্চেষ্টতার পথে স্পর্ধা করিয়া পদচারণ করিতে চাই। ধর্মবুদ্ধি চরিত্রবল যখন জাগিয়া উঠে তখন সে এই-সকল বিড়ম্বনা-সৃষ্টিকে প্রবল পৌরুষের সহিত অবজ্ঞা করে। মানুষের যে-সকল দুঃখ-দুর্গতি সম্মুখে স্পষ্ট বিদ্যমান তাহাকে সে হৃদয়হীন ভাবুকতার সূক্ষ্ম কারুকার্যে মনোরম করিয়া তোলার অধ্যবসায়কে কিছুতেই আর সহ্য করিতে পারে না।

ইহা হইতেই আমাদের প্রয়োজন বুঝা যাইবে। জ্ঞানবৃদ্ধির দ্বারা আমাদের সম্পূর্ণ বলবৃদ্ধি হইতেছে না। আমাদের মনুষ্যত্বকে সমগ্রভাবে উদ্‌বোধিত করিয়া তোলার অভাবে আমরা নির্ভীক পৌরুষের সহিত পূর্ণশক্তিতে জীবনকে মঙ্গলের সরল পথে প্রবাহিত করিতে পারিতেছি না।

এই দুর্গতির দিনে সেই মহাপুরুষেরাই আমাদের সহায় যাঁহারা কোনো কারণেরই কোনো প্রলোভনেই আপনাকে এবং অন্যকে বঞ্চনা করিতে চান নাই, যাঁহারা প্রবল

বলে মিথ্যাকে অস্বীকার করিয়াছেন এবং সমস্ত পৃথিবীর লোকের নিকট অপমানিত হইয়াও সত্যকে যাঁহারা নিজের জীবন দিয়া সপ্রমাণ করিয়াছেন। তাঁহাদের চরিত চিন্তা করিয়া সমস্ত কৃত্রিমতা কুটিলতর্ক ও প্রাণহীন বাহ্য-আচারের জটিল বেষ্টন হইতে চিত্ত মুক্তিলাভ করিয়া রক্ষা পায়।

যিশুর চরিত আলোচনা করিলে দেখিতে পাইব যাঁহারা মহাত্মা তাঁহারা সত্যকে অত্যন্ত সরল করিয়া সমস্ত জীবনের সামগ্রী করিয়া দেখেন— তাঁহারা কোনো নূতন পন্থা, কোনো বাহ্য প্রণালী, কোনো অদ্ভুত মত প্রচার করেন না। তাঁহারা অত্যন্ত সহজ কথা বলিবার জন্য আসেন— তাঁহারা পিতাকে পিতা বলিতে ও ভাইকে ভাই ডাকিতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা এই অত্যন্ত সরল বাক্যটি অত্যন্ত জোরের সঙ্গে বলিয়া যান যে, যাহা অন্তরের সামগ্রী তাহাকে বাহিরের আয়োজনে পুঞ্জীকৃত করিবার চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র। তাঁহারা মনকে জাগাইতে বলেন, তাঁহারা দৃষ্টিকে সরল করিয়া সম্মুখে লক্ষ্য করিতে বলেন, অন্ধ অভ্যাসকে তাঁহারা সত্যের সিংহাসন হইতে অপসারিত করিতে আদেশ করেন। তাঁহারা কোনো অপরূপ সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া আনেন না, কেবল তাঁহাদের দীপ্ত নেত্রের দৃষ্টিপাতে আমাদের জীবনের মধ্যে তাঁহারা সেই চিরকালের আলোক নিক্ষেপ করেন যাহার আঘাতে আমাদের দুর্বল জড়তার সমস্ত ব্যর্থ জাল-বুনানির মধ্য হইতে আমরা লজ্জিত হইয়া জাগিয়া উঠি।

জাগিয়া উঠিয়া আমরা কী দেখি? আমরা মানুষকে দেখিতে পাই। আমরা নিজের সত্যমূর্তি সম্মুখে দেখি। মানুষ যে কত বড়ো সে কথা আমরা প্রতিদিন ভুলিয়া থাকি; স্বরচিত ও সমাজরচিত শত শত বাধা আমাদিগকে চারি দিক হইতে ছোটো করিয়া রাখিয়াছে, আমরা আমাদের সমস্তটা দেখিতে পাই না। যাঁহারা আপনার দেবতাকে ক্ষুদ্র করেন নাই, পূজাকে কৃত্রিম করেন নাই, লোকাচারের দাসত্ব চিহ্ন ধুলায় ফেলিয়া দিয়া যাঁহারা আপনাকে অমৃতের পুত্র বলিয়া সগৌরবে ঘোষণা করিয়াছেন, তাঁহারা মানুষের কাছে মানুষকে বড়ো করিয়া দিয়াছেন। ইহাকেই বলে মুক্তি দেওয়া। মুক্তি স্বর্গ নহে, সুখ নহে। মুক্তি অধিকার বিস্তার, মুক্তি ভূমাকে উপলব্ধি।

সেই মুক্তির আহ্বান বহন করিয়া নিত্যকালের রাজপথে ঐ দেখো কে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। তাঁহাকে অনাদর করিয়ো না, আঘাত করিয়ো না, তুমি আমাদের কেহ নও বলিয়া আপনাকে হীন করিয়ো না। তুমি আমাদের জাতির নও বলিয়া আপনার জাতিকে লজ্জা দিয়ো না। সমস্ত জড়সংস্কারজাল ছিন্ন করিয়া বাহির হইয়া আইস, ভক্তিনম্র চিত্তে প্রণাম করো, বলো— তুমি আমাদের অত্যন্ত আপন, কারণ তোমার মধ্যে আমরা আপনাকে সত্যভাবে লাভ করিতেছি।

যে সময়ে কোনো দেশে কোনো মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন সে সময়কে আমরা তাঁহার আবির্ভাবের অনুকূল সময় বলিয়া গণ্য করি। এ কথা এক দিক হইতে সত্য

হইলেও এ সম্বন্ধে আমাদের ভুল বুঝিবার সম্ভাবনা আছে। সাধারণত যে লক্ষণগুলিকে আমরা অনুকূল বলিয়া মনে করি তাহার বিপরীতকেই প্রতিকূল বলিয়া গণ্য করা চলে না। অভাব অত্যন্ত কঠোর হইলে মানুষের লাভের চেষ্টা অত্যন্ত জাগ্রত হয়। অতএব একান্ত অভাবকেই লাভসম্ভাবনার প্রতিকূল বলা যাইতে পারে না। বাতাস যখন অত্যন্ত স্থির হয় তখনই ঝড়কে আমরা আসন্ন বলিয়া থাকি। বস্তুত মানুষের ইতিহাসে আমরা বরাবর দেখিয়া আসিতেছি— প্রতিকূলতা যেমন আনুকূল্য করে এমন আর কিছুতেই নহে। যিশুর জন্মগ্রহণকালের প্রতি লক্ষ করিলেও আমরা এই সত্যটির প্রমাণ পাইব।

মানুষের প্রতাপ ও ঐশ্বর্য যখন চোখে দেখিতে পাই তখন আমাদের মনের উপর তাহার প্রভাব যে কীরূপ প্রবল হইয়া উঠে তাহা বর্তমান যুগে আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি। সে আপনার চেয়ে বড়ো যেন আর কাহাকেও স্বীকার করিতে চায় না। মানুষ এই ঐশ্বর্যের প্রলোভনে আকৃষ্ট হইয়া কেহ-বা ভিক্ষাবৃত্তি, কেহ-বা দাস্যবৃত্তি, কেহ-বা দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিয়া সমস্ত জীবন কাটাইয়া দেয়— এক মুহূর্ত অবকাশ পায় না।

যিশু যখন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তখন রোম-সাম্রাজ্যের প্রতাপ অভ্রভেদী হইয়া উঠিয়াছিল। যে কেহ যে দিকে চোখ মেলিত এই সাম্রাজ্যেরই গৌরবচূড়া সকল দিক হইতেই চোখে পড়িতে থাকিত; ইহারই আয়োজন উপকরণ সকলের চিত্তকে অভিভূত করিয়া দিতেছিল। রোমের বিদ্যাবুদ্ধি বাহুবল ও রাষ্ট্রীয় শক্তির মহাজালে যখন বিপুল সাম্রাজ্য চারি দিকে আবদ্ধ, সেই সময়ে সাম্রাজ্যের এক প্রান্তে দরিদ্র ইহুদি মাতার গর্ভে এই শিশু জন্মগ্রহণ করিলেন।

তখন রোম-সাম্রাজ্যে ঐশ্বর্যের যেমন প্রবল মূর্তি, ইহুদি-সমাজে লোকাচার ও শাস্ত্রশাসনেরও সেইরূপ প্রবল প্রভাব।

ইহুদিদের ধর্ম স্বজাতির মধ্যে গণ্ডিবদ্ধ। তাহাদের ঈশ্বর জিহোভা বিশেষভাবে তাহাদিগকে বরণ করিয়া লইয়াছেন এইরূপ তাহাদের বিশ্বাস। তাঁহার নিকট তাহারা কতকগুলি সত্যে বদ্ধ, এই সত্যগুলি বিধিরূপে তাহাদের সংহিতায় লিখিত। এই বিধি পালন করাই ঈশ্বরের আদেশ পালন।

বিধির অচল গণ্ডির মধ্যে নিয়ত বাস করিতে গেলে মানুষের ধর্মবুদ্ধি কঠিন ও সংকীর্ণ না হইয়া থাকিতে পারে না। কিন্তু ইহুদিদের সনাতন-আচার-নিষ্পেষিত চিত্তে নূতন প্রাণ সঞ্চার করিবার উপায় ঘটিয়াছিল। মাঝে মাঝে তাহাদের পাথরের প্রাচীর ভেদ করিয়া তাহাদের মধ্যে এক-একজন ঋষি আসিয়া দেখা দিতেন। ধর্মের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি বহন করিয়াই তাঁহাদের অভ্যুদয়। তাঁহারা স্মৃতিশাস্ত্রের মৃতপত্রমর্মরকে আচ্ছন্ন করিয়া দিয়া অমৃতবাণী প্রচার করিতেন। এই ইসায়া জেরেমায়া প্রভৃতি ইহুদি ঋষিগণ পরমদুর্গতির দিনে আলোক জ্বালাইয়াছেন। তাঁহাদের তীব্র জ্বালাময় বাক্যের বজ্রবর্ষণে স্বজাতির বদ্ধজীবনের বহুদিন সঞ্চিত কলুষরাশি দগ্ধ করিয়াছেন।

শাস্ত্র ও আচারধর্মের দ্বারাই ইহুদিদের সমস্ত জীবন নিয়মিত। যদিচ তাহারা সাহসিক যোদ্ধা ছিল তবু রাষ্ট্ররক্ষা-ব্যাপারে তাহাদের পটুত্ব প্রকাশ পায় নাই। এইজন্য রাষ্ট্র সম্বন্ধে বিদেশী প্রতিবেশীদের হাতে তাহারা দুর্গতিলাভ করিয়াছিল।

যিশুর জন্মের কিছুকাল পূর্ব হইতে ইহুদিদের সমাজে ঋষি-অভ্যুদয় বন্ধ ছিল। কালের গতি প্রতিহত করিয়া, প্রাণের প্রবাহ অবরুদ্ধ করিয়া, পুরাতনকে চিরস্থায়ী করিবার চেষ্টায় তখন সকলে নিযুক্ত ছিল। বাহিরকে একেবারে বাহিরে ঠেকাইয়া, সমস্ত দ্বার জানালা বন্ধ করিয়া, দেয়াল গাঁথিয়া তুলিবার দলই তখন প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। নবসংকলিত তাল্‌মদ্‌ শাস্ত্রে বাহ্য আচারবন্ধনের আয়োজন পাকা হইল, এবং ধর্ম-পালনের মূলে যে-একটি মুক্ত বুদ্ধি ও স্বাধীনতা-তত্ত্ব আছে তাহাকে স্থান দেওয়া হইল না।

জড়ত্বের চাপ যতই কঠোর হউক মনুষ্যত্বের বীজ একেবারে মরিতে চায় না। অন্তরাত্মা যখন পীড়িত হইয়া উঠে, বাহিরে যখন সে কোনো আশার মূর্তি দেখিতে পায় না, তখন তাহার অন্তর হইতেই আশ্বাসের বাণী উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে— সেই বাণীকে সে হয়তো সম্পূর্ণ বোঝে না অথচ তাহাকে প্রচার করিতে থাকে। এই সময়টাতে ইহুদিরা আপনা-আপনি বলাবলি করিতেছিল মর্তে পুনরায় স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠার কাল আসিতেছে। তাহারা মনে করিতেছিল তাহাদেরই দেবতা তাহাদের জাতিকেই এই স্বর্গরাজ্যের অধিকার দান করিবেন— ঈশ্বরের বরপুত্র ইহুদি জাতির সত্যযুগ পুনরায় আসন্ন হইয়াছে।

এই আসন্ন শুভ মুহূর্তের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে এই ভাবচিন্ত জাতির মধ্যে কাজ করিতেছিল। এইজন্য মরুস্থলীতে বসিয়া অভিষেক-দাতা যোহন্‌ যখন ইহাদিগকে অনুতাপের দ্বারা পাপের প্রায়শ্চিত্ত ও জর্ডনের তীর্থজলে দীক্ষা গ্রহণ করিবার জন্য আহ্বান করিলেন তখন দলে দলে পুণ্যকামিগণ তাঁহার নিকট আসিয়া সমবেত হইতে লাগিল। ইহুদিরা ঈশ্বরকে প্রসন্ন করিয়া পৃথিবীতে আপনাদের অপমান ঘুচাইতে চাহিল, ধরাতলের রাজত্ব এবং সকলের শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিবার আশ্বাসে তাহারা উৎসাহিত হইয়া উঠিল।

এমন সময়ে যিশুও মর্তলোকে ঈশ্বরের রাজ্যকে আসন্ন বলিয়া ঘোষণা করিলেন। কিন্তু ঈশ্বরের রাজ্য যিনি স্থাপন করিতে আসিবেন তিনি কে? তিনি তো রাজা, তাঁহাকে তো রাজপদ গ্রহণ করিতে হইবে। রাজপ্রভাব না থাকিলে সর্বত্র ধর্মবিধি প্রবর্তন করিবে কী করিয়া? একবার কি মরুস্থলীতে মানবের মঙ্গল ধ্যান করিবার সময় যিশুর মনে এই দ্বিধা উপস্থিত হয় নাই? ক্ষণকালের জন্য কি তাঁহার মনে হয় নাই রাজপীঠের উপরে ধর্মসিংহাসন প্রতিষ্ঠা করিলে তবেই তাঁহার ক্ষমতা অপ্রতিহত হইতে পারে? কথিত আছে, শয়তান তাঁহার সম্মুখে রাজ্যের প্রলোভন বিস্তার করিয়া তাঁহাকে মুগ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। সেই প্রলোভনকে নিরস্ত করিয়া তিনি জয়ী

হইয়াছিলেন। এই প্রলোভনের কাহিনীকে কাল্পনিক বলিয়া উড়াইয়া দিবার হেতু নাই। রোমের জয়-পতাকা তখন রাজগৌরবে আকাশে আন্দোলিত হইতেছিল এবং সমস্ত ইহুদি জাতি রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার সুখস্বপ্নে নিবিষ্ট হইয়াছিল। এমন অবস্থায় সমস্ত জনসাধারণের সেই অন্তরের আন্দোলন যে তাঁহারও ধ্যানকে গভীরভাবে আঘাত করিতে থাকিবে ইহাতে আশ্চর্যের কথা কিছুই নাই।

কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে, এই সর্বব্যাপী মায়াজালকে ছেদন করিয়া তিনি ঈশ্বরের সত্যরাজ্যকে সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষ করিলেন। ধনমানের মধ্যে তাহাকে দেখিলেন না, মহাসাম্রাজ্যের দৃপ্ত প্রতাপের মধ্যে তাহাকে দেখিলেন না ; বাহ্য উপকরণহীন দারিদ্র্যের মধ্যে তাহাকে দেখিলেন এবং সমস্ত বিষয়ীলোকের সম্মুখে একটা অদ্ভুত কথা অসংকোচে প্রচার করিলেন যে, যে নম্র পৃথিবীর অধিকার তাহারই। তিনি চরিত্রের দিক দিয়া এই যেমন একটা কথা বলিলেন, উপনিষদের ঋষিরা মানুষের মনের দিক দিয়া ঠিক এই প্রকারই অদ্ভুত একটা কথা বলিয়াছেন— 'যাহারা স্থির তাহারাই সকলের মধ্যে প্রবেশের অধিকার লাভ করে।' 'ধীরাঃ সর্বমেবাবিশন্তি।'

যাহা অত্যন্ত প্রত্যক্ষ এবং যাহা সর্বজনের চিত্তকে অভিভূত করিয়া বর্তমান, তাহাকে সম্পূর্ণ ভেদ করিয়া, সাধারণ মানবের সংস্কারকে অতিক্রম করিয়া, ঈশ্বরের রাজ্যকে এমন একটি সত্যের মধ্যে তিনি দেখিলেন যেখানে সে আপনার আন্তরিক শক্তিতে আপনি প্রতিষ্ঠিত— বাহিরের কোনো উপাদানের উপর তাহার আশ্রয় নহে। সেখানে অপমানিতেরও সম্মান কেহ কাড়িতে পারে না, দরিদ্রেরও সম্পদ কেহ নষ্ট করিতে পারে না। সেখানে যে নত সেই উন্নত হয়, যে পশ্চাদ্‌বর্তী সেই অগ্রগণ্য হইয়া উঠে। এ কথা তিনি কেবল কথায় রাখিয়া যান নাই। যে দোর্দণ্ডপ্রতাপ সম্রাটের রাজদণ্ড অনায়াসে তাঁহার প্রাণবিনাশ করিয়াছে তাহার নাম ইতিহাসের পাতার এক প্রান্তে লেখা আছে মাত্র। আর যিনি সামান্য চোরের সঙ্গে একত্রে ক্রুসে বিদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন, মৃত্যুকালে সামান্য কয়েকজন ভীত অখ্যাত শিষ্য যাঁহার অনুবর্তী, অন্যায় বিচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার সাধ্যমাত্র যাঁহার ছিল না, তিনি আজ মৃত্যুহীন গৌরবে সমস্ত পৃথিবীর হৃদয়ের মধ্যে বিরাজ করিতেছেন এবং আজও বলিতেছেন, যাহারা দীন তাহারা ধন্য ; কারণ, স্বর্গরাজ্য তাহাদের। যাহারা নম্র তাহারা ধন্য ; কারণ পৃথিবীর অধিকার তাহারাই লাভ করিবে।

এইরূপে স্বর্গরাজ্যকে যিশু মানুষের অন্তরের মধ্যে নির্দেশ করিয়া মানুষকেই বড়ো করিয়া দেখাইয়াছেন। তাহাকে বাহিরের উপকরণের মধ্যে স্থাপিত করিয়া দেখাইলে মানুষের বিশুদ্ধ গৌরব খর্ব হইত। তিনি আপনাকে বলিয়াছেন মানুষের পুত্র। মানবসন্তান যে কে তাহাই তিনি প্রকাশ করিতে আসিয়াছেন।

তাই তিনি দেখাইয়াছেন, মানুষের মনুষ্যত্ব সাম্রাজ্যের ঐশ্বর্যেও নহে, আচারের অনুষ্ঠানেও নহে ; কিন্তু মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের প্রকাশ আছে এই সত্যেই সে সত্য।

মানবসমাজে দাঁড়াইয়া ঈশ্বরকে তিনি পিতা বলিয়াছেন। পিতার সঙ্গে পুত্রের যে সম্বন্ধ তাহা আত্মীয়তার নিকটতম সম্বন্ধ— আত্মাবৈ জায়তে পুত্রঃ। তাহা আদেশপালনের ও অঙ্গীকাররক্ষার বাহ্য সম্পর্ক নহে। ঈশ্বর পিতা এই চিরন্তন সম্বন্ধের দ্বারাই মানুষ মহীয়ান, আর কিছুর দ্বারা নহে। তাই ঈশ্বরের পুত্ররূপে মানুষ সকলের চেয়ে বড়ো, সাম্রাজ্যের রাজারূপে নহে। তাই শয়তান আসিয়া যখন তাঁহাকে বলিল, তুমি রাজা তিনি বলিলেন, না, আমি মানুষের পুত্র। এই বলিয়া তিনি সমস্ত মানুষকে সম্মানিত করিয়াছেন।

তিনি এক জায়গায় ধনকে নিন্দা করিয়াছেন, বলিয়াছেন ধন মানুষের পরিত্রাণের পথে প্রধান বাধা। ইহা একটা নিরর্থক বৈরাগ্যের কথা নহে। ইহার ভিতরকার অর্থ এই যে, ধনী ধনকেই আপনার প্রধান অবলম্বন বলিয়া জানে— অভ্যাসের মোহবশত ধনের সঙ্গে সে আপনার মনুষ্যত্বকে মিলাইয়া ফেলে। এমন অবস্থায় তাহার প্রকৃত আত্মশক্তি আবৃত হইয়া যায়। যে আত্মশক্তিকে বাধামুক্ত করিয়া দেখে সে ঈশ্বরের শক্তিকেই দেখিতে পায় এবং সেই দেখার মধ্যেই তাহার যথার্থ পরিত্রাণের আশা। মানুষ যখন যথার্থভাবে আপনাকে দেখে তখনই আপনার মধ্যে ঈশ্বরকে দেখে ; আর আপনাকে দেখিতে গিয়া যখন সে কেবল ধনকে দেখে, মানকে দেখে, তখনই আপনাকে অবমানিত করে এবং সমস্ত জীবনযাত্রার দ্বারা ঈশ্বরকে অস্বীকার করিতে থাকে।

মানুষকে এই মানবপুত্র বড়ো দেখিয়াছেন বলিয়াই মানুষকে যন্ত্ররূপে দেখিতে চান নাই। বাহ্য ধনে যেমন মানুষকে বড়ো করে না তেমনি বাহ্য আচারে মানুষকে পবিত্র করে না। বাহিরের স্পর্শ বাহিরের খাদ্য মানুষকে দূষিত করিতে পারে না ; কারণ, মানুষের মনুষ্যত্ব যেখানে, সেখানে তাহার প্রবেশ নাই। যাহারা বলে বাহিরের সংশ্রবে মানুষ পতিত হয় তাহারা মানুষকে ছোটো করিয়া দেয়। এইরূপে মানুষ যখন ছোটো হইয়া যায় তখন তাহার সংকল্প, তাহার ক্রিয়াকর্ম, সমস্তই ক্ষুদ্র হইয়া আসে ; তাহার শক্তি হ্রাস হয় এবং সে কেবলই ব্যর্থতার মধ্যে ঘুরিয়া মরে। এইজন্যই মানবপুত্র আচার ও শাস্ত্রকে মানুষের চেয়ে বড়ো হইতে দেন নাই এবং বলিয়াছেন, বলি-নৈবেদ্যের দ্বারা ঈশ্বরের পূজা নহে, অন্তরের ভক্তির দ্বারাই তাহার ভজনা। এই বলিয়াই তিনি অস্পৃশ্য স্পর্শ করিলেন, অনাচারীর সহিত একত্রে আহার করিলেন এবং পাপীকে পরিত্যাগ না করিয়া তাহাকে পরিত্রাণের পথে আহ্বান করিলেন।

শুধু তাই নয়, সমস্ত মানুষের মধ্যে তিনি আপনাকে এবং সেই যোগে ভগবানকে উপলব্ধি করিলেন। তিনি শিষ্যদিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, দরিদ্রকে যে খাওয়ায় সে আমাকেই খাওয়ায়, বস্ত্রহীনকে যে বস্ত্র দেয় যে আমাকেই বসন পরায়। ভক্তিবৃত্তিকে বাহ্য অনুষ্ঠানের দ্বারা সংকীর্ণরূপে চরিতার্থ করিবার উপদেশ ও দৃষ্টান্ত তিনি দেখান নাই। ঈশ্বরের ভজনা ভক্তিরসসম্ভোগ করার উপায়মাত্র নহে। তাঁহাকে ফুল দিয়া,

নৈবেদ্য দিয়া, বস্ত্র দিয়া, স্বর্ণ দিয়া ফাঁকি দিলে যথার্থ আপনাকেই ফাঁকি দেওয়া হয়, ভক্তি লইয়া খেলা করা হয় মাত্র এবং এইরূপ খেলায় যতই সুখ হউক তাহা মনুষ্যত্বের অবমাননা। যিশুর উপদেশ যাঁহারা সত্যভাবে গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা কেবলমাত্র পূজার্চনা-দ্বারা দিনরাত কাটাইয়া দিতে পারেন না; মানুষের সেবা তাহাদের পূজা, অতি কঠিন তাঁহাদের ব্রত। তাঁহারা আরামের শয্যা ত্যাগ করিয়া, প্রাণের মমতা বিসর্জন দিয়া, দূর-দেশান্তরে নরখাদকদের মধ্যে, কুষ্ঠরোগীদের মধ্যে, জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন— কেননা, যাঁহার নিকট হইতে তাঁহারা দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন তিনি মানবপুত্র, তাঁহার আবির্ভাবে মানবের প্রতি ঈশ্বরের দয়া সুস্পষ্ট প্রকাশমান হইয়াছে। কারণ, এই মহাপুরুষ সর্বপ্রকারে মানবের মাহাত্ম্য যেমন করিয়া প্রচার করিয়াছেন এমন আর কে করিয়াছেন?

তাঁহাকে তাঁহার শিষ্যেরা দুঃখের মানুষ বলেন। দুঃখস্বীকারকে তিনি মহৎ করিয়া দেখাইয়াছেন। ইহাতেও তিনি মানুষকে বড়ো করিয়াছেন। দুঃখের উপরেও মানুষ যখন আপনাকে প্রকাশ করে তখনই মানুষ আপনার সেই বিশুদ্ধ মনুষ্যত্বকে প্রচার করে যাহা আগুনে পোড়ে না যাহা অস্ত্রাঘাতে ছিন্ন হয় না।

সমস্ত মানুষের প্রতি প্রেমের দ্বারা যিনি ঈশ্বরের প্রেম প্রচার করিয়াছেন, সমস্ত মানুষের দুঃখভার স্বেচ্ছাপূর্বক গ্রহণ করিবার উপদেশ তাঁহার জীবন হইতে আপনিই নিঃশ্বসিত হইয়া উঠিবে ইহাতে আর আশ্চর্য কী আছে। কারণ, স্বেচ্ছায় দুঃখবহন করিতে অগ্রসর হওয়াই প্রেমের ধর্ম। দুর্বলের নির্জীব প্রেমই ঘরের কোণে ভাবাবেশের অশ্রুজলপাতে আপনাকে আপনি আর্দ্র করিতে থাকে। যে প্রেমের মধ্যে যথার্থ জীবন আছে সে আত্মত্যাগের দ্বারা, দুঃখস্বীকারের দ্বারা গৌরব লাভ করে। সে গৌরব অহংকারের গৌরব নহে; কারণ অহংকারের মদিরায় নিজেকে মত্ত করা প্রেমের পক্ষে অনাবশ্যক— তাহার নিজের মধ্যে স্বতঃ-উৎসারিত অমৃতের উৎস আছে।

মানুষের মধ্যে ভগবানের প্রকাশ— যিশুর এই বাণী কেবলমাত্র তত্ত্বকথারূপে কোনো-একটি শাস্ত্রের শ্লোকের মধ্যে বন্দী হইয়া বাস করিতেছে না। তাঁহার জীবনের মধ্যে তাহা একান্ত সত্য হইয়া দেখা দিয়াছিল বলিয়াই আজ পর্যন্ত তাহা সজীব বনস্পতির মতো নব নব শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিতেছে। মানবচিত্তের শত সহস্র সংস্কারের বাধা প্রতিদিনই সে ক্ষয় করিবার কাজে নিযুক্ত আছে। ক্ষমতার মদে মাতাল প্রতিদিন তাহাকে অপমান করিতেছে, জ্ঞানের গর্বে উদ্ধত প্রতিদিন তাহাকে উপহাস করিতেছে। শক্তি-উপসাক তাহাকে অক্ষমের দুর্বলতা বলিয়া অবজ্ঞা করিতেছে। কঠোর বিষয়ী তাহাকে কাপুরুষের ভাবুকতা বলিয়া উড়াইয়া দিতেছে; তবু সে নম্র হইয়া নীরবে মানুষের গভীরতম চিত্তে ব্যাপ্ত হইতেছে, দুঃখকেই আপনার সহায় এবং সেবাকে আপনার সঙ্গিনী করিয়া লইয়াছে— যে পর তাহাকে আপন করিতেছে, যে পতিত তাহাকে তুলিয়া লইতেছে, যাহার কাছ হইতে কিছুই পাইবার নাই তাহার কাছে

আপনাকে নিঃশেষে উৎসর্গ করিয়া দিতেছে। এমনি করিয়া মানবপুত্র পৃথিবীকে, সকল মানুষকেই বড়ো করিয়া তুলিয়াছেন— তাহাদের অনাদর দূর করিয়াছেন, তাহাদের অধিকার প্রশস্ত করিয়াছেন, তাহারা যে তাহাদের পিতার ঘরে বাস করিতেছে, এই সংবাদের দ্বারা অপমানের সংকোচ মানবসমাজ হইতে অপসারিত করিয়াছেন— ইহাকেই বলে মুক্তিদান করা।

শান্তিনিকেতন
২৫ ডিসেম্বর ১৯১০

১২

বসন্ত-প্রয়াণ : সরযূবালা দাসগুপ্ত

পাঠকের কাছে এই গ্রন্থখানির পরিচয় করাইবার ভার আমার উপর পড়িয়াছে। আমি এমন ভার লইতাম না। কারণ আমি জানি কর্ম হইতে কর্মের উৎপত্তি হয়। এ কাজটি করিলেই ইহার অনুরূপ কাজের জন্য অন্তত অনুরোধ সহিতে হইবে। আমার বয়সে নিত্য প্রয়োজনের পক্ষেই শক্তির টানাটানি ঘটে, এইজন্য কাজ যাহাতে না বাড়ে সেজন্য সাবধান হইতেই হয়।

কিন্তু সাবধানী মানুষের সংকল্প স্থির থাকে না এমন ঘটনাও ঘটে। বইখানি পড়িয়া আমারও সেই দশা হইয়াছে। যখন ইহার ভূমিকা লিখিয়া দিবার অনুরোধ পাইলাম, তখন ভাবী বিপদের আশঙ্কা ভুলিয়া গিয়াও সম্মত হইতে দ্বিধা করিলাম না।

পৃথিবীর অধিকাংশ লেখকই ক্রমে ক্রমে আপনার পরিচয় আপনিই দিয়া থাকেন। তাঁহাদের রচনা অল্পে অল্পে অঙ্কুর হইতে বাড়িয়া ক্রমে ক্রমে শাখা পল্লবে সম্পূর্ণরূপ ধারণ করে— ইতিমধ্যে পাঠকেরা রহিয়া বসিয়া তাঁহাদিগকে চিনিয়া লইবার অবকাশ পায়। এইজন্য অল্প বয়সের কোনো লেখকের প্রথম রচনা দেখিবার জন্য যখন অনুরোধ পাওয়া যায়, তখন তাহা পড়িতে ভয় করি। মনে জানি, এরূপ লেখা কাঁচা হইবারই কথা। কারণ যদি-বা কোনো গুণী, বিধাতাদত্ত বীণা লইয়াই জন্মগ্রহণ করেন তবু সেটির সুর বাঁধিতে এবং তাহাকে আয়ত্ত করিয়া লইতে, অভ্যাসের প্রয়োজন হয়। যতক্ষণ তাহা না ঘটে ততক্ষণ শক্তি অনাথ হইয়া থাকে। কেননা বাহিরের নৈপুণ্য কেবল যে অন্তরের শক্তিকে প্রকাশ মাত্র করে তাহা নহে, তাহাকে জাগাইয়া তুলিতে থাকে।

খাতাখানি হাতে লইয়া পড়িতে বসিলাম। অক্ষরগুলি কাঁচা মেয়েলি ছাঁদের। জানি না তাহা লেখিকার নিজের কি না। কিন্তু অধিকাংশ মেয়ের হাতের অক্ষরের ছাঁদ কেন যে অনেকটা এক রকমের হইবে, তাহা তো বুঝিতে পারি না। তাহার কারণ যাহাই থাক্, তাহার ফলে, এই হয়, মেয়ের হাতের লেখা পড়িবার সময় প্রথমেই ধারণা হয়, ইহার মধ্যে অসাধারণতা নাই। মনে হয় যিনি লিখিতেছেন, নিজের ছাঁদে জোর করিয়া চলিবার সাহস তাঁহার নাই। দস্তুর মানিয়া, দশের মুখ চাহিয়া অন্তঃপুরের গণ্ডি বাঁচাইয়া কতকগুলি প্রচলিত কথাকে মেয়েলি পোশাকে কনে-বউ সাজাইয়া অত্যন্ত জড়সড় ভালো মানুষ করিয়া বসানো হইয়াছে, ইহারা বিশ্বভুবনের নহে, ইহারা ঘরের কোণের সামগ্রী মাত্র।

মনে সেই আশঙ্কা করিয়াই পড়িতে শুরু করিয়াছিলাম পড়িতে পড়িতে মন নম্র হইয়া আসিল। বিচারকের আসন হইতে নীচে নামিয়া বসিতে হইল। ক্রমেই আর সন্দেহ রহিল না যে, এ একটা নূতন সৃষ্টি বটে। এ তো একেবারেই শেখা কথা নহে। প্রথমে একটা পেন্সিল হাতে করিয়া বসিয়াছিলাম, ভাবিয়াছিলাম যেখানে ভাষা বা ভাব কাঁচা কাছে দাগ দিব, কিংবা কিছু কিছু বদল করিব। পেন্সিল রাখিয়া দিলাম— কোথাও কিছু দাগ দিই নাই।

এই রচনার মধ্যে কোথাও যে কিছু বদল করিলে চলে না এমনতর কথা নয়। কিন্তু সেদিকে লক্ষ্য রাখিবার প্রতি মনের উৎসাহ রহিল না। তাহার একটি কারণ এই যে, সমস্ত জিনিসটা যেখানে সাঁচ্চা, সেখানে স্থানে স্থানে দাগে আঁচড়ে বিশেষ কিছু আসে যায় না— গিল্টিতে আঁচড় লাগিলেই ভয় হয় তাহার ফাঁকি ধরা পড়িবে। আর-একটি কারণ এই, যে রচনা প্রাণের সৃষ্টি প্রাণময়, বাহির হইতে তাহাকে বদল করা সহজ নহে; তাহার সমস্ত ত্রুটিও তাহার বিকাশের অঙ্গ। ইট কাঠ সাজাইয়া যাহা তৈরি, তাহাকে ভাঙিয়া চুরিয়া মেরামত করা যায় কিন্তু জীবকে তো মেরামত করা চলে না।

এ কথা শুনিতে অদ্ভুত কিন্তু ইহা সত্য যে অন্যের নকল করা সহজ কিন্তু নিজের সত্যটিকে অবারিত করা সকলের চেয়ে কঠিন। কারণ আমরা প্রত্যেকেই দশের দ্বারা অত্যন্ত চাপা পড়িয়া গেছি। সেই দশের ভিড় ঠেলিয়া নিজেকে স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করা আমাদের শক্তিতে নাই। হাটের কোলাহলের উপরে নিজের সুরটিকে জাগাইয়া তুলিতে পারি না বলিয়া গোলে হরিবোল দিই;— সেইটেই সহজ, এবং আশপাশের লোকেও সেইটে প্রত্যাশা করে।

কিন্তু এই 'বসন্ত-প্রয়াণ' একেবারে আপনার সুরে আপনি প্রকাশ পাইয়াছে। আমাদের সাহিত্যে কিংবা অন্য কোনো সাহিত্যে অন্য কোনো বইয়ের সঙ্গে ইহাকে শ্রেণীবদ্ধ করিতে পারি না। পাশ্চাত্য সাহিত্যে অনেক গ্রন্থ আছে যাহাতে লেখক নিজের মর্মকথা প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন— তাহার কোনোটার সঙ্গে এই

রচনাকে ঠিক মিলাইতে পারি না। সেই গ্রন্থগুলি 'Confession' নামে পরিচিত— এই নামের দ্বারাই বোঝা যায় ওগুলি পাঠকদের সম্মুখে রাখিয়াই লেখা— কোনোটা বা কৈফিয়ত কোনোটা বা অন্যের কাছে নিজের পরিচয় দান।

'বসন্ত-প্রয়াণ'ও লেখিকার নিজের জীবনের একটা পরিচয় বটে কিন্তু সে পরিচয় পরের কাছে নহে। সে পরিচয় স্বতই প্রকাশ পাইয়াছে। অর্থাৎ ইহা রাঁধা তরকারি নহে ইহা গাছের ফল। বাহিরের রৌদ্র বৃষ্টি বাতাসের সঙ্গে গাছের জীবনশক্তির যোগ হইয়া ফলটি গাছকে সার্থক করে ;— অন্যের দিকে তাকাইয়া এ ফল তৈরি হয় না, কিন্তু অন্যে ইহাকে ভোগ করিতে পারে। বসন্ত-প্রয়াণকেও পাঠকেরা তেমনি আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করিবে কিন্তু পাঠকদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ইহা লেখা হয় নাই। আপনাকে প্রকাশ করাই ইহার লক্ষ্য, পাঠকেরা উপলক্ষ। অর্থাৎ এ বইখানি কাব্য।

কিন্তু কাব্য বলিতে আমরা সচরাচর যাহা বুঝি বসন্ত-প্রয়াণ তাহা নহে। ইহার মধ্যে রসের অংশ যেমন তত্ত্বের অংশও তেমনিই— কোনোটা কম নহে। পৃথিবীর বয়ঃসন্ধির সময়ে, যখন তাহার অন্তরে অন্তরে একটি প্রবল উত্তাপের বিপ্লব ঘটিতেছিল তখন যেমন নানা বিভিন্ন পদার্থ গলিয়া মিলিয়া কত যৌগিক ধাতুর স্তর রচনা করিয়াছে, এই রচনাটি সেই রকমের। অন্তরের আগুনে গদ্যে পদ্যে মিলিয়া এক হইয়া গেছে— এখন তাহাদিগকে পৃথক করা দায়। স্বামীর দুঃসহ বিচ্ছেদ তাপে এই রচনার মধ্যে যেন স্ত্রী-পুরুষের যুগল প্রকৃতি অবিচ্ছেদে একাত্ম হইয়া দেখা দিয়াছে।

"স তপোঽতপ্যত" তাপই তো সমস্ত সৃষ্টির গোড়ায় আছে। এই লেখাটিও যেন লেখিকার জ্বলন্ত হৃদয়ের তাপে আবর্তিত হইতে হইতে ছিন্ন হইয়া বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছে। আমরাও যেন একটি সদ্য সৃষ্টির অপূর্ব রহস্যটিকে তাহার নিজের আলোকে প্রত্যক্ষ করিলাম।

জ্যোতির্বিৎ রাত্রির পর রাত্রি জাগিয়া দূরবীন লইয়া নক্ষত্রের তালিকা করিতেছেন। একদিন দেখিলেন যেখানে প্রায় কিছুই দেখা যাইতেছিল না সেখানে একটি তারা জ্বলিয়া উঠিয়াছে তাহার উজ্জ্বলতা প্রথম শ্রেণীর তারার সমান। তিনি বুঝিলেন হয়তো দুই তারার প্রবল সংঘাতে এই একটি নূতন জ্যোতির সৃষ্টি হইয়াছে।

আমরা যে সাহিত্য জ্যোতিষ্কটি সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি ইহার কোনো জ্যোতির রেখা তো ইহার পূর্বে কোনো দিক্‌প্রান্তে দেখা যায় নাই। তাই স্পষ্টই দেখিতেছি ইহার মধ্যে সৃষ্টির একটি আদি রহস্য রহিয়াছে।

হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ে প্রেমের সংঘাত যেখানে ঘটে সেখানে চৈতন্য উজ্জ্বল হইয়া জ্বলিয়া উঠে। সেই উদ্দীপ্ত বোধের আলোকে সীমার সঙ্গে অসীমের যোগরহস্যটি যেন প্রত্যক্ষ হইয়া প্রকাশ পায়। যাহাকে ভালোবাসি তাহার সীমার মায়া যেন কাটিয়া যায়, তাই তাহার মূল্য অসীম হইয়া ওঠে, তাই তাহার জন্য প্রাণ দেওয়া কঠিন হয় না।

অসীমকে আর কোনো উপায়ে আমরা প্রত্যক্ষ করিতে পাই না— তাহাকে ইন্দ্রিয় দিয়াই দেখি আর মন দিয়াই দেখি, সীমার পর্দা পড়িয়া যায় ; একটা পর্দা

উঠাইলে তাহার পরে আর-একটা পর্দা দেখা দেয়। এইজন্যই তো উপনিষদে বলে, বাক্য এবং মন তাঁহাকে না পাইয়া ফিরিয়া আসে। কিন্তু এই ফিরিয়া আসার কথাই যদি একেবারে শেষ কথা হইত তবে তো অনন্তের সঙ্গে কোনো কারবারই কোনোমতে চলিত না।

তাই উপনিষদে বলে তিনি ধরা পড়িয়াছেন আনন্দে— অর্থাৎ প্রেমে। প্রীতির মধ্যে আমরা অনন্তকে একেবারে অন্তরতম করিয়া উপলব্ধি করি। সেখানে কোনো পর্দা নাই। সেখানে এক পিঠে দেখি সীমা অন্য পিঠে দেখি অসীম। সেখানে চোখে যদি দেখি রূপ, ভাবের মধ্যে দেখি রস। সেই রূপকে খণ্ড করা যায় কিন্তু রসকে খণ্ড করা যায় না। এই রসের স্বাদটি ঠিকমতো পাইলে মানুষ তাহার জন্য না করিতে পারে এমন কিছুই নাই। কেননা সেইখানে সে যে অল্প কিছুকে পাইল না, সে ভূমাকে পাইল, এমন কিছুকে পাইল, 'যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্যমনসা সহ'।

এই আনন্দটি আমরা জলে স্থলে আকাশে নানা বর্ণে গন্ধে গীতে কিছু-না-কিছু পাইতেছিই। তাহাতেই রূপের সঙ্গে সঙ্গে অপরূপের পরিচয় ধরা পড়িতেছে। তাহাতে বুঝিতেছি, 'রসো বৈ সঃ' অর্থাৎ বুঝিতেছি বস্তুতে কেবল বস্তুরই প্রকাশ নহে, তাহাতে একটি অখণ্ড সংগীতের আনন্দ স্পন্দিত হইতেছে। সেই খণ্ড তারটির দ্বারা সেই আনন্দের পরিমাপ হইতে পারে না। এই আনন্দ হইতেই আমরা জানিতেছি যা-কিছু নির্বচনীয় তাহারই সঙ্গে মিলিয়া আছে অনির্বচনীয়।

শুধু তাহাই নহে। যাহা নির্বচনীয়, যাহা সীমাবদ্ধ তাহা সেই সীমার আড়ালে আমাদের বাহিরে পড়িয়া থাকে। সেই সীমাই তাহাকে আমাদের সঙ্গে মিলিতে দেয় না। বীণার তারটাকে কোনো মতেই আমি আত্মসাৎ করিতে পারি না। কিন্তু যাহা অনির্বচনীয় সেই সংগীতের রসটি একেবারে অব্যবহিত হইয়া আমার সঙ্গে মিলিয়া যায় আমাতে তাহাতে ভেদ থাকে না। আনন্দের দ্বারা অসীমকে একেবারে আপন করিয়া পাই।

নরনারীর প্রেমে এই আনন্দের আলোটি একান্ত উজ্জ্বল হইয়া জ্বলিয়া উঠে। এই আলোকে অসীমের আনন্দরূপের যেন মহোৎসব ঘটে। জলে স্থলে আকাশে যে আনন্দের বিচিত্র আভাস আমরা পাই তাহাকে পরিপূর্ণরূপে পাই না, কিন্তু যুগল প্রেমের প্লাবনে মানুষের শরীর, মন, ধ্যান, জ্ঞান, দান গ্রহণ সমস্তই সর্বাংশে আনন্দময় হইয়া উঠে। একজন আর-একজনকে যে কেমন করিয়া পাইতে পারে এই প্রেমে সেই বিষম সমস্যার সমাধান হয়। কারণ পূর্বেই বলিয়াছি, সীমাই আমাদিগকে সম্পূর্ণ করিয়া পাইতে দেয় না আমাদের পাওয়াটি সীমায় প্রতিহত হইতে থাকে। কিন্তু প্রেমে যখন একজনের সঙ্গে আর-একজনকে মিলাইয়া দেয় তখন আনন্দের দ্বারা আবিষ্কার করি যে বাহিরে যাহা সীমারূপে প্রকাশ পাইতেছে অন্তরে তাহার সীমা নেই।

কিন্তু তবু যুগল প্রেমে এই যে ভূমানন্দের পরিচয় আছে, নানা কারণে তাহাকে আমরা মুগ্ধভাবে অনুভব করি, তাহার চরম প্রকাশটি আমাদের জ্ঞানের মধ্যে পরিস্ফুট

হয় না। কারণ ত্যাগের দ্বারা ভোগ সম্পূর্ণ না হইলে, আমাদের আনন্দ মূঢ় হইয়া থাকে, তাহা জ্ঞানময় হয় না। বৈরাগ্যের দ্বারাই অনুরাগ পরিপূর্ণরূপে সচেতন হইয়া উঠে; আসক্তিতে যখন জড়িত থাকে প্রীতি তখন আপনার স্বরূপ আপনি জানে না। প্রীতির যথার্থ স্বরূপই পূর্ণতার আনন্দে আপনাকে উৎসর্গ করা। প্রীতি যতক্ষণ ভোগের কাঙাল হইয়া থাকে ততক্ষণ সে আপনার ঐশ্বর্যটিই ভুলিয়া থাকে।

এইজন্যই একবার মৃত্যুর মধ্য দিয়া প্রেমের শোধন হওয়া চাই, ত্যাগের মধ্য দিয়া প্রেমের বোধন হওয়া চাই। কালিদাসের কুমারসম্ভব ও শকুন্তলার মধ্যে এই তত্ত্বটি নিহিত আছে এ কথা আমি ওই দুটি কাব্যের সমালোচনায় অন্যত্র বলিয়াছি। গৌরী বসন্তপুষ্পাভরণে সাজিয়া একদিন শিবের হাতে হাত দিয়াছিলেন কিন্তু সেই স্পর্শ নিত্য হইল না। তপের আগুন জ্বলিল, বিচ্ছেদের ভিতর দিয়া তবে তাঁহার সাধনা সম্পূর্ণ হইতে পারিল। বসন্তসখা একদিন পুড়িয়া ছাই হইল তবেই চিরবসন্তের অভ্যুদয় ঘটিল। শকুন্তলাতেও সেই বৈরাগ্যের ভিতর দিয়া অনুরাগের তপঃসাধনা।

বসন্ত-প্রয়াণের রচনাতেও এই তত্ত্বটি লেখিকার নিজের জীবনের মধ্য দিয়া সহজেই প্রকাশ পাইয়াছে। প্রেমের পাওয়া জিনিসটি সম্পূর্ণ হইতে হইলে একবার যে তাহাকে মরিতে হয়; সে যে দ্বিজ, রাগ হইতে বৈরাগ্যে যে তাহাকে জন্মগ্রহণ করিতে হয়, তবেই ডিম ভাঙা পাখির মতো সে মুক্তিলাভ করে, এই কথাটি লেখিকা আশ্চর্য করিয়া বলিয়াছেন।

বলিয়াছেন বলিলে গ্রন্থটির ঠিক পরিচয় হয় না— কিসে যেন লেখিকাকে তাহা বলাইয়াছে। নহিলে ইহার পূর্ববর্তী তাঁহার আর কোনো রচনায় ইহার সূচনা করিল না কেন? এই লেখাটি তো নিতান্ত শোকের বিলাপ নহে। ইহা তো অন্য কোনো লেখকের ছাঁদে হাত পাকাইবার প্রথম চেষ্টা নহে। লেখিকার অন্তরের মধ্যে যে প্রেমের নিগূঢ় রহস্য প্রচ্ছন্ন ছিল, বেদনার প্রচণ্ড উত্তাপে তাহা এই রচনায় দানা বাঁধিয়া এইমাত্র প্রথম আবিষ্কৃত হইল। এই আবিষ্কার কেবল পাঠকের কাছে নহে ইহা লেখিকার কাছেও নূতন।

অথচ ইহাকে একেবারে খাপছাড়া রকমের নূতন বলিলে ঠিক বলা হইবে না কারণ, কেবল তো ইহা ভাবের বিকাশ নহে, দেখিতেছি ইহার মধ্যে চিন্তার প্রণালীও আছে। সে চিন্তা অশিক্ষিত চিন্তা নহে। আমাদের দেশের রসশাস্ত্রের ভাষা ও তাহার ছাঁদ লেখিকার বেশ জানা আছে। ইহাতে বোঝা যায় তাঁহার মনের মধ্যে শিক্ষার সঞ্চয় ও চিন্তার শক্তি ছিল। সেইটে হৃদয়ের গভীর অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়া জীবনের অঙ্গীভূত হইয়া বিচিত্ররূপে দেখা দিয়াছে এবং শোকের সংঘাতে ভিতরের কথা বাহিরে প্রকাশ করিবার একটি আকস্মিক বেদনা লেখিকার চিত্তে জাগিয়া উঠিয়াছে। এই-সকল কারণে এই রচনাটি সাহিত্যে বড়ো অপূর্ব হইয়াছে। ইহা লেখিকার নবীন সৃষ্টি, অথচ ইহার মধ্যে প্রবীণতা আছে। ইহা তাজা, অথচ ইহা কাঁচা নহে। সমুদ্র মন্থনে অপ্সরী যেমন একেবারেই পূর্ণ যৌবনে প্রকাশ পাইয়াছে তেমনি

শোকে লেখিকার হৃদয় মথিত করিয়া, এমন একটি পূর্ণাবয়ব রচনা প্রকাশিত হইল যাহা তাঁহার জাগ্রত চৈতন্যের তলদেশের অব্যক্ত লোকে সকলের অগোচরে পরিপুষ্ট হইতেছিল।

আমার প্রতি অনুরোধ ছিল এই রচনার তত্ত্বকথাটিকে ভূমিকায় স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিতে. কিন্তু সে ভার আমি গ্রহণ করিতে পারিলাম না। নিজের লেখার অস্পষ্টতার জবাবদিহি আজও আমার চুকিল না; অতএব আমি চেষ্টা করিলে পাঠকদের কাছে অস্পষ্টকে অস্পষ্টতর করা অসম্ভব না হইতে পারে, হয়তো ইতিমধ্যেই তাহাতে কতকটা কৃতকার্য হইয়াছি।

এ লেখাটি যদি বিশুদ্ধ তত্ত্বালোচনা হইত, তবে ইহাকে বিশ্লেষণ করিয়া শ্রেণী বিভক্ত করিয়া দিলে, ইহার মর্মকথাটি স্পষ্ট হইয়া ব্যক্ত হইত। কিন্তু যাহা জীবনের অভিজ্ঞতায় নিগূঢ়রূপে পাওয়া বলিয়া প্রাণময় হইয়া উঠিয়াছে; ছিন্ন ছিন্ন করিয়া তাহার উপাদানগুলি দেখাইতে গেলে তাহার আসল জিনিসটিই, তাহার প্রাণটিই গৌণ হইয়া পড়ে। আমার কাছে এই রচনার প্রাণময় সত্তাটিই আশ্চর্য ও মনোহর; মানুষের মর্মান্তিক একটি বোধশক্তি, বেদনায় জাগরিত হইয়া উঠিয়া, বিশেষ হইতে বিশ্বে ও বিশ্ব হইতে বিশ্বাতীতে সমস্ত ব্যবধানকে সহজেই দূর করিয়া দেখিতেছে ইহাই এই লেখায় আমি বুঝিয়াছি, ইহা বুদ্ধি করিয়া ভাবা নয়; চিন্তা করিয়া পাওয়া নয়; বিশেষ অবস্থায় মানুষের সমস্ত প্রকৃতি যখন অবিভক্তভাবে জাগিয়া উঠিয়াছে যখন তাহার সমস্ত ইন্দ্রিয় মন হৃদয় সহসা তীব্র চৈতন্যের আলোকে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে তখন সেই আলোকে একটি কোন্ গুহাহিতকে অনুভব করা গেল ইহাই এই রচনার বিষয়। এই রচনার মধ্যে যে অনির্বচনীয়ের অনুভূতি আছে তাহার অনির্বচনীয়তা কিছুই নষ্ট হয় না; তবে আমাদের লাভ হইল কী? না, অনুভূতির সত্যতা; তাহার স্বতঃ-প্রকাশিত স্বাভাবিকতা। আমরা বিশ্বের এবং আত্মার রহস্যলোকের একটি নূতন সাক্ষী পাইলাম। সেই সাক্ষী সরল অথচ শিক্ষিত এইজন্য তাহার সাক্ষ্যের একটি বিশেষ মূল্য আছে। এ সাক্ষ্য কেমন সাক্ষ্য? যেমন উদ্ভিদের প্রাণের উপর তড়িতের আঘাত করিয়া আমাদের বিজ্ঞানাচার্য জগদীশ যে সাড়া পাইয়াছেন, সেই সাড়াটি তাঁহার উদ্ভাবিত অদ্ভুত যন্ত্রের সাহায্যে স্বতোলিখিত হইয়া ধরা পড়িয়াছে, এ তেমনি শোকাহত প্রেমের তাড়নায় মানব-হৃদয়ের স্বতোলিখিত একটি বার্তা।

এরূপ রচনাকে একেবারে জলের মতো বোঝা যায় না— যে বেদনা পাইয়াছে ও প্রকাশ করিয়াছে তাহার সঙ্গে মন মিলাইয়া দিয়া তবে বুঝিতে হয়। নিজের যদি এই জাতীয় অভিজ্ঞতা ও অনুভব শক্তি এবং অন্যের চিত্তের রহস্যলোকে প্রবেশ করিবার সহায় স্বরূপ কল্পনা বৃত্তি থাকে তবে অল্প হোক বেশি হোক বোঝা যায়, সেই বোঝা বুদ্ধিগত না হইলেও তাহা কোনো-না-কোনো প্রকারে হৃদয়ের অধিগম্য হয়। পাঠকদিগকে এই বইখানিকে তেমনি করিয়া পড়িতে হইবে— বুঝিলাম না বলিয়া

ইহাকে গালি দিয়া একপাশে ঠেলিয়া রাখিলে চলিবে না। সাহিত্যসভায় এই রচনাকে সম্মানের স্থান দিতেই হইবে, ইহাকে উপেক্ষা করিবার জো নাই।

এই গ্রন্থের তত্ত্ব বিশ্লেষণ আমি করিলাম না, তাহার কারণ আমি পারি না, আমি দার্শনিক নহি এবং সেরূপ ব্যাখ্যা আমার স্বভাবসংগত নহে। আমাদের দেশে রসতত্ত্ব সম্বন্ধে যে-সকল শাস্ত্র আছে আমি তাহার কিছুই জানি না; এ গ্রন্থ যাঁহার রচনা নিঃসন্দেহে তিনি আমার চেয়ে এ বিষয়ে অনেক বেশি আলোচনা করিয়াছেন। তাই আমার বিশ্বাস, তিনি যাহা শিখিয়াছেন ও যাহা পাইয়াছেন তাহা পরবর্তী রচনায় নিজেই উত্তরোত্তর উদ্‌ঘাটন করিবেন এবং সেইরূপে, তাঁহার জীবনের সহিত প্রকাশের যোগে, যে তত্ত্ব আপনাকে আপনি ব্যাখ্যা করিয়া চলিবে তাহারই জন্য নীরবে অপেক্ষা করিয়া থাকা আমি সংগত মনে করি।

শান্তিনিকেতন
৮ চৈত্র ১৩২০

১৩

দ্বিজেন্দ্রলাল : দেবকুমার রায়চৌধুরী

দ্বিজেন্দ্রলাল যখন বাংলার পাঠকসাধারণের নিকট পরিচিত ছিলেন না তখন হইতেই তাঁহার কবিত্বে আমি গভীর আনন্দ পাইয়াছি এবং তাঁহার প্রতিভার মহিমা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হই নাই। দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গে আমার যে সম্বন্ধ সত্য, অর্থাৎ আমি যে তাঁর গুণপক্ষপাতী, এইটাই আসল কথা এবং এইটাই মনে রাখিবার যোগ্য! আমার দুর্ভাগ্যক্রমে এখনকার অনেক পাঠক দ্বিজেন্দ্রলালকে আমার প্রতিপক্ষ শ্রেণীতে ভুক্ত করিয়া কলহের অবতারণা করিয়াছেন। অথচ আমি স্পর্ধা করিয়া বলিতে পারি এ কলহ আমার নহে এবং আমার হইতেই পারে না। পশ্চিম দেশের আঁধি হঠাৎ একটা উড়ো হাওয়ার কাঁধে চড়িয়া শয়ন বসন আসনের উপর এক পুরু ধুলা রাখিয়া চলিয়া যায়। আমাদের জীবনে অনেক সময়ে সেই ভুল-বোঝার আঁধি কোথা হইতে আসিয়া পড়ে তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু উপস্থিতমতো সেটা যত বড়ো উৎপাতই হোক সেটা নিত্য নহে এবং বাঙালি পাঠকদের কাছে আমার বড়ো নিবেদন এই যে, তাঁহারা এই ধুলা জমাইয়া রাখিবার চেষ্টা না করেন, করিলেও কৃতকার্য হইতে পারিবেন না। কল্যাণীয় কবি শ্রীমান্ দেবকুমার তাঁহার বন্ধুর জীবনীর ভূমিকায় আমাকে কয়েকছত্র লিখিয়া দিতে অনুরোধ করিয়াছেন। এই উপলক্ষে আমি কেবলমাত্র এই কথাটি জানাইতে চাই যে, সাময়িক পত্রে যে-সকল সাময়িক আবর্জনা জমা

হয় তাহা সাহিত্যের চিরসাময়িক উৎসব-সভার সামগ্রী নহে। দ্বিজেন্দ্রলালের সম্বন্ধে আমার যে পরিচয় স্মরণ করিয়া রাখিবার যোগ্য তাহা এই যে আমি অন্তরের সহিত তাঁহার প্রতিভাকে শ্রদ্ধা করিয়াছি এবং আমার লেখায় বা আচরণে কখনো তাঁহার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করি নাই।— আর যাহা-কিছু অঘটন ঘটিয়াছে তাহা মায়ামাত্র, তাহার সম্পূর্ণ কারণ নির্ণয় করিতে আমি তো পারিই না, আর কেই পারেন বলিয়া আমি বিশ্বাস করি না।

১৪

রামেন্দ্রসুন্দর জীবন-কথা : আশুতোষ বাজপেয়ী

আমার শরীর ভালো নাই আমার অবকাশও অল্প। রামেন্দ্রসুন্দরের সম্বন্ধে মনের মতো করিয়া কিছু লিখিব এমন সুযোগ এখন আমার নাই। শুধু শ্রদ্ধা নহে, তাঁহার প্রতি আমার প্রীতি সুগভীর ছিল, এ কথা আমি পূর্বেও বলিয়াছি। কিন্তু এ কথা বলিবার লোক আরো অনেক আছে। যে কেহ তাঁহার কাছে আসিয়াছিল, সকলেই তাঁহার মনীষায় বিস্মিত ও সহৃদয়তায় আকৃষ্ট হইয়াছে। বুদ্ধির, জ্ঞানের, চরিত্রের ও উদার-হৃদয়তার এরূপ সমাবেশ দেখা যায় না। আমার প্রতি তাঁহার যে অকৃত্রিম অনুরাগ ছিল তাহা তাঁহার ঔদার্যের একটি অসামান্য প্রমাণ। আমার সহিত তাঁহার সামাজিক মতের ও ব্যবহারের অনৈক্য শেষ পর্যন্ত তাঁহার চিত্তকে আমার প্রতি বিমুখ করিতে পারে নাই ; এমন-কি, প্রবল প্রতিকূলতা সত্ত্বেও সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে একদা আমার প্রশস্তিসভার আয়োজন করিতে তিনি কুণ্ঠিত হন নাই।

বাংলার লেখকমণ্ডলীর মধ্যে সাধারণত লিপিনৈপুণ্যের অভাব দেখা যায় না ; কিন্তু স্বাধীন মননশক্তির সাহস ও ঐশ্বর্য অত্যন্ত বিরল। মনন ও রচনারীতি সম্বন্ধে রামেন্দ্রসুন্দরের দুর্লভ স্বাতন্ত্র্য ছিল। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁহার সেই খ্যাতি বিলুপ্ত হইবে না। বিদ্যা তাঁহার ছিল প্রভূত, কিন্তু সেই বিদ্যা তাঁহার মনকে চাপা দিতে পারে নাই। তিনি যাহা বলিতেন, তাহার বিষয়-বিচারে অথবা তাহার লেখন-প্রণালীতে অন্য কারো অনুবৃত্তি ছিল না।

দেশের প্রতি তাঁহার প্রীতির মধ্যেও তাঁহার নিজের বিশিষ্টতা ছিল ; তাহা স্কুলপাঠ্য বিলাতী ইতিহাস হইতে উদ্ধৃত তৎকালীন কন্‌গ্রেস তোতাপাখি কর্তৃক উচ্চারিত বাঁধাবুলির দ্বারা পুষ্ট ছিল না। তাঁহার চিত্তের মধ্যে ভারতের একটি মানসী মূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। সেই মূর্তিটি ভারতেরই সনাতন বাণীর উপকরণে নির্মিত। সেই বাণীর সহিত তাঁহার নিজের ধ্যান নিজের মনন সম্মিলিত ছিল। তাঁহার সেই স্বদেশপ্রীতির মধ্যে ব্রাহ্মণের জ্ঞানগাম্ভীর্য ও ক্ষত্রিয়ের তেজস্বিতা একত্র সংহত হইয়াছিল।

জীবনে তিনি অনেক দুঃখ পাইয়াছিলেন। প্রিয়জনের মৃত্যুশোক তাঁহাকে বারংবার মর্মাহত করিয়াছে। তিনি যে-সকল ব্রত গ্রহণ করিয়া প্রাণপণে পালন করিতেছিলেন তাহাতেও নানাপ্রকার বাধাবিরুদ্ধতা তাঁহাকে কঠোরভাবে আক্রমণ করিয়াছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাঁহার অজস্র মাধুর্য-সম্পদের কিছুমাত্র ক্ষয় হয় নাই— রোগ তাপ প্রতিকূলতার মধ্যে তাঁহার প্রসন্নতা অম্লান ছিল। বিরোধের আঘাত তাঁহাকে গভীর করিয়া বাজিত, অন্যায় তাঁহাকে তীব্র পীড়া দিত, কিন্তু তিনি ক্ষমা করিতে জানিতেন। সেই মাধুর্য সেই ক্ষমাই ছিল তাঁহার শক্তির প্রকাশ।

তিনি যদি কেবলমাত্র বিদ্বান্ বা গ্রন্থ-রচয়িতা বা স্বদেশপ্রেমিক হইতেন, তাহা হইলেও তিনি প্রশংসালাভ করিতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার মধ্যে স্বভাবের যে একটি পূর্ণতা ছিল, তাহারই গুণে তিনি সকলের প্রীতি লাভ করিয়া গিয়াছেন। এমন পুরস্কার অতি অল্প লোকেরই ভাগ্যে ঘটে।

২৮ ফাল্গুন ১৩২৪

১৫

বাগগুহা ও রামগড় : অসিতকুমার হালদার

পুরাতন যে-ভারতের আদর্শ আধুনিককালের ভারতবাসীদের মনে অনেকদিন থেকে ফুটে উঠেছে সেই হচ্ছে প্রধানত ধর্মশাস্ত্রের ভারতবর্ষ, দর্শনশাস্ত্রের ভারতবর্ষ, জপতপঃক্লিষ্ট ভারতবর্ষ। কিন্তু এই নিরবচ্ছিন্ন ধ্যানপরায়ণ, চিন্তাপরায়ণ ভারতবর্ষই যে সম্পূর্ণ সত্য নয় তা ইতিহাসের নূতন আবিষ্কৃত তথ্যগুলির দ্বারা অল্প কিছুদিন থেকে আমরা কিছু কিছু অনুভব করতে আরম্ভ করেছি। একটি জিনিস আমরা বিশেষ করে দেখেছি এই যে, বৌদ্ধযুগের এবং তার অব্যবহিত পরবর্তীকালের ভারতবর্ষের প্রভাব এশিয়ার যেখানে যেখানেই বিকীর্ণ হয়েছে সেখানেই চিত্র স্থাপত্য ভাস্কর্যকলার অভ্যুদয় হয়েছে। শুদ্ধমাত্র দার্শনিক তত্ত্বালোচনা কখনোই কলাবিদ্যার অনুকূল হতে পারে না। কেননা দর্শন রূপলোকের জিনিস নয় তা রূপাতীত লোকেরই জিনিস।

যদি দেখা যায় কোনো একটি নদী যেখান দিয়ে গেছে সেইখানেই তার তীরে তীরে বিশেষ কোনো জাতের গাছ জন্মেছে তা হলে এই বুঝতে হবে যে, সেই নদীর উৎসের কাছে এই জাতের অরণ্য আছে এবং অরণ্য থেকে বীজ পড়ে নদীর স্রোতে দেশে দেশে সঞ্চারিত হয়েছে। তখনকার দিনে ভারত-সভ্যতায় কলাবিদ্যার চর্চা বিশেষ সজীব ছিল সন্দেহ নেই, নইলে এই-সভ্যতার স্পর্শে দেশান্তরে এই বিদ্যার উৎসাহ এমন প্রবল হয়ে উঠতে পারত না। চিত্রকলাকে আধুনিক ভারত অনেকদিন

থেকে অবজ্ঞা করে এসেছে। এ সম্বন্ধে আমাদের চিত্তের অসাড়তা এতদূর এগিয়েছে যে, আমরা যে কেবলমাত্র চিত্র সৃষ্টি করতে পারছি নে তা নয় প্রাচীন ভারতের চিত্র-রচনারীতি আমরা বুঝতেই পারি নে, তাকে আমরা ব্যঙ্গ করতে ছাড়ি নে। আমরা যখন স্বাদেশিকতার অভিমানে উন্মত্ত হয়ে উঠি তখনো এই কথাটি বুঝতে পারি নে যে, যে জাতি কলাবিদ্যায় আপন চিত্তের পরিচয় দেয় নি সে জাতি মহাপ্রাণ জাতি নয়। তা ছাড়া এ কথা আমরা মনের দৈন্যবশতই ভুলেছি যে একটুকরো কাগজে একটুখানি ছোটো ছবি যদি সত্য করে আঁকতে পারি তার দ্বারা নিত্যকালের কাছে দেশের যে পরিচয় প্রকাশ হবে তা রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে খবরের কাগজের বড়ো বড়ো ধ্বজা আস্ফালন করেও হবে না। অজন্তার সময়কার রাষ্ট্রীয় ঐশ্বর্যের একটি খুদকুঁড়োও আজ ভারতের ভাগ্যে বাকি নেই কিন্তু অজন্তা গুহার ভিত্তিচিত্রে তখনকার ভারত যে লিপিখানি লিখে গেছে সেই লিপি যুগ হতে যুগান্তরে আপন বাণীকে প্রচার করে চলেছে।

এই কারণেই সম্প্রতি বাগগুহার চিত্রগুলির যে আবিষ্কার ও অনুলিখন হয়েছে সে আমাদের পক্ষে এমন বহুমূল্য। প্রাচীন ভারত পঞ্জিকার তিথি বার গণনা করে কেবল উপবাস করে নিজেকে শুকিয়ে মারত না বারংবার তার প্রমাণ আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হওয়া দরকার। আমাদের ইতিহাসে জাতীয় চিত্তের সজীবতার নিদর্শন যতই পাব ততই আমরা বুঝব জীবনের ধর্ম কী, তার প্রকাশ কীরূপ।

ভাগ্যক্রমে বাগগুহার চিত্রের অনুলেখ্যগুলি আমি দেখেছি। দেখে কেবল যে তার আশ্চর্য কলা-রস প্রচুর পরিমাণে উপভোগ করেছি তা নয় সেইসঙ্গে এটুকু প্রত্যক্ষ করেছি যে তখনকার কালের মানুষেরা তাসের সাহেব বিবি ও গোলাম ছিল না। তখন বৈরাগ্যের শক্তি বড়ো ছিল কেননা রাগ-অনুরাগের শক্তি সজীব ছিল। যারা জগৎকে জীবনকে পূর্ণভাবে গ্রহণ করতে জানে তারাই ত্যাগ করতে জানে।

একটি কথা বলে আমার ভূমিকা শেষ করি—শ্রীমান অসিতকুমারের এই বইখানি পড়ে আমি খুশি হয়েছি। এর রচনা সরস, সরল, এবং শিক্ষা ও প্রত্যক্ষবোধের দ্বারা উজ্জ্বল।

১৫ ভাদ্র ১৩২৮

১৬

কান্তকবি রজনীকান্ত : নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত

রজনীকান্ত সেনের সহিত আমার প্রত্যক্ষ পরিচয় অতি সামান্যই ছিল। আমি কয়েকবার মাত্র তাঁহার গান তাঁহার মুখে শুনিয়াছি এবং রোগশয্যায় যখন ক্ষতকণ্ঠে তিনি মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, তখন একদিন তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। এই স্বল্প পরিচয়ে তাঁহার সম্বন্ধে আমার মনে যে ভাবের উদয় হইয়াছে সে আমি তৎকালে তাঁহাকে পত্রদ্বারাই জানাইয়াছিলাম। সেই পত্র এই বর্তমান গ্রন্থে যথাস্থানে প্রকাশিত হইয়াছে। ভূমিকা লিখিবার উপলক্ষে রীতিরক্ষার উপরোধে সেই পত্রলিখিত ভাবকে যদি পল্লবিত করিয়া বলিবার চেষ্টা করি তবে তাহাতে রসভঙ্গ হইবে, অতএব তাহা হইতে নিরস্ত হইলাম। কেবল শ্রীমান নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত এই কবি-চরিত রচনাকল্পে যে সাধু অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিলেন, সেজন্য এই অবকাশে তাঁহাকে আমার হৃদয়ের আশীর্বাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

শান্তিনিকেতন
৩১ আশ্বিন ১৩২৮

১৭

বেড়াল ঠাকুরঝি : বিভূতিভূষণ গুপ্ত

রূপকথা মেয়েদের মুখে যেমন শোনা যায় ঠিক তেমনি লিপিবদ্ধ করিবার চেষ্টা করা যাইতেছে। এগুলি পড়িলেই বুঝা যাইবে, এ সমস্তই অখ্যাতনাম্নী মেয়েদেরই রচনা, তাহাদেরই প্রতিদিনের ঘরকরনার হাঁড়িকুড়ির অন্তরের কথা। তা ছাড়া ইহার মধ্যে মানবমনের যে প্রকৃতিপরিচয় পাওয়া যায় তাহারও আধার এই বাংলাদেশের গ্রামের অন্তঃপুরে। অবশ্য মানবপ্রকৃতি ভিতরে সকল জায়গাতেই সমান, কিন্তু তাহার বাহিরের চেহারাটা দেশভেদে অবস্থাভেদে ভিন্ন। এই গল্পগুলির ভিতরে যে চেহারা পাওয়া যায় তাহার বিশেষ রস আছে এবং তাহা বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া দেখিবার যোগ্য। শিশুদের এই গল্পগুলি বিশ্বভারতীর শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ গুপ্ত তাঁহার বর্ষীয়সী আত্মীয়ার মুখ হইতে লিখিয়া লইয়াছেন। একটি কথা বলা আবশ্যক, ভিন্ন ভিন্ন জেলায় এই গল্পগুলিরই কিছু কিছু রূপান্তর ঘটিয়াছে।

শান্তিনিকেতন
১০ শ্রাবণ ১৩৩০

কাঠের কাজ : লক্ষ্মীশ্বর সিংহ

বিদ্যাশিক্ষায় আমাদিগকে মানুষ করিয়া তুলিবে এই কথাই খাঁটি। কিন্তু পুঁথি পড়া মানুষই যে পুরা মানুষ তাহা বলা যায় না। অথচ এ সম্বন্ধে আমাদের বিদ্যা বিভাগের লজ্জা নাই। তাই দীর্ঘকাল সে আমাদের কানে এই মন্ত্র দিয়া আসিয়াছে যে ভদ্রলোককে পুরা মানুষ হইতে হইবে না। ভদ্রলোকের চোখ ভালো করিয়া দেখিতে না শিখুক, কান ভালো করিয়া শুনিতে না শিখুক, হাত ভালো করিয়া কাজ না করিতে শিখুক, তাহাতে কোনো অগৌরব নাই, কেবল যেন সে পড়িতে শেখে। আমাদের মতে পঙ্গুতাই ভদ্র সমাজের লক্ষণ, হাত-পাগুলোকে অপটু করিয়া তুলিলেই ভদ্রতা পাকা হয়। ইহার ক্ষতি ততদিন বুঝিতে পারি নাই যতদিন বাঙালি ভদ্রসন্তানের একমাত্র মোক্ষলাভ ছিল চাকরিধামে কেরানিতীর্থে। সেখানে জায়গার টানাটানি ঘটিতেই দেখা গেল তাহার মতো অসহায় প্রাণী জীবলোকে আর নাই। সংসার সমুদ্রে পুঁথিগত বিদ্যাই যাহাদের একমাত্র ভেলা ছিল তাহাদের এবার নৌকাডুবির পালা। সেই সংকটের তাড়নায় ভদ্রলোকের ছেলেকেও আজ হাতে ও কলমে দুই দিকেই শক্ত হইতে হইবে এই তাগিদ আসিয়াছে। এই শুভদিনের প্রারম্ভে শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীশ্বর সিংহ 'কাঠের কাজ' বইখানি লিখিয়াছেন ; ভদ্রলোকের ভয়ে 'ছুতারের কাজ' নাম দিতে পারেন নাই। তা হউক, বইখানি সকলেরই কাজে লাগিবে, কেবলমাত্র জীবিকার জন্য নহে, শিক্ষার জন্য। কারণ যাহার হাত দুটো কর্মিষ্ঠ নয়, হাতের দিকে সে মূঢ়, তা হোক-না সে নবাবজাদা, বা পণ্ডিত বংশের কুলতিলক। দেশের এই-সব বোকা-হাতের মানুষকে শিক্ষিত-হাতের মানুষ করিবার অভিপ্রায়ে এই যে বইখানি লেখা, ইহা বাঙালির ঘরে এবং বিদ্যালয়ে আজকাল আদর পাইবে বলিয়া আশা হইতেছে। লেখক বিশ্বভারতীর শ্রীনিকেতন বিভাগে কাঠের কাজের সাধনাতেই নিযুক্ত। এই চর্চায় তিনি যেমন বই পড়িতে উৎসাহী তেমনি হাত চালাইতেও অক্লান্ত ; অতএব এই বিদ্যায় তাঁহার উপদেশ দিবার অধিকার আছে পাঠকদিগকে আমরা এমন ভরসা দিতে পারি।

৯ অগ্রহায়ণ ১৩৩২

১৯

সরোজনলিনী : গুরুসদয় দত্ত

অর্থভাণ্ডারে মূল্যবান সামগ্রী লইয়া মানুষ গর্ব করে। কিন্তু তাহার চেয়ে বড়ো কথা স্মৃতিভাণ্ডারের সম্পদ। সেই মানুষই একান্ত দরিদ্র যাহার স্মৃতিসঞ্চয়ের মধ্যে অক্ষয় গৌরবের ধন বেশি কিছু নাই।

তাই সরোজনলিনীর জীবনী পড়িয়া বুঝিলাম জীবনীলেখক তাঁহার স্বামী শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত যথার্থই ভাগ্যবান। কারণ এরূপ স্ত্রীকে মৃত্যুর মধ্যে হারাইয়াও হারানো সম্ভব নহে ; শুভাদৃষ্টক্রমে যিনি তাঁহাকে নিকটে পাইয়াছেন তাঁহার জীবনের মধ্যেই তিনি চিরদিন জীবিত থাকিবেন। বইখানি পড়িয়া আমার মনে এই খেদ হইল যে তাঁহার সঙ্গে একবার কেবল ক্ষণকালের জন্য আমার দেখা হইয়াছিল, তাঁহার সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগ আমার ঘটে নাই।

সাধারণত আমরা যখন খাঁটি বাঙালি মেয়ের আদর্শ খুঁজি তখন গৃহকোণচারিণীর 'পরেই আমাদের দৃষ্টি পড়ে। গৃহসীমানার মধ্যে আবদ্ধ যে সংকুচিত জীবন তাহারই সংকীর্ণ আদর্শের বহুবেষ্টনরক্ষিত উৎকর্ষ দুর্লভ পদার্থ নহে। তাহার উপাদান অল্প, তাহার ক্ষেত্র অপ্রশস্ত, তাহার পরীক্ষা অপেক্ষাকৃত অকঠোর।

সরোজনলিনী বাহির সংসারের ভিড়ের মধ্যেই অধিকাংশ জীবন কাটাইয়াছেন, অনেক সময় বিদেশী সমাজের অতিথি বন্ধুদের লইয়া তাঁহাকে সামাজিকতা করিতে হইয়াছে ; তাঁহার কর্মজীবনের পরিধি আত্মীয়স্বজন বন্ধুমণ্ডলীর মধ্যেই অবরুদ্ধ ছিল না ; তাঁহার সংসার আত্মীয় অনাত্মীয়, স্বদেশী বিদেশী, পরিচিত অপরিচিত অনেক লোককে লইয়া। এই তাঁর বড়ো সংসারের মধ্যে সকলের সঙ্গে সম্বন্ধকে তিনি মাধুর্যের দ্বারা শোভন ও ত্যাগের দ্বারা কল্যাণময় করিয়াছিলেন। এইরূপ ক্ষেত্রেই নারীজীবনের যথার্থ পরিচয় ও পরীক্ষা। তাঁহার কাছে বাহিরের দ্বারা ঘর, ও ঘরের দ্বারা বাহির পরাহত হয় নাই। এই উভয়ের সুন্দর সমন্বয়েই তাঁহার মহিমা প্রকাশিত হইয়াছে। আজকালকার দিনে যে নারী একান্তভাবেই গৃহিণী তিনি আমাদের আদর্শ নহেন, ঘরে বাহিরে সর্বত্রই যিনি কল্যাণী তিনিই আদর্শ, যাঁহার জীবন কেবলমাত্র চিরাগত প্রাদেশিক প্রথা ও সংস্কারের ছাঁচে ঢালা তিনি আদর্শ নহেন কিন্তু যাঁহার মধ্যে বৃহৎ বিশ্বের জ্ঞান ও ভাবের বিচিত্র ধারা গভীর ও সুন্দরভাবে সংগতি লাভ করিতে বাধা না পায় তিনিই আদর্শ।

সরোজনলিনীর জীবনী পড়িয়া আমরা এই আদর্শের পরিচয় পাইলাম।

২০ অগ্রহায়ণ ১৩৩২

রায়তের কথা : প্রমথ চৌধুরী

শ্রীমান প্রমথনাথ চৌধুরী,

কল্যাণীয়েষু।

আমাদের শাস্ত্রে বলে সংসারটা ঊর্ধ্বমূল অবাক্‌শাখ। উপরের দিক থেকে এর শুরু, নীচে এসে ডালপালা ছড়িয়েছে; অর্থাৎ নিজের জোরে দাঁড়িয়ে নেই, উপরের থেকে ঝুলছে। তোমার 'রায়তের কথা' পড়ে আমার মনে হল যে আমাদের পলিটিক্সও সেই জাতের। কন্‌গ্রেসের প্রথম উৎপত্তিকালে দেখা গেল এই জিনিসটি শিকড় মেলেছে উপরওয়ালাদের উপর-মহলে— কী আহার কী আশ্রয় উভয়েরই জন্যে এর অবলম্বন সেই ঊর্ধ্বলোকে।

যাঁদের আমরা ভদ্রলোক বলে থাকি তাঁরা স্থির করেছিলেন যে, রাজপুরুষে ও ভদ্রলোকে মিলে ভারতের গদি ভাগাভাগি করে নেওয়াই পলিটিক্স। সেই পলিটিক্সে যুদ্ধবিগ্রহ সন্ধিশান্তি উভয় ব্যাপারই বক্তৃতামঞ্চে ও খবরের কাগজে, তার অস্ত্র বিশুদ্ধ ইংরেজি ভাষা— কখনো অনুনয়ের করুণ কাকলি, কখনো-বা কৃত্রিম কোপের উত্তপ্ত উদ্দীপনা। আর দেশে যখন এই প্রগল্‌ভ বাগ্‌বাত্যা বায়ুমণ্ডলের ঊর্ধ্বস্তরে বিচিত্র বাষ্পলীলা রচনায় নিযুক্ত তখন দেশের যারা মাটির মানুষ তারা সনাতন নিয়মে জন্মাচ্ছে মরছে, চাষ করছে, কাপড় বুনছে, নিজের রক্তে মাংসে সর্বপ্রকার শ্বাপদ-মানুষের আহার জোগাচ্ছে— যে দেবতা তাদের ছোঁয়া লাগলে অশুচি হন মন্দির-প্রাঙ্গনের বাইরে সেই দেবতাকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করছে, মাতৃভাষায় কাঁদছে, হাসছে আর মাথার উপর অপমানের মুষলধারা নিয়ে কপালে করাঘাত করে বল্‌ছে 'অদৃষ্ট' দেশের সেই পোলিটিশান্‌ আর দেশের সর্বসাধারণ, উভয়ের মধ্যে অসীম দূরত্ব।

সেই পলিটিক্স আজ মুখ ফিরিয়েছে, অভিমানিনী যেমন করে বল্লভের কাছ থেকে মুখ ফেরায়। বল্‌ছে, 'কালো মেঘ আর হেরব না গো দূতী।' তখন ছিল পূর্বরাগ ও অভিসার, এখন চল্‌ছে মান এবং বিচ্ছেদ। পালাবদল হয়েছে, কিন্তু লীলা বদল হয় নি। কাল যেমন জোরে বলেছিলেম 'চাই', আজ তেমনি জোরেই বলছি 'চাই নে'। সেইসঙ্গে এই কথা যোগ করেছি বটে যে, পল্লীবাসী জনসাধারণের অবস্থার উন্নতি করাতে চাই। অর্থাৎ, এরাই আমার আপন, ওরা আমার পর। কিন্তু 'চাই নে', 'চাই নে' বলবার হু-হুংকারেই গলার জোর গায়ের জোর চুকিয়ে দিই। তার সঙ্গে যেটুকু 'চাই' জুড়ি, তার আওয়াজ বড়ো মিহি। যে অছিলাতেই অর্থ কিছু সংগ্রহ করি, ভদ্রসমাজের পোলিটিক্যাল বারোয়ারি জমিয়ে তুলতেই তা ফুরিয়ে যায়, তার পরে অর্থ গেলে শব্দ যেটুকু বাকি থাকে, সেইটুকু থাকে পল্লীর হিতের জন্যে। অর্থাৎ, আমাদের আধুনিক

পলিটিক্সের শুরু থেকেই আমরা নির্গুণ দেশপ্রেমের চর্চা করেছি— দেশের মানুষকে বাদ দিয়ে।

এই নিরুপাধিক প্রেমচর্চার অর্থ যাঁরা জোগান, তাঁদের কারো-বা আছে জমিদারি, কারো-বা আছে কারখানা ; আর শব্দ যাঁরা জোগান, তাঁরা আইন-ব্যবসায়ী। এর মধ্যে, পল্লীবাসী কোনো জায়গাতেই নেই ; অর্থাৎ আমরা যাকে দেশ বলি, সেই প্রতাপাদিত্যের প্রেতলোকে তারা থাকে না। তারা অত্যন্ত প্রতাপহীন— কী শব্দ-সম্বলে, কী অর্থ-সম্বলে। যদি দেওয়ানি অবাধ্যতা চলত তা হলে তাদের ডাকতে হত বটে— সে কেবল খাজনা বন্ধ ক'রে মরবার জন্যে ; আর, যাদের অদ্য-ভক্ষ্য-ধনুর্গুণ, তাদের এখনো মাঝে মাঝে ডাক পাড়া হয় দোকান বন্ধ ক'রে হরতাল করবার জন্যে, উপর-ওয়ালাদের কাছে আমাদের পোলিটিক্যাল বাঁকা ভঙ্গিটাকে অত্যন্ত তেড়া করে দেখাবার উদ্দেশ্যে।

এই কারণেই রায়তের কথাটা মুলতুবিই থেকে যায়। আগে পাতা হোক সিংহাসন, গড়া হোক মুকুট, খাড়া হোক রাজদণ্ড, ম্যাঞ্চেস্টার পরুক কোপ্‌নি— তার পর সময় পাওয়া যাবে রায়তের কথা পাড়বার। অর্থাৎ, দেশের পলিটিক্স আগে, দেশের মানুষ পরে। তাই শুরুতেই পলিটিক্সের সাজ-ফরমাশের ধুম পড়ে গেছে। সুবিধা এই যে, মাপ নেবার জন্যে কোনো সজীব মানুষের দরকার নেই। অন্য দেশের মানুষ নিজের দেহের বহর ও আবহাওয়ার প্রতি দৃষ্টি রেখে বার বার কেটে ছেঁটে বদ্‌লে জুড়ে যে-সাজ বানিয়েছে, ঠিক সেই নমুনাটা দরজির দোকানে চালান্‌ করলেই হবে। সাজের নামও জানি, একেবারে কেতাবের পাতা থেকে সদ্য-মুখস্থ, কেননা আমাদের কারখানা-ঘরে নাম আগে, রূপ পরে। ডিমোক্রেসি, পার্লামেন্ট, কানাডা অস্ট্রেলিয়া দক্ষিণ-আফ্রিকার রাষ্ট্রতন্ত্র ইত্যাদি ; এর সমস্তই আমরা চোখ বুজে কল্পনা করতে পারি ; কেননা গায়ের মাপ নেবার জন্যে মানুষকে সামনে রাখবার কথাই একেবারে নেই। এই সুবিধাটুকু নিষ্কণ্টকে ভোগ করবার জন্যেই বলে থাকি, আগে স্বরাজ, তার পর স্বরাজ যাদের জন্যে। তারা পৃথিবীতে অন্য-সব জায়গাতেই দেশের প্রকৃতি শক্তি ও প্রয়োজনের স্বাভাবিক প্রবর্তনায় আপনিই আপনার স্বরাজ গড়ে তুলছে ; জগতে আমরাই কেবল পঞ্জিকার কোনো-একটি আসন্ন পয়লা জানুয়ারিতে আগে স্বরাজ পাব, তার পরে স্বরাজের লোক ডেকে যেমন করে হোক সেটাকে তাদের গায়ে চাপিয়ে দেব। ইতিমধ্যে ম্যালেরিয়া আছে, মারী আছে, দুর্ভিক্ষ আছে, মহাজন আছে, জমিদার আছে, পুলিসের পেয়াদা আছে, গলায়-ফাঁস-লাগানো মেয়ের বিয়ে, মায়ের শ্রাদ্ধ, সহস্রবাহু সমাজের ট্যাক্‌সো আর আছে ওকালতির দংষ্ট্রাকরাল সর্বস্বলোলুপ আদালত।

এই-সব কারণে আমাদের পলিটিক্সে তোমার 'রায়তের কথা' স্থানকালপাত্রোচিত হয়েছে কি না সন্দেহ করি। তুমি ঘোড়ার সামনের দিকে গাড়ি জোতবার আয়োজনে যোগ দিচ্ছ না— শুধু তাই নয়, ঘোড়াটাকে জোতবার উদ্‌যোগ বন্ধ রেখে খবর নিতে

চাও সে দানা পেলে কি না, ওর দম কতটুকু বাকি। তোমার মন্ত্রণাদাতা বন্ধুদের মধ্যে এমন কী কেউ নেই যে তোমাকে বলতে পারে— আগে গাড়ি টানাও, তা হলেই অমুক শুভলগ্নে গম্যস্থানে পৌঁছবই; তার পরে পৌঁছবামাত্রই যথেষ্ট সময় পাওয়া যাবে খবর নেবার জন্যে যে, ঘোড়াটা সচল না অচল, বেঁচে আছে না মরেছে। তোমার জানা উচিত ছিল, হাল-আমলের পলিটিক্সে টাইমটেব্‌ল তৈরি, তোরঙ্গ গুছিয়ে গাড়িতে চড়ে বসাই প্রধান কর্তব্য। অবশেষে গাড়িটা কোনো জায়গাতেই পৌঁছয় না, বটে, কিন্তু সেটা টাইমটেব্‌লের দোষ নয়, ঘোড়াটা চললেই হিসেব ঠিক মিলে যেত। তুমি তার্কিক, এত বড়ো উৎসাহে বাধা দিয়ে বলতে চাও— ঘোড়াটা যে চলে না, বহুকাল থেকে সেইটেই গোড়াকার সমস্যা। তুমি সাবেক ফ্যাসানের সাবধানী মানুষ, আস্তাবলের খবরটা আগে চাও। এদিকে হাল-ফ্যাসানের উৎসাহী মানুষ কোচবাক্সে চড়ে বসে অস্থিরভাবে পা ঘষছে; ঘরে আগুন লাগার উপমা দিয়ে সে বলছে, অতি শীঘ্র পৌঁছনো চাই, এইটেই একমাত্র জরুরি কথা। অতএব ঘোড়ার খবর নেওয়া নিছক সময় নষ্ট করা। সব আগে দরকার গাড়িতে চড়ে বসা। তোমার 'রায়তের কথা' সেই ঘোড়ার কথা— যাকে বলা যেতে পারে গোড়ার কথা।

২

কিন্তু ভাববার কথা এই যে, বর্তমান কালে একদল জোয়ান মানুষ রায়তের দিকে মন দিতে শুরু করেছেন। সব আগে তাঁরা হাতের গুলি পাকাচ্ছেন। বোঝা যাচ্ছে, তাঁরা বিদেশে কোথাও একটা নজির পেয়েছেন। আমাদের মন যখন অত্যন্ত আড়ম্বরে স্বাদেশিক হয়ে ওঠে তখনো দেখা যায় সেই আড়ম্বরের সমস্ত মালমসলার গায়ে ছাপ মারা আছে— Made in Europe। য়ুরোপে প্রকৃতিগত ও অবস্থাগত কারণের স্বাভাবিক বেগে মানুষ সোশ্যালিজম্‌, কম্যুনিজম্‌, সিণ্ডিক্যালিজম্‌, প্রভৃতি নানা প্রকার সামাজিক পরিবর্তনের পরখ করছে। কিন্তু আমরা যখন বলি রায়তের ভালো করব, তখন য়ুরোপের বাঁধি বুলি ছাড়া আমাদের মুখে বুলি বেরোয় না। এবার পূর্ববঙ্গে গিয়ে দেখে এলুম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুশাঙ্কুরের মতো ক্ষণভঙ্গুর সাহিত্য গজিয়ে উঠছে। তারা সব ছোটো ছোটো এক-একটি রক্তপাতের ধ্বজা। বলছে পিষে ফেলো; দলে ফেলো; অর্থাৎ ধরণী নির্জমিদার নির্মহাজন হোক। যেন জবরদস্তির দ্বারা পাপ যায়, যেন অন্ধকারকে লাঠি মারলে সে মরে। এ কেমন, যেন বউয়ের দল বলছে শাশুড়িগুলোকে গুণ্ডা লাগিয়ে গঙ্গাযাত্রা করাও, তা হলেই বধূরা নিরাপদ হবে। ভুলে যায় যে মরা শাশুড়ির ভূত ঘাড়ে চেপে তাদের শাশুড়িতর শাশুড়িতম করে তুলতে দেরি হবে না। আমাদের দেশের শাস্ত্রে বলে, বাইরের থেকে আত্মহত্যা করে ম'লেই ভববন্ধন ছেদন করা যায় না— স্বভাবের ভিতর থেকে বন্ধনের মূলোচ্ছেদ করতে হয়। য়ুরোপের স্বভাবটা মারমুখো। পাপকে ভিতর থেকে মারতে সময় লাগে— তাদের সে তর সয় না। তারা বাইরে থেকে মানুষকে মারে।

একদিন ইংরেজের নকল করে আমাদের ছেঁড়া পলিটিক্স নিয়ে পার্লামেন্টীয় রাজনীতির পুতুলখেলা খেলতে বসেছিলেন। তার কারণ, সেদিন পলিটিক্সের আদর্শটাই য়ুরোপের অন্য সব-কিছুর চেয়ে আমাদের কাছে প্রত্যক্ষগোচর ছিল।

তখন য়ুরোপীয় যে সাহিত্য আমাদের মন দখল করেছে, তার মধ্যে মাট্‌সিনি গারিবাল্‌ডির সুরটাই ছিল প্রধান। এখন সেখানে নাট্যের পালা বদল হয়েছে। লঙ্কাকাণ্ডে ছিল রাজবীরের জয়, ছিল দানবের হাত থেকে সীতার মুক্তির কথা। উত্তরকাণ্ডে আছে দুর্মুখের জয়, রাজার মাথা হেঁট, প্রজার মন জোগাবার তাগিদে রাজরানীকে বিসর্জন। যুদ্ধের দিনে ছিল রাজার মহিমা, এখন এক প্রজার মহিমা। তখন গান চলছিল বাহিরের বিরুদ্ধে ঘরের জয়— এখনকার গান ইমারতের বিরুদ্ধে আঙিনার জয়। ইদানীং পশ্চিমে বল্‌শেভিজ্‌ম্‌, ফাসিজি্‌ম্‌ প্রভৃতি যে-সব উদ্যোগ দেখা দিয়েছে, আমরা যে তার কার্য-কারণ তার আকার-প্রকার সুস্পষ্ট বুঝি তা নয়; কেবল মোটের উপর বুঝেছি যে, গুণ্ডাতন্ত্রের আখড়া জমল। অমনি আমাদের নকলনিপুণ মন গুণ্ডামিটাকেই সব চেয়ে বড়ো করে দেখতে বসেছে। বরাহ অবতার পঙ্কনিমগ্ন ধরাতলকে দাঁতের ঠেলায় উপরে তুলেছিলেন, এরা তুলতে চায় লাঠির ঠেলায়। এ কথা ভাববার অবকাশও নেই, সাহসও নেই যে, গোঁয়ার্তমির দ্বারা উপর ও নীচের অসামঞ্জস্য ঘোচে না। অসামঞ্জস্যের কারণ মানুষের চিত্তবৃত্তির মধ্যে। সেইজন্যেই আজকের দিনের নীচের থাকটাকে উপরে তুলে দিলে, কালকের দিনের উপরের থাকটা নীচের দিকে পূর্বের মতোই চাপ লাগাবে। রাশিয়ার জার-তন্ত্র ও বল্‌শেভিক-তন্ত্র একই দানবের পাশ-মোড়া দেওয়া। পূর্বে যে ফোড়াটা বাঁ হাতে ছিল, আজ সেটাকে ডান হাতে চালান করে দিয়ে যদি তাণ্ডব নৃত্য করা যায়, তা হলে সেটাকে বলতেই হবে পাগলামি। যাদের রক্তের তেজ বেশি, এক-এক সময়ে মাথায় বিপরীত রক্ত চড়ে গিয়ে তাদের পাগলামি দেখা দেয়— কিন্তু সেই দেখাদেখি পাগলামি চেপে বসে অন্য লোকের, যাদের রক্তের জোর কম, তাকেই বলে হিস্‌টিরিয়া। আজ তাই যখন শুনে এলুম সাহিত্যে ইশারা চলছে— মহাজনকে লাগাও বাড়ি, জমিদারকে ফেলো পিষে, তখনি বুঝতে পারলুম এই লালমুখো বুলির উৎপত্তি এদের নিজের রক্তের থেকে নয়। এ হচ্ছে বাঙালির অসাধারণ নকল-নৈপুণ্যের নাট্য, ম্যাজেন্টা রঙে ছোবানো। এর আছে উপরে হাত-পা ছোঁড়া, ভিতরে চিত্তহীনতা।

৩

আমি নিজে জমিদার, এইজন্য হঠাৎ মনে হতে পারে, আমি বুঝি নিজের আসন বাঁচাতে চাই। যদি চাই তা হলে দোষ দেওয়া যায় না— ওটা মানবস্বভাব। যারা সেই অধিকার কাড়তে চায় তাদের যে বুদ্ধি, যারা সেই অধিকার রাখতে চায় তাদেরও সেই বুদ্ধি— অর্থাৎ কোনোটাই ঠিক ধর্মবুদ্ধি নয়, ওকে বিষয়বুদ্ধি বলা যেতে পারে। আজ

যারা কাড়তে চায় যদি তাদের চেষ্টা সফল হয়, তবে কাল তারাই বনবিড়াল হয়ে উঠবে। হয়তো শিকারের বিষয়-পরিবর্তন হবে, কিন্তু দাঁত-নখের ব্যবহারটা কিছুমাত্র বৈষ্ণব ধরনের হবে না। আজ অধিকার কাড়বার বেলা তারা যে-সব উচ্চ অঙ্গের কথা বলে, তাতে বোঝা যায় তাদের 'নামে রুচি' আছে; কিন্তু কাল যখন 'জীবে দয়া'র দিন আসবে, তখন দেখব আমিষের প্রতি জিহ্বার লেলিহার চাঞ্চল্য। কারণ নামটা হচ্ছে মুখে, আর লোভটা হচ্ছে মনে। অতএব, দেশের চিত্তবৃত্তির মাটিতে আজ যে-জমিদার দেখা দিয়েছে সে যদি নিছক কাঁটাগাছই হয়, তা হলে তাকে দ'লে ফেললেও সেই মরাগাছের সারে দ্বিতীয় দফা কাঁটাগাছের শ্রীবৃদ্ধির ঘটবে। কারণ মাটি বদল হল না তো।

আমার জন্মগত পেশা জমিদারি, কিন্তু আমার স্বভাবগত পেশা আসমানদারি। এই কারণেই জমিদারির জমি আঁকড়ে থাকতে আমার অন্তরের প্রবৃত্তি নেই। এই জিনিসটার 'পরে আমার শ্রদ্ধার একান্ত অভাব। আমি জানি জমিদার জমির জোঁক, সে প্যারাসাইট, পরাশ্রিত জীব। আমরা পরিশ্রম না ক'রে, উপার্জন না ক'রে, কোনো যথার্থ দায়িত্ব গ্রহণ না ক'রে ঐশ্বর্য ভোগের দ্বারা দেহকে অপটু ও চিত্তকে অলস ক'রে তুলি। যারা বীর্যের দ্বারা বিলাসের অধিকার লাভ করে, আমরা সে জাতির মানুষ নই। প্রজারা আমাদের অন্ন জোগায় আর আমলারা আমাদের মুখে অন্ন তুলে দেয়— এর মধ্যে পৌরুষও নেই, গৌরবও নেই। নিজেকে ছোটো হাতের মাপে রাজা ব'লে কল্পনা করবার একটা অভিমান আছে বটে, 'রায়তের কথা'য় পুরাতন দপ্তর ঘেঁটে তুমি সেই সুখস্বপ্নেও বাদ সাধতে বসেছ। তুমি প্রমাণ করতে চাও যে, আমরা ইংরেজ রাজ-সরকারের পুরুষানুক্রমিক গোমস্তা। আমরা এদিকে রাজার নিমক খাচ্ছি, রায়তদের বলছি "প্রজা", তারা আমাদের বলছে "রাজা" ;— মস্ত একটা ফাঁকির মধ্যে আছি। এমন জমিদারি ছেড়ে দিলেই তো হয়। কিন্তু কাকে ছেড়ে দেব? অন্য এক জমিদারকে? গোলামচোর খেলার গোলাম যাকেই গতিয়ে দিই— তার দ্বারা গোলাম-চোরকে ঠকানো হয় না। প্রজাকে ছেড়ে দেব? তখন দেখতে দেখতে এক বড়ো জমিদারের জায়গায় দশ ছোটো জমিদার গজিয়ে উঠবে। রক্তপিপাসায় বড়ো জোঁকের চেয়ে ছিনে জোঁকের প্রবৃত্তির কোনো পার্থক্য আছে তা বলতে পারি নে। তুমি বলেছ, জমি চাষ করে যে, জমি তারই হওয়া উচিত। কেমন করে তা হবে? জমি যদি পণ্যদ্রব্য হয়, যদি তার হস্তান্তরে বাধা না থাকে? এ কথা মোটের উপর বলা চলে যে, বই তারই হওয়া উচিত যে মানুষ বই পড়ে। যে মানুষ পড়ে না অথচ সাজিয়ে রেখে দেয়, বইয়ের সদ্ব্যবহারীকে সে বঞ্চিত করে। কিন্তু বই যদি পটলডাঙার দোকানে বিক্রি করতে কোনো বাধা না থাকে, তা হলে যার বইয়ের শেল্‌ফ্ আছে, বুদ্ধি নেই, সে যে বই কিনবে না এমন ব্যবস্থা কী করে করা যায়? সংসারে বইয়ের শেল্‌ফ্ বুদ্ধির চেয়ে অনেক সুলভ ও প্রচুর। এই কারণে অধিকাংশ বইয়ের গতি হয়

শেল্‌ফের থাকে, বুদ্ধিমানের ডেস্কে নয়। সরস্বতীর বরপুত্র যে-ছবি রচনা করে লক্ষ্মীর বরপুত্র তাকে দখল ক'রে বসে। অধিকার আছে বলে নয়— ব্যাঙ্কে টাকা আছে বলে ; যাদের মেজাজ কড়া, সম্বল কম, এ অবস্থায় তারা খাপ্পা হয়ে ওঠে। বলে— মারো টাকাওলাকে, কাড়ো ছবি। কিন্তু চিত্রকরের পেটের দায় যতদিন আছে, ছবি যতদিন বাজারে আসতে বাধ্য, ততদিন লক্ষ্মীমানের ঘরের দিকে ছবির টান কেউ ঠেকাতে পারবে না।

৪

জমি যদি খোলা বাজারে বিক্রি হয়ই, তা হলে যে ব্যক্তি স্বয়ং চাষ করে তার কেনবার সম্ভাবনা অল্পই ; যে লোক চাষ করে না কিন্তু যার আছে টাকা, অধিকাংশ বিক্রয়-যোগ্য জমি তার হাতে পড়বেই। জমির বিক্রয়ের সংখ্যা কালে কালে ক্রমেই যে বেড়ে যাবে, এ কথাও সত্য। কারণ উত্তরাধিকার সূত্রে জমি যতই খণ্ড খণ্ড হতে থাকবে, চাষীর সাংসারিক অভাবের পক্ষে সে জমি ততই অল্প-স্বত্ব হবেই ; কাজেই অভাবের তাড়ায় খরিদ-বিক্রি বেড়ে চলবে। এমনি ক'রে ছোটো ছোটো জমিগুলি স্থানীয় মহাজনের বড়ো বড়ো বেড়াজালের মধ্যে ঝাঁকে ঝাঁকে ধরা পড়ে। তার ফলে জাঁতার দুই পাথরের মাঝখানে গোটা রায়ত আর বাকি থাকে না। একা জমিদারের আমলে জমিতে রায়তের যেটুকু অধিকার, জমিদার-মহাজনের দ্বন্দ্ব-সমাসে তা আর টেঁকে না। আমার অনেক রায়তকে এই চরম অকিঞ্চনতা থেকে আমি নিজে রক্ষা করেছি, জমি হস্তান্তরের বাধার উপর জোর দিয়ে। মহাজনকে বঞ্চিত করি নি, কিন্তু তাকে রফা করাতে বাধ্য করেছি। যাদের সম্বন্ধে তা করা একেবারে অসম্ভব হয়েছে, তাদের কান্না আমার দরবার থকে বিধাতার দরবারে গেছে। পরলোকে তারা কোনো খেসারত পাবে কি না, সে তত্ত্ব এই প্রবন্ধে আলোচ্য নয়।

নীল চাষের আমলে নীলকর যখন ঋণের ফাঁসে ফেলে প্রজার জমি আত্মসাৎ করবার চেষ্টায় ছিল, তখন জমিদার রায়তকে বাঁচিয়েছে। নিষেধ-আইনের বাঁধ যদি সেদিন না থাকত, তা হলে নীলের বন্যায় রায়তি জমি ডুবে একাকার হত। মনে করো, আজ কোনো কারণে বাংলার উৎপন্ন ফসলের প্রতি যদি মারোয়াড়ি দখল-স্থাপনের উদ্দেশে ক্রমশ প্রজার জমি ছিনিয়ে নিতে ইচ্ছা করে, তা হলে অতি সহজেই সমস্ত বাংলা তারা ঘানির পাকে ঘুরিয়ে তার সমস্ত তেল নিংড়ে নিতে পারে। এমন মতলব এদের কারো মাথায় যে কোনোদিন আসে নি, তা মনে করবার হেতু নেই। যে-সব ব্যবসায়ে এরা আজ নিযুক্ত আছে তার মুনফায় বিঘ্ন ঘটলেই আবদ্ধ মূলধন এই-সব খাতের সন্ধান খুঁজবেই। এখন কথা হচ্ছে, ঘরের দিকে বেনো জল ঢোকাবার অনুকূল খাল খনন কি রায়তের পক্ষে ভালো? মূল কথাটা এই— রায়তের বুদ্ধি নেই,

বিদ্যা নেই, শক্তি নেই, আর ধনস্থানে শনি। তারা কোনো মতে নিজেকে রক্ষা করতে জানে না। তাদের মধ্যে যারা জানে, তাদের মতো ভয়ংকর জীব আর নেই। রায়ত-খাদক রায়তের ক্ষুধা যে কত সর্বনেশে, তার পরিচয় আমার জানা আছে। তারা যে-প্রণালীর ভিতর দিয়ে স্ফীত হ'তে হ'তে জমিদার হয়ে ওঠে, তার মধ্যে শয়তানের সকল শ্রেণীর অনুচরেরই জটলা দেখতে পাবে। জাল, জালিয়াতি, মিথ্যা-মকদ্দমা, ঘর-জ্বালানো, ফসল-তছরূপ— কোনো বিভীষিকায় তাদের সংকোচ নেই। জেলখানায় যাওয়ার মধ্য দিয়ে তাদের শিক্ষা পাকা হয়ে উঠতে থাকে। আমেরিকায় যেমন শুনতে পাই ছোটো ছোটো ব্যাবসাকে গিলে ফেলে বড়ো বড়ো ব্যাবসা দানবাকার হয়ে ওঠে, তেমনি করেই দুর্বল রায়তের ছোটো ছোটো জমি ছলে বলে কৌশলে আত্মসাৎ ক'রে প্রবল রায়ত ক্রমেই জমিদার হয়ে উঠতে থাকে। এরা প্রথম অবস্থায় নিজে জমি চাষ করেছে, নিজের গোরুর গাড়িতে মাল তুলে হাটে বেচে এসেছে, স্বাভাবিক চতুরতা ছাড়া অন্য চাষীর সঙ্গে এদের কোনো প্রভেদ ছিল না। কিন্তু যেমনি জমির পরিধি বাড়তে থাকে, অমনি হাতের লাঙল খসে গিয়ে গদার আবির্ভাব হয়। পেটের প্রত্যন্ত-সীমা প্রসারিত হতে থাকে, পিঠের দিকে লাগে তাকিয়া, মুলুকের মিথ্যা মকদ্দমা পরিচালনার কাজে পসার জমে, আর তার দাবরাব-তর্জন-গর্জন-শাসন-শোষণের সীমা থাকে না। বড়ো বড়ো জালের ফাঁক বড়ো, ছোটো মাছ তার ভিতর দিয়ে পালাবার পথ পায় ; কিন্তু ছোটো ছোটো জালে চুনোপুঁটি সমস্তই ছাঁকা পড়ে— এই চুনোপুঁটির ঝাঁক নিয়েই রায়ত।

একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, প্রতিকূল আইনটাকে নিজের করে নেওয়াই মকদ্দমার জুজুৎসু খেলা। আইনের যে আঘাত মারতে আসে, সেই আঘাতের দ্বারাই উলটিয়ে মরা ওকালতি-কুস্তির মারাত্মক প্যাঁচ। এই কাজে বড়ো বড়ো পালোয়ান নিযুক্ত আছে। অতএব রায়ত যতদিন বুদ্ধি ও অর্থের তহবিলে সম্পন্ন হয়ে না ওঠে, ততদিন 'উচল' আইনও তার পক্ষে 'অগাধ জলে' পড়বার উপায় হবে।

এ কথা বলতে ইচ্ছা করে না, শুনতেও ভালো লাগে না যে, জমি সম্বন্ধে রায়তের স্বাধীন ব্যবহারে বাধা দেওয়া কর্তব্য। একদিক থেকে দেখতে গেলে ষোলো আনা স্বাধীনতার মধ্যে আত্ম-অপকারের স্বাধীনতাও আছে। কিন্তু তত বড়ো স্বাধীনতার অধিকার তারই যার শিশু-বুদ্ধি নয়। যে রাস্তায় সর্বদা মোটর চলাচল হয়, সে রাস্তায় সাবালক মানুষকে চলতে বাধা দিলে সেটাকে বলা যায় জুলুম— কিন্তু অত্যন্ত নাবালককে যদি কোনো বাধা না দিই তবে তাকে বলে অবিবেচনা। আমার যেটুকু অভিজ্ঞতা তাতে বলতে পারি, আমাদের দেশে মূঢ় রায়তদের জমি অবাধে হস্তান্তর করবার অধিকার দেওয়া আত্মহত্যার অধিকার দেওয়া। এক সময়ে সেই অধিকার তাদের দিতেই হবে, কিন্তু এখন দিলে কি সেই অধিকারের কিছু বাকি থাকবে? তোমার লেখার মধ্যে এই অংশ আমার মনে যে সংশয় আছে তা বললেম।

৫

আমি জানি জমিদার নির্বোধ নয়। তাই রায়তের যেখানে কিছু বাধা আছে, জমিদারের আয়ের জালে সেখানে মাছ বেশি আটকে পড়ে। আমাদের দেশে মেয়ের বিবাহের সীমা সংকীর্ণ, সেই বাধাটাই বরপক্ষের আয়ের উপায়। এও তেমনি, কিন্তু দেখতে দেখতে চাষীর জমি সরে সরে মহাজনের হাতে পড়লে আখেরে জমিদারের লোকসান আছে বলে আনন্দ করবার কোনো হেতু নেই। চাষীর পক্ষে জমিদারের মুষ্টির চেয়ে মহাজনের মুষ্টি অনেক বেশি কড়া— যদি তাও না মানো এটা মানতে হবে, সেটা আরেকটা উপরি মুষ্টি।

রায়তের জমিতে জমা-বৃদ্ধি হওয়া উচিত নয়, এ কথা খুব সত্য। রাজসরকারের সঙ্গে দেনা-পাওনায় জমিদারের রাজস্ব-বৃদ্ধি নেই, অথচ রায়তের স্থিতিস্থাপক জমায় কমা সেমিকোলন চলবে, কোথাও দাঁড়ি পড়বে না, এটা ন্যায়বিরুদ্ধ। তা ছাড়া এই ব্যবস্থাটা স্বাভাবিক উৎসাহে জমির উন্নতি সাধন সম্বন্ধে একটা মস্ত বাধা ; সুতরাং কেবল চাষী নয়, সমস্ত দেশের পক্ষে এটাতে অকল্যাণ। তা ছাড়া গাছ কাটা, বাসস্থান পাকা করা, পুষ্করিণী খনন প্রভৃতির অন্তরায়গুলো কোনোমতেই সমর্থন করা চলে না।

কিন্তু এ-সব গেল খুচরো কথা। আসল কথা, যে-মানুষ নিজেকে বাঁচাতে জানে না কোনো আইন তাকে বাঁচাতে পারে না। নিজেকে এই যে বাঁচাবার শক্তি, তা জীবনযাত্রার সমগ্রতার মধ্যে, কোনো একটা খাপছাড়া প্রণালীতে নয়। তা বিশেষ আইনে নয়, চরখায় নয়, খদ্দরে নয়, কন্‌গ্রেসে ভোট দেবার চার-আনা-ক্রীত অধিকারে নয়। পল্লীর মধ্যে সমগ্রভাবে প্রাণ সঞ্চার হলে তবেই সেই প্রাণের সম্পূর্ণতা নিজেকে প্রতিনিয়ত রক্ষা করবার শক্তি নিজের ভিতর থেকেই উদ্ভাবন করতে পারবে।

কেমন করে সেটা হবে? সেই তত্ত্বটাই কাজে ও কথায় কিছুকাল থেকে ভাবছি। ভালো জবাব দিয়ে যেতে পারব কি না জানি নে— জবাব তৈরি হয়ে উঠতে সময় লাগে। তবু, আমি পারি বা না পারি, এই মোটা জবাবটাই খুঁজে বের করতে হবে। সমস্ত খুচরো প্রশ্নের সমাধান এরই মধ্যে, নইলে তালি দিতে দিতে দিন বয়ে যাবে ; যার জন্যে এত জোড়াতাড়া সে ততকাল পর্যন্ত টিকবে কি না সন্দেহ।

[বৈশাখ ১৩৩৩]

২১

রাগশ্রেণী : ভীমরাও শাস্ত্রী

শ্রীযুক্ত ভীমরাও শাস্ত্রী দীর্ঘকাল সংগীত অধ্যাপনা করিয়া অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। এই গ্রন্থখানিতেই তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে। তিনি উত্তর ভারতীয় সংগীতের রাগ-রাগিণীর যে শ্রেণী নির্ণয় করিয়াছেন তাহাতে শিক্ষার্থীদের বিশেষ উপকার হইবে সন্দেহ নাই। সাধারণ বিদ্যালয়ে সংগীত শিক্ষার সংকল্প মাঝে মাঝে শুনা যায়। এই গ্রন্থ সেই কাজে আনুকূল্য করিবে। পণ্ডিতজী শিক্ষাদানের যে প্রণালী উদ্ভাবন করিয়াছেন তাহা যন্ত্রসংগীত কণ্ঠসংগীত উভয়েরই পক্ষে বিশেষ উপযোগী হইয়াছে।

২৫ বৈশাখ ১৩৩৩

২২

হারামণি (লোকসংগীত সংগ্রহ) : মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন সংগৃহীত ও সম্পাদিত

আশীর্বাদ

মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন বাউল-সংগীত সংগ্রহে প্রবৃত্ত হয়েছেন। এ সম্বন্ধে পূর্বেই তাঁর সঙ্গে আমার মাঝে মাঝে আলাপ হয়েছিল, আমিও তাঁকে অন্তরের সঙ্গে উৎসাহ দিয়েছি। আমার লেখা যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা জানেন, বাউল পদাবলীর প্রতি আমার অনুরাগ আমি অনেক লেখায় প্রকাশ করেছি। শিলাইদহে যখন ছিলাম, বাউল-দলের সঙ্গে আমার সর্বদাই দেখা-সাক্ষাৎ ও আলাপ-আলোচনা হত। আমার অনেক গানেই আমি বাউলের সুর গ্রহণ করেছি। এবং অনেক গানে অন্য রাগ-রাগিণীর সঙ্গে আমার জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে বাউল সুরের মিল ঘটেছে। এর থেকে বোঝা যাবে, বাউলের সুর ও বাণী কোন্ এক সময়ে আমার মনের মধ্যে সহজ হয়ে মিশে গেছে। আমার মনে আছে, তখন আমার নবীন বয়স— শিলাইদহ অঞ্চলেরই এক বাউল কলকাতায় একতারা বাজিয়ে গেয়েছিল—

“কোথায় পাব তারে
আমার মনের মানুষ যে রে!
হারায়ে সেই মানুষে তার উদ্দেশে
দেশ-বিদেশে বেড়াই ঘুরে।”

কথা নিতান্ত সহজ, কিন্তু সুরের যোগে এর অর্থ অপূর্ব জ্যোতিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। এই কথাটিই উপনিষদের ভাষায় শোনা গিয়েছে, "তং বেদ্যং পুরুষং বেদ মা বো মৃত্যুঃ পরিব্যথাঃ"— যাঁকে জানবার সেই পুরুষকেই জানো, নইলে যে মরণ-বেদনা। অপণ্ডিতের মুখে এই কথাটিই শুনলুম, তার গেঁয়ো সুরে, সহজ ভাষায়— যাঁকে সকলের চেয়ে জানবার তাঁকেই সকলের চেয়ে না-জানবার বেদনা— অন্ধকারে মাকে দেখতে পাচ্ছে না যে শিশু, তারই কান্নার সুর— তার কণ্ঠে বেজে উঠেছে। "অন্তরতর যদয়মাত্মা" উপনিষদের এই বাণী এদের মুখে যখন 'মনের মানুষ' বলে শুনলুম, আমার মনে বড়ো বিস্ময় লেগেছিল। এর অনেককাল পরে ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের অমূল্য সঞ্চয়ের থেকে এমন বাউলের গান শুনেছি, ভাষার সরলতায়, ভাবের গভীরতায়, সুরের দরদে যার তুলনা মেলে না— তাতে যেমন জ্ঞানের তত্ত্ব তেমনি কাব্যরচনা, তেমনি ভক্তির রস মিশেছে। লোকসাহিত্যে এমন অপূর্বতা আর কোথাও পাওয়া যায় বলে বিশ্বাস করি নে।

সকল সাহিত্যে যেমন লোকসাহিত্যেও তেমনি, তার ভালোমন্দের ভেদ আছে। কবির প্রতিভা থেকে যে রসধারা বয় মন্দাকিনীর মতো অলক্ষ্যলোক থেকে সে নেমে আসে; তার পর একদল লোক আসে যারা খাল কেটে সেই জল চাষের ক্ষেতে আনতে লেগে যায়। তারা মজুরি করে, তাদের হাতে এই ধারার গভীরতা, এর বিশুদ্ধিতা চলে যায়, কৃত্রিমতায় নানাপ্রকারে বিকৃত হতে থাকে। অধিকাংশ আধুনিক বাউলের গানের অমূল্যতা চলে গেছে তা চলতি হাটের শস্তা দামের জিনিস হয়ে পথে পথে বিকোচ্ছে। তা অনেক স্থলে বাঁধি বোলের পুনরাবৃত্তি এবং হাস্যকর উপমা তুলনার দ্বারা আকীর্ণ— তার অনেকগুলোই মৃত্যুভয়ের শাসনে মানুষকে বৈরাগীদলে টানবার প্রচারকগিরি। এর উপায় নেই, খাঁটি জিনিসের পরিমাণ বেশি হওয়া অসম্ভব, খাঁটির জন্যে অপেক্ষা করতে ও তাকে গভীর করে চিনতে যে ধৈর্যের প্রয়োজন তা সংসারে বিরল। এইজন্যে কৃত্রিম নকলের প্রচুরতা চলতে থাকে। এইজন্যে সাধারণত যে-সব বাউলগান যেখানে-সেখানে পাওয়া যায়, কী সাধনার কী সাহিত্যের দিক থেকে তার দাম বেশি নয়।

তবু তার ঐতিহাসিক মূল্য আছে। অর্থাৎ এর থেকে স্বদেশের চিত্তের একটা ঐতিহাসিক পরিচয় পাওয়া যায়। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে ভারতবর্ষীয় চিত্তের যে একটি বড়ো আন্দোলন জেগেছিল সেটি মুসলমান অভ্যাগমের আঘাতে। অস্ত্র হাতে বিদেশী এল, তাদের সঙ্গে দেশের লোকের মেলা হল কঠিন। প্রথম আসামঞ্জস্যটা বৈষয়িক অর্থাৎ বিষয়ের অধিকার নিয়ে, স্বদেশের সম্পদের ভোগ নিয়ে। বিদেশী রাজা হলেই এই বৈষয়িক বিরুদ্ধতা অনিবার্য হয়ে ওঠে। কিন্তু মুসলমান শাসনে সেই বিরুদ্ধতার তীব্রতা ক্রমশই কমে আসছিল কেননা তারা এই দেশকেই আপন করে নিয়েছিল, সুতরাং দেশকে ভোগ করা সম্বন্ধে আমরা পরস্পরের অংশীদার হয়ে

উঠলুম। তা ছাড়া, সংখ্যা গণনা করলে দেখা যাবে, এদেশের অধিকাংশ মুসলমানই বংশগত জাতিতে হিন্দু, ধর্মগত জাতিতে মুসলমান। সুতরাং দেশকে ভোগ করবার অধিকার উভয়েরই সমান। কিন্তু তীব্রতর বিরুদ্ধতা রয়ে গেল ধর্ম নিয়ে। মুসলমান শাসনের আরম্ভকাল থেকেই ভারতের উভয় সম্প্রদায়ের মহাত্মা যাঁরা জন্মেছেন তাঁরাই আপন জীবনে ও বাক্য-প্রচারে এই বিরুদ্ধতার সমন্বয় সাধনে প্রবৃত্ত হয়েছেন। সমস্যা যতই কঠিন, ততই পরমাশ্চর্য তাঁদের প্রকাশ। বিধাতা এমনি করেই দুরূহ পরীক্ষার ভিতর দিয়েই মানুষের ভিতরকার শ্রেষ্ঠকে উদ্‌ঘাটিত করে আনেন। ভারতবর্ষে ধারাবাহিকভাবেই সেই শ্রেষ্ঠের দেখা পেয়েছি, আশা করি আজও তার অবসান হয় নি। যে-সব উদার চিত্তে হিন্দু-মুসলমানের বিরুদ্ধ ধারা মিলিত হতে পেরেছে, সেই-সব চিত্তে সেই ধর্মসংগমে ভারতবর্ষের যথার্থ মানস-তীর্থ স্থাপিত হয়েছে। সেই-সব তীর্থ দেশের সীমায় বদ্ধ নয়, তা অন্তহীন কালে প্রতিষ্ঠিত। রামানন্দ, কবীর, দাদু, রবিদাস, নানক প্রভৃতির চরিত্রে এই-সব তীর্থ চিরপ্রতিষ্ঠিত হয়ে রইল। এঁদের মধ্যে সকল বিরোধ সকল বৈচিত্র্য একের জয়বার্তা মিলিত কণ্ঠে ঘোষণা করেছে।

আমাদের দেশে যাঁরা নিজেদের শিক্ষিত বলেন তাঁরা প্রয়োজনের তাড়নায় হিন্দু-মুসলমানের মিলনের নানা কৌশল খুঁজে বেড়াচ্ছেন। অন্যদেশের ঐতিহাসিক স্কুলে তাঁদের শিক্ষা। কিন্তু আমাদের দেশের ইতিহাস আজ পর্যন্ত প্রয়োজনের মধ্যে নয়, পরন্তু মানুষের অন্তরতর গভীর সত্যের মধ্যে মিলনের সাধনাকে বহন করে এসেছে। বাউল সাহিত্যে বাউল সম্প্রদায়ের সেই সাধনা দেখি— এ জিনিস হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই, একত্র হয়েছে অথচ কেউ কাউকে আঘাত করে নি। এই মিলনে সভা-সমিতির প্রতিষ্ঠা হয় নি, এই মিলনে গান জেগেছে, সেই গানের ভাষা ও সুর অশিক্ষিত মাধুর্যে সরস। এই গানের ভাষায় ও সুরে হিন্দু-মুসলমানের কণ্ঠ মিলেছে, কোরান পুরাণে ঝগড়া বাধে নি। এই মিলনেই ভারতের সভ্যতার সত্য পরিচয়, বিবাদে বিরোধে বর্বরতা। বাংলা দেশের গ্রামের গভীর চিত্তে উচ্চ সভ্যতার প্রেরণা ইস্কুল কলেজের অগোচরে আপনা-আপনি কী রকম কাজ করে এসেছে, হিন্দু-মুসলমানের জন্য এক আসন রচনার চেষ্টা করেছে, এই বাউল গানে তারই পরিচয় পাওয়া যায়। এইজন্য মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন মহাশয় বাউল সংগীত সংগ্রহ ক'রে প্রকাশ করবার যে উদ্‌যোগ করেছেন, আমি তার অভিনন্দন করি— সাহিত্যের উৎকর্ষ বিচার ক'রে না, কিন্তু স্বদেশের উপেক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে মানব-চিত্তের যে-তপস্যা সুদীর্ঘকাল ধরে আপন সত্য রক্ষা করে এসেছে তারই পরিচয় লাভ করব এই আশা ক'রে।

শান্তিনিকেতন,
পৌষ-সংক্রান্তি ১৩৩৪

২৩

সরল কৃষি শিক্ষা : সন্তোষবিহারী বসু

যে আদর্শে আমাদের দেশে ক্ষেতের কাজ হওয়া উচিত, আমি জানি, সে সম্বন্ধে শ্রীসন্তোষবিহারী বসু অগ্রগণ্য ব্যক্তিদের মধ্যে একজন। কৃষিকার্যে নূতন জ্ঞান ও নূতন চিন্তা প্রয়োগ করিবার দিন আসিয়াছে, যদি জড় প্রথার উপর বরাত দিয়া উদাসীন থাকি, তবে, আধুনিক কালের দাবি রক্ষা করিতে অক্ষম হইয়া, বিশ্বের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় আমাদিগকে পরাস্ত হইতে হইবে। পূর্বকালে আমাদের গ্রামের হাটই ছিল আমাদের ফসলের হাট, আমাদের ফল ফলাইবার চেষ্টা সেই সংকীর্ণ পরিধির উপযুক্ত ছিল। এখন বিশ্বের হাটে আমাদের চাষীদের তলব পড়িয়াছে, জোগান দিতে কুলায় না। বাহিরের কথা ছাড়িয়া দিলেও আগে আমাদের গৃহস্থদের প্রয়োজনের পরিমাণ যতটা ছিল, এখন তার চেয়ে অনেক বেশি বাড়িয়াছে, অথচ উৎপাদনের উপায়গুলি পূর্ববৎ, এবং উৎপাদনের শক্তিও বাড়ে নাই। কৃষিপ্রধান দেশের পক্ষে এমন সাংঘাতিক দুর্গতির কারণ আর কিছুই হইতে পারে না। কৃষিজীবী দেশের পক্ষে বিশেষ দরকার উদ্‌বৃত্ত সঞ্চয়। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, বাহিরের হাটে মূল্যের পতন প্রভৃতি, আকস্মিক উৎপাত মাঝে মাঝে অনিবার্য। সে স্থলে পূর্ব-সঞ্চিত সম্বল হাতে না থাকিলে দল বাঁধিয়া নিরুপায়ে মরিতে হয়। সেই দারুণ দৃশ্য প্রায়ই আমাদের চোখে পড়িতেছে। শুধু তাই নয়, আমাদের দেশে চাষীর বিপদ কেবল যে নৈমিত্তিক তাহা বলিতে পারা যায় না, তাহার নিত্য টানাটানি প্রতিদিনই চলিতেছে। তাই উদ্‌বৃত্ত দূরে থাক্ ঋণের দায়ই বাড়িয়া চলিয়াছে, বর্তমানের দায়ে তাহাদের ভবিষ্যৎ পর্যন্ত বাঁধা পড়িল। চাষী ছাড়া আমরা অন্য যাহারা আছি, বাক্য ছাড়া কোনো প্রকার উৎপাদন প্রায় কিছুই করিতেছি না। সুতরাং সমাজের নিম্নস্তরে চাষী যাহা ফলাইতেছে উপরিস্তরের লোক নানা বৃত্তি অবলম্বন করিয়া তাহাদেরই সেই ফসলের ভাগ লইতেছে— দেশের অল্পধন নিয়ত গ্রহণ করিতেছে— তাহার পরিবর্তে কোনো ধন দেশকে ফিরাইয়া দিতেছে না।

সেই উপরিতন লোকদের কথা এখন থাক্। চাষীদের হাতে যাহাতে উদ্‌বৃত্ত সঞ্চয় থাকে আশু তাহার উপায় করা উচিত— অন্যান্য সকল সমস্যার চেয়ে এটা বড়ো বৈ ছোটো নয়। এই উদ্‌বৃত্ত সঞ্চয় হইতেই তাহাদের স্বাস্থ্য, তাহাদের শিক্ষা, তাহাদের ধর্মকর্ম, তাহাদের উৎসব সম্ভবপর। সে সঞ্চয় যদি না থাকে তবে তাহারা মূঢ়তা, অস্বাস্থ্য, অপমান ও নিরানন্দের মধ্যে কেবলই তলাইতে থাকিবে ও তাহার ফলে তাহাদের প্রাণশক্তি ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া তাহাদের কর্মকে মূল্যহীন ও স্বল্পফল করিয়া তুলিবে। যত লোক দেশে বাস করিতেছে, নানা কারণে তাহাদের শক্তি

যদি অল্প হয়, তবে, তাহাদের সংখ্যাধিক্যে ব্যয় যত বাড়িবে, আয় তত বাড়িবে না, সুতরাং দারিদ্র্যের দুঃখই কেবল বাড়িয়া চলিবে। এ কথা ভুলিলে বিপদ যে, উদ্‌বৃত্ত অন্নই আমাদের শক্তির পরিচয় ও শক্তির আশ্রয়, এই শক্তিই সকল সভ্যতার মূল।

আজ পৃথিবীতে সর্বত্রই ফসল ফলানোর ব্যাপার কেবলমাত্র চাষীর হাতে নাই। জ্ঞানী, বুদ্ধিমান ও উদ্ভাবনপটু যান্ত্রিকদল ইহাতে মন দিয়াছেন। যাহা অন্ধ অভ্যাসের কাজ ছিল, তাহাতে চিত্তের দৃষ্টি পড়িবামাত্র আশ্চর্য সফলতা ঘটিয়াছে। তাই আমাদের দেশের কৃষির পশু ও কৃষিকলের সহিত পাশ্চাত্য দেশের তুলনা করিলে আমাদের মাথা হেঁট হইয়া যায়। যে অযোগ্যতার বিধিনির্দিষ্ট শাস্তি মৃত্যু— সেই শাস্তি স্বীকার করিয়াও দেশের বুদ্ধি এই কাজে একটুও লাগিল না— উপবাসে মরিতে মরিতেও নিরক্ষর চাষীর উপর নির্ভর করিয়া রহিলাম। যাহা যেমন আছে তাহা তেমনই থাকিবে ; স্বচেষ্টায় তাহার উন্নতি করিতে পারি এ শ্রদ্ধা নিজের উপর নাই— তাই জীর্ণ সাবেক কালকে দিয়া বর্তমান কালের বিপুল দায় মিটাইবার তাড়ায় প্রাণ বাহির হইল।

পলিটিক্স-প্রমত্ত দেশের এই অপরিসীম জড়তা সত্ত্বেও যাঁহারা সাধ্যমতে কৃষিসাধারণের উন্নতিকল্পে কাজে লাগিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে সন্তোষবিহারী বসু একজন। অনেকদিন হাতে কাজ করিয়াছেন, এখন হাতে-কলমে কাজ করিতে তিনি প্রস্তুত। কৃষিশিক্ষা প্রচারের উপযোগী একখানি পাঠ্যগ্রন্থ তিনি লিখিয়াছেন— এরূপ গ্রন্থের প্রয়োজন যে গুরুতর, তাহাতে কাহারো সন্দেহ থাকা উচিত নহে, এবং এইরূপ গ্রন্থ লিখিবার উপযুক্ত ব্যক্তি যে তিনি তাহাতে আমার সন্দেহ নাই।

শ্রীনিকেতন
৪ বৈশাখ ১৩৩৪

২৪

ইন্দ্রধনু : সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী

শ্রীমান সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীকে আমি স্নেহ করি, শ্রদ্ধা করি এইজন্যে আমার অন্তরের কামনা, তাঁর সাহিত্যতীর্থপথ সুগম হোক, সার্থক হোক। শকুন্তলায় পড়েছি, 'ওদকান্তাৎ স্নিগ্ধো হত্তুগন্তব্যঃ'— স্নিগ্ধজনকে জল পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিতে হয়। পথিক যে-পর্যন্ত

ছায়া ও জল না পেয়েছেন সেই পর্যন্তই বন্ধু সহায়তার অপেক্ষা থাকে— তার পরে আর ভাবনা থাকে না। সুরেশের যাত্রাপথে ফলবান তরুচ্ছায়া ও উচ্ছ্বসিত উৎস-ধারা দেখা দিয়েছে, এখন তিনি তাঁর সফলতার সম্বল সহজে আহরণ ক'রে চলবেন, কেবল তাঁর পথিক কবিতাকে প্রাচীন কবিবাক্যে এই আশীর্বাদ করি

রম্যান্তরঃ কমলিনী হরিতৈঃ সরোভি
শ্ছায়া দ্রুমৈর্নিয়মিতার্ক ময়ূখ তাপঃ।
ভূয়াৎ কুশেশয়রজো মৃদু রেণুরম্যাঃ
শান্তানুকূল পবনশ্চ শিবশ্চ পন্থাঃ।।[১]

শান্তিনিকেতন,
২৮শে মাঘ ১৩৩৪

২৫

উদিতা : মৈত্রেয়ী দেবী

কল্যাণীয়া মৈত্রেয়ীর বয়স বেশি নয়। কিন্তু তার লেখা কবিতা প্রথম যখন আমার গোচরে আসে, তখন তার বয়স, ছন্দের পথে লেখনী চালনার পক্ষে আরো অল্প ছিল। পরে মনে হল বয়সের চেয়ে লেখা অনেকটা এগিয়ে চলেছে। স্বাভাবিক শক্তির আভাস পাওয়া গেল। কবিতাগুলি বয়সের হিসাবে নিপুণ তবু সাহিত্যের নিত্য আদর্শের পক্ষে কিছু কাঁচা ছিল।[২] আমার মতে সেটা দোষের নয়, কাঁচা থাকাটাই স্বাস্থ্যের লক্ষণ। যতদিন বাড়বার বয়স থাকে ততদিন হাড় থাকে নরম ; সেটা কঠিন হলে বাড় বন্ধ হয়ে যায়। তেমনি লেখবার শক্তি থাকলেও অল্পবয়সের লেখার মধ্যে ভাবী বিকাশের যথেষ্ট অপেক্ষা থাকা আশ্বাসের বিষয়।

আমাকে তার খাতা দেখতে দেওয়া হয়েছিল। আমি খুব বেশি স্কুল-মাস্টারি করি নি। মাঝে মাঝে ছন্দে মিলে শৈথিল্য ছিল, সেইগুলি নিয়ে বালিকাকে কিছু উপদেশ দিয়েছিলুম। তখনই লক্ষ্য করেছিলুম মৈত্রেয়ীর মনের মধ্যে প্রকাশযোগ্য ভাবগুলি মুকুলিত হয়ে উঠছে। সেটা বিস্ময়ের বিষয়।

---

১. অর্থাৎ, এঁর পথ মাঝে মাঝে কমলদল হরিৎ সরোবরে মনোরম হোক ; গাছের নিবিড় ছায়ায় (পথে) সূর্যের উত্তাপ সংযত হোক ; পদ্মের পরাগে (পথের) ধূলি কোমল হোক ; শান্ত ও অনুকূল বাতাসে পথ শিবময় হোক।

২. ১৯২৬, তখন মৈত্রেয়ীর বয়স বারো বৎসর।

অল্প বয়সে মন বাইরের জিনিস ছুঁয়ে ছুঁয়ে বেড়াতেই ব্যস্ত থাকে। তখন খাপ-ছাড়া অভিজ্ঞতাগুলিকে মিলিয়ে নিয়ে রূপ দান করবার মতো ধ্যান শক্তি থাকে না। কারো কারো যদি-বা থাকে কিন্তু দৈবাৎ সেটাকে আবার বাইরেকার উপকরণে প্রতিফলিত করবার প্রবর্তনা দেখা যায়।

মৈত্রেয়ীর সেই প্রথম খাতা দেখবার পরে মাঝে মাঝে সাময়িক পত্রে তার কবিতা আমার চোখে পড়ল। তার মধ্যে যে পরিণতির চেহারা দেখেছি সেটা আমি প্রত্যাশা করি নি। এর পরে আরো দুই-একবার তার খাতা আমার হাতে এসেছে। কিন্তু এখন থেকে তার লেখা নিয়ে তাকে অধিক কিছু বলি নি। দেখলুম লেখিকার মন কাব্যের পথ চলতে শুরু করেছে, চলতে চলতে সে আপনার বিশেষ পথ আপনিই তৈরি করতে পারবে এই আমার বিশ্বাস। বাইরে থেকে তার সমালোচনা করা যেন সদ্য উন্মুখ অঙ্কুরকে ক্ষণে ক্ষণে তার শিকড় নাড়া দিয়ে উৎপাত করা। যা প্রাণের নিয়মে আপনি বেড়ে উঠছে তাকে বাইরে থেকে তাড়া দেওয়া ভুল।

কিছুকাল থেকে তার লেখায় একটি যে লক্ষণ দেখা দিয়েছে সেটা তার এ বয়সের পক্ষে একেবারেই অনপেক্ষিত। ভাবের ছবি মনে অল্প বয়সেও রচিত হতে পারে কিন্তু তত্ত্বের গাঁথুনি তো তেমন সহজ নয়। কাব্যের মধ্যে তত্ত্বের উঁকিঝুঁকি চলে, কিন্তু তাকে ডাক দিয়ে ভিতরে নিয়ে আসা প্রায় দেখতে পাওয়া যায় না। যদি-বা এমন ঘটে, মৈত্রেয়ীর বয়সে সেটা আশ্চর্যের কথা। জ্ঞানের পথে যে উপলব্ধি সে তো পরিণত বয়সের অপেক্ষা রাখে বলেই জানি। শুধু চিন্তা করা নয়, চিন্তা করতে রস না পেলে সেটা কাব্যের বিষয় হতে পারে না। মৈত্রেয়ীর কাব্যে ক্রমে তত্ত্বের আনন্দই যদি প্রধান হয়ে ওঠে তবে এ সম্বন্ধে তার রচনার অনন্যপূর্বতা বঙ্গ সাহিত্যে একটি বিশেষ স্থান নিতে পারবে।

শান্তিনিকেতন
২৬ নভেম্বর ১৯২৯

সংযোজন

পূর্বেই বলেছি রচনার প্রথম অবস্থায় বাইরের দৃষ্টি বাইরের নিন্দা প্রশংসা থেকে তাকে রক্ষা করা রচয়িতার মনের পক্ষে স্বাস্থ্যকর বলে বিশ্বাস করি। যখন কালক্রমে রচনার স্বকীয় সহজ ধারায় লেখকের চিত্ত নিঃসংশয়ে প্রবৃত্ত হয় তার পরে তার উপর নিজের চিন্তা ও পরের চিন্তার আঘাত তাকে আর বিক্ষিপ্ত করতে পারে না। মৈত্রেয়ীর কাব্যগুলিকে এখনই সাহিত্যের প্রকাশ্য সভায় ভিড়ের মধ্যে উপস্থিত করা ভালো হল

কি না জানি না। এ কথা আমি তার কাব্যের দিক থেকে বলছি নে, তার নিজের দিক থেকে বলছি।

আমার মুখে এমন কথা সংগত হল কি না এ তর্ক উঠতে পারে ; আমিও কাঁচা লেখা কাঁচা বয়সেই প্রকাশ করেছি ; প্রকৃতি কাঁচা ফলকে শক্ত করে রাখেন, কৌতূহলের চক্ষু তাকে ভেদ করতে বাধা পায়। কিন্তু সাহিত্যের আমদরবারের দিনে ছাপাখানার দৌত্যগুণে আজকাল কোনো লেখাকেই উপযুক্ত লগ্নের জন্য অপেক্ষা করতে হয় না। ভিড়ের মধ্যে ঠেলাঠেলি করে ঢুকে পড়া চলে, পরিচয়ের টিকিট দেখাতে হয় না। সেকালে বাংলা সাহিত্যের আসরে এত ভিড় ছিল না জায়গা ছিল ফাঁকা, কিন্তু তবু বাইরে নিষেধ না থাকলেও ভিতরে কালের একটা পাহারা থাকে। সেই মহাকালের নন্দী নিশ্চয়ই তর্জনী তুলেছিল।

ভাগ্যক্রমে তখনকার বিচারকদের কাছে আমি প্রশ্রয় পাই নি। আমার লেখার অস্পষ্টতা অপরিণতি প্রভৃতি নানা দোষ নিয়ে আমাকে লাস্ট বেঞ্চিতে বসিয়ে রাখা হয়েছিল। বিচারে ভুল হয়েছিল আমি এ কথা বলি নে। লাস্ট বেঞ্চিতে অবহেলা-রচিত অবকাশের অভাব থাকে না। সেইখানে বসে বসে আমি আপন লেখার ছাঁদ আপনি বানিয়েছি। কিন্তু মনে আজও অনুশোচনা আছে যে, যার নেপথ্য বিধান সারা হয় নি তাকে রঙ্গমঞ্চের হাজার আলোর সামনে দাঁড় করানো হল, ভালো হল না। সে আজ শুভ্র কাগজের উপরে কালির নৃত্যে যোগ দিয়েছে, তাকে থামানো যায় না, আড়াল করা অসম্ভব।

লোকের সামনে বসে লেখাও চলে লোককে যদি একেবারে ভুলে থাকবার ক্ষমতা থাকে। আমাদের বাল্যকালে সেটা দুরূহ ছিল না। তখন বিচারকদের রায় বেরোত উদার খাগড়া কলমের মুখে। তার রক্তপাত করবার মতো ধার ছিল না। আর রচনার ত্রুটি যে অক্ষমতার ত্রুটি, সেটা যে নৈতিক অপরাধ নয়, এই মত বোধ করি তখনকার ভদ্র সমাজে প্রচলিত ছিল। মূল্য বিচার দেওয়ানি আদালতে, আর অপরাধ বিচার ফৌজদারিতে। একটাতে সম্পত্তিগত অধিকার নির্ণয় আর-একটাতে ব্যক্তিগত চরিত্র নির্ণয়। সাহিত্যে আজকাল সিভিল কোড প্রায় ব্যবহারে আসে না, সমস্তই দেখি পুলিস কেস্। যাদের হাড় পাকা, লাল পাগড়ি কনিষ্ঠবলদের অপমান তারাই সইতে পারে। সাহিত্য রচনায় যারা প্রথম প্রবৃত্ত, যাদের বয়স নিতান্তই অল্প সেই সুকুমার জীবদের কি এমন ক্ষেত্রে উপস্থিত করা ভালো যেখানে অনুচিত অসম্মান করবার রূঢ় প্রবৃত্তি নিঃসংকোচ, এমন-কি, সাধারণের রুচিকর? যেখানে নন্-ভায়োলেন্সের নীতি উপহসিত? আজকের দিনের এই নৃশংস সাহিত্য-বিচারের এলাকায় আমি যদি রচনায় প্রবৃত্ত হতুম তা হলে সে রচনার আঘাতে মৃত্যু হতে বিলম্ব হত না এই আমার বিশ্বাস। ষোলো বছর বয়সের অভিমন্যুকে যুধিষ্ঠির সপ্তরথীর ব্যূহের মধ্যে পাঠিয়েছিলেন, এটি

অবিবেচনার কাজ হয়েছিল তা সপ্রমাণ হয়েছে। আমার সেই কথাই মনে পড়ছে যখন দেখছি বাণ-বর্ষণ-মুখর সাহিত্য-ক্ষেত্রে বালিকার রচনাকে এগিয়ে দেওয়া হচ্ছে, সে রচনায় শক্তির লক্ষণ যতই থাক্।

২৬ নভেম্বর ১৯২৯
শান্তিনিকেতন

২৬

বাতায়ন : উমা দেবী

তোমার "ছায়াছবি"গুলি আমার বিশেষ ভালো লেগেছে, তা'র কারণ ওর মধ্যে একটা বিশেষত্ব আছে। ভাবুকতার কবিতা অনেক সময় রঙিন মেঘের মতো; তা'র মধ্যে যদি-বা স্বাতন্ত্র্য দেখা দেয়, সে সুনির্দিষ্ট নয়; বাষ্পরেখায় রূপ যদি-বা আঁকা পড়ে, মনে হ'তে থাকে এর ধ্রুবত্ব নেই। কিন্তু যে-জিনিসকে তুমি হৃদয় দিয়ে দেখেছ, এই ছোটো ছোটো কবিতায় তাকেই সহজ ক'রে দেখিয়েছ; এই মনে ক'রে তৃপ্তি হয় যে, এগুলি প্রত্যক্ষ বিষয়। হৃদয়ের উড়ো হাওয়ায় যে-সকল বেদনার খেয়াল ভেসে বেড়ায়, তা'কে পাঠকের মনে অনুভাবিত করা, সে আর-এক জিনিস। সেখানে প্রায় দেখা যায় ঠিক সুরটি লাগে না, অত্যুক্তি এসে পড়ে, সর্বদা কাব্যে ব্যবহৃত বাক্য ও বাক্যরীতি জমাট বেঁধে ভাবের আন্তরিক লঘুতা ঢাকা দেয়, একরকম প্রথাসম্মত চলনসই জিনিস দাঁড়িয়ে যায়, তা'র চেয়ে বেশি কিছু নয়। কিন্তু এই "ছায়াছবি"'র বিষয়গুলি তোমার বানানো পদার্থ নয়, এগুলি তোমার আপন-দেখা বিষয়, তোমার দৃষ্টির ঔৎসুক্য ও প্রকাশের সরল নৈপুণ্য দিয়ে এর প্রত্যেকটিকে বিশিষ্টতা দিয়েছ। তোমার ঘরের কাছে মজুররা কাজ করে, তাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার উপর কারো চোখ পড়ে না; তোমার দৃষ্টিতে তা'রা উপেক্ষিত হয় নি, তোমার রচনায় তা'রা সমাদর পেয়েছে— এইটি আমার ভালো লাগল।

"ছায়াছবি" নামটি সংগত হয়েছে ব'লে মনে হয় না। এই লেখাগুলিতে ছায়ার অস্পষ্টতা নেই।

মনে আশা রইল। তোমার বাতায়নের ঠিক সম্মুখবর্তী দৃশ্যের বাইরেও তোমার দৃষ্টি প্রসারিত হবে, এবং তোমার অভিজ্ঞতা-ক্ষেত্রের সকল দিক থেকেই প্রত্যক্ষ-দেখা বিচিত্র ছবিগুলিকে সংগ্রহ ক'রে এমনি সহজ ও সুস্পষ্ট ভাষায় তোমার কবিতায় তাদের সজ্জিত ক'রে তুলবে।

২৭

ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা : ক্ষিতিমোহন সেন

ভারতবর্ষের যে-সব ইতিহাস আমরা পড়ি সে তার বাইরের ইতিহাস। সেই ইতিহাসে বিদেশীর অংশই বেশি। তারা রাজ্যশাসন করেছে, যুদ্ধবিগ্রহ করেছে, আমরা সেই বাইরের চাপ স্বীকার ক'রে নিয়েছি— মাঝে মাঝে মাথা নাড়া দিয়ে সেটা ঠেলে ফেলবার চেষ্টা করেছি, মাঝে মাঝে চেষ্টা সফল হয়েছে। মোটের উপর এই ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের অকৃতার্থতাই অধ্যায়ের পর অধ্যায়ে আমাদের চোখে পড়তে থাকে।

এ কথা মানতে হবে যে রাষ্ট্রিক সাধনা ভারতের সাধনা নয়। একদা বড়ো বড়ো রাজা ও সম্রাট আমাদের দেশে দেখা দিয়েছেন, কিন্তু তাঁদের মহিমা তাঁদের মধ্যেই স্বতন্ত্র। দেশের সর্বসাধারণ সেই মহিমাকে সৃষ্টি, বহন বা ভোগ করে না। ব্যক্তিবিশেষের শক্তির মধ্যেই তার উদ্ভব এবং বিলয়।

কিন্তু ভারতের একটি স্বকীয় সাধনা আছে; সেইটি তার অন্তরের জিনিস। সকল-প্রকার রাষ্ট্রিক দশা-বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে তার ধারা প্রবাহিত হয়েছে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই ধারা শাস্ত্রীয় সম্মতির তটবন্ধনের দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়, এর মধ্যে পাণ্ডিত্যের প্রভাব যদি থাকে তো সে অতি অল্প। বস্তুত এই সাধনা অনেকটা পরিমাণে অশাস্ত্রীয়, এবং সমাজশাসনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। এর উৎস জনসাধারণের অন্তরতম হৃদয়ের মধ্যে, তা সহজে উৎসারিত হয়েছে, বিধি-নিষেধের পাথরের বাধা ভেদ ক'রে। যাঁদের চিত্তক্ষেত্রে এই প্রস্রবণের প্রকাশ, তাঁরা প্রায় সকলেই সামান্য শ্রেণীর লোক, তাঁরা যা পেয়েছেন ও প্রকাশ করেছেন তা "ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন"।

ভারতের এই আন্তরিক সাধনার ধারাবাহিক রূপ যদি আমরা স্পষ্ট ক'রে দেখতে পেতুম তা হলে ভারতের প্রাণবান ইতিহাস যে কোন্‌খানে তা আমাদের গোচর হতে পারত। তা হলে জানা যেত ভারতবর্ষ যুগে যুগে কী লক্ষ্য ক'রে চলেছে, এবং সেই লক্ষ্য সাধনে কী পরিমাণ তার সিদ্ধি। সুহৃদ্‌বর ক্ষিতিমোহন সেন তাঁর এই গ্রন্থে ভারতবর্ষের সুদীর্ঘকালের সেই চিত্তপ্রবাহের পথটিকে তার ভিন্ন ভিন্ন শাখায় প্রশাখায় অনুসরণ ক'রে এসেছেন। আমরা দেখতে পেয়েছি এই প্রবাহটি গভীর রূপে সত্য এবং একান্তভাবে ভারতবর্ষের স্বকীয়। ভারতের জনসাধারণের মধ্যে সাধনার যে স্বাভাবিক শক্তি অন্তর্নিহিত রয়েছে ক্ষিতিমোহনের এই রচনায় তাকে আবিষ্কার করা গেল। এই প্রকাশের অভিব্যক্তির যে ধারা অন্তর-বাহিরের বাধার ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। এই গ্রন্থের সীমারেখায় তার একটা রূপচিত্র অঙ্কিত হয়েছে। এখন তার উদ্ভাবনের তার প্রাগ্রসর যাত্রার সম্পূর্ণ একটি ইতিহাস পাবার অপেক্ষা রয়ে গেল,

না পেলে ভারতবর্ষের ধ্রুব স্বরূপটির পরিচয় ভারতবর্ষের লোকের কাছে অসম্পূর্ণ, এমন-কি ভ্রমসংকুল হয়ে থেকে যাবে।

শান্তিনিকেতন
১২ পৌষ ১৩৩৬

২৮

কালিদাসের গল্প : রঘুনাথ মল্লিক

কোনো একজন আধুনিক বাঙালি কবি তাঁর কাব্যে লিখেছেন— "আমি যদি জন্ম নিতেম কালিদাসের কালে!" এই সঙ্গে কবির জানানো উচিত ছিল যে, তাঁর কালে তো জন্ম নেওয়া হয়েইছে। সাহিত্যের একটা প্রধান কাজই হচ্ছে এক শতাব্দীকে আর-এক শতাব্দীতে রওনা ক'রে দেওয়া। কালিদাসের কাল দূর তারার আলোর মতো অতীত যুগ থেকে নিঃসৃত হয়ে বর্তমান কালে এসে পৌঁচচ্ছে। একটুখানি বাধা আছে, সংস্কৃত ভাষার দূরবীন দিয়ে দেখতে হয়। এই বাধা কোনো কালে ঘুচবে না। সে-কালের সমস্ত রস ও রূপ নিয়ে তাকে স্পষ্ট ক'রে দেখতে হলে দৃষ্টিকে সংস্কৃত ভাষার মধ্যেই নিবিষ্ট করতে হবে। সকলের পক্ষে এটা সুলভ হয় না। তাই অভাবপক্ষে বাংলা চশমা কাজে লাগাতে হবে। "কালিদাসের গল্প" বইটিতে সেই কাজ করা হল। তাতে ছবির সীমান্ত-রেখাটি দেখা দিয়েছে— রঙ বাদ প'ড়ল। যাই হোক পরিচয়ের সূচনা হল, সে কম কথা নয়। অনেকে বাংলা ছন্দের ছাঁচে কালিদাসের কাব্য ঢালাই ক'রে তার সমগ্র মূর্তি দেখবার চেষ্টা করেন। এ কাজে সিদ্ধিলাভ করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। সংস্কৃত কাব্যের প্রতিরূপ ছন্দোযোগে বাংলা কাব্যে উদ্ধার করতে পারে এমন মায়ালেখনী কার আছে! এ স্থলে সবিনয়ে গদ্য আশ্রয় করাই ভালো। "কালিদাসের গল্প" বইটিতে লেখক তার চেয়েও আরো বিনয় প্রকাশ ক'রেছেন, তিনি কেবল বিষয়টিমাত্র সাজিয়ে দিয়েছেন। আমরা বলি যথালাভ। সর্বনাশ সমুৎপন্নে অর্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ— কেন তার চেয়ে অনেক বেশি ত্যাগ করতে হলেও দোষের হয় না।

শান্তিনিকেতন
১৪ ভাদ্র ১৩৩৮

জাতীয় ভিত্তি : নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

মানুষের ধর্মই এই যে, সে অনেকে মিলে একত্র বাস করতে চায়। একলা মানুষ কখনোই পূর্ণ মানুষ হতে পারে না ; অনেকের যোগে তবেই সে নিজকে ষোলো আনা পেয়ে থাকে।

দল বেঁধে থাকা, দল বেঁধে কাজ করা মানুষের ধর্ম বলেই সেই ধর্ম সম্পূর্ণভাবে পালন করাতেই মানুষের কল্যাণ, তার উন্নতি। লোভ, ক্রোধ, মোহ প্রভৃতিকে মানুষ রিপু অর্থাৎ শত্রু বলে কেন? কেননা এই সমস্ত প্রবৃত্তি ব্যক্তিবিশেষ বা সম্প্রদায়বিশেষের মনকে দখল করে নিয়ে মানুষের জোট বাঁধার সত্যকে আঘাত করে। যার লোভ প্রবল, সে আপনার নিজের লাভকেই বড়ো করে দেখে ; এই অংশে সে অন্য সকলকে খাটো করে দেখে ; তখন অন্যের ক্ষতি করা অন্যকে দুঃখ দেওয়া, তার পক্ষে সহজ হয়। এইরকম যে-সকল প্রবৃত্তির মোহে আমরা অন্যের কথা ভুলে যাই, তারা যে, কেবল অন্যের পক্ষেই তা নয়, তারা আমাদের নিজেরই রিপু, কেননা সকলের যোগে মানুষ নিজের যে পূর্ণতা পায়, এই প্রবৃত্তি তারই বিঘ্ন করে।

স্বধর্মের আকর্ষণে মানুষ এই যে অনেকে এক হয়ে বাস করে, তারই গুণে প্রত্যেক মানুষ বহু মানুষের শক্তির ফল লাভ করে। চার পয়সা খরচ করে কোনো মানুষ একলা নিজের শক্তিতে একখানা সামান্য চিঠি চাটগাঁ থেকে কন্যাকুমারীতে কখনোই পাঠাতে পারত না ;— পোস্ট অফিস জিনিসটি বহু মানুষের সংযোগ সাধনের ফল ;— সেই ফল এতই বড়ো যে তাতে চিঠি পাঠানো সম্বন্ধে দরিদ্রকেও লক্ষপতির দুর্লভ সুবিধা দিয়েছে। এই একমাত্র পোস্ট অফিসের যোগে ধর্মে, অর্থে, শিক্ষায় পৃথিবীর সকল মানুষের কী প্রভূত উপকার করছে, হিসাব করে তার সীমা পাওয়া যায় না। ধর্মসাধনা, জ্ঞানসাধনা সম্বন্ধে প্রত্যেক সমাজেই মানুষের সম্মিলিত চেষ্টার কত যে অনুষ্ঠান চলছে, তা বিশেষ করে বলবার কোনো দরকার নেই, সকলেরই তা জানা আছে।

তা হলেই দেখা যাচ্ছে যে, যে-সকল ক্ষেত্রে সমাজের সকলে মিলে প্রত্যেকের হিতসাধনের সুযোগ আছে, সেইখানেই সকলের এবং প্রত্যেকের কল্যাণ। যেখানেই অজ্ঞান বা অন্যায় -বশত সেই সুযোগে কোনো বাধা ঘটে, সেইখানেই যত অমঙ্গল।

পৃথিবীর প্রায় সকল সমাজেই একটা জায়গায় এই বাধা ঘটে। সে হচ্ছে অর্থোপার্জনের কাজে। এইখানে মানুষের লোভ তার সামাজিক শুভবুদ্ধিকে ছাড়িয়ে চলে যায়। ধনে বা শক্তিতে অন্যের চেয়ে আমি বড়ো হব, এই কথা যেখানেই মানুষ

বলেছে সেইখানেই মানুষ নিজেকে আঘাত করেছে; কেননা পূর্বেই বলেছি কোনো মানুষই একলা নিজেতে নিজে সম্পূর্ণ নয়। সত্যকে যে আঘাত করা হয়েছে তার প্রমাণ এই যে, অর্থ নিয়ে, প্রতাপ নিয়ে মানুষে মানুষে যত লড়াই, যত প্রবঞ্চনা।

অর্থ-উপার্জন শক্তি-উপার্জন যদি সমাজভুক্ত লোকের পরস্পরের যোগে হতে পারত তা হলে সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিই সকল ব্যক্তির সম্মিলিত প্রয়াসের প্রভূত ফল সহজ নিয়মে লাভ করতে পারত। ধনীর উপরে বরাবর এই একটি ধর্ম উপদেশ চলে আসছে যে, তুমি দান করবে। তার মানেই ধর্ম এবং বিদ্যা প্রভৃতির ন্যায় ধনেও কল্যাণের দাবি খাটে— না খাটাই অধর্ম। কল্যাণের দাবি হচ্ছে স্বার্থের দাবির বিপরীত এবং স্বার্থের দাবির চেয়ে তা উপরের জিনিস। দানের যে উপদেশ আছে তাতে ধনীর স্বার্থকে সাধারণের কল্যাণের সঙ্গে জড়িত করবার চেষ্টা করা হয়েছে বটে, কিন্তু কল্যাণকে স্বার্থের অনুবর্তী করা হয়েছে, তাকে পুরোবর্তী করা হয় নি। সেইজন্য দানের দ্বারা দারিদ্র্য দূর না হয়ে বরঞ্চ তা পাকা হয়ে ওঠে।

ধর্মের উপদেশ ব্যর্থ হয়েছে বলেই, সকল সমাজেই ধন ও দৈন্যের দ্বন্দ্ব একান্ত হয়ে রয়েছে বলেই, যাঁরা এই কল্যাণকর ভেদকে সমাজ থেকে দূর করতে চান, তাঁদের অনেকেই জবরদস্তির দ্বারা লক্ষ্য সাধন করতে চান। তাঁরা দস্যুবৃত্তি ক'রে, রক্তপাত ক'রে, ধনীর ধন অপহরণ ক'রে সমাজে আর্থিক সাম্য স্থাপন করতে চেষ্টা করেন। এ সমস্ত চেষ্টা বর্তমান যুগে পশ্চিম মহাদেশে প্রায় দেখতে পাওয়া যায়। তার কারণ হচ্ছে, পশ্চিমের মানুষের গায়ের জোরটা বেশি, সেইজন্যেই গায়ের জোরের উপর তার আস্থা বেশি— কল্যাণ সাধনেও সে গায়ের জোর না খাটিয়ে থাকতে পারে না। তার ফলে, অর্থও নষ্ট হয়, ধর্মও নষ্ট হয়। রাশিয়ায় সোভিয়েট রাষ্ট্রনীতিতে তার দৃষ্টান্ত দেখতে পাই।

অতএব ধর্মের দোহাই বা গায়ের জোরের দোহাই, এই দুয়ের কোনোটাই মানব সমাজের দারিদ্র্য মোচনের পন্থা নয়। মানুষকে দেখানো চাই যে, বড়ো মূলধনের সাহায্যে অর্থসম্ভোগকে ব্যক্তিগত-স্বার্থের সীমার মধ্যে একান্ত আটকে রাখা সম্ভব হবে না। আজকের দিনে যদি কোনো ক্রোরপতি উটের ডাক বসিয়ে কেবল মাত্র তাঁর নিজের চিঠি চালাচালির বন্দোবস্ত করতে চান, তা হলে সামান্য চাষার চেয়েও তাঁকে ঠকতে হবে— অথচ পূর্বকালে এমন একদিন ছিল যখন ধনীরই ছিল উটের ডাক, আর চাষীর কোনো ডাক ছিল না। সেদিন ধনীকে তাঁর গুরুঠাকুর এসে যদি ধর্ম উপদেশ দিতেন, তবে হয়তো তিনি তাঁর নিজের চিঠিপত্রের সঙ্গে গ্রামের আরো কয়েকজনের চিঠিপত্রের ভারবহন করতে পারতেন, কিন্তু তাতে করে দেশে পত্র-চালনার অভাব প্রকৃতভাবে দূর হতে পারত না। সাধারণের দারিদ্র্য হরণের শক্তি ধনীর ধনে নেই।

সে আছে সাধারণের শক্তির মধ্যেই। এই কথাটা জানা চাই, এবং তার দৃষ্টান্ত সকলের কাছে সুস্পষ্ট হওয়া চাই। কৃত্রিম উপায়ে ধন বণ্টন করে কোনো লাভ নেই, সত্য উপায়ে ধন উৎপাদন করা চাই। জনসাধারণে যদি নিজের অর্জনশক্তিকে একত্র মেলাবার উদ্যোগ করে, তবে এই কথাটা স্পষ্ট দেখিয়ে দিতে পারে যে, যে-মূলধনের মূল সকলের মধ্যে, তার মূল্য ব্যক্তিবিশেষের মূলধনের চেয়ে অসীমগুণে বেশি। এইটি দেখতে পারলেই তবে মূলধনকে নিরস্ত্র করা যায়, অস্ত্রের জোরে করা যায় না। মানুষের মনে ধন ভোগ করার ইচ্ছা আছে— সেই ইচ্ছাকে কৃত্রিম উপায়ে দলন ক'রে মেরে ফেলা যায় না। সেই ইচ্ছাকে বিরাটভাবে সার্থক করার দ্বারাই তাকে তার সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত করা যেতে পারে।

একদিন মানুষের ইতিহাসে একদিকে রাজশক্তি অন্যদিকে প্রজাশক্তি এই দুই শক্তির দ্বন্দ্ব [ছিল]। রাজার প্রতি ধর্ম উপদেশ ছিল যে, প্রজার মঙ্গল সাধনই তাঁর কর্তব্য। সে কথা কেউ-বা শুনতেন, কেই-বা আধাআধি শুনতেন, কেই-বা একেবারেই শুনতেন না। এমন অবস্থা এখনো পৃথিবীতে অনেক দেশে আছে। অধিকাংশ স্থলেই এই অবস্থায় রাজা নিজের সুখ সম্ভোগ, নিজের প্রতাপ বৃদ্ধিকেই মুখ্য করে' প্রজার মঙ্গল সাধনকে গৌণ করে থাকেন। এই রাজতন্ত্র উঠে গিয়ে আজ দেশে গণতন্ত্র বা ডিমক্রাসির প্রাদুর্ভাব হয়েছে। এই ডিমক্রাসির লক্ষ্য এই যে, প্রত্যেক প্রজার মধ্যে যে আত্মশাসনের ইচ্ছা ও শক্তি আছে তারই সমবায়ের দ্বারা রাষ্ট্রশাসন শক্তিকে অভিব্যক্ত করে তোলা। আমেরিকার যুক্তরাজ্য এই ডিমক্রাসির বড়াই করে থাকে।

কিন্তু যেখানে মূলধন ও মজুরির মধ্যে অত্যন্ত ভেদ আছে, সেখানে ডিমক্রাসি পদে পদে প্রতিহত হতে বাধ্য। কেননা সকল রকম প্রতাপের প্রধান বাহক হচ্ছে অর্থ। সেই অর্থ-অর্জনে যেখানে ভেদ আছে, সেখানে রাজপ্রতাপ সকল প্রজার মধ্যে সমানভাবে প্রবাহিত হতেই পারে না। তাই য়ুনাইটেড স্টেট্‌সে রাষ্ট্র-চালনার মধ্যে ধনের শাসনের পদে পদে পরিচয় পাওয়া যায়। টাকার জোরে সেখানে লোকমত তৈরি হয়, টাকার দৌরাত্ম্যে সেখানে ধনীর স্বার্থের সর্বপ্রকার প্রতিকূলতা দলিত হয় —এ'কে জনসাধারণের স্বায়ত্ত শাসন বলা চলে না।

এইজন্যে, যথেষ্ট পরিমাণ স্বাধীনতাকে সর্বসাধারণের সম্পদ করে তোলবার মূল উপায় হচ্ছে ধন অর্জনে সর্বসাধারণের শক্তিকে সম্মিলিত করা। তা হলে ধন টাকা আকারে কোনো একজনের বা এক সম্প্রদায়ের হাতে জমা হবে না, কিন্তু লক্ষপতি ক্রোরপতিরা আজ ধনের যে ফলভোগ করবার অধিকার পায়, সেই ফল সকলেই ভোগ করতে পারে। সমবায় প্রণালীতে অনেকে আপন শক্তিকে যখন ধনে পরিণত করতে শিখবে, তখনই সর্ব মানবের স্বাধীনতার ভিত্তি স্থাপিত হবে।

এই সমবায় প্রণালীতে ধন উৎপাদন করার আলোচনা ও পরীক্ষা আমাদের দেশে সম্প্রতি আরম্ভ হয়েছে। আমাদের দেশে এর প্রয়োজন অত্যন্ত বেশি। দারিদ্র্য

থেকে রক্ষা না পেলে আমরা সকল রকম যমদূতের হাতে মার খেতে থাকব। আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই ধন নিহিত হয়ে আছে, এই সহজ কথাটি বুঝলে এবং কাজে খাটালে তবেই আমরা দারিদ্র্য থেকে বাঁচব।

দেশের সমস্ত গ্রামকে নিজের সর্বপ্রকার প্রয়োজনসাধনক্ষম করে গড়ে তুলতে হবে। এজন্য কতকগুলি পল্লী নিয়ে এক-একটি মণ্ডলী স্থাপন করা দরকার; সেই মণ্ডলীর প্রধানগণ যদি গ্রামের সমস্ত কর্মের ও অভাব মোচনের ব্যবস্থা করে' মণ্ডলীকে নিজের মধ্যে পর্যন্ত করে' তুলতে পারে, তবেই স্বায়ত্ত শাসনের চর্চা দেশের সর্বত্র সত্য হয়ে উঠবে। নিজের পাঠশালা, শিল্পশিক্ষালয়, ধর্মগোলা, সমবেত পণ্যভাণ্ডার ও ব্যাঙ্ক স্থাপনের জন্য পল্লীবাসীদের শিক্ষা, সাহায্য ও উৎসাহ দান করতে হবে। এমনি করে দেশের পল্লীগুলি আত্মনির্ভরশীল ও ব্যূহবদ্ধ হয়ে উঠলেই আমরা রক্ষা পাব। কীভাবে বিশিষ্ট পল্লীসমাজ গড়ে তুলতে হবে, এই হচ্ছে আমাদের প্রধান সমস্যা। যে-বইখানির ভূমিকা লিখছি, সেই বইয়ে এই সমস্যার কিছু আলোচনা করা হয়েছে।

৩০

হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমালা : দ্বিতীয় খণ্ড

[নরেন্দ্রনাথ লাহা ও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় -সম্পাদিত]

বালক-কালে মানিকতলায় রাজেন্দ্রলাল মিত্রের ঘরে আমরা যাওয়া-আসা ছিল। গাম্ভীর্যে বিনয়ে মিশ্রিত তাঁর বুদ্ধি-উজ্জ্বল সহজ আভিজাত্যে আমি মুগ্ধ ছিলুম। তাঁর কাছে নিজের জোরে প্রশ্রয়দাবি করি নি, তিনি স্নেহ ক'রে আমাকে প্রশ্রয় দিয়েছিলেন। কথা প্রসঙ্গে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের নাম সর্বপ্রথমে আমি তাঁরই কাছে শুনেছিলেম। অনুভব করেছিলেম শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ছিল। সেই সময়ে এশিয়াটির সোসাইটির কাজে অনেক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত তাঁর সহযোগিতা করতেন। তাঁদের মধ্যে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়কে তিনি যে বিশেষভাবে আদর করেছিলেন পরেও তার প্রমাণ দেখেছি। নেপালি বৌদ্ধসাহিত্য গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন, I feel deeply obliged to him for the timely aid he rendered me, and tender him my cordial acknowledgements for it. His thorough mastery of the Sanskrit language and knowledge of European literature fully qualified him for the task; and he did his work to my full satisfaction.

এখানে রাজেন্দ্রলালের উল্লেখ করবার কারণ এই যে, আমার মনে এই দুইজনের চরিত-চিত্র মিলিত হয়ে আছে। উভয়েরই অনাবিল বুদ্ধির উজ্জ্বলতা একই শ্রেণীর। উভয়েরই পাণ্ডিত্যের সঙ্গে ছিল পারদর্শিতা,— যে-কোনো বিষয়ই তাঁদের আলোচ্য ছিল, তার জটিল গ্রন্থিগুলি অনায়াসেই মোচন ক'রে দিতেন। জ্ঞানের গভীর ব্যাপকতার সঙ্গে বিচারশক্তির স্বাভাবিক তীক্ষ্ণতার যোগে এটা সম্ভবপর হয়েছে। তাঁদের বিদ্যায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাধন-প্রণালী সম্মিলিত হয়ে উৎকর্ষলাভ করেছিল। অনেক পণ্ডিত আছেন, তাঁরা কেবল সংগ্রহ করতেই জানেন, কিন্তু আয়ত্ত করতে পারেন না; তারা খনি থেকে তোলা ধাতুপিণ্ডটার সোনা এবং খাদ অংশটাকে পৃথক করতে শেখেন নি বলেই, উভয়কেই সমান মূল্য দিয়ে কেবল বোঝা ভারী করেন। হরপ্রসাদ যে যুগে জ্ঞানের তপস্যায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন সে যুগ বৈজ্ঞানিক বিচারবুদ্ধির প্রভাবে সংস্কারমুক্ত জ্ঞানের উপাদানগুলি শোধন ক'রে নিতে শিখেছিল। তাই স্থূল পাণ্ডিত্য নিয়ে বাঁধা মত আবৃত্তি করা তাঁর পক্ষে কোনোদিন সম্ভবপর ছিল না। বুদ্ধি আছে কিন্তু সাধনা নেই, এইটেই আমাদের দেশে সাধারণত দেখতে পাই— অধিকাংশ স্থলেই আমরা কম শিক্ষায় বেশি মার্কা পাবার অভিলাষী। কিন্তু হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ছিলেন সাধকের দলে, এবং তাঁর ছিল দর্শনশক্তি।

যে-কোনো বিষয় শাস্ত্রী মহাশয় হাতে নিয়েছেন, তাকে সুস্পষ্ট ক'রে দেখেছেন ও সুস্পষ্ট ক'রে দেখিয়েছেন। তাঁর রচনায় খাঁটি বাংলা যেমন স্বচ্ছ ও সরল এমন তো আর কোথাও দেখা যায় না। বিদ্যার সংগ্রহ ব্যাপার অধ্যবসায়ের দ্বারা হয়, কিন্তু তাঁকে নিজের ও অন্যের মনে সহজ ক'রে তোলা ধী-শক্তির কাজ। এই জিনিসটি বড়ো বিরল। তবু, জ্ঞানের বিষয় প্রভূত পরিমাণে সংগ্রহ করার যে পাণ্ডিত্য তার জন্যেও দৃঢ় নিষ্ঠার প্রয়োজন, আমাদের আধুনিক শিক্ষাবিধির গুণে সেই নিষ্ঠার চর্চাও শিথিল। ধ্বনি দ্বিগুণিত করার একরকম যন্ত্র আজকাল বেরিয়েছে, তাতে স্বাভাবিক গলায় জোর না থাকলেও আওয়াজে আসর ভরিয়ে দেওয়া যায়। সেই রকম উপায়েই অল্প জানাকে তুমুল ক'রে ঘোষণা করা এখন সহজে হয়েছে। তাই বিদ্যার সাধনা হাল্‌কা হয়ে উঠল, বুদ্ধির তপস্যাও ক্ষীণবল, যাকে বলে মনীষা, মনের যেটা চরিত্রবল, সেইটের অভাব ঘটেছে।

আমাদের সৌভাগ্যক্রমে সাহিত্য-পরিষদে হরপ্রসাদ অনেকদিন ধরে আপন বহুদর্শী শক্তির প্রভাব প্রয়োগ করবার উপযুক্ত ক্ষেত্র পেয়েছিলেন। রাজেন্দ্রলালের সহযোগিতায় এশিয়াটিক সোসাইটির বিদ্যাভাণ্ডারে নিজের বংশগত পাণ্ডিত্যের অধিকার নিয়ে তরুণ বয়সে তিনি যে অক্লান্ত তপস্যা করেছিলেন, সাহিত্য-পরিষদকে তারই পরিণত ফল দিয়ে এতকাল সতেজ ক'রে রেখেছিলেন। যাঁদের কাছ থেকে দুর্লভদান আমরা পেয়ে থাকি, কোনো মতে মনে করতে পারি নে যে, বিধাতার দাক্ষিণ্যবাহী

তাঁদের বাহুকে মৃত্যু কোনোদিনই নিশ্চেষ্ট করতে পারে। সেইজন্য যে বয়সেই তাঁদের মৃত্যু হোক, দেশ অকাল মৃত্যুর শোক পায়, তার কারণ আলোক-নির্বাণের মুহূর্তে পরবর্তীদের মধ্যে তাঁদের জীবনের অনুবৃত্তি দেখতে পাওয়া যায় না। তবু বেদনার মধ্যেও মনে আশা রাখতে হবে যে, আজ যার স্থান শূন্য, একদা যে আসন তিনি অধিকার করেছিলেন সেই আসনেরই মধ্যে শক্তি সঞ্চার ক'রে গেছেন এবং অতীত কালকে যিনি ধন্য করেছেন ভাবী কালকেও তিনি অলক্ষ্যভাবে চরিতার্থ করবেন।

শাস্ত্রী মহাশয়ের পঞ্চশপ্ততিতমবর্ষ উপলক্ষে বিশিষ্ট লেখকগণের নিকট থেকে ভারত-তত্ত্ব বিষয়ে প্রবন্ধ সংগ্রহ ক'রে লেখমালা-গ্রন্থ প্রকাশের আয়োজন হয়। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ এই কাজের ভার গ্রহণ করেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের জীবিত কালে এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড বা'র হয়েছিল। তাঁর পরলোক গমনের প্রায় এক বৎসর পরে এখন এই দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হল। এই সাধু কার্যের দ্বারা পরিষদ যে আদর্শ দেখালেন, কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, তা সার্থক হোক।

৩১

জাতীয় সাহিত্য : আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

ভারতীয় সাহিত্যের ভবিষ্যৎ-নামক প্রবন্ধে আশুতোষ ভারতব্যাপী বিশাল ভূমিকায় তাঁর মনের সর্বোচ্চ কামনার ও সাধনার যে চিত্র এঁকেছেন তাতে এই কর্মবীরের ধ্যানের মহত্ত্ব আমি সুস্পষ্টরূপে অনুভব করেছি। তাঁর বলিষ্ঠ প্রকৃতি শিক্ষানিকেতনে দুরূহ বাধার বিরুদ্ধে আপন সৃষ্টিশক্তির ক্ষেত্র অধিকার করেছিল। এইখানে তিনি সমস্ত ভারতের চিত্তমুক্তি ও জ্ঞানসম্পদের ভিত্তিস্থাপন করতে প্রবৃত্ত ছিলেন। তার অসামান্য কৃতিত্ব ও উদার কল্পনাশক্তি সমস্ত দেশের ভবিষ্যৎকে ধ্রুব আশ্রয় দেবার অভিপ্রায় সেই বিদ্যানিকেতনের প্রসারীকৃত ভিত্তির উপর স্থায়ী কীর্তি প্রতিষ্ঠার উদ্‌যোগ করেছিল। এই প্রবন্ধে সেই তাঁর মহতী ইচ্ছার সম্পূর্ণ স্বরূপটি দেখে সেই পরলোকগত মনস্বী পুরুষের কাছে শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

৩২

প্রিয় পুষ্পাঞ্জলি : প্রিয়নাথ সেন

মুখবন্ধ

প্রিয়নাথ সেনের সঙ্গে আমার নিকট সম্বন্ধ ছিল। নিজের কাছ থেকে দূরে বাহিরে স্থাপন করে তাঁর কথা সমালোচনা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তাঁর যে-সব কথা এই বইয়ে সংগ্রহ করা হয়েছে, তার অনেকগুলিই আমার রচনা নিয়ে। আমি জানি তার কারণটি কত স্বাভাবিক। বাংলা সাহিত্যে যখন আমি তরুণ লেখক, আমার লেখনী নূতন নূতন কাব্যরূপের সন্ধানে আপন পথ রচনায় প্রবৃত্ত, তখন তীব্র এবং নিরন্তর প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে তাকে চলতে হয়েছে। সেই সময়ে প্রিয়নাথ সেন অকৃত্রিম অনুরাগের সঙ্গে আমার সাহিত্যিক অধ্যবসায়কে নিত্যই অভিনন্দিত করেছেন। তিনি বয়সে এবং সাহিত্যের অভিজ্ঞতায় আমার চেয়ে অনেক প্রবীণ ছিলেন। নানা ভাষায় ছিল তাঁর অধিকার, নানা দেশের নানা শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের অবারিত আতিথ্যে তাঁর সাহিত্যরসসম্ভোগ প্রতিদিনই প্রচুরভাবে পরিতৃপ্ত হত। সেদিন আমার লেখা তাঁর নিত্য আলোচনার বিষয় ছিল। তাঁর সেই ঔৎসুক্য, আমার কাছে যে কত মূল্যবান ছিল সে কথা বলা বাহুল্য। তার পর অনেকদিন গেল কেটে, বাংলা সাহিত্যের অনেক পরিণতি ও পরিবর্তন ঘটল— পাঠকদের মানসিক আবহাওয়ারও অনেক বদল হয়েছে। বোধ করি আমার রচনাও সেদিনকার ঘাট পেরিয়ে আজ এসেছে অনেক দূরে। প্রিয়নাথ সেনের এই প্রবন্ধগুলিকে সেই দূরের থেকে আজ দেখছি। সেদিনকার অপেক্ষাকৃত নির্জন সাহিত্যসমাজে শুধু আমার নয়, সমস্ত দেশের কিশোর-বয়স্ক মনের বিকাশস্মৃতি এই বইয়ের মধ্যে উপলব্ধি করছি। বৎসর গণনা করলে খুব বেশিদিনের কথা হবে না, কিন্তু কালের বেগ সর্বত্রই হঠাৎ অত্যন্ত দ্রুত হয়ে উঠেছে, তাই অদূরবর্তী সামনের জিনিস পিছিয়ে পড়ছে দেখতে দেখতে, নিজেরই জীবিতকালের মধ্যে যুগান্তরের স্বাদ পাওয়া যাচ্ছে। বহুকালের বহুদেশের জ্ঞান ও ভাবের ভাণ্ডারে প্রিয়নাথ সেনের চিত্ত সমৃদ্ধি লাভ করেছিল, তবু তিনি যে-কালের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত, এখনকার পাঠকদের কাছে সে দূরবর্তী, সেই কালকে বঙ্কিমের যুগ বলা যেতে পারে। সেই বঙ্কিমের যুগ এবং তাহার অব্যবহিত পরবর্তী যুগারম্ভকালীন বৈদগ্ধ্যের আদর্শ এই বই থেকে পাওয়া যাবে এই আমার বিশ্বাস।

শান্তিনিকেতন

২৯ আষাঢ় ১৩৪০

৩৩

বঙ্গবীণা : ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় ও চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

যখন কবি য়েট্‌স্‌ আমার গীতাঞ্জলির কবিতাগুলি নিয়ে আলোচনা করছিলেন, তখন একদিন প্রসঙ্গক্রমে আমাকে বলেছিলেন, আপনার এই যে কাব্য আজ আমাদের গোচর হল, এ'কে বাংলা-সাহিত্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখছি, কিন্তু বস্তুত এ তো বিচ্ছিন্ন নয়— যে একটি বৃহৎ ভূমিকার উপর এই কাব্যের বিশেষ স্থান আছে সেটি না জানতে পারলে এর রস উপলব্ধি হয়তো সম্পূর্ণ হবে না।

কথাটা অনেকদিন পর্যন্ত আমার মনে লেগে ছিল। কোনো কাব্যের পরিচয় তার নিজের মধ্যে সম্পূর্ণ হতে পারে না ; যখনই তার বিচার করি, তখনই স্বদেশী বিদেশী যে-কোনো সাহিত্য আমাদের জানা আছে, নিজের অগোচরেও তার সঙ্গে আমরা যাচাই করে থাকি।

কলাসৃষ্টি বা সাহিত্যসৃষ্টিতে রুচি নিয়ে যখন তর্ক ওঠে, তখন তার অন্ত থাকে না। সংসারে এক-একজন মানুষ থাকে যে সহজ কবি ; তেমনি সহজ রুচিবান লোকও রসসৌন্দর্যের 'পরে সহজ দরদ নিয়ে দৈবক্রমে জন্মায়। এই কবি এবং রসিক উভয়ে একই জাতের মানুষ, তফাতের মধ্যে এই যে, একজনের আছে সুরের প্রাণ এবং গলা, আর-একজনের আছে সুরের প্রাণ ও কান।

এই শ্রুতিবোধের সহজ শক্তি যথেষ্ট পরিমাণে না থাকলেও যে-মানুষ বহুশ্রুত সে রসসৌন্দর্যের একটা আদর্শ বাইরে থেকে সংগ্রহ করে অনেক পরিমাণে আত্মসাৎ করতে পারে। এর জন্যে চাই, সাহিত্যে যা-কিছু শ্রেষ্ঠ তার সঙ্গে নিরন্তর পরিচয় থাকা। এই পরিচয় বিশুদ্ধ সম্ভোগের, এ তত্ত্ব বিশ্লেষণের বা শবব্যবচ্ছেদের মতো অঙ্গ বিভাগের চর্চা নয়।

এই সম্ভোগকে খাঁটি করতে হলে যা-কিছু আকস্মিক, যা-কিছু সাময়িক উত্তেজনামূলক, যা-কিছু ব্যক্তিগত সংকীর্ণ প্রবৃত্তি বা সামাজিক অভ্যাসলালিত, তার থেকে মনকে বিবিক্ত করে নিতে হয়। এ কাজ সহজ নয়, কেননা যা আমাদের কাছের জিনিস, যা উপস্থিতমতো ঘাটে-বাটে দশের কোলে-কাঁধে আদর পেয়ে ফেরে, তা অচিরস্থায়ী ও অকিঞ্চিৎকর হলেও তার প্রতি অভ্যস্ত স্নেহবশত তাকে আমরা বেশি দাম দিয়ে ঠকি। এইরকম পাড়ার হাটের রাংতা-লাগানো সস্তা সামগ্রীর মোহ থেকে মনকে বাঁচাবার উপায় দূরপ্রসারিত সাহিত্যকে মনের সঞ্চরণক্ষেত্র করা। যে-সমস্ত রসসৃষ্টি ক্ষণকালের প্রশ্রয়ের গণ্ডি পেরিয়ে নিত্যকালের বৃহৎ পরিপ্রেক্ষিতের মধ্যে দৃঢ় হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাদের সঙ্গে সর্বদা চেনাশোনা থাকলে সাহিত্যবিচার করবার অধিকার জন্মে ও আনন্দভোগ করবার শক্তি খাঁটি হয়ে ওঠে।

সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ্‌গুলি সংকলনের প্রয়োজন এই কারণেই। সাহিত্য বিজ্ঞানের মতো নয়। তার ঝুটা-সাঁচ্চা বিচার, যুক্তির দ্বারা সম্ভব হলে ভাবনা থাকত না; রুচি ছাড়া আর কোনো কষ্টিপাথর বা মানদণ্ড তার নেই। অথচ রুচি-সম্বন্ধে অতি অযোগ্য লোকেরও আত্মাভিমান আছে। এইরকম অভাজনের অসংকোচ উপদ্রব সাহিত্যকে সহ্য করতেই হয়; চতুরাননের কাছে নালিশ করেও কোনো ফল নেই। বিধি যেখানে আছে বিধাতার কাছে তার দরবার খাটে। এ তো বিধি নয়, এ যে উপলব্ধি, এ ক্ষেত্রে করেও কোনো ফল নেই। নির্বিবেক অত্যাচার ঘটলে তার কোনো চরম প্রতিকার আছে বলে জানি নে— একটি মাত্র উপায় হচ্ছে, সাহিত্য অনুশীলনের সাহায্যেই সাহিত্যরুচির বিস্তার সাধন করা। এ জিনিসটা সাধুতার মতোই— স্বাভাবিক সাধুতা যদি দুর্বল হয়, তবে সাধুসঙ্গ হচ্ছে পথ। কিন্তু মূলধন অল্প থাকা সত্ত্বেও এ প্রণালী যে সকলের পক্ষে খাটবে তা নয়; তবু যাঁরা উপযুক্ত ভোজের আয়োজন করে সাহিত্যরুচির উদ্‌বোধন করতে প্রবৃত্ত, তাঁরা অসাধ্য-সাধনে অক্ষম হলেও অন্তত কবিদের কৃতজ্ঞতাভাজন।

৩৪

দাদূ : ক্ষিতিমোহন সেন

অপেক্ষাকৃত আধুনিককালের হিন্দি কাব্যসাহিত্য পড়তে গিয়ে দেখা গেল হিন্দুস্থানী খেয়াল-টপ্পার মতোই তার তান তার মানকে কেবলই ছাড়িয়ে চলেছে। অলংকারই হয়েছে লক্ষ্য, মূর্তিটি হয়েছে উপলক্ষ।

কবি সত্যকে যখন উপলব্ধি করেন তখন বুঝতে পারেন সত্যের প্রকাশ সহজেই সুন্দর। এইজন্যে তখন তিনি সত্যের রূপটিকে নিয়ে পড়েন তার অলংকারের আড়ম্বরে মন দেন না। বৈষ্ণব-পদে পড়েছি, রাধা যখন কৃষ্ণের মিলন চান, তখন গলার হারগাছির আড়ালটুকুও তাঁর সয় না। তার মানে, কৃষ্ণই তাঁর কাছে একান্ত সত্য; সেই সত্যকে পেতে গেলে অলংকার শুধু যে বাহুল্য, তা নয়, তা বাধা।

সংসারে যেমন, সাহিত্যেও তেমনি, বিষয়াসক্ত লোক আছে। বিষয়ী লোকের লক্ষণই এই যে, তারা সত্যকে পায় না বলেই বস্তুকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করে। সাহিত্যেও রস জিনিসটার প্রতি যদি স্বাভাবিক দরদ না থাকে তা হলেই কৌশলের পরিমাণ নিয়ে তার দর যাচাই চলে। রসটা সত্যের আপন অন্তরের প্রকাশ, আর কৌশলটা বাহিরের উপসর্গ, তাই নিয়ে বাহিরের বাহনটা ভিতরের সত্যকে ছাপিয়ে আপন গুমর করে। এতে রসিক লোকেরা পীড়িত হয়, বিষয়ী লোকেরা বাহবা দিতে থাকে।

আমার অপরিচিত হিন্দিসাহিত্যের মহলে কাব্যের বিশুদ্ধ রসরূপটি যখন খুঁজছিলুম, এমন সময় একদিন ক্ষিতিমোহন সেন মশায়ের মুখ থেকে বঘেল-খণ্ডের কবি জ্ঞানদাসের দুই-একটি হিন্দি পদ আমার কানে এল। আমি বলে উঠলুম, এই তো পাওয়া গেল। খাঁটি জিনিস, একেবারে চরম জিনিস, এর উপরে আর তান চলে না।

অলংকারের স্বভাবই এই যে, কালে-কালে তার বদল হয়। এক সময়ে বাজারে এক রকম ফ্যাশানের চলতি, আর-একসময়ে আর-একরকমের। সাবেক কালে অনুপ্রাসের, বক্রোক্তির খুবই আদর ছিল। এখন তার অল্প আভাস চলে, কিন্তু বেশি সয় না। কোনো একটি কাব্যকে সাবেক কালের বলে চিনতে পারি তার সাবেকি সাজ দেখে। যেখানে সাজের ঘটা নেই সত্য আপন সহজ বেশে প্রকাশমান, সেখানে কালের দাগ পড়বে কিসের উপরে? সেখানে অলংকারের বাজরদরের ওঠা-নামার খবরই পৌঁছয় না। কালে হাটের মার্কা দাগা দেবে এমন মরা জিনিস তার আছে কোথায়?

জ্ঞানদাসের কবিতা যখন শুনলুম তখন এই কথাটি বার বার মনে এল, এ যে আধুনিক! আধুনিক বলতে আমি এই কালেরই বিশেষ ছাঁদের জিনিস বলছি নে। এ-সব কবিতা চিরকালই আধুনিক। কোনো কালে কেউ বলতে পারবে না, এর ফ্যাশান বদলেছে। আমাদের পুরাতন বাংলা সাহিত্যে অল্প কবিতাই আছে যার সম্বন্ধে এমন কথা পুরোপুরি বলা যায়। মাঝে মাঝে পাওয়া যায়, এবং পুরাতনের মধ্যে চিরন্তনকে দেখে চমকে উঠি। যেমন দুটো ছত্র এই মাত্র আমার মনে পড়ছে—

তোমার গরবে গরবিনী আমি
রূপসী তোমার রূপে।

'রূপসী তোমার রূপে', এ কথাটা একেবারে বাঁধা দস্তুরের কথা নয়। বাঁধা দস্তুর বড়োই ভীতু, নজিরের কেল্লা বেঁধে তবে সে সর্দারী করে। গরবিনী গরব ভাসিয়ে দিয়ে বলছে, আমার রূপ আমার নয়, এ তোমারই— এমন কথা তার মুখেই আসত না; সে মাথায় হাত দিয়ে ভাবত, এত বড়ো অত্যুক্তির নজির কোথায়? যারা নজির সৃষ্টি করে, নজির অনুসরণ করে না তারাই আধুনিক, চিরকালই আধুনিক।

ক্ষিতিবাবুর কল্যাণে ক্রমে হিন্দুস্থানের আরো কোনো কোনো সাধক কবির সঙ্গে আমার কিছু কিছু পরিচয় হল। আজ আমার মনে সন্দেহ নেই যে, হিন্দি ভাষায় একদা যে-গীত-সাহিত্যের আবির্ভাব হয়েছে তার গলায় অমরসভার বরমাল্য। অনাদরের আড়ালে আজ তার অনেকটা আচ্ছন্ন; উদ্ধার করা চাই, আর এমন ব্যবস্থা হওয়া চাই যাতে ভারতবর্ষের যারা হিন্দি ভাষা জানে না তারাও যেন ভারতের এই চিরকালের সাহিত্যে আপন উত্তরাধিকার গৌরব ভোগ করতে পারে।

এই-সকল কাব্যে যে রস এত নিবিড় হয়ে প্রকাশ পেয়েছে সে হচ্ছে ভগবানের প্রতি প্রেমের রস। য়ুরোপীয় সাহিত্যে আমরা তো ঈশ্বর-সম্বন্ধে কাব্য রচনা কিছু কিছু পড়েছি, বার বার মনে হয়েছে মেজ্‌রাপটাই কড়া হয়ে আওয়াজ করছে, তারটা তেমন

বাজছে না। তাই খৃস্টান-ধর্ম-সংগীতের বইগুলি সাহিত্যের অন্দর মহলে ঢুকতে পারলে না, গির্জাঘরেই আটকা পড়ে গেল। আসল কথা, শাস্ত্রের যে ভগবান ধর্মকর্মের ব্যবহারে লাগেন, যিনি সনাতনপন্থী ধার্মিক লোকের ভগবান, তাঁকে নিয়ে আনুষ্ঠানিক শ্লোক চলে; তাঁর জন্যে অনেক মন্ত্রতন্ত্র; আর যে-ভগবানকে নিজের আত্মার মধ্যে ভক্ত সত্য ক'রে দেখেছেন, যিনি অহেতুক আনন্দের ভগবান, তাঁকে নিয়েই গান গাওয়া যায়। সত্যের পূজা সৌন্দর্যে, বিষ্ণুর পূজা নারদের বীণায়।

কবি ওয়ার্ড্‌স্বার্থ্ আক্ষেপ করে বলেছেন জগতের সঙ্গে আমরা অত্যন্ত বেশি করে লেগে আছি। আসল কথাটা জগতের সঙ্গে, আমরা বেশি করে নয়, অত্যন্ত খুচরো করে লেগে আছি। আজ এটুকু দরকার, কাল ওটুকু, আজ এখানে ডাক, কাল ওখানে। পুরো মন দিয়ে পুরো বিশ্বকে দেখি নে। আমাদের দরকারের সঙ্গে তার খানিকটা জোড়া, খানিকটা ছেঁড়া, খানিকটা বিরুদ্ধ। প্রতিদিনের এই দেনাপাওনার জগতে আমাদের হিসাবী বুদ্ধিটাই মনের আর-সব বিভাগকে কম-বেশি-পরিমাণে দাবিয়ে রেখে মুরুব্বিআনা করে বেড়ায়। যে হিসাবী বুদ্ধিটা গুনতি করে, ওজন করে, মাপ করে, ভাগ করে, তার কাছ থেকে আমরা অনেক খবর পাই, তার যোগে ছোটো বড়ো নানা বিষয়ে সিদ্ধিলাভও করি, অর্থাৎ তার মহলটা হল লাভের মহল, কিন্তু বিশুদ্ধ আনন্দের মহল নয়।

পূর্বে কোথাও কোথাও এ কথা বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা করেছি যে, যেখানে স্বার্থের বাইরে, প্রয়োজনের মানুষের বিশেষ-কোনো বাস্তব লাভক্ষতির বাইরে কোনো একটি একের পূর্ণতা হৃদয়ে অনুভব করতে পারি সেখানে আমাদের বিশুদ্ধ আনন্দ। জ্ঞানের মহলেও তার পরিচয় পেয়েছি, দেখেছি টুকরো টুকরো তথ্য মনের পক্ষে বোঝা, যেই কোনো একটিমাত্র তত্ত্বে সেই বিচ্ছিন্ন বহু ধরা দেয় অমনি আমাদের বুদ্ধি আনন্দিত হয়, বলে, পেয়েছি সত্যকে। তাই আমরা জানি, ঐক্যই সত্যের রূপ, আর আনন্দই তার রস।

অধিকাংশ মানুষকেই আমরা বহুর ভিড়ের ভিতরে দেখি বিপুল অনেকের মধ্যে তারা অনির্দিষ্ট। যে-মানুষকে ভালোবাসি, সাধারণ অনেকের মাঝখানে সে বিশেষ এক। এই নিবিড় ঐক্যের বোধেই এক বন্ধু আমার পক্ষে হাজার লক্ষ অবন্ধুর চেয়ে সত্যতর। বন্ধুকে যেমন বিশেষ একজন করে দেখলুম, বিশ্বের অন্তরতম একককে যদি তেমনি স্পষ্ট করে দেখতে পাই তা হলে বুঝতে পারি সেই সত্য আনন্দময়। আমার আত্মার মধ্যে একের উপলব্ধি যদি তেমনি সত্য করে প্রকাশ পায় তা হলে জীবনের সুখে দুঃখে লাভে ক্ষতিতে কোথাও আমার আনন্দের বিচ্ছেদ ঘটে না। যতক্ষণ সেই উপলব্ধি আমাদের না হয় ততক্ষণ আমাদের চৈতন্য বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে বিচ্ছিন্ন। যখন সেই উপলব্ধিতে এসে পৌঁছই আমাদের চৈতন্য তখন অখণ্ডভাবে সেই সৃষ্টি

সংগীতেরই অঙ্গ হয়ে ওঠে। তখন সে শুধু মাত্র জানে না, শুধু মাত্র করে না, সমস্তের সঙ্গে সুরে বেজে ওঠে।

সৃষ্টিতে অসৃষ্টিতে তফাত হচ্ছে এই যে, সৃষ্টিতে বহু আপন এককে দেখায়, আর অসৃষ্টিতে বহু আপন বিচ্ছিন্ন বহুত্বকেই দেখায়। সমাজ হল মানুষের একটি বড়ো সৃষ্টি, সেখানে প্রত্যেক মানুষই অন্য সকলের সঙ্গে আপন সামাজিক ঐক্যকে দেখায়, আর ভিড় হচ্ছে অসৃষ্টি, যেখানে প্রত্যেক মানুষ ঠেলাঠেলি করে আপনাকে স্বতন্ত্র দেখায়; আর দাঙ্গাবাজি হচ্ছে অনাসৃষ্টি; তার মধ্যে কেবল পরস্পরের অনৈক্য নয় বিরুদ্ধতা। ইমারত হল সৃষ্টি, ইঁটের গাদা হল অসৃষ্টি। আর যখন দেয়াল ভেঙে ইঁটগুলো হুড়মুড় করে পড়ছে সে হল অনাসৃষ্টি।

এই ঐক্যটি বস্তুর একত্র হওয়ার মধ্যে নয়, এ যে একটি অনির্বচনীয় অদৃশ্য সম্বন্ধের রহস্য। ফুলের মধ্যে যে ঐক্য দেখে আমরা আনন্দ পাই, সে তার বস্তু পিণ্ডে নেই, সে তার গভীর অন্তর্নিহিত এমন একটি সত্যের মধ্যে যা সমস্ত বিশ্বভুবনে একের সঙ্গে আরকে নিগূঢ় সামঞ্জস্যে ধারণ করে আছে। এই সম্বন্ধের সত্য মানুষকে আনন্দ দেয়, মানুষকেও সৃষ্টিকার্যে প্রবৃত্ত করে।

মানুষের অন্তর্বর্তী সেই সৃষ্টিকর্তা মধ্যযুগের সাধকদের মধ্যে যে ভগবানের স্পর্শ পেয়েছিলেন, তিনি শাস্ত্রে বর্ণিত কেউ নন, তিনি মনে প্রাণে হৃদয়ে আবিষ্কৃত অদ্বৈত পরমানন্দরূপ। সেইজন্যেই মন্ত্র পড়ে তাঁর পূজা হল না, গান দিয়ে তাঁর আবাহন হল। তিনি প্রত্যক্ষ সত্যরূপে জীবনে আর্বির্ভূত হয়েছিলেন ব'লে সহজ-সুন্দররূপে কাব্যে প্রকাশ পেলেন।

ইংরেজ কবি শেলি তাঁর সৌন্দর্য-লক্ষ্মীর স্তব নামক কবিতায় বলছেন একটি অদৃশ্য শক্তির মহতী ছায়া বিশ্বে আমাদের মধ্যে ভেসে বেড়াচ্ছে। সেই ছায়াটি চঞ্চল, সে মধুর, সে রহস্যময়, সে আমাদের প্রিয়। তারই আবির্ভাবে আমাদের পূর্ণতা, তারই অভাবে আমাদের অবসাদ। প্রশ্ন এই মনে জাগে যাঁর এই ছায়া তাঁর সঙ্গে ক্ষণে ক্ষণে আমাদের বিচ্ছেদ কেন? কেন জগতে সুখদুঃখ, আশা-নৈরাশ্য, রাগ-দ্বেষের এই নিরন্তর দ্বন্দ্ব? কবি বলেন, শাস্ত্রে জনশ্রুতিতে দেবতা দৈত্য স্বর্গ প্রভৃতি যে-সব পদার্থের কল্পনা পাওয়া যায়, তাদের নম ধরে প্রশ্ন করলে জবাব মেলে কই? কবি বলেন, তিনি তো অনেক চেষ্টা করেছেন, তত্ত্বকথা জেনে নেবেন বলে পোড়ো বাড়ির শূন্য ঘরে, গুহায় গহ্বরে অন্ধকারে ভূতপ্রেতেরও সন্ধান করে ফিরেছেন, কিন্তু না পেলেন কারো দেখা না পেলেন কারো সাড়া। অবশেষে একদিন বসন্তে যখন দক্ষিণ হাওয়ার আন্দোলনে বনে বনে প্রাণের গোপন-বাণী জাগবে-জাগবে করছে এমন সময় হঠাৎ তাঁর অন্তরের মধ্যে এই সৌন্দর্য-লক্ষ্মীর স্পর্শ নেমে এল, মুহূর্তে তাঁর সংশয় ঘুচে গেল। শাস্ত্রের মধ্যে যাঁকে খুঁজে পান নি তিনি হঠাৎ চিত্তের মধ্যে ধরা দিলেন, তখনই জগতের সমস্ত দ্বন্দ্বের মধ্যে একের আবির্ভাব প্রকাশিত হল, তখন কবি

দেখলেন, জগতের মুক্তি এইখানে, এই মহাসুন্দরের মধ্যে। তখনই কবির আত্মনিবেদন গানে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।

আমাদের সাধক কবিদের অন্তর থেকে গানের উৎস এমনি করেই খুলেছে। তাঁরা রামকে আনন্দস্বরূপ পরম এককে আত্মার মধ্যে পেয়েছিলেন। তাঁরা সকলেই প্রায় আত্মজ, সমাজের নীচের তলাকার ; পণ্ডিতদের বাঁধা মতের শাস্ত্র, ধার্মিকদের বাঁধা নিয়মের আচার তাঁদের কাছে সুগম ছিল না। বাইরের পূজার মন্দির তাঁদের কাছে বন্ধ ছিল বলেই অন্তরের মিলন-মন্দিরের চাবি তাঁরা খুঁজে পেয়েছিলেন। তাঁরা কত শাস্ত্রীয় শব্দ আন্দাজে ব্যবহার করেছেন, শাস্ত্রের সঙ্গে তার অর্থ মেলে না। তাঁদের এই প্রত্যক্ষ উপলব্ধির রাম কোনো পুরাণের মধ্যে নেই। তুলসীদাসের মতো ভক্ত কবিও এঁদের এই বাঁধন ছাড়া সাধনভজনে ভারি বিরক্ত। তিনি সমাজের বাহ্য বেড়ার ভিতর থেকে এঁদের দেখেছিলেন, একেবারে চিনতে পারেন নি।

এঁরা হলেন এক বিশেষ জাতের মানুষ। ক্ষিতিবাবুর কাছে শুনেছি, আমাদের দেশে এঁদের দলের লোককে বলে থাকে 'মরমিয়া'। এঁদের দৃষ্টি, এঁদের স্পর্শ মর্মের মধ্যে ; এঁদের কাছে আসে সত্যের বাহিরের মূর্তি নয়, তার মর্মের স্বরূপ। বাঁধা পথে যাঁরা সাবধানে চলেন তাঁরা সহজেই সন্দেহ করতে পারেন যে, এঁদের দেখা এঁদের বলা সব বুঝি পাগলের খামখেয়ালি। অথচ সকল দেশে সকল কালেই এই দলের লোকের বোধের ও বাণীর সাদৃশ্য দেখতে পাই। সব গাছেরই দেখি কাঠের থেকে একই আগুন মেলে। সে আগুন তারা কোনো চুলো থেকে যেচে নেয় নি— চার দিক থেকে আপনিই ধরে নিয়েছে। গাছের পাতায় সূর্যের আলোর ছোঁওয়া লাগে, অমনি এক জাগ্রত শক্তির জোরে বাতাস থেকে তারা কার্বন ছেঁকে নেয়, তেমনি মানবসমাজের সর্বত্রই এই মরমিয়াদের একটি সহজ শক্তি দেখা যায়, উপর থেকে তাঁদের মনে আলো পড়ে আর তাঁরা চার দিকের বাতাস থেকে আপনিই সত্যের তেজোরূপটিকে নিজের ভিতরে ধ'রে নিতে পারেন, পুঁথির ভাণ্ডারে শাস্ত্রবচনের সনাতন সঞ্চয়ের থেকে কুড়িয়ে কুড়িয়ে তাঁদের সংগ্রহ নয়। এইজন্য এঁদের বাণী এমন নবীন, তার রস কখনো শুকোয় না।

অনন্তকে তো জ্ঞানে কুলিয়ে ওঠে না— ঋষি তাই বলেন, তাঁকে না পেয়ে মন ফিরে আসে। সেই অনন্তের সমস্ত রহস্য বাদ দিয়ে তাঁকে সম্প্রদায়ের ঈশ্বর, শাস্ত্রবাক্যের ঈশ্বর, কবুলতিপত্রে দশে মিলে দস্তখতের দ্বারা স্বীকার করে নেওয়া, হাটে-বাটে গোলে-হরিবোলের ঈশ্বর করে নিই। সেই বরদাতা, সেই ত্রাণকর্তা, সেই সুনির্দিষ্ট মতের ফ্রেম দিয়ে বাঁধানো ঈশ্বরের ধারণা একেবারে পাথরের মতো শক্ত ; তাকে মুঠোয় করে নিয়ে সাম্প্রদায়িক ট্যাঁকে গুঁজে রাখা চলে, পরস্পরের মাথা ভাঙাভাঙি করা সহজ হয়। আমাদের মরমিয়াদের ঈশ্বর কোনো একটি পুণ্যাভিমানী দলবিশেষের সরকারি ঈশ্বর নন, তিনি প্রাণেশ্বর।

কেননা ঋষি বলেছেন, জ্ঞানে তাঁকে পাওয়া যায়. না, আনন্দেই তাঁকে পাওয়া যায়। অর্থাৎ হৃদয় যখন অনন্তকে স্পর্শ করে তখন হৃদয়-মন তাঁকে অমৃত বলে বোধ করে, আর এই নিবিড় রসবোধেই সমস্ত সংশয় দূর হয়ে যায়। শেলি সেই বোধের গানই গেয়েছেন, মরমিয়া কবিদের কণ্ঠে সেই বোধেরই গান। যা রহস্য, জ্ঞানের কাছে তা নিছক অন্ধকার, তা একেবারে নেই বললেই হয়। কিন্তু যা রহস্য, হৃদয়ের কাছে তারই আনন্দ গভীর। সেই আনন্দের দ্বারাই হৃদয় অসীমতার সত্যকে প্রত্যক্ষ চিনতে পারে। তখন সে কোনো বাঁধা রীতি মানে না, কোনো মধ্যস্থের ঘটকালিকে কাছে ঘেঁষতে দেয় না।

অমৃতের রসবোধ যার হয় নি, সে-ই মানে ভয়কে, ক্ষুধাকে, ক্ষমতাকে। সে এমন একটি দেবতাকে মানে, যিনি বর দেন, নয় দণ্ড দেন। যাঁর দক্ষিণে স্বর্গ, বামে নরক। যিনি দূরে বসে কড়া হুকুমে বিশ্বশাসন করেন। যাঁকে পশুবলি দিয়ে খুশি করা চলে, যাঁর গৌরব প্রচার করবার জন্যে পৃথিবীকে রক্তে ভাসিয়ে দিতে হয়, যাঁর নাম করে মানবসমাজে এত ভেদবিচ্ছেদ, পরস্পরের প্রতি এত অবজ্ঞা, এত অত্যাচার।

ভারতের মরমিয়া কবিরা শাস্ত্রনির্মিত পাথরের বেড়া থেকে ভক্তের মনকে মুক্তি দিয়েছিলেন। প্রেমের অশ্রুজলে দেবমন্দিরের অঙ্গন থেকে রক্তপাতের কলঙ্করেখা মুছে দেওয়া ছিল তাঁদের কাজ। যাঁর আবির্ভাব ভিতরের থেকে আনন্দের আলোকে মানুষের সকল ভেদ মিটিয়ে দেয়, সেই রামের দূত ছিলেন তাঁরা। ভারত-ইতিহাসের নিশীথরাত্রে ভেদের পিশায় যখন বিকট নৃত্য করছিল তখন তাঁরা সেই পিশাচকে স্বীকার করেন নি। ইংরেজ মরমিয়া কবি যেমন দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে বলেছিলেন যে, বিশ্বের মর্মাধিষ্ঠাত্রী দেবী আনন্দ লক্ষ্মীই মানুষকে সকল বন্ধন থেকে মুক্তি দেবেন, তেমনি তাঁরা নিশ্চয় জানতেন যাঁর আনন্দে তাঁরা আপনাকে অহমিকার বেষ্টন থেকে ভাসিয়ে দিতে পেরেছিলেন, তাঁরই আনন্দে মানুষের ভেদবুদ্ধি দূর হতে পারবে, বাইরের কোনো রফারফি থেকে নয়। তাঁরা এখনো কাজ করছেন। আজও যেখানে কোথাও হিন্দু-মুসলমানের আন্তরিক প্রেমের যোগ দেখি সেখানে দেখতে পাই তাঁরাই পথ করে দিয়েছেন। তাঁদের জীবন দিয়ে গান দিয়ে সেই মিলনদেবতার পূজা প্রতিষ্ঠা হয়েছে যিনি 'সেতুর্বিধরণরেষাং লোকানামসম্ভেদায়।' তাঁদেরই উত্তরসাধকেরা আজও বাংলা দেশের গ্রামে গ্রামে একতারা বাজিয়ে গান গায় ; তাদের সেই একতারার তার ঐক্যেরই তার। ভেদবুদ্ধির পাণ্ডা শাস্ত্রজ্ঞের দল তাদের দণ্ড উদ্যত করেছে। কিন্তু এতদিন যারা সামাজিক অবজ্ঞায় মরে নি, তারা যে সামাজিক শাসনের কাছে আজ হার মানবে এ কথা বিশ্বাস করি নে।

যেহেতু ভারতীয় সমাজ ভেদবহুল, যেহেতু এখানে নানা ভাষা নানা ধর্ম, নানা জাতি সেইজন্যেই ভারতের মর্মের বাণী হচ্ছে ঐক্যের বাণী। সেইজন্যেই যাঁরা যথার্থ ভারতের শ্রেষ্ঠপুরুষ তাঁরা মানুষের আত্মায় আত্মায় সেতু নির্মাণ করতে চেয়েছেন।

যেহেতু বাহিরের আচার ভারতে নানা আকারে ভেদকে পাকা করে রেখেছে এইজন্যেই ভারতের শ্রেষ্ঠ সাধনা হচ্ছে বাহ্য আচারকে অতিক্রম করে অন্তরের সত্যকে স্বীকার করা। পরম্পরাক্রমে ভারতবর্ষের মহাপুরুষদের আশ্রয় করে এই সাধনার ধারা চিরদিনই চলেছে। অথচ ভারত সমাজের বাহিরের অবস্থার সঙ্গে তার অন্তরের সাধনার চিরদিনই বিরোধ, যেমন বিরোধ ঝর্নার সঙ্গে তার স্রোতঃপথের পাথরগুলোর। কিন্তু অচল বাধাকেই কি সত্য বলব, না সচল প্রবাহকে? সংখ্যা গণনায় বাধারই জিত, তার ভারও কম নয়, কিন্তু তাই বলেই তাকে প্রাধান্য দিতে পারি নে। ঝির্ ঝির্ করে একটুখানি যে জল শৈলরাজের বক্ষ-গুহা থেকে বেরিয়ে আসছে, বহু আঘাত-ব্যাঘাতের ভিতর দিয়ে বিপুল বিস্তীর্ণ বালুকারাশির একপ্রান্তে কোনোমতে পথ করে নিয়ে সমুদ্র সন্ধানে চলেছে, পর্বতের বরফগলা বাণী তারই লহরীতে। এই শীর্ণ স্বচ্ছ প্রচ্ছন্ন ধারাটি মহায়তন বহুবিচ্ছিন্নতার ভিতরকার ঐক্যসূত্র।

ভারতের বাণী বহন করে যে-সকল একের দূত এ দেশে জন্মেছেন তাঁরা যে প্রথম হতেই এখানে আদর পেয়েছেন তা নয়। দেশের লোক নিতান্তই যখন তাঁদের অস্বীকার করতে পারে নি তখন নানা কাল্পনিক কাহিনী দ্বারা তারা তাঁদের স্মৃতিকে চেয়েছে শোধন করে নিতে, যতটা পেরেছে তাঁদের চরিতের উপর সনাতনী রঙের তুলি বুলিয়েছে। তবু ভারতের এই শ্রেষ্ঠ সন্তানেরা অনাদর পেতে বাধা পেয়েছিলেন এ কথা মনে রাখা চাই; সে আদর না পাওয়াই স্বাভাবিক কেননা তাঁরা ভেদ-প্রবর্তক সনাতন বিধির বাহিরের লোক, যেমন খৃস্ট ছিলেন য়িহুদী ফ্যারিসিগণ্ডির বাহিরে। কিন্তু বহুদিন তাঁরা অনাদরের অসাম্প্রদায়িক ছায়ায় প্রচ্ছন্ন ছিলেন বলে তাঁরাই যে অভারতীয় ছিলেন তা নয়। তাঁরাই ছিলেন যথার্থ ভারতীয়, কেননা তাঁরাই বাহিরের কোনো সুবিধা থেকে নয় অন্তরের আত্মীয়তা থেকে হিন্দু মুসলমানকে এক করে জেনেছিলেন —তাঁরাই ঋষিদের সেই বাক্যকে সাধনার মধ্যে প্রমাণ করেছিলেন যে-বাক্য ব'লে, সত্যকে তিনিই জানেন যিনি আপনাকেই জানেন সকলের মধ্যে।

ভারতীয় এই সাধকদেরই সাধনা ধারা বর্তমান কালে প্রকাশিত হয়েছে রামমোহন রায়ের জীবনে। এই যুগে তিনিই উপনিষদের ঐক্যতত্ত্বের আলোকে হিন্দু-মুসলমান-খৃস্টানকে সত্যদৃষ্টিতে দেখতে পেয়েছিলেন, তিনি কাউকেই বর্জন করেন নি। বুদ্ধির মহিমায় ও হৃদয়ের বিপুলতায় তিনি এই বাহ্যভেদের ভারতে আধ্যাত্মিক অভেদকে উজ্জ্বল করে উপলব্ধি করেছিলেন এবং সেই অভেদকে প্রচার করতে গিয়ে দেশের লোকের কাছে আজও তিনি তিরস্কৃত। যাঁর নির্মল দৃষ্টির কাছে হিন্দু-মুসলমান-খৃস্টানের শাস্ত্র আপন দুরূহ বাধা সরিয়ে দিয়েছিল তাঁকে আজ তারাই অভারতীয় বলতে স্পর্ধা করছে পাশ্চাত্য বিদ্যা ছাড়া আর কোনো বিদ্যায় যাদের অভিনিবেশ নেই। আজকের দিনেও রামমোহন রায় আমাদের দেশে যে জন্মেছেন তাতে এই

বুঝতে পারি যে, কবীর নানক দাদু ভারতের যে সত্যসাধনাকে বহন করেছিলেন আজও সেই সাধনার প্রবাহ আমাদের প্রাণের ক্ষেত্র পরিত্যাগ করে নি। ভারতচিত্তের প্রকাশের পথ উদ্‌ঘাটিত হবেই।

মাটির নীচের তলায় জলের স্রোত বইছে, ঘোর শুষ্কতার দিনে এই আশার কথাটি মনে করিয়ে দেওয়া চাই। মরুর বেড়া লোহার বেড়ার চেয়ে দুস্তর। আমাদের দেশে সেই শুষ্কতার সেই অপ্রেমের বেড়াই সকলের চেয়ে সর্বনেশে হয়ে দিকে দিকে প্রসারিত। প্রয়োজনের যোগ মশকে জল-বহে-নেওয়া সার্থবাহের যোগের মতো। তাতে ক্ষণে ক্ষণে বিশেষ কোনো একটা কাজ দেয়, কখনো-বা দেয়ও না, বালির আঁধিতে সব চাপা দিয়ে ফেলে ; মশকের জল তেতে উঠে, শুকিয়ে যায়, ফুটো দিয়ে ঝরে পড়ে। এই মরুতে যেখানে মাটির নীচের চিরবহমান লুকানো জল উৎসারিত হয়ে ওঠে সেইখানেই বাঁচোয়া। মরমিয়া কবিদের বাণীস্রোত বইছে সমাজের অগোচর স্তরে। শুষ্কতার বেড়া ভাঙবার সত্যকার উপায় আছে সেই প্রাণময়ী ধারার মধ্যে। তাকে আজ সাহিত্যের উপরিতলে উদ্ধার করে আনতে হবে। আমাদের পুরাণে আছে যে-সগর বংশ ভস্ম হয়ে রসাতলে পড়েছিল তাদেরই বাঁচিয়ে দেবার জন্যে বিষ্ণুপাদপদ্ম-বিগলিত জাহ্নবীধারাকে বৈকুণ্ঠ থেকে আবাহন করে আনা হয়েছিল। এর মধ্যে গভীর অর্থটি এই যে, প্রাণ যেখানে দগ্ধ হয়ে গেছে সেখানে তাকে রসপ্রবাহেই বাঁচিয়ে তোলা যায় কেবলমাত্র, কোনো একটা কর্মের আবর্তনে তাকে নড়ানো যায় মাত্র, বাঁচানো যায় না। মৃত্যু থেকে মানুষের চিত্তকে পরিত্রাণ করার জন্যে বৈকুণ্ঠের অমৃতরসপ্রস্রবণের উপরেই আমাদের মরমিয়া কবিরা দৃঢ় আস্থা রেখেছিলেন, কোনো একটা বাহ্য আচারের রাজিনামার উপরে নয়। তাঁরা যে-রসের ধারাকে বৈকুণ্ঠ থেকে এনেছিলেন, আমাদের দেশের সামাজিক বালুর তলায় তা অন্তর্হিত। কিন্তু তা মরে যায় নি। ক্ষিতিমোহনবাবু ভার নিয়েছেন বাংলা দেশে সেই লুপ্ত স্রোতকে উদ্ধার করে আনবার। শুধু কেবল হিন্দি ভাষা থেকে নয় আশা করে আছি বাংলা ভাষার গুহার থেকে বাউলদের সেই সুবর্ণরেখার বাণীধারাকে প্রকাশ করবেন যার মধ্যে সোনার কণা লুকিয়ে আছে।

৩৫

হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ : কাজী আবদুল ওদুদ

এ দেশে হিন্দু-মুসলমান-বিরোধের বিভীষিকায় মন যখন হতাশ্বাস হয়ে পড়ে, এই বর্বরতার অন্ত কোথায় ভেবে পায় না, তখন মাঝে মাঝে দূরে দূরে সহসা দেখতে পাই দুই বিপরীত কূলকে দুই বাহু দিয়ে আপন করে আছে এমন এক-একটি সেতু। আবদুল ওদুদ সাহেবের চিত্তবৃত্তির ঔদার্য সেই মিলনের একটি প্রশস্ত পথ রূপে যখন

আমার কাছে প্রতিভাত হয়েছে তখনি আশান্বিত মনে আমি তাঁকে নমস্কার করেছি। সেইসঙ্গে দেখেছি তাঁর মননশীলতা, তাঁর পক্ষপাতহীন সূক্ষ্ম বিচারশক্তি, বাংলা ভাষায় তাঁর প্রকাশ শক্তির বিশিষ্টতা। তাই একদিন সমাদরপূর্বক তাঁকে শান্তিনিকেতন আশ্রমে আহ্বান করেছি, অনুরোধ করেছি বিশ্বভারতীর বিদ্যাভবনে বক্তৃতা করবার জন্যে। আমার সাগ্রহ প্রত্যাশা ক্ষুণ্ণ হয় নি এই আনন্দটুকু জানাবার অভিপ্রায়ে আমার এই কয়টি ছত্র লেখা।

শান্তিনিকেতন
২১ মাঘ ১৩৪২

৩৬

দিনেন্দ্র-রচনাবলী : দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

দিনেন্দ্রনাথের কণ্ঠে আমার গান শুনেছি, কিন্তু কোনোদিন তার নিজের গান শুনি নি। কখনো কখনো কোনো কবিতায় তাকে সুর বসাতে অনুরোধ করেছি, কথাটাকে একেবারেই অসাধ্য বলে সে উড়িয়ে দিয়েছে। গান নিয়ে যারা তার সঙ্গে ব্যবহার করেছে, তারা জানে সুরের জ্ঞান তার ছিল অসামান্য। আমার বিশ্বাস গান সৃষ্টি করা এবং সেটা প্রচার করার সম্বন্ধে তার কুণ্ঠার কারণই ছিল তাই। পাছে তার যোগ্যতা তার আদর্শ পর্যন্ত না পৌঁছয়, বোধ করি এই ছিল তার আশঙ্কা। কবিতা সম্বন্ধেও সেই একই কথা ; কাব্যরসে তার মতো দরদী অল্পই দেখা গেছে। তা ছাড়া কবিতা আবৃত্তি করবার নৈপুণ্যও ছিল তার স্বাভাবিক। বিশেষ উপলক্ষে শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের আবৃত্তি শিক্ষা দেবার প্রয়োজন ঘটলে, তাকেই অনুরোধ করতে হয়েছে। অথচ কবিতা সে যে নিজে লেখে, এ কথা প্রায় গোপন ছিল বললেই হয়। অনেকদিন পূর্বে কয়েকটি ছোটো ছোটো কবিতা সে বই আকারে ছাপিয়েছিল। ছাপা হয়েছিল মাত্র, কিন্তু পাঠকসমাজে সেটা প্রচার করবার জন্যে সে লেশমাত্র উদ্যোগ করে নি। আমার মনে হয় কোনো একজনের উদ্দেশে তার রচনা নিবেদন করাতেই সে পেয়েছে তৃপ্তি, পাঠক সাধারণের স্বীকৃতির দিকে সে লক্ষ্যই করে নি। চির জীবন অন্যকেই সে প্রকাশ করেছে, নিজেকে করে নি। তার চেষ্টা না থাকলে আমার গানের অধিকাংশই বিলুপ্ত হত। কেননা, নিজের রচনা সম্বন্ধে আমার বিস্মরণশক্তি অসাধারণ। আমার সুরগুলিকে রক্ষা করা এবং যোগ্য এমন-কি অযোগ্য পাত্রকেও সমর্পণ করা তার যেন একান্ত সাধনার বিষয় ছিল। তাতে তার কোনোদিন ক্লান্তি বা ধৈর্যচ্যুতি হতে দেখি নি। আমার সৃষ্টিকে নিয়েই সে আপনার সৃষ্টির আনন্দকে সম্পূর্ণ করেছিল। আজ স্পষ্টই অনুভব

করছি, তার স্বকীয় রচনাচর্চার বাধাই ছিলেম আমি। কিন্তু তাতে তার আনন্দ যে ক্ষুণ্ণ হয় নি, সে কথা তার অক্লান্ত অধ্যবসায় থেকেই বোঝা যায়। আজ এতেই আমি সুখ বোধ করি যে, তার জীবনের একটি প্রধান পরিতুষ্টির উপকরণ আমিই তাকে জোগাতে পেরেছিলুম।

দিনেন্দ্রের যে পরিচয় আচ্ছন্ন ছিল, যে পরিচয় শেষপর্যন্ত সম্পূর্ণ বিকাশ পাবার অবসর পায় নি, আমাদের কাছে সেইটিরই প্রতিষ্ঠা হল তার এই স্বল্পসঞ্চিত গানে ও কবিতায়। রচনা নিয়ে খ্যাতিলাভের আকাঙ্ক্ষা তার কিছুমাত্র ছিল না, তার প্রমাণ হয়ে গেছে। তার নিজের ইচ্ছায় এতকাল এর অধিকাংশই সে প্রকাশ করে নি এবং বেঁচে থাকলে আজও করত না। সেইজন্যে এই বইটি সম্বন্ধে মনে কোনো সংকোচ নেই যে, তা বলতে পারি নে। কিন্তু তাঁর বন্ধু ছিল অনেক, তার ছাত্রেরও অভাব ছিল না, এঁদের সম্মুখে এবং আমাদের মতো স্নিগ্ধজনের কাছে এই লেখাগুলি নিয়ে তার একটি মানসমূর্তির আবরণ উদ্ঘাটিত হল— এই আমাদের লাভ।

১ ভাদ্র ১৩৪৩

৩৭

গল্প সঞ্চয় : যোগীন্দ্রনাথ সরকার -সম্পাদিত

ছেলেদের যেমন চাই দুধভাত, তেমনি চাই গল্প। যে মা মাসিরা তাদের খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করেছে, এতকাল তারাই তাদের মিষ্টি গলায় গল্প জুগিয়ে এসেছে। ছেলেদের সেই সত্যযুগ আজ এসে ঠেকেছে কলিযুগে— আজকের দিনের মা মাসিরা গেছেন গল্প ভুলে— কিন্তু ছেলেরা তাদের ফরমাস ভোলে নি। ছেলেরা আজো বলছে, গপ্‌প বলো। কিন্তু তাদের ঘরে মধ্যে গপ্‌প নেই। এই গল্পের দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য যাঁরা কোমর বেঁধেছেন, তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য যোগীন্দ্রনাথ। তিনি নিজের সম্বল থেকেও কিছু দিচ্ছেন, ভিক্ষে করেও কিছু সংগ্রহ করছেন। ছেলেরা তো আশীর্বাদ করতে জানে না, সেই আশীর্বাদ করবার ভার নিলেন তাদের বন্ধু রবীন্দ্রনাথ।

১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৩৬

৩৮

চম্পা ও পাটল : প্রিয়ম্বদা দেবী

প্রিয়ম্বদার কবিতার প্রধান বিশেষত্ব রচনার সহজ ধারায়, অলংকারশাস্ত্রে যাকে বলে প্রসাদগুণ। স্বচ্ছ তার ভাষা, সরল তার ভাবের সংবেদন। সে যেন ফুলের মতো, বাইরে থেকে যার পাপ্‌ড়িতে রঙ ফলানো হয় নি, আপন রঙ যে নিজের অগোচরেই সঙ্গে নিয়ে এসেছে। আর, সেই ফুলটি যূথী মালতী জাতের, পেলব তার চিক্কণতা, সে চোখ ভোলায় না প্রগল্‌ভ প্রসাধনে, মনের মধ্যে প্রবেশ করে অদৃশ্য সুগন্ধের প্রেরণায়। প্রিয়ম্বদার অধিকার ছিল যে সংস্কৃত বিদ্যায়, সেই বিদ্যা আপন আভিজাত্য ঘোষণাচ্ছলে বাংলা ভাষার মর্যাদা কোথাও অতিক্রম করে নি ; তাকে একটি উজ্জ্বল শুচিতা দিয়েছে, তার সঙ্গে মিলে গিয়েছে অনায়াসে গঙ্গা যেমন বাংলার বক্ষে এসে মিলেছে ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে। বিশ্বপ্রকৃতির সংস্রবে প্রিয়ম্বদার স্পর্শ সচেতন মন যে আনন্দ পেয়েছিল কাব্যে সে প্রতিফলিত হয়েছে জলের উপরে যেন আলোর বিচ্ছুরণ, আর জীবনে যত সে পেয়েছে দুঃসহ বিচ্ছেদ বেদনা কাব্যে তার একান্ত আবেগ দেখা দিয়েছেন নারীর অবারণীয় অশ্রুধারার মতো।

বাংলা সাহিত্যে প্রিয়ম্বদার কবিতা স্বকীয় আসন রক্ষা করতে পারবে, কেননা সে অকৃত্রিম।

২২।২।৩৯

৩৯

প্রাচীন হিন্দুস্থান প্রমথ চৌধুরী

আমরা পর্যায়ক্রমে লোকশিক্ষা পাঠ্যগ্রন্থ প্রকাশের ভার গ্রহণ করেছি। শিক্ষণীয় বিষয়মাত্রই বাংলা দেশের সর্বসাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত করে দেওয়া এই অধ্যবসায়ের উদ্দেশ্য। তদনুসারে ভাষা সরল এবং যথাসম্ভব পরিভাষা-বর্জিত হবে এর প্রতি লক্ষ্য করা হয়েছে, অথচ রচনার মধ্যে বিষয়বস্তুর দৈন্য থাকবে না, সেও আমাদের চিন্তার বিষয়। দুর্গম পথে দুরূহ পদ্ধতির অনুসরণ করে বহু ব্যয়সাধ্য ও সময়সাধ্য শিক্ষার সুযোগ অধিকাংশ লোকের ভাগ্যে ঘটে না, তাই বিদ্যার আলোক পড়ে দেশের অতি সংকীর্ণ অংশেই। এমন বিরাট মূঢ়তার ভার বহন করে দেশ কখনোই মুক্তির পথে অগ্রসর

হতে পারে না। যত সহজে যত দ্রুত এবং যত ব্যাপকভাবে এই ভার লাঘব করা যায় সেজন্যে তৎপর হওয়া কর্তব্য। গল্প এবং কবিতা বাংলা ভাষাকে অবলম্বন করে চারি দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। তাতে অশিক্ষিত ও স্বল্পশিক্ষিত মনে মননশক্তির দুর্বলতা এবং চরিত্রের শৈথিল্য ঘটবার আশঙ্কা প্রবল হয়ে উঠছে। এর প্রতিকারের জন্য সর্বাঙ্গীণ শিক্ষা অচিরাৎ অত্যাবশ্যক।

বুদ্ধিকে মোহমুক্ত ও সতর্ক করবার জন্য প্রধান প্রয়োজন বিজ্ঞানচর্চার। আমাদের গ্রন্থপ্রকাশকার্যে তার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়েছে। বলা বাহুল্য সাধারণ জ্ঞানের সহজবোধ্য ভূমিকা করে দেওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য। অতএব জ্ঞানের সেই পরিবেশন-কার্যে পাণ্ডিত্য যথাসাধ্য বর্জনীয় মনে করি। আমাদের দেশে বিশেষজ্ঞ লোক অনেক আছেন। কিন্তু তাঁদের অভিজ্ঞতাকে সহজ বাংলা ভাষায় প্রকাশ করার অভ্যাস অধিকাংশ স্থলেই দুর্লভ। এই কারণে আমাদের গ্রন্থগুলিতে ভাষার আদর্শ সর্বত্র সম্পূর্ণ রক্ষা করতে পারা যাবে বলে আশা করি নে কিন্তু চেষ্টার ত্রুটি হবে না।

৪০

ভারতীয় ব্যাধি ও আধুনিক চিকিৎসা পশুপতি ভট্টাচার্য

ডাক্তারি বইয়ের ভূমিকা কবির চেয়ে কবিরাজকে মানায় ভালো। এ কাজে আমার যদি সত্যকার কোনো তাগিদ থাকে তবে সে রোগীর তরফ থেকে। কিছুকাল থেকে গ্রামের কাজে নিযুক্ত আছি, দেখেছি সকলের চেয়ে গুরুতব অভাব আরোগ্যের। আধমরা মানুষ নিয়ে দেশে কোনো বড়ো কাজের পত্তন সম্ভব নয়, তারা কাজে ফাঁকি দেয় প্রাণের দায়ে, আবার সেই কারণেই প্রাণের দায় দুরূহ হয়ে ওঠে। আমরা অনেক সময়ে দোষ দিই বাহ্য কারণকে— কিন্তু রোগজীর্ণতা পুরুষানুক্রমে আমাদের মজ্জার মধ্যে বাস করে— গুরুতর কর্তব্যের ভারকে ভগ্ন উদ্যমের ফাটল দিয়ে পথে পথে সে ছড়িয়ে দিতে থাকে, লক্ষ্যস্থানে অল্পই পৌঁছয়। লোকসানের হিসাব বিচারের সময় আমরা নানা নেতার নানা মত, নানা প্রণালী নিয়ে বকাবকি, এমন-কি, হাতাহাতি করে থাকি, এদিকে রোগে আমাদের শক্তিকে যে চালুনীর মতো শতছিদ্রময় করে দিয়েছে এই কথাটা যথেষ্ট পরিমাণে আমলের মধ্যে আনি নে। যখন দেখি দেশে যথেষ্ট পরিমাণে ধন উৎপন্ন হয় না তখন বলি চরকা চালাও, তাঁত বোনো, চাষ করো— কিন্তু যে হাতে এই-সব কাজ চলবে সেই হাতে চেপে বসেছে যমের পেয়াদারা। পাঁচজন লোকে বহু কষ্টে দেড়জন লোকের মতো কাজ করে অথচ পাঁচ মুখেই তারা খায় এবং পাঁচখানা দেহকেই কাপড় পরাতে হয়। একে গরম দেশে মানুষের উদ্যম সহজেই শিথিল হয় তার উপরে এই উৎপাত।

বিবিধ উপায়ে গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে এদেশের লোককে বুঝিয়ে দেওয়া উচিত ছিল কী করে রোগ ঠেকানো যায়। এই উদ্দেশ্যেই আমাদের রাষ্ট্রনৈতিক সভার অঙ্গীভূত একটি আরোগ্য বিভাগ থাকা উচিত, আরোগ্যরীতির বহু প্রচারের ভার তার উপরে থাকা চাই। রাশিয়াতে এই প্রচারকার্য কী রকম সম্যকভাবে ব্যাপকভাবে সমস্ত দেশ জুড়ে চলছে তা দেখে এসেছি। আমাদের দেশে এর প্রয়োজন সেখানকার চেয়ে অনেক বেশি, অথচ আয়োজন নেই বললেই হয়।

আমাদের দেশে যে-সকল রোগ মানুষের ধন-প্রাণ-মানের গোড়া ঘেঁষে কোপ মারছে শ্রীযুক্ত ডাক্তার পশুপতি ভট্টাচার্য এই গ্রন্থে তার প্রকৃতি ও প্রতিকার নির্ণয় সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এই লেখাগুলি আমার কাছে অত্যন্ত ঔৎসুক্যজনক। তার একটা কারণ, রোগের পরিচয়ে শরীরের পরিচয় পাওয়া যায়। শরীরী মানুষ এ সম্বন্ধে উদাসীন থাকতে পারে না। দ্বিতীয় কারণ, যে-সমস্ত রোগের সঙ্গে প্রতিদিন আমাদের ঘর করতে হচ্ছে তাদের সঙ্গে পদে পদে কারবার করতে গেলে অসহায় অজ্ঞতা নিয়ে মাত্র ডাক্তারের দিকেই পথ তাকিয়ে থাকলে চলে না— অন্তত কিছু পরিমাণে ডাক্তারের সহযোগিতা না করতে পারলে বাঁচাও নেই। এ দেশে রোগ যত সুলভ ডাক্তার তত সুলভ নয়। চিকিৎসার-উপায়-বিরল এই দেশে আনাড়িরাও বাধ্য হয়ে হোমিয়োপ্যাথি প্রভৃতি চিকিৎসার-প্রণালী সম্বন্ধে পুঁথিগত বিদ্যা সংগ্রহ করে রোগের সঙ্গে হাতাহাতি লড়াই করতে চেষ্টা করে। ব্যবসায়ীরা যাই বলুন, কিছু ফল পায় না এ কথা বলা অত্যুক্তি। মন্দ ফল হয় না তাও বলতে পারি নে। কিন্তু শহরের বাইরে এই যে-সব জায়গায় থাকি এখান থেকে ডাক্তার কত দূরে!— সে দূরত্ব কেবল ভৌগোলিক দূরত্ব নয়, আর্থিক দূরত্ব। তা ছাড়া যে-সব ডাক্তার এখানে-ওখানে বহু দূরে দূরে ছিটকিয়ে আছেন তাঁদের বিদ্যেতে দ্রুতগতিতে মরচে পড়ে আসছে। ডাক্তার পশুপতির এই বইখানি তাঁদের কাজে লাগবে।

গ্রামে যদি কোথাও এক-আধজন জনহিতৈষী শিক্ষিত লোক থাকেন তাঁরাও এইরকম বইয়ের সাহায্যে উপস্থিত অনেক উপকার করতে পারবেন— আর আমার মতো সাহিত্য-ডাক্তার যাকে দায়ে পড়ে হঠাৎ ভিষক্‌-ডাক্তার হতে হয় তার তো কথাই নেই। কিসের দায়? তার দৃষ্টান্ত দিই। সাঁওতাল পাড়ার মা এসে আমার দরজায় কেঁদে পড়ল, তার ছেলেকে ওষুধ দিতে হবে। যতই বলি আমি ডাক্তার নই, তার জিদ্‌ ততই বেড়ে যায়। জানি, যদি তাকে নিতান্তই বিদায় করে দিই, সে তখন যাবে ভূতের ওঝার কাছে— তার ঝাড়ার চোটে রোগ ও রোগী দুইই দেবে দৌড়। বই খুলে বসতে হল— বড়াই করতে চাই নে কেননা পসার বাড়াবার ইচ্ছে মোটেই নেই —সে রোগী আজও বেঁচে আছে; আমার গুণে বা তার ভাগ্যের গুণে সে তর্কের শেষ মীমাংসা কোনো উপায়েই হতে পারে না। বহুকাল পূর্বে রামগড় পাহাড়ে গিয়েছিলুম; সেখানেও রোগীরা আমাকে অসাধ্য রোগের মতোই পেয়ে বসেছিল—

ঝেড়ে ফেলবার অনেক চেষ্টা করেছিলুম, শেষকালে তাদেরই হল জিত। যাদের সাধ্যগোচরে কোথাও কোনো চিকিৎসার উপায় নেই তারা যখন কেঁদে এসে পায়ে ধরে পড়ে, তাদের তাড়া করে ফিরিয়ে দিতে পারি এত বড়ো নিষ্ঠুর শক্তি আমার নেই। এদের সম্বন্ধে পণ করে বসতে পারি নে যে পুরো চিকিৎসক নই বলে কোনো চেষ্টা করব না। আমাদের হতভাগ্য দেশে আধা-চিকিৎসকদেরকেও যমের সঙ্গে যুদ্ধে আড়কাঠি দিয়ে সংগ্রহ করতে হয়।

তা ছাড়া ঘরের লোক নির্বুদ্ধিতা ও দুর্বুদ্ধিতা বশত ডাকাতের ব্যবস্থাকে প্রায় বিকৃত করে দিয়ে থাকে। এই কারণে, একে তো অভিজ্ঞ ডাক্তার বহুমূল্য, তার উপরে তাঁরা প্রায়ই অভিজ্ঞ শুশ্রূষার ব্যবস্থা দাবি করেন। ব্যয় সম্বন্ধে একে বলা যায় ডব্‌ল্ ব্যারেল্ বন্দুক। রোগীরা এই রাস্তা দিয়ে কখনো ধনে কখনো ধনেপ্রাণে মরে। উপস্থিত বইখানি ঘরের কোনো কোনো লোক যদি পড়ে রাখেন তবে তাঁদের শুশ্রূষায় হৃদয়ের সঙ্গে জ্ঞানের যোগ হয়ে তার মূল্য অনেক বেড়ে যাবে। আর যাই হোক, ডাক্তার পশুপতিকে আশীর্বাদ করে, আমি মাঝে মাঝে এই বইখানি পড়ব এবং সেই পড়া নিশ্চয়ই কাজে লাগবে।

৪১

পাগলা দাশু । সুকুমার রায়

সুকুমারের লেখনী থেকে যে অবিমিশ্র হাস্যরসের উৎসধারা বাংলাসাহিত্যকে অভিষিক্ত করেছে তা অতুলনীয়। তাঁর সুনিপুণ ছন্দের বিচিত্র ও স্বচ্ছন্দ গতি তাঁর ভাব-সমাবেশের অভাবনীয় অসংলগ্নতা পদে পদে চমৎকৃতি আনে। তাঁর স্বভাবের মধ্যে বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতির গাম্ভীর্য ছিল সেইজন্যেই তিনি তাঁর বৈপরীত্য এমন খেলা-ছলে দেখাতে পেরেছিলেন। বঙ্গসাহিত্যে ব্যঙ্গ-রসিকতার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত আরো কয়েকটি দেখা গিয়েছে, কিন্তু সুকুমারের হাস্যোচ্ছ্বাসের বিশেষত্ব তার প্রতিভার যে স্বকীয়তার পরিচয় দিয়েছে তার ঠিক সমশ্রেণীর রচনা দেখা যায় না। তাঁর এই বিশুদ্ধ হাসির দানের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর অকালমৃত্যুর সকরুণতা পাঠকদের মনে চিরকালের জন্য জড়িত হয়ে রইল।

গৌরীপুর ভবন, কালিম্পং

২. ৬. ৪০

৪২

পৃথ্বী-পরিচয় : প্রমথনাথ সেনগুপ্ত

বিষয় হিসাবে বিজ্ঞান সহজে আয়ত্তগম্য নয় বলেই বিজ্ঞান-অধ্যাপনায় শিক্ষকেরা সচারচর দুরূহ শব্দের আশ্রয় নিয়ে থাকেন। দুর্বোধ শিক্ষার ভার দুর্গম ভাষার পথে বহন করতে গিয়ে প্রথম শিক্ষার্থীদের মন পীড়িত পিষ্ট হতে থাকে, এবং তাদের শক্তির প্রভূত অপচয় ঘটে। এই অনর্থক মানসিক ক্ষতি নিবারণ অত্যন্ত আবশ্যক বলে আমি মনে করি। জনসাধারণের কাছে বিজ্ঞানের দ্বার উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা পাশ্চাত্য দেশে আজকাল বহুপ্রচলিত। এই কর্তব্য সাধনে যাঁরা প্রবৃত্ত তাঁরা কেবল যে বিখ্যাত বিজ্ঞানবিদ্‌ তা নয় তাঁরা ভাষা ব্যবহারে নিপুণ। তাঁরা শিক্ষণীয় বিষয়কে যথোচিত সরল করতে চেষ্টার ত্রুটি করেন না। দেশের চিত্তক্ষেত্রে বিজ্ঞানের সেচন ব্যাপারকে ব্যাপক করে তোলা তাঁরা কত বড়ো সতর্ক সাধনার বিষয় বলে মনে করেন এর থেকে তার প্রমাণ হয়। আমাদের দেশে জনসাধারণ যেখানে বিজ্ঞানের পরিচয় থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত সেখানে সহজ প্রণালীতে বিদ্যাদানের অধ্যবসায়কে আমি পুণ্য কর্ম বলে গণ্য করি। লোকশিক্ষাসংসদ এই কাজের ভার গ্রহণ করতে প্রবৃত্ত। কিন্তু যাঁরা বিজ্ঞানের চর্চা সহযোগে একান্তভাবে ইংরেজি ভাষার ব্যবহারেই দীক্ষিত তাঁদের পক্ষে এই জনহিতকর সাহিত্য স্বদেশে প্রচার করা দুঃসাধ্য। এইজন্য যথেষ্ট লেখক পাওয়া দুর্লভ।

সৌভাগ্যক্রমে স্নেহাস্পদ শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ সেন এই গুরুভার গ্রহণ স্বীকার করেছেন। বাংলা ভাষা প্রয়োগে তাঁর নৈপুণ্য আছে নির্মমতা নেই। দুরূহ বাক্যজালজড়িত পাণ্ডিত্যের আঘাতে শিক্ষার্থীদের পক্ষে শিক্ষার বিষয়কে দুঃসহ করে তোলা তাঁর পন্থা নয়। সেইজন্য লোকশিক্ষা-দান সংকল্পকে সার্থক করার উদ্দেশে তাঁর সহায়তা পেয়ে আমি আশ্বস্ত হয়েছি। এই শুভকার্যে তিনি আমার আশীর্বাদ গ্রহণ করুন।

৪৩

গল্পসংগ্রহ : প্রমথ চৌধুরী

আমার এই নিভৃত কক্ষের মধ্যে সংবাদ এসে পৌঁছল যে প্রমথর জয়ন্তী উৎসবের উদ্যোগ চলেছে— দেশের যশস্বীরা তাতে যোগ দিয়েছেন। প্রমথ চৌধুরীর এই জয়ন্তী অনুষ্ঠানের কর্তৃত্বপদ নেবার অধিকার স্বভাবতই আমারই ছিল। যখন তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে অপরিচিত ছিলেন তাঁর পরিচয় আমার কাছে ছিল সমুজ্জ্বল। যখন

থেকে তিনি সাহিত্যপথে যাত্রা আরম্ভ করেছেন আমি পেয়েছি তাঁর সাহচর্য এবং উপলব্ধি করেছি তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত প্রতিভা। আমি যখন সাময়িকপত্র চালনায় ক্লান্ত এবং বীতরাগ, তখন প্রমথর আহ্বানমাত্রে 'সবুজপত্র' বাহকতায় আমি তাঁর পার্শ্বে এসে দাঁড়িয়েছিলুম। প্রমথনাথ এই পত্রকে যে একটি বিশিষ্টতা দিয়েছিলেন তাতে আমার তখনকার রচনাগুলি সাহিত্য-সাধনার একটি নূতন পথে প্রবেশ করতে পেরেছিল। প্রচলিত অন্য কোনো পরিপ্রেক্ষণীর মধ্যে তা সম্ভবপর হতে পারত না। সবুজপত্রে সাহিত্যের এই একটি নূতন ভূমিকা রচনা প্রমথর প্রধান কৃতিত্ব। আমি তাঁর কাছে ঋণ স্বীকার করতে কখনো কুণ্ঠিত হই নি।

প্রমথর গল্পগুলিকে একত্র বার করা হচ্ছে এতে আমি বিশেষ আনন্দিত, কেননা গল্পসাহিত্যে তিনি ঐশ্বর্য দান করেছেন। অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্যে মিলেছে তাঁর অভিজাত মনের অনন্যতা, গাঁথা হয়েছে উজ্জ্বল ভাষার শিল্পে। বাংলা দেশে তাঁর গল্প সমাদর পেয়েছে, এই সংগ্রহ প্রতিষ্ঠার কাজে সহায়তা করবে।

অনেকদিন পর্যন্ত আমাদের দেশ তাঁর সৃষ্টিশক্তিকে যথোচিত গৌরব দেয় নি সেজন্য আমি বিস্ময় বোধ করেছি। আজ ক্রমশ যখন দেশের দৃষ্টির সম্মুখে তাঁর কীর্তির অবরোধ উন্মোচিত হল তখন আমি নিস্তেজ এবং জরার অন্তরালে তার সঙ্গ থেকে দূরে পড়ে গেছি। তাই তাঁর সম্মাননাসভায় দুর্বল স্বাস্থ্যের জন্য যথাযোগ্য আসন গ্রহণ করতে পারলেম না। বাহির থেকে তার কোনো প্রয়োজন নেই অন্তরেই অভিনন্দনের আসন প্রসারিত করে রাখলুম, দলপুষ্টির জন্য নয়, আমার মালা এতকাল একাকী তাঁর কাছে সর্বলোকের অগোচরে অর্পিত হয়েছে, আজও একাকীই হবে। আজ বিরলেই না-হয় তাঁকে আশীর্বাদ করে বন্ধুকৃত্য সমাপন করে যাব।

[১৯৪১]

৪৪

ঘরোয়া : অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমার জীবনের প্রান্তভাগে যখন মনে করি সমস্ত দেশের হয়ে কাকে বিশেষ সম্মান দেওয়া যেতে পারে তখন সর্বাগ্রে মনে পড়ে অবনীন্দ্রনাথের নাম। তিনি দেশকে উদ্ধার করেছেন আত্মনিন্দা থেকে, আত্মগ্লানি থেকে তাকে নিষ্কৃতি দান করে তার সম্মানের পদবী উদ্ধার করেছেন। তাকে বিশ্বজনের আত্ম-উপলব্ধিতে সমান অধিকার দিয়েছেন। আজ সমস্ত ভারতে যুগান্তরের অবতারণা হয়েছে চিত্রকলায় আত্ম-উপলব্ধিতে।

সমস্ত ভারতবর্ষ আজ তাঁর কাছ থেকে শিক্ষাদান গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশের এই অহংকারের পদ তাঁরই কল্যাণে দেশে সর্বোচ্চ স্থান গ্রহণ করেছে। এঁকে যদি আজ দেশলক্ষ্মী বরণ করে না নেয়, আজও যদি সে উদাসীন থাকে, বিদেশী খ্যাতিমানদের জয়ঘোষণায় আত্মাবমান স্বীকার করে নেয়, তবে এই যুগের চরম কর্তব্য থেকে বাঙালি ভ্রষ্ট হবে। তাই আজ আমি তাঁকে বাংলাদেশে সরস্বতীর বরপুত্রের আসনে সর্বাগ্রে আহ্বান করি।

শান্তিনিকেতন
১৩ জুলাই ১৯৪১

৪৫

শ্যামকান্তের পত্রাবলী : শ্যামকান্ত সরদেশাই

শ্যামকান্ত সরদেশাই একদা শান্তিনিকেতন আশ্রমে প্রবেশ করেছিল অপ্রত্যাশিতভাবে, তখন আমাদের বিদ্যালয়ে অন্য প্রদেশের ছাত্র প্রায় কেউ ছিল না। কিন্তু সে যেমন সকল দিক থেকে আমাদের আশ্রমের সকলের সঙ্গে একীভূত হয়েছিল এমন অন্য কোনো ছাত্র আমরা দেখি নি। পড়া মুখস্থ করে পরীক্ষায় ভালোরূপ সিদ্ধিলাভ করবার উপযুক্ত মেধা আমাদের দেশের ছেলেদের মধ্যে দুর্লভ নয়— কিন্তু বোধশক্তিবান যে-চিত্তবৃত্তি বিদ্যাকে এবং চারি দিকের পরিকীর্ণ প্রভাবকে সমঞ্জসীভূত করে সজীব সত্তায় পরিণত করতে পারে তা অল্পই দেখা যায়। সেই শক্তি ছিল শ্যামকান্তের তাই সে আমাদের অত্যন্ত আপন হয়ে উঠেছিল— কিছুই তার কাছে বিদেশী ছিল না। সে আমাদের আশ্রমকে হৃদয়ে গ্রহণ করেছিল, জীবনে প্রতিষ্ঠিত করেছিল, এবং সে অধিকার করেছিল আমাদের হৃদয়। আমরা তাকে সকলেই ভালোবেসেছিলুম।

তার সময়কার এমন কেনো ছাত্র আমাদের ওখানে ছিল না বাংলা ভাষার অধিকারে যে তার সমকক্ষ ছিল। তা ছাড়া আমাদের সংগীতে তার অনুরাগ এবং প্রবেশ ছিল স্বাভাবিক। এই দুই পথ দিয়েই তার মন আমাদের আশ্রমের আদর্শে ও জীবনযাত্রায় নিজেকে সহজেই বিস্তারিত করতে পেরেছিল। দূর গৃহ থেকে এসেছিল শ্যামকান্ত, কিন্তু আপন হৃদয়-মনের শক্তিতে সে আমাদের একান্ত নিকটস্থ হয়েছিল, এবং এখনো নিকটেই আছে। ইতি

১১ জুন ১৯৩৩

সুন্দর গ্রন্থাবলী : প্রাক্‌কথন

দুর্ভাগ্যক্রমে হিন্দি ভাষায় আমার অধিকার নাই। কিন্তু বন্ধুবর শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেনের সাহায্যে উক্ত ভাষায় লিখিত সন্তদের সাহিত্যের প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা ও অনুরাগ জন্মিয়াছে। এই উপলক্ষে এমন সকল রচনার সহিত আমার পরিচয় ঘটিয়াছে অপর কোনো সাহিত্যে যাহার তুলনা নাই। অনেকে আধুনিক ভারতের রাষ্ট্রীয় সাধনার বাহনরূপে হিন্দি ভাষার প্রচার কামনা করেন। কিন্তু কোনো ভাষার সাময়িক প্রয়োজন সাধনের উপযোগিতা যথেষ্ট শ্রদ্ধেয় নহে। ভাষা আপনার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা দাবি করিতে পারে আপনার সাহিত্যের মূল্য লইয়া। সেই বিশেষ মূল্য হিন্দি ভাষায় যথেষ্ট পরিমাণে আছে। মধ্যযুগের সাধক কবিরা হিন্দি ভাষায় যে ভাবরসের ঐশ্বর্য বিস্তার করিয়াছেন, তাহার মধ্যে অসামান্য বিশেষত্ব আছে। সেই বিশেষত্ব এই যে, তাঁহাদের রচনায় উচ্চ অঙ্গের সাধক এবং উচ্চ অঙ্গের কবি একত্রে মিলিত হইয়াছেন। এমন মিলন সর্বত্রই দুর্লভ।

যখন হইতে এই-সকল কাব্যের সহিত আমার পরিচয় হইয়াছে, তখন হইতে একান্ত মনে কামনা করিতেছি এগুলির সংগ্রহ এবং রক্ষাকার্যে যেন যোগ্য ব্যক্তিদের উৎসাহ জাগরিত হয়। অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায়, যে-সকল কাব্যরচনায় আলংকারিক গুণপনার বাহুল্য আছে তাহারই প্রতি সাধারণের চিত্ত আকৃষ্ট হয়। এই কারণেই ভারতীয় চিন্তাধারার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ যে-সকল কাব্যে তাহাদের ভাবগর্ভতার গুণেই জনসাধারণের দ্বারা তাহারা উপেক্ষিত হইয়া থাকে। সাহিত্যে উচ্চ অঙ্গের সৃষ্টি যথোচিত সমাদর লাভের জন্য শিক্ষা ও সাধনার অপেক্ষা রাখে। এই শিক্ষার বাহন রচনাগুলি নিজেই। অর্থাৎ পাঠের অভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদের সম্বন্ধে রসবোধ জন্মে ও ক্রমশ তাহাদের গভীর অর্থের মধ্যে মন প্রবেশ লাভ করে। এই কারণেই যাঁহারা প্রাচীন হিন্দি ভাষার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থগুলিকে সাধারণের অনাদর হইতে উদ্ধার করিয়া প্রকাশ ও প্রচারের অধ্যবসায়ে প্রবৃত্ত তাঁহারা আমাদের সকলেরই কৃতজ্ঞতাভাজন।

বর্তমান গ্রন্থখানি সুন্দরদাসের কবিতা লইয়া। প্রাচীন সাহিত্যে যে-সকল সাধক কবি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছেন, তাঁহারা কেহই পাণ্ডিত্যের জন্য বিখ্যাত ছিলেন না এ কথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। স্বচ্ছ জলের উৎস যেমন ভূগর্ভ হইতে আপন আন্তরিক বেগে আপনি উৎসারিত হয়, তাঁহাদের ভাবরসের ধারা তেমনি আপন অবিমিশ্র আনন্দের প্রেরণা বেগে আপনি উৎসারিত হইয়াছিল। এই সাধক দলের মধ্যে একমাত্র সুন্দরদাস ছিলেন শাস্ত্রমতো পণ্ডিত। তিনি নিজেই বলিয়াছেন, 'ষড়দর্শন, যোগীজঙ্গম, শেখ সন্ন্যাসী ভক্ত প্রভৃতি সবার তত্ত্বই খুঁজিয়া দেখিয়াছি।' (পৃ. ২৩৫,

১-২)। তিনি কেবল কবি ছিলেন না— তিনি ছিলেন সন্ধানী। তিনি মালাজপ, তীর্থযাত্রা, স্নান আচার, ব্রতনিয়ম প্রভৃতির ধার ধারেন নাই এ কথা তাঁহার উক্তি হইতেই পাওয়া যায় (পৃ. ৩০৪, ৪-৫)। সকল সাধকের মধ্যে যিনি সহজরূপে বিরাজিত, সেই সহজ স্বরূপই সুন্দরের আরাধ্য (পৃ. ৩০৫, ১৯-২৩)।

সুন্দর বলেন, 'মনের লীলা দুর্বোধ্য, কখনো সে হাসে, কখনো কাঁদে, কখনো সে তুষ্ট, কখনো তাহার ক্ষুধা অতৃপ্ত, কখনো সে আকাশে উঠে, কখনো নামে সে পাতালে, এমন মনকে আয়ত্ত করিবে কেমন করিয়া?' (পৃ. ৪৪৮, ১৭)। তাই তাঁর মতে 'জপ তপ, যোগ যাগ, তীর্থ, দেহকর্ষণ, সবই ব্যর্থ জ্ঞান বিনা মুক্তি নাই।' (পৃ. ৪৫৬)। তাই তাঁর মতে মুক্তির পথ পাইতে গুরু পরম সহায়। তিনি লিখিতেছেন, 'আমার গুরুর উপদিষ্ট অকৃত্রিম সহজ সত্যে যে বিশ্বাস করে সে সহজেই হয় মুক্ত।' (পৃ. ২৪৭-৫১)। তাঁহার গুরু দাদূর প্রতি সুন্দরদাসের ভক্তির আর অবধি ছিল না। ভারতের মধ্যযুগের হিন্দি সাহিত্যে যাঁরা সন্ধান রাখিতে চান পুরোহিত শ্রীযুক্ত হরিনারায়ণ শর্মা বিদ্যাভূষণের সম্পাদিত সমগ্র সুন্দর গ্রন্থাবলী তাঁহাদের আদরণীয় হইবে। শুনিয়াছি হরিনারায়ণজি সুপণ্ডিত লেখক, পুরাকালের ছন্দশাস্ত্রে তাঁহার প্রগাঢ় অধিকার। তাই, এই গ্রন্থের ছন্দের সমস্ত জটা তিনি পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিয়া গ্রন্থখানি সম্পাদন করিতে পারিয়াছেন।

তাঁহার পাদটীকাগুলিও এই যুগের বিদ্যার্থীদের পরম সহায় হইবে।

কলিকাতা
১ মার্চ ১৯৩৭

প্রথম বিভাগ

দ্বিতীয় অধ্যায়

৪৭

মেয়েলি ব্রতকথা : পরমেশপ্রসন্ন রায়

শ্রীযুক্ত পরমেশপ্রসন্ন রায় মহাশয় -সংকলিত 'মেয়েলি ব্রতকথা'র মুদ্রিতাংশ প্রাপ্ত হইয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিলাম।

বহুদিন হইল সাধনা পত্রিকায় বাংলার এই-সকল গ্রাম্য সাহিত্য প্রকাশের জন্য উদ্যোগী ছিলাম, তখন এগুলিকে তুচ্ছ ও লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবার অযোগ্য বলিয়া অনেকেই অনাদর করিতেন। এই সাহিত্যে যে স্বতঃসৃত নদীর ধারার মতো সুচিরকাল হইতে বাংলার পল্লীগৃহের দ্বারে দ্বারে প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে, শিক্ষা ও আনন্দ ঘরে ঘরে বহন করিয়া দিবার এমন সহজবিহিত, সুন্দর, এমন চিরন্তন ব্যবস্থা যে আর কিছুই হইতে পারে না, এই সাহিত্যের মধ্যেই আমাদের পল্লী জীবন-যাত্রার সরল মূলনীতিগুলি যে নানা আকারে সন্নিবেশিত হইয়া আছে এবং কালের পরিবর্তনবশত এগুলি বিলুপ্ত হইয়া গেলে দেশের পুরাবৃত্তের একটি প্রধান উপকরণ নষ্ট হইয়া যাইবে— স্বদেশের প্রতি একটা ঔদাসীন্যবশত এ কথা তখনি কেহ চিন্তা করিতেন না। এখন যে আমাদের সেই দুর্দিনের অবসান হইয়াছে, দেশকে প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করিবার জন্য আমাদের হৃদয়ে আগ্রহ জন্মিয়াছে, বর্তমান গ্রন্থ তাহারই সূচনা করিতেছে। আর-একখানি ব্রতকথার সংগ্রহ অল্পদিন হইল প্রকাশিত হইয়াছে; কিন্তু তাহাতে কথাগুলি পুঁথির ভাষায় লিখিত হওয়ায় তাহার রস নষ্ট হইয়াছে। বর্তমান গ্রন্থে সেরূপ নিষ্ঠুরভাবে বিশুদ্ধি সাধনের চেষ্টা হয় নাই দেখিয়া আশ্বস্ত হইয়াছি।

আশা করি গ্রন্থকারের সংগ্রহ অধ্যবসায় পাঠকদিগের নিকট হইতে সমাদর লাভ করিয়া স্বদেশের অন্তঃপুরে নূতন নূতন সন্ধান ও আবিষ্কারে সার্থক হইবে।

৪৮

সুরধুনী : সুধীরচন্দ্র কর

ইহার অনেকগুলি কবিতা আমার ভালো লাগিল। ভাষা ছন্দ ও ভাবের সামঞ্জস্যে এগুলি সুন্দর হইয়াছে।

১৭ পৌষ ১৩৪৪

৪৯

শিশুভারতী : যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

শিশুভারতীর উদ্দেশ্য সফল হউক এই কামনা করি।

৭ আশ্বিন ১৩৩৯

৫০

বঙ্গীয় শব্দকোষ : হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

শান্তিনিকেতন-শিক্ষাভবনের সংস্কৃত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সুদীর্ঘকাল বাংলা অভিধান সংকলন কার্যে নিযুক্ত আছেন। তাঁহার এই বহুবর্ষব্যাপী অক্লান্ত চিন্তা ও চেষ্টা আজ সম্পূর্ণতা লাভ করিয়া সর্বসাধারণের নিকট উপস্থিত হইল। তাঁহার এই অধ্যবসায় যে সার্থক হইয়াছে, আমার বিশ্বাস সকলেই তাহার সমর্থন করিবেন।

শান্তিনিকেতন
৮ আশ্বিন ১৩৩৯

৫১

জলধর-কথা : ব্রজমোহন দাশ -সম্পাদিত

ওঁ

শান্তিনিকেতন

যিনি বাংলা সাহিত্য সমাজে আপন স্নিগ্ধ সহৃদয়তা গুণে বর্তমান সাহিত্য সাধকদের হৃদয় জয় করিয়াছেন সেই প্রবীণ সাহিত্য-তীর্থপথিক শ্রীযুক্ত জলধর সেনের সম্মাননার উদ্দেশ্যে উৎসৃষ্ট প্রশস্তি পুস্তকে এই কয়েক ছত্র অর্ঘ্যরূপে পাঠাইলাম। ইতি

২৩ আষাঢ় ১৩৪১

৫২

বঙ্গীয় মহাকোষ : অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ -সম্পাদিত

স্বস্তি-বাচন

বঙ্গসাহিত্যের যে পরিমাণ উৎকর্ষ ও বিস্তার হইলে বঙ্গীয় মহাকোষ প্রকাশের সংকল্পরূপ গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইতে পারে তাহা আমাদের গৌরবের বিষয়। এই মহাকোষ সম্পূর্ণ হইলে বাংলা দেশের শিক্ষার পথ প্রশস্ত করিতে পারিবে কল্পনা করিয়া উৎসাহ বোধ করিতেছি। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের নেতৃত্বে এই মহদনুষ্ঠান সিদ্ধিলাভ করিবে আশা করিয়া একান্ত মনে ইহার সফলতা কামনা ও সম্পাদকের প্রতি বঙ্গদেশের নামে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

শান্তিনিকেতন
পৌষ সংক্রান্তি ১৩৪১

৫৩

সপ্তপর্ণ । রাখালচন্দ্র সেন

ওঁ

সপ্তপর্ণীতে প্রকাশিত প্রথম গল্পটির নাম সহযাত্রী। কিছুকাল পূর্বে এটি পড়েছিলুম পরিচয় পত্রে। এ ধারার গল্প আমাদের সাহিত্যে দেখি নি। কেবল যে বিষয়টি য়ুরোপীয় তা নয়, রসের তীব্রতা এবং আখ্যানের চমক লাগানো নাট্যবিকাশের মধ্যে য়ুরোপীয় আধুনিক সাহিত্যের স্বাদ পাওয়া যায়। আরো যেটা লক্ষ্য করেছিলুম সে হচ্ছে ঘটনার যাথার্থ্য, অপরিচয়বশত বাঙালির হাতে যে ত্রুটি ঘটতে পারত তা এতে কিছু ঘটে নি। পড়ে আমি বিস্মিত হয়েছিলুম। লেখকের খবর নিতে গিয়ে জানলুম তিনি বাঙালি সিভিলিয়ন, য়ুরোপীয় আবহাওয়া তাঁর জানা আছে। কিন্তু জানা থাকলেই যে জানানো যায় তা নয়। তাঁর এই পাকা হাতের পরিচয় পেয়ে আশা করেছিলুম বাংলায় গল্প রচনায় নূতন পথযাত্রীর অভ্যুদয় হয়েছে। তার অল্পকাল পরেই তাঁর অকালমৃত্যুর সংবাদে হতাশ্বাস হয়েছি। সপ্তপর্ণী বইখানিতে তাঁর লেখনীর অল্প কিছু পরিচয় রয়ে গেল। কিন্তু বেঁচে থাকলে যা আশা করা যেতে পারত তার থেকে বাংলা সাহিত্য বঞ্চিত হল।

আশ্বিন ১৩৪৪

৫৪

শ্রীরামকৃষ্ণ কাব্যলহরী : শ্যামানন্দ

[বর্তমান ভারতের কবিগুরু বিশ্ববিখ্যাত রবীন্দ্রনাথের স্বহস্ত লিখিত আভাস।]

উত্তরায়ণ
শান্তিনিকেতন। বেঙ্গল

স্বামী শ্যামানন্দ পদ্যচ্ছন্দে শ্রীরামকৃষ্ণ কাব্যলহরী রচনা করিয়াছেন, ইহার যথার্থ মূল্য সরল ভক্তির। ভক্তেরা ইহা শ্রদ্ধাপূর্বক গ্রহণ করিবেন সন্দেহ নাই। ইতি

৪।৯।'৩৮

৫৫

জ্ঞানভারতী : প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

জ্ঞানভারতীর সম্পাদনায় শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমারের অধ্যবসায় সার্থক হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের শব্দভাণ্ডারে এই গ্রন্থের সংগ্রহ আদরণীয়।

২৫ আষাঢ় ১৩৪৭

৫৬

বাংলার কথাসাহিত্য / বঙ্গোপন্যাস : ঠাকুরদাদার ঝুলি
দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার

বাংলা সাহিত্যের অপূর্ব সম্পদ চিত্রে ও রসে ভরা ঝুলি অক্ষয় হউক।

৫৭

মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস : আশুতোষ ভট্টাচার্য

Uttarayan
Santiniketan, Bengal

বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস রচনায় লেখক শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য যে অসামান্য পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন তা বিশেষ শ্রদ্ধার যোগ্য। দুর্গম ও বহুবিস্তৃত ক্ষেত্র থেকে তিনি প্রভূত তথ্য সংগ্রহ এবং সতর্কতার সঙ্গে প্রমাণ বিশ্লেষণ ক'রে তার ঐতিহাসিকতা নির্ণয় করেছেন। এই মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যেই বাংলা কাব্যভাষার প্রথম আত্মোপলব্ধির অভিব্যক্তি দেখা দিয়েছে। বাংলা সাহিত্যের পরিণতি আলোচনাকার্যে এই বইখানি বিশেষ সহায়তা করতে পারবে, এজন্যে লেখক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস-সন্ধানকারীদের কৃতজ্ঞতাভাজন।

১।১২।৩৯

৫৮

পথ্যে পরমায়ু : কিরণচন্দ্র দাস

আমাদের খাদ্য

কোনো একটা জাতিকে জ্ঞানে ও কর্মে পুরো দমে উন্নতির পথে চালাতে হলে, প্রথম হতেই তাকে প্রচুর পরিমাণে আহার জোগাতে হয়। শুধু বুদ্ধি থাকলেই চলে না, উৎসাহ, অধ্যবসায়ের জোরে সেই বুদ্ধি ষোলো-আনা পরিমাণে খাটাতে হয়। দুটো দেশের মানুষের সংখ্যার তুলনা করতে গেলে শুধু মাথা গুনতি করে তার সত্য পরিমাণ পাওয়া যায় না। কোন্ দেশে মানুষ খেতে পায় কত, সেটাকে সংখ্যার সঙ্গে যোগ করলে তবে ঠিক ওজন পাওয়া যায়। কেননা, বড়ো সভ্যতাকে ধারণ করে রাখবার জন্যে স্বাস্থ্য ও প্রাণশক্তি, উৎসাহ ও অধ্যবসায় প্রভূত পরিমাণে দরকার হয়; এজন্যে যথেষ্ট আহার্য চাই।

এই উপলক্ষে বিশেষভাবে নিজেদের দেশের কথা ভেবে দেখতে হবে। আমাদের দেশে সামরিক অবরোধ নেই কিন্তু আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকই যে বহুকাল

ধরে আধপেটা খেয়ে আসছে, সে কথা সকলেই জানে। আমরা যতটা খাই তাতে না হয় মরণ, না হয় বাঁচন। কেননা, শুধু নিশ্বাস নেওয়াকেই বাঁচা বলে না। শিশুর মৃত্যু সংখ্যা আমাদের দেশে খুবই বেশি। কিন্তু যে শিশু মরে না সে যে সম্পূর্ণ পরিমাণে বেঁচে থাকবার মতো আহার পায় না, সেইটেই দুঃখ। কেবলমাত্র আর্থিক দিক হতে যদি এর ফল দেখি, তবে দেখা যাবে সর্বসমেত আমাদের দেশে কর্মশক্তি কম হওয়াতে অধিক মূল্য দিয়ে অল্প ফল পাই। অন্য দেশে একজন যে-কাজ করে, আমাদের দেশে সে-কাজে অন্তত চারজনের দরকার হয়। এতে কেবল কাজের পরিমাণ নষ্ট হয় তা নয়, কাজের গুণও নষ্ট হয়। অঙ্ক দিয়ে কি তার পরিমাণ পাওয়া যায়? কেননা, কাজের শক্তি থাকলে সেই শক্তি খাটাতেই আনন্দ হয়, কাজে ফাঁকি দিতে সহজেই ইচ্ছে হয় না। কর্তব্য এড়াবার জন্যে ইচ্ছার উৎপত্তি প্রধানতই শরীর পোষণের অভাব হতে। দেশের লোক ম্যালেরিয়ায় মরছে এবং জীবন্মৃত হয়ে আছে তারও কারণ ঐ; শুধু বেচারা মশাকে দোষ দিলে চলবে না। কী করে আমরা বাঁচব এ কথা ভাববার নয়— কেননা, কোনো মতে বাঁচার চেয়ে মরাই ভালো। কী করে আমরা পুরোপুরি বাঁচব সেইটেই আমাদের ভাববার কথা। শরীর মনের উপবাসজাত যে অবসাদ, ভীরুতা, ঔদাসীন্য, জড়ত্ব আমাদিগকে ধূলিসাৎ করে রেখেছে, তার ভার কি সামান্য?

এই-সব বিপত্তি হতে দেশকে রক্ষা করবার জন্যে যতটুকু আহার্য আমাদের ভাণ্ডারে আছে তার পুষ্টিকরতার বিচার করে, আহার সম্বন্ধে আমাদের অবিলম্বে অভ্যাস পরিবর্তন করতে যদি পারি, তা হলে একদমে অনেকটা ফল পাওয়া যাবে।

সকলেই জানেন আজকাল পাড়াগাঁয়েও দুধ, ঘি যথেষ্ট মেলে না। যে-সকল জায়গায় নদীতে মাছ ধরা হয় সেখানেও মাছ পাওয়া দুর্লভ, কারণ, মাছ শহরে চালান হয়। ঘিয়ে অখাদ্য জিনিস ভেজাল দেওয়া হয় বলে ঘি অপথ্য হয়ে উঠেছে। তাই আমাদের খাদ্য-পদার্থের যে ভাগটা এখন বাকি আছে তাতে পুষ্টিকরতা অতি সামান্য। শাক-সবজি, লাউ, কুমড়া, থোড়, মোচা প্রভৃতির সঙ্গে মসলা মিশিয়ে যে-সকল ব্যঞ্জন তৈরি হয়, তাতে পেট ভরলেও, শরীরের উপবাস-দশা ঘোচে না।

এতে ফল হয়েছে এই যে, এককালে জীবনীশক্তির সতেজতার জোরে যে-সকল রোগের আক্রমণ আমরা নিরস্ত করতে পারতাম এখন তা পারি না। পুষ্টির অভাবে শরীর নির্জীব হয়ে আছে বলেই নানাপ্রকার রোগের হাতে আমরা হার মানছি ও মরছি।

তাই আজ যে-সকল খাদ্য অপেক্ষাকৃত সুলভ আছ তাদের পুষ্টিকরতা বিচার করে বাছাই করে নেওয়া এখন আমাদের কর্তব্য। এককালে যে-সকল খাদ্য প্রধান খাদ্যের পারিপার্শ্বিক মাত্র ছিল এখন তারাই প্রধান হয়ে উঠেছে; এতে কেবলমাত্র আমাদের অভ্যাসকেই তুষ্ট করে শরীরকে হনন করা চলছে। শুধু তাই নয়, আগে

আমাদের হাতে সময় যথেষ্ট ছিল, তাই নানাপ্রকার তরকারি রাঁধবার আয়োজন তখন সহজেই হ'ত। এখন তেমন বিচিত্র আয়োজনে পাত সাজাবার জোগাড় করতে যে সময় ও উদ্যোগ খরচ করা হচ্ছে, সেটার মতো অপব্যয় আর নেই। কিন্তু আমাদের অভ্যাসকে প্রশ্রয় না দিলে আমাদের রুচি তৃপ্ত হয় না বলে এত অত্যাচার সইতে হয়।

পোষণ-গুণ বিচার করে আহার ব্যবস্থা বেঁধে দেবার প্রধান অন্তরায় রসনার গোঁড়ামি। অভ্যাসের ব্যতিক্রম হলে যেন আহার হল না, এরূপ বোধ হয়। সেইজন্যে আমাদের দেশে অনেকে যেদিন একাদশী পালন করেন সেইদিনই আহারটা গুরুতর হয় ; সেদিন ভাত ছেড়ে রুটি প্রভৃতি খেয়ে মনে করেন তাঁরা উপবাস করলেন।

এই রসনার গোঁড়ামি বাঙালির ছেলের অত্যন্ত প্রবল। তার উপর বাঙালি তার্কিক ; এইজন্যে বাঙালির প্রচলিত খাদ্যই যে বাংলা দেশের জলবায়ুর পক্ষে বিশেষ উপযোগী, এই তর্কের দ্বারা তারা নিজের রুচির সমর্থন করে। একটা কথা ভুলে যায় যে, তাঁদের চিরন্তন খাদ্য-তালিকার কয়েকটি প্রধান অঙ্গ কম পড়েছে এবং বিকৃত হয়েছে। অতএব সেটা পূরণ করবার উপায় বার করতে এবং তদনুসারে আহারের রুচি তৈরি করতে হবে, নইলে মরণং ধ্রুবং। সেই মৃত্যু শুরু হয়েছে, কেবল সেটা ছদ্মবেশে চলছে বলে বুঝতে পারছি না। বস্তুত আমাদের উপবাসই নানা রোগের ছদ্মবেশ নিয়ে আমাদিগকে মারছে।

আহার্যের অপূর্ণতাবশত দীর্ঘকাল হতে আমাদের প্রাণসম্বলের ক্ষয় হয়েছে এবং নিরন্তর হতে চলেছে, সে কথা আর ভুললে চলবে না। স্বজাতির আয়ুক্ষয় নিবারণ লক্ষ্য করে নিজের অভ্যাসের সঙ্গে, রুচির সঙ্গে লড়াই করবার মতো বুদ্ধির দৃঢ়তা নাই যাদের, তারা বিদেশী শত্রুভাগ্য নিয়ে বিলাপ করতে যেন লজ্জাবোধ করে।

৫৯

মন্দির : কিরণচাঁদ দরবেশ

প্রশস্তি

মন্দির পড়িয়া আনন্দিত হইলাম। ভূমিকায় রামেন্দ্রসুন্দর বাবু এই কাব্যগ্রন্থখানির অনুকূল সাক্ষ্য দিয়াছেন ;— বোধ হয় একলা পড়িয়াছেন বলিয়া তাঁহার সাক্ষ্যের মধ্যে কিছু সংকোচ প্রকাশ পাইয়াছে। এক্ষণে দ্বিতীয় সাক্ষিরূপে আমি তাঁহার উক্তির সমর্থন করিলাম।

জগদীশচন্দ্রের পত্রাবলী

পত্র-পরিচয়

তখন অল্প বয়স ছিল। সামনের জীবন ভোর বেলাকার মেঘের মতো; অস্পষ্ট কিন্তু নানা রঙে রঙিন। তখন মন রচনার আনন্দে পূর্ণ; আত্মপ্রকাশের স্রোত নানা বাঁকে বাঁকে আপনাতে আপনি বিস্মিত হয়ে চলেছিল; তীরের বাঁধ কোথাও ভাঙছে কোথাও গড়ছে; ধারা কোথায় গিয়ে মিশবে সেই সমাপ্তির চেহারা দূর থেকেও চোখে পড়ে নি। নিজের ভাগ্যের সীমারেখা তখনো অনেকটা অনির্দিষ্ট আকারে ছিল বলেই নিত্য নূতন উদ্দীপনায় মন নিজের শক্তির নব নব পরীক্ষায় সর্বদা উৎসাহিত থাকত। তখনো নিজের পথ পাকা করে বাঁধা হয় নি; সেইজন্যে চলা আর পথ বাঁধা এই দুই উদ্যোগের সব্যসাচিতায় জীবন ছিল সদাই চঞ্চল।

এমন সময়ে জগদীশের সঙ্গে আমার প্রথম মিলন। তিনিও তখন চূড়ার উপর ওঠেন নি। পূর্ব উদয়াচলের ছায়ার দিকটা থেকেই ঢালু চড়াই পথে যাত্রা করে চলেছেন, কীর্তি-সূর্য আপন সহস্র কিরণ দিয়ে তাঁর সফলতাকে দীপ্যমান করে তোলে নি। তখনো অনেক বাধা, অনেক সংশয়। কিন্তু নিজের শক্তি স্ফুরণের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের যে আনন্দ যে যেন যৌবনের প্রথম প্রেমের আনন্দের মতোই আগুনে ভরা, বিঘ্নের পীড়নে দুঃখের তাপে সেই আনন্দকে আরো নিবিড় করে তোলে। প্রবল সুখ-দুঃখের দেবাসুরে মিলে অমৃতের জন্য তখন জগদীশের তরুণ শক্তিকে মন্থন করছিল সেই সময় আমি তাঁর খুব কাছে এসেছি।

বন্ধুত্বের পক্ষে এমন শুভ সময় আর হয় না। তার পরে যখন মধ্যাহ্নকাল আসে তখন বিপুল সংসার মানুষকে দাবি করে বসে। তখন কার কাছে কী আশা করা যেতে পারে তার মূল্যতালিকা পাকা অক্ষরে ছাপা হয়ে বেরোয়, সেই অনুসারে নিলেম বসে, ভিড় জমে। তখন মানুষের ভাগ্য অনুসারে মাল্যচন্দন, পূজা-অর্চনা সবই জুটতে পারে; কিন্তু এখন পথযাত্রীর রিক্তপ্রায় হাতের উপর বন্ধুর যে করস্পর্শ নির্জন প্রভাতে দৈবক্রমে এসে পড়ে, তার মতো মূল্যবান আর কিছুই পাওয়া যায় না।

তখন জগদীশ যে চিঠিগুলি আমাকে লিখেছিলেন তার মধ্যে আমাদের প্রথম বন্ধুত্বের স্বত চিহ্নিত পরিচয় অঙ্কিত হয়ে আছে। সাধারণের কাছে ব্যক্তিগতভাবে তার যথোচিত মূল্য না থাকতে পারে, কিন্তু মানবমনের যে ইতিহাসে কোনো কৃত্রিমতা নেই, যা সহজ প্রবর্তনায় দিনে দিনে আপনাকে উদ্‌ঘাটন করেছে, মানুষের মনের কাছে তার আদর আছেই। তা ছাড়া, যাঁর চিঠি তিনি ব্যক্তিগত জীবনের কৃষ্ণপক্ষ পেরিয়ে গেছেন, গোপনতার অন্ধ রাত্রি তাঁকে প্রচ্ছন্ন করে নেই, তিনি আজ পৃথিবীর সামনে

প্রকাশিত। সেই কারণে তাঁর চিঠির মধ্যে যা তুচ্ছ তাও তাঁর সমগ্র জীবন-ইতিবৃত্তের অঙ্গরূপে গৌরব লাভ করবার যোগ্য।

এর মধ্যে আমারও উৎসাহের কথা আছে। প্রথম বন্ধুত্বের স্মৃতি যদিচ মনে থাকে, কিন্তু তার ছবি সর্বাংশে সুস্পষ্ট হয়ে থাকে না। এই চিঠিগুলির মধ্যে সেই মন্ত্র ছড়ানো আছে যাতে করে সেই ছবি আবার মনে জেগে উঠছে। সেই তাঁর ধর্মতলার বাসা থেকে আরম্ভ করে আমাদের নির্জন পদ্মাতীর পর্যন্ত বিস্তৃত বন্ধুলীলার ছবি। ছেলেবেলা থেকে আমি নিঃসঙ্গ, সমাজের বাইরে পারিবারিক অবরোধের কোণে কোণে আমার দিন কেটেছে। আমার জীবনে প্রথম বন্ধুত্ব জগদীশের সঙ্গে। আমার চিরাভ্যস্ত কোণ থেকে তিনি আমাকে টেনে বের করেছিলেন যেমন করে শরতের শিশিরস্নিগ্ধ সূর্যোদয়ের মহিমা চিরদিন আমাকে শোবার ঘর থেকে ছুটিয়ে বাইরে এনেছে। তাঁর মধ্যে সহজেই একটি ঐশ্বর্য দেখেছিলুম। অধিকাংশ মানুষেরই যতটুকু গোচর তার বেশি আর ব্যঞ্জনা নেই, অর্থাৎ মাটির প্রদীপ দেখা যায়, আলো দেখা যায় না। আমার বন্ধুর মধ্যে আলো দেখেছিলুম। আমি গর্ব করি এই যে, প্রমাণের পূর্বেই আমার অনুমান সত্য হয়েছিল। প্রত্যক্ষ হিসাব গণনা করে যে শ্রদ্ধা, তাঁর সম্বন্ধে আমার শ্রদ্ধা সে জাতের ছিল না। আমার অনুভূতি ছিল তার চেয়ে প্রত্যক্ষতর; বর্তমানের সাক্ষ্যটুকুর মধ্যেই আবদ্ধ করে ভবিষ্যৎকে সে খর্ব করে দেখে নি। এই চিঠিগুলির মধ্যে তারই ইতিহাস পাওয়া যাবে, আর যদি কোনো দিন এরই উত্তরে প্রত্যুত্তরে আমার চিঠিগুলিও পাওয়া যায়, তা হলে এই ইতিহাস সম্পূর্ণ হতে পারবে।

২২ চৈত্র ১৩৩২

প্রথম বিভাগ

তৃতীয় অধ্যায়

৬১

যুগলাঞ্জলি : স্নেহলতা সেন ও ললিতা গুপ্ত

ওঁ

শান্তিনিকেতন
বোলপুর

দুহিতৃকল্পা

শ্রীমতী স্নেহলতা সেন ও শ্রীমতী ললিতা গুপ্ত

কল্যাণীয়াসু

একদিন যাহাদিগকে অস্ফুটবাক্ শিশুকালে পিতামাতার কোলে বাড়িতে দেখিয়াছি, আজ সংসারে নানা সুখদুঃখের নানা চিন্তা ও বেদনার আঘাতে তাহাদের চিত্ত যখন গানে ও গল্পে আপনাকে ব্যক্ত করিতে থাকে, তখন পিতৃবন্ধুদের মনে বিস্ময় উপস্থিত হয়। আমরা তোমাদের এই-সকল রচনার মধ্যে তোমাদিগকেই অনুভব করি ; তোমাদের মনের প্রকাশ-চেষ্টা, তোমাদের হৃদয়ের আকৃতি আমাদের অন্তঃকরণকে স্পর্শ করে। এখানে আমরা সাহিত্যের পাঠক নহি। তোমাদের শিশুকালের স্মৃতিবিজড়িত পিতৃগৃহে যে অপর্যাপ্ত স্নেহসমাদর লাভ করিয়াছি, তোমাদের লেখার ভিতর দিয়া সেই বহুদিনের কথাও জাগিয়া উঠে এবং সেইসঙ্গে মনে পড়ে তোমাদের মাতৃদেবীর লক্ষ্মী-হস্তের অশ্রান্ত আতিথ্য। আজ কন্যার যুগলাঞ্জলি হইতে সেই স্বর্গধামবাসিনী মর্ত্যলোকের উপহার গ্রহণ করিতেছেন স্মরণ করিয়া তোমাদের এই স্বহস্তরচিত ভক্তি-অভিষিক্ত অর্ঘ্যের সহিত আমারও অন্তরের শ্রদ্ধা সম্মিলিত করিলাম। ইতি

২১ আষাঢ় ১৩১৩ সাল

৬২

রাক্ষস রহস্য : উমেশচন্দ্র মৈত্র

ওঁ

রাক্ষস রহস্য গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমি প্রীতিলাভ করিয়াছি। বহু শাস্ত্র মন্থন করিয়া লেখক মহাশয় নানা তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন, ইহার রচনারীতিও সরস, এবং

স্বাধীন পন্থা অবলম্বন করিয়া শক্তি ও সাহসের পরিচয় দিয়াছেন। এই গ্রন্থের সিদ্ধান্তের সহিত আমার মতের ঐক্য নাই কিন্তু পদে পদে যুক্তি নৈপুণ্য ও দৃষ্টান্ত সমাবেশের গুণে পাঠকালে আমার চিত্ত আকৃষ্ট ও চিন্তা জাগরূক হইয়াছে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে।

৬৩

রোবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম : কান্তিচন্দ্র ঘোষ

ওঁ

কল্যাণীয়েষু—

বাংলা ছন্দে তুমি ওমর খৈয়ামের যে তর্জমা করেছ তা গ্রন্থ আকারে প্রকাশের পূর্বেই আমি দেখেছি। এ রকম কবিতা এক ভাষা থেকে অন্য ভাষার ছাঁচে ঢেলে দেওয়া কঠিন। কারণ এর প্রধান জিনিসটা বস্তু নয়, গতি। ফিট্জ্ জেরাল্ড্-ও তাই ঠিকমতো তর্জমা করেন নি— মূলের ভাবটা নিয়ে সেটাকে নূতন করে সৃষ্টি করেছেন। ভালো কবিতা মাত্রকেই তর্জমায় নূতন করে সৃষ্টি করা দরকার।

তোমার তর্জমা পড়ে আমার একটা কথা বিশেষ করে মনে উঠেছে। সে হচ্ছে এই যে, বাংলা কাব্যভাষার শক্তি এখন এত বেড়ে উঠেছে যে, অন্য ভাষার কাব্যের লীলা অংশও এ-ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব। মূল কাব্যের এই রস-লীলা যে তুমি বাংলা ছন্দে এমন সহজে বহমান করতে পেরেছ এতে তোমার বিশেষ ক্ষমতা প্রকাশ পেয়েছে। কবিতা লাজুক বধূর মতো এক ভাষার অন্তঃপুর থেকে অন্য ভাষার অন্তঃপুরে আসতে গেলে আড়ষ্ট হয়ে যায়। তোমার তর্জমায় তুমি তার লজ্জা ভেঙেছ, তার ঘোমটার ভিতর থেকে হাসি দেখা যাচ্ছে। ইতি—

২৯ শ্রাবণ ১৩২৬

৬৪

ময়নামতীর চর : বন্দে আলি মিঞা

Visva-Bharati
Santiniketan, Bengal

তোমার ময়নামতীর চর কাব্যখানিতে চরের দৃশ্য এবং তার জীবনযাত্রার প্রত্যক্ষ ছবি দেখা গেল। পড়ে বিশেষ আনন্দ পেয়েছি। তোমার রচনা সহজ এবং স্পষ্ট, কোথাও ফাঁকি নেই। সমস্ত মনের অনুরাগ দিয়ে তুমি দেখেছ এবং কলমের অনায়াস ভঙ্গিতে লিখেছ। তোমার সুপরিচিত প্রাদেশিক শব্দগুলি যথাস্থানে ব্যবহার করতে তুমি কুণ্ঠিত হও নি তাতে করে কবিতাগুলি আরো সরস হয়ে উঠেছে। পদ্মাতীরের পাড়াগাঁয়ের এমন স্পর্শ বাংলা ভাষায় আর কোনো কবিতায় পেয়েছি বলে আমার মনে পড়ছে না। বাংলা সাহিত্যে তুমি আপন বিশেষ স্থানটি অধিকার করতে পেরেছ বলে আমি মনে করি।

২৬ জুলাই ১৯৩২

৬৫

ব্যাকরণিকা : জগৎমোহন সেন

সবিনয় নমস্কার সম্ভাষণ,

সময়ের অত্যন্ত অভাব। এখনি বোম্বাই যাত্রা করছি।

ব্যাকরণিকা বাংলা শেখানোর পক্ষে উপযোগী হয়েছে। খাঁটি বাংলা ব্যাকরণের প্রয়োজন আছে।

এককালে সমাসদর্পণ ও লোহারামের ব্যাকরণ আমাদের পড়তে হয়েছে সেটাতে সংস্কৃত শিক্ষার ভূমিকা হয়েছিল। তাতে খাঁটি বাংলা ভাষাকে যথোচিত স্বীকার করা হয় নি। আমার নিজের মত এই যে, পারিভাষিক ব্যাকরণের অনেক অংশই, বাংলা সাহিত্যে পরিচয়-অগ্রসর হলে, তার পরে আলোচ্য। ভাষাটা মোটামুটি আয়ত্ত হলে তার পরে বিশ্লেষণের দ্বারা পরিচয় পাকা করবার সময়। বস্তুত বাংলার যে অংশটা সংস্কৃতের অনুবর্তী যেমন সন্ধি তদ্ধিৎ প্রত্যয় সমাস সেইগুলোই গোড়া থেকে জানা চাই। বাংলায় তৎসম শব্দের উপযুক্ত ব্যবহার কিছু পরিমাণ সংস্কৃত ব্যাকরণের সাহায্যে সম্ভবপর হয়। যে বাংলা শিশুকাল থেকে আমাদের অভ্যস্ত তার ব্যাকরণ,

ভাষা পরিচয়ের জন্যে আবশ্যক নয়, ভাষাতত্ত্ব জানবার জন্যেই সে উপযোগী। কিন্তু শিশুদের জন্য বাংলা ক্লাসে বাংলা ব্যাকরণ পড়ানোর বিধি যদি প্রবর্তিত হয়ে থাকে তা হলে এই ব্যাকরণ যথোপযুক্ত হয়েছে বলে বিশ্বাস করি।

সংস্কৃত ভাষার পরিভাষা বাংলায় সর্বত্র খাটে কি না সন্দেহ করি।

২১ নভেম্বর ১৯৩৩

৬৬

মৌন ও মুখর : মমতা মিত্র

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

তোমার বইখানি পড়ে দেখলুম। কবিতার ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা আছে। তার মধ্যে যে আলোক জ্বলে উঠলে সে জ্যোতিষ্কলোকে স্থান পায় সর্বদা তার সন্ধান মেলে না। অদূর দেশ ও অচিরকালের কীর্তিতে যদি তুমি সন্তুষ্ট হতে পারো তবে সেই সন্তোষের কারণ তোমার আছে। ভবিষ্যৎ আছে। আশীর্বাদ করি তোমার সাধনা সফল হবে। ইতি

২৯ অগ্রহায়ণ ১৩৪১

৬৭

দ্বীপময় ভারতের প্রাচীন সাহিত্য : হিমাংশুভূষণ সরকার

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

ইতিমধ্যে পশ্চিম ভারতে ভ্রমণে বেরবার মুখে তোমার 'Indian influences on the Literature of Java and Bali' নামক বইখানি পেয়ে রাস্তায় যেতে যেতে পড়ছিলুম। অনেককাল থেকেই এই রকম বইয়ের জন্যে অপেক্ষা করেছি, অবশেষে এখানে পেয়ে আমার আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত হল। এতে যে বহুবিস্তৃত গবেষণার পরিচয় পেয়েছি

তা আমাদের দেশে দুর্লভ। এই বিষয়টি শেষ পর্যন্ত আলোচনার সুযোগ দাবি করবার অধিকার তুমি প্রমাণ করেছ। ইতি

১১।৩।৩৫

৬৮

কাদম্বরী : প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর -অনূদিত

[১]

কল্যাণীয়েষু

এত দিন পরে অক্ষুণ্ণ ভাষায় তোমার রচনাকে প্রশংসা করবার সুযোগ আমার হল। অনিন্দ্য নৈপুণ্যে তুমি সংস্কৃত কাদম্বরীকে বাংলার আসনে যথাযোগ্য স্থান দিতে পেরেছ— তার সম্মানের হানি হয় নি অথচ বাংলা ভাষারও সম্মান রক্ষা করতে পেরেছ। কলম এগিয়ে চলুক, মাঝখানে যাত্রা ভঙ্গ না হয় যেন।

শরীর অপটু, অবকাশ অল্প।

২৫।১।৩৬

[২]

ওঁ

'Uttarayan'
Santiniketan, Bengal

কল্যাণীয়েষু

তর্জমাটি পড়লুম। দোষ ধরবার নেই। মাঝে মাঝে দু-চারটে প্রাকৃত বাংলা শব্দ অতিরিক্ত গ্রাম্য হয়েছে। তাদের সংখ্যা সামান্য। আমি ওতে হাত দিই নি। কাদম্বরীর মতো গদ্য কাব্যকে সমাসের গ্রন্থি ছাড়িয়ে নিতান্ত সহজ বাংলায় এমন রসিয়ে তর্জমা করতে পারা কম কথা নয়। এ যেন স্বর্গের মন্দাকিনীকে বাংলার মাটিতে ভাগরথী-ধারার মতো নামিয়ে আনা। অত্যন্ত দুরূহব্রতে তুমি সিদ্ধিলাভ করেছ। বাংলা সাহিত্যে এ একটি স্থায়ী কীর্তি রচনা করা হল। প্রকাশ করতে সংকোচ কোরো না। এর আদর হবেই। তোমাকে নিঃসংকোচে অভিনন্দন করতে পেরে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। ইতি

২০ আষাঢ় ১৩৪৩

৬৯

শতপর্ণী : সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

ওঁ

'Uttarayan'
Santiniketan, Bengal

কল্যাণীয়েষু

ব্রাউনিঙের কবিতাগুলিকে তুমি যে বাংলারূপ দিয়েছ তা অপরূপ হয়েছে। তাতে অনুবাদের ক্লিষ্টতা লেশমাত্র নেই, তাতে যেন নবজন্মের নূতন শ্রী প্রকাশ পেয়েছে। সত্যেন্দ্র দত্তের অনুবাদে ছন্দোনৈপুণ্যের সহজ লীলা দেখা যায়, কিন্তু তুমি অসাধ্য সাধন করেছ। বিদেশী রসপণ্যের ভার নিয়ে তুমি একঘাট থেকে আর-একঘাটে খেয়া দিয়েছে দুর্গমতম উজান পথে, দুঃসাহসিক নাবিকবৃত্তিতে এরকম কৃতিত্ব দেখা যায় না। ইতি

১৪।১২।৩৬

৭০

প্রেমাঞ্জলি (Love Offerings) : নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বিভাতু নূতনে লোকে শোভনামূর্তিরুজ্জ্বলা।
প্রভাতে বিমলে রম্যে নবীনারুণভাসিতে॥

ওঁ

শোভনা,

অস্তরবি-কিরণে তব জীবনশতদল
মুদিল তার আঁখি
মরমে যাহা ব্যাপ্ত ছিল স্নিগ্ধ পরিমল
মরণে নিল ঢাকি'।

নিয়ে গেল সে বিদায়কালে মোদের আঁখিজল
মাধুরী-সুধা সাথে।
নূতন লোকে শোভনারূপ জাগিবে উজ্জ্বল
বিমল নবপ্রাতে॥

৭১

দেহলি : হেমলতা দেবী

ওঁ

'Uttarayan'
Santiniketan, Bengal

কল্যাণীয়াসু

তোমার ছোটো গল্পগুলি পড়ে আমার খুব ভালো লাগল। কী মানবচরিত্রের কী তার পারিপার্শ্বিকের চিত্র সুস্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। বাংলা দেশের ছোটো বড়ো নানা গ্রামে পল্লীতে তুমি ভ্রমণ করেছ, সেই উপলক্ষে তোমার দৃষ্টিশক্তি তোমার অভিজ্ঞতাকে বিচিত্র করে তুলেছে, তোমার গল্পগুলি সেই অভিজ্ঞতার চিত্রপ্রদর্শনী। তোমার গল্পগুলির মধ্যে সাহিত্যিক গুণপণা বিশেষভাবে ফুটেছে তাদের সম্বন্ধে আমার এই মন্তব্য। ইতি

৮ চৈত্র ১৩৪৫

৭২

রবীন্দ্র সাহিত্যের পরিচয় : শচীন সেন

ওঁ

মংপু

কল্যাণীয়েষু

আমার নিজের রচনা সম্বন্ধে আলোচনা পড়তে অত্যন্ত কুণ্ঠিত হই। অথচ যখন দেখি কোনো সাহিত্যরসজ্ঞ তাঁর অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা আমার কাব্যের রহস্য ভেদ করেছেন তখন কেবল যে আনন্দ পাই তা নয় নিজের পরিচয়েরও সুযোগ পাই। কবি আপনার যে কবিত্ব প্রকাশ করে সে তার নিজের কাছে সম্পূর্ণ অগোচর নয়— কিন্তু সেইসঙ্গে সে যে আপনার মন উদ্‌ঘাটন করে, সেটা অনেক সময়ে সচেতনভাবে করে না বলেই সে তার নিজের চোখের সামনে থাকে না— এই জিনিসটাই অলংকারশাস্ত্রে যাকে

বলে সহৃদয়হৃদয়বেদ্য। কবির কাব্যের মধ্যে তুমি কবিকে দেখেছ, তোমার সেই দেখার ভিতর দিয়ে কবির যে স্বরূপ প্রকাশ পেয়েছে, সে আমার কাছে আমার প্রতিরূপ হয়ে দেখা দিল, যেমন দেখি অন্য কবিকে তোমার এই গ্রন্থে কবিকে বহু যত্নে ও সন্ধানে বিচিত্র করে দেখেছ সেই বৈচিত্র্যের মধ্যে যে ঐক্যের বিশিষ্টতা তোমার মনে প্রতিফলিত হয়েছে সে আমার কাছে ঔৎসুক্যজনক। তুমি আমার আশীর্বাদ গ্রহণ করো। ইতি

১৮।১০।৩৯

৭৩

বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস : সুকুমার সেন

ওঁ

Mangpoo P.O.
(Darjeeling Dist.)

কল্যাণীয়েষু

কিছুকাল থেকে দৃষ্টিক্ষীণতাবশত ছাপার বা লেখার অক্ষর পড়ে ওঠা আমার পক্ষে দুঃখসাধ্য হয়েছে। তবু ডাক্তার সুকুমার সেনের রচিত বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসের মুদ্রিত যে অংশটুকু আমার হাতে এসেছে ধীরে ধীরে তা আমি পড়ে শেষ করেছি। শেষ পর্যন্ত আমার ঔৎসুক্য জাগরূক ছিল। বাংলা সাহিত্যের সমগ্র পরিচয়ের এমন পরিপূর্ণ চিত্র ইতিপূর্বে আমি পড়ি নি। গ্রন্থকার তার বিবৃতির সঙ্গে সঙ্গে আলোচিত পুস্তকগুলি থেকে যে দীর্ঘ অংশ সকল উদ্ধৃত করে দিয়েছেন তাতে করে তাঁর গ্রন্থ একসঙ্গে ইতিহাসে এবং সংকলনে সম্পূর্ণ রূপ ধরেছে। সেই কারণে এই গ্রন্থ ছাত্রদের প্রয়োজন সিদ্ধ করবে এবং সাহিত্যরসসন্ধানীদের পরিতৃপ্তি দেবে। এই গ্রন্থে সাহিত্যের ইতিহাস বাংলা দেশের রাষ্ট্রিক ও সামাজিক ইতিহাসের পটভূমিকায় বর্ণিত হওয়াতে রচনার মূল্যবৃদ্ধি করেছে। গ্রন্থকারকে আমার সকৃতজ্ঞ অভিনন্দন জানাই। ইতি

৪।৫।৪০

৭৪

আহার ও আহার্য : পশুপতি ভট্টাচা৲

কল্যাণীয়েষু,

পশুপতি, পরিভাষাবর্জিত সরল প্রণালীতে রচিত পথ্যবিচার সম্বন্ধে তোমার লেখাটি আমার ভালো লেগেছে বলে আমাদের লোকশিক্ষা গ্রন্থাবলীর মধ্যে তাকে গ্রহণ করবার জন্যে আমি আনন্দের সঙ্গে সম্মতি দিয়েছি। আমাদের দেশে কুপথ্যজীর্ণ পাকস্থলীর পক্ষে এই গ্রন্থ বিশেষ উপযোগী হয়েছে বলে আমার বিশ্বাস। আশা করি, তোমার এই লেখা দেশের লোকে আহার সম্বন্ধে আপন অভ্যস্ত রুচির সংস্কার সাধনে শ্রদ্ধার সঙ্গে ব্যবহার করবে। তুমি আমার আশীর্বাদ গ্রহণ করো। ইতি

৬। ১। ৪১

২

বাংলা সাহিত্যের ভূমিকা : নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

কল্যাণীয়েষু,

নন্দগোপাল, তোমার বাংলা সাহিত্যের ভূমিকা বইখানি পড়ে খুশি হলুম। এর মধ্যে তোমার সূক্ষ্মদৃষ্টির এবং ভাষার সুতীক্ষ্ণতার প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু সূক্ষ্মদৃষ্টি জিনিসটা যে রস আহরণ করে সেটা সকল সময় সার্বজনিক হয় না সাহিত্যের এটাই হল অপরিহার্য দৈন্য। তাকে পুরস্কারের জন্য নির্ভর করতে হয় ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধির উপরে। তার নিম্ন আদালতের বিচার সেও যেমন বৈজ্ঞানিক বিধি-নির্দিষ্ট নয়, তার আপিল আদালতের রায়ও তথৈবচ। এ স্থলে আমাদের প্রধান নির্ভরের বিষয় ব- সংখ্যক শিক্ষিত রুচির অনুমোদনে। কিন্তু কে না জানে যে শিক্ষিত লোকের রুচি- পরিধি তৎকালীন বেষ্টনীর দ্বারা সীমাবদ্ধ, সময়ান্তরে তার দশান্তর ঘটে। সাহি- বিচারের মাপকাঠি একটা সজীব পদার্থ। কালক্রমে সেটা বাড়ে এবং কমে, কৃশ হ- এবং স্থূল হয়েও থাকে। তার সেই নিত্য পরিবর্তমান পরিমাণবৈচিত্র্য দিয়েই - সাহিত্যকে বিচার করতে বাধ্য, আর কোনো উপায় নেই। কিন্তু বিচারকেরা সেই হ্রাস- বৃদ্ধিকে অনিত্য বলে স্বীকার করেন না— তাঁরা বৈজ্ঞানিক ভঙ্গি নিয়ে নির্বিকার অবিচলতার ভান করে থাকেন। কিন্তু এ বিজ্ঞান মেকি বিজ্ঞান, খাঁটি নয়, ঘরগড়া বিজ্ঞান, শাশ্বত নয়। উপস্থিত মতো যখন একজন বা এক সম্প্রদায়ের লোক সাহিত্যিকের

উপরে কোনো মত জাহির করেন, তখন সেই ক্ষণিক চলমান আদর্শের অনুসারে সাহিত্যিকের দণ্ড-পুরস্কারের ভাগ-বাঁটোয়ারা হয়ে থাকে। তার বড়ো আদালত নেই। তার ফাঁসির দণ্ড হলেও সে একান্ত মনে আশা করে যে বেঁচে থাকতে থাকতে হয়তো ফাঁস যাবে ছিঁড়ে, গ্রহের গতিকে কখনো যায়, কখনো যায় না। সমালোচনার এই অধ্রুব অনিশ্চয়তা থেকে স্বয়ং শেক্সপিয়ারও নিষ্কৃতি লাভ করেন নি। পণ্যের মূল্য নির্ধারণকালে ঝগড়া করে তর্ক করে কিংবা আর পাঁচজনের নজির তুলে তার সমর্থন করা জলের উপর ভিত গাড়া। জল তো স্থির নয়, মানুষের রুচি স্থির নয়, কাল স্থির নয়। এ স্থলে ধ্রুব আদর্শের ভান না করে সাহিত্যের পরিমাপ যদি সাহিত্য দিয়েই করা যায় তা হলে শান্তি রক্ষা হয়। অর্থাৎ জজের রায় স্বয়ং যদি শিল্প-নিপুণ হয় তা হলে মানদণ্ডই সাহিত্য-ভাণ্ডারে সসম্মানে রক্ষিত হবার যোগ্য হতে পারে।

সাহিত্য-বিচার-মূলক গ্রন্থ পড়বার সময় প্রায়ই কমবেশি পরিমাণে যে জিনিসটি চোখে পড়ে, সে হচ্ছে বিচারকের বিশেষ সংস্কার। এই সংস্কারের প্রবর্তনা ঘটে তাঁর দলের সংস্রবে, তাঁর শ্রেণীর টানে, তাঁর শিক্ষার বিশেষত্ব নিয়ে। কেউ এ প্রভাব সম্পূর্ণ এড়াতে পারেন না। বলা বাহুল্য এ সংস্কার জিনিসটা সর্বকালের আদর্শের নির্বিশেষ অনুবর্তী নয়। জজের মনে ব্যক্তিগত সংস্কার থাকেই, কিন্তু তিনি আইনের দণ্ডের সাহায্যে নিজেকে খাড়া রাখেন। দুর্ভাগ্যক্রমে সাহিত্যে এই আইন তৈরি হতে থাকে বিশেষ কালের বা বিশেষ শিক্ষার বা বিশেষ ব্যক্তির তাড়নায়। এই আইন সর্বজনীন এবং সর্বকালের হতে পারে না। সেইজন্যেই পাঠক সমাজে বিশেষ বিশেষ কালে এক-একটা বিশেষ মরসুম দেখা দেয়, যথা টেনিসনের মরসুম, কিপ্‌লিঙের মরসুম। এমন নয় যে ক্ষুদ্র একটা দলের মনেই সেটা ধাক্কা মারে, বৃহৎ জনসংঘ এই মরসুমের দ্বারা চালিত হতে থাকে, অবশেষে কখনো এক সময় ঋতু পরিবর্তন হয়ে যায়। বৈজ্ঞানিক সত্য বিচারে এ রকম ব্যক্তিগত পক্ষপাতিত্ব কেউ প্রশ্রয় দেয় না। এই বিচারে আপন বিশেষ সংস্কারের দোহাই দেওয়াকে বিজ্ঞানে মূঢ়তা বলে। অথচ সাহিত্যে এই ব্যক্তিগত ছোঁয়াচ লাগাকে কেউ তেমন নিন্দা করে না। সাহিত্যে কোন্‌টা ভালো কোন্‌টা মন্দ সেটা অধিকাংশ স্থলেই যোগ্য বা অযোগ্য বিচারকের বা তার সম্প্রদায়ের আশ্রয় নিয়ে আপনাকে ঘোষণা করে। বর্তমানকালে বিত্তাল্পতার মমত্ব বা অহংকার সর্বজনীন আদর্শের ভান করে দণ্ডনীতি প্রবর্তন করতে চেষ্টা করছে। এও যে অনেকটা বিদেশী নকলের ছোঁয়াচ লাগা মরসুম হতে পারে, পক্ষপাতী লোকে এটা স্বীকার করতে পারেন না। সাহিত্যে এই রকম বিচারকের অহংকার ছাপার অক্ষরের বত্রিশ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। অবশ্য যারা শ্রেণীগত বা দলগত বা বিশেষকালগত মমত্বের দ্বারা সম্পূর্ণ অভিভূত নয়, তাদের বুদ্ধি অপেক্ষাকৃত নিরাসক্ত। কিন্তু তারা যে কে তা কে স্থির করবে, যে সরষে দিয়ে ভূত ঝাড়ায় সেই সরষেকেই ভূতে পায়। আমরা বিচারকের শ্রেষ্ঠতা নিরূপণ করি নিজের মতের শ্রেষ্ঠতার অভিমানে। মোটের

উপর নিরাপদ হচ্ছে ভান না করা, সাহিত্যের সমালোচনাকেই সাহিত্য করে তোলা। সে রকম সাহিত্য মতের একান্ত সত্যতা নিয়ে চরম মূল্য পায় না। তার মূল্য তার সাহিত্যরসেই।

সমালোচকদের লেখায় কটাক্ষে এমন আভাস পেয়ে থাকি যেন আমি অন্তত কোথাও কোথাও আধুনিকের পদক্ষেপের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলবার কাঁচা চেষ্টা করছি এবং সেটা আমার কাব্যের স্বভাবের সঙ্গে মিশ খাচ্ছে না। এই উপলক্ষে এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্যটা বলে নিই।

আমার মনে আছে যখন আমি ক্ষণিকা লিখেছিলেম, তখন একদল পাঠকের ধাঁধা লেগেছিল। তখন যদি আধুনিকের রেওয়াজ থাকত তা হলে কারো বলতে বাধত না যে ঐ-সব লেখায় আমি আধুনিকের সাজ পরতে শুরু করেছি। মানুষের বিচারবুদ্ধির ঘাড়ে তার ভূতগত সংস্কার চেপে বসে। মনে আছে কিছুকাল পূর্বে কোনো সমালোচক লিখেছিলেন, হাস্যরস আমার রচনা মহলের বাইরের জিনিস। তাঁর মতে সেটা হতে বাধ্য কেননা লিরিক কবিদের মধ্যে স্বভাবতই হাস্যরসের অভাব থাকে। তৎসত্ত্বেও আমার চিরকুমারসভা ও অন্যান্য প্রহসনের উল্লেখ তাঁকে করতে হয়েছে, কিন্তু তাঁর মনে হাস্যরসটা অগভীর, কারণ— কারণ আর কিছু বলতে হবে না, কারণ তাঁর সংস্কার, যে সংস্কার যুক্তিতর্কের অতীত।

তুমি মনে কোরো না তোমার লেখায় আমার প্রতি কোনো অবিচার করছে বলে আমি তোমার উপর কটাক্ষপাত করেছি, ঠিক তার উল্টো। তুমি আমাকে যা নগদ বিদায় দিয়েছ শেষ পর্যন্ত তার বোঝা বইতে পারলে আমি বেঁচে যাব। কিন্তু দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতায় সাহিত্যিক যশ সম্বন্ধে আমার মনের মধ্যে একটা সুগভীর বৈরাগ্য এসেছে। এতদিনে কালের খাজাঞ্চিখানা থেকে আমি যা-কিছু লাভ করেছি সেটা খাঁটি কিংবা খাঁটি নয়, যখন তার প্রমাণ হবে, তখন আমি উপস্থিত থাকব না।

আমার এই লেখাটা তোমার গ্রন্থের সমালোচনা নয়, তার কারণ সমালোচনায় আমার রুচি বা কৃতিত্ব কোনো কালেই ছিল না এবং এখনো নেই। ইতিপূর্বে আমি কখনো কখনো এমন সব লেখা লিখেছি যা পাঠকেরা সমালোচনা বলে গণ্য করে নিয়েছেন। কিন্তু তা বস্তুত শিল্পকর্ম— বিশ্লেষণের সামগ্রী নয়। সংক্ষেপে আমি বলতে পারি তোমার রচনার বরাবর আমি প্রশংসা করে এসেছি, তার ভাষা ও মননশক্তির উজ্জ্বলতা গুণে, এ গ্রন্থেও তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এর তন্ন তন্ন বিচার তাঁরাই করবেন যাঁদের শক্তি আছে এবং অভ্যাস আছে— আমি অক্ষম। আমার নিজের সম্বন্ধে বিচারকের জরিমানা ও বকশিশ নিঃশব্দে মেনে নিই, অন্যের সম্বন্ধে আমার অভিমত প্রক্ষেপ করতে যথেষ্ট সংকোচ বোধ করি, কারণ এই অভিমত সম্বন্ধে আমার অহংকার কালক্রমে ক্ষীণ হয়ে গেছে।

আমি অনেক সময় খুঁজি সাহিত্যে কার হাতে কর্ণধারের কাজ দেওয়া যেতে পারে, অর্থাৎ কার হাল ডাইনে-বাঁয়ের ঢেউয়ের দোলাদুলি করে না। একজনের নাম

খুব বড়ো করে আমার মনে পড়ে তিনি হচ্ছেন প্রমথ চৌধুরী। প্রমথর নাম আমার বিশেষ করে মনে আসবার কারণ এই যে, আমি তাঁর কাছে ঋণী। সাহিত্যে ঋণ গ্রহণ করবার ক্ষমতাকে গৌরবের সঙ্গে স্বীকার করা যেতে পারে। অনেককাল পর্যন্ত যারা গ্রহণ করতে এবং স্বীকার করতে পারে নি তাদের আমি অশ্রদ্ধা করে এসেছি। তাঁর যেটা আমার মনকে আকৃষ্ট করেছে, সে হচ্ছে তাঁর চিত্তবৃত্তির বাহুল্যবর্জিত আভিজাত্য, সেটা উজ্জ্বল হয়ে প্রকাশ পায় তাঁর বুদ্ধিপ্রবণ মননশীলতায়— এই মননধর্ম মনের সে তুঙ্গ শিখরেই অনাবৃত থাকে সেটা ভাবালুতার বাষ্পস্পর্শহীন। তাঁর মনের সচেতনতা আমার কাছে আশ্চর্যের বিষয়। তাই অনেকবার ভেবেছি তিনি যদি বঙ্গসাহিত্যের চালকপদ গ্রহণ করতেন তা হলে এ সাহিত্য অনেক আবর্জনা হতে রক্ষা পেত। এত বেশি নির্বিকার তাঁর মন যে বাঙালি পাঠক অনেকদিন পর্যন্ত তাঁকে স্বীকার করতেই পারে নি, মুশকিল এই যে বাঙালি কাউকে কোনো একটা দলে না টানলে তাকে বুঝতেই পারে না। আমার নিজের কথা যদি বল, সত্য আলোচনা সভায় আমার উক্তি অলংকারের ঝংকারে মুখরিত হয়ে ওঠে। এ কথাটা অত্যন্ত বেশি জানা হয়ে গেছে সেজন্য আমি লজ্জিত এবং নিরুত্তর। অতএব সমালোচনার আসরে আমার আসন থাকতেই পারে না। কিন্তু রসের অসংযম প্রমথ চৌধুরীর লেখায় একেবারেই নেই। এই-সকল গুণেই মনে মনে তাঁকে জজের পদে বসিয়েছিলুম। কিন্তু বুঝতে পারছি বিলম্ব হয়ে গেছে। তার বিপদ এই যে সাহিত্যে অরক্ষিত আসনে যে খুশি সেই চড়ে বসে। তার ছত্রদণ্ড ধরবার লোক পিছনে পিছনে জুটে যায়।

এখানেই আমার শেষ কথাটা বলে নিই। আমার রচনার যাঁরা মধ্যবিত্ততার সন্ধান করে পান নি বলে নালিশ করেন, তাঁদের কাছে আমার একটা কৈফিয়ত দেবার সময় এল। পলিমাটি কোনো স্থায়ী কীর্তির ভিত বহন করতে পারে না। বাংলার গাঙ্গেয় প্রদেশে এমন কোনো সৌধ পাওয়া যায় না যা প্রাচীনতার স্পর্ধা করতে পারে। এ দেশের আভিজাত্য সেই শ্রেণীর। আমরা যাদের বনেদী বংশীয় বলে আখ্যা দিই তাদের বনেদ বেশি নীচে পর্যন্ত পৌঁছয় নি। এরা অল্পকালের পরিসরের মধ্যে মাথা তুলে ওঠে তার পরে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে যেতে বিলম্ব করে না। এই আভিজাত্য সেইজন্য একটা আপেক্ষিক শব্দ মাত্র। তার সেই ক্ষণভঙ্গুর ঐশ্বর্যকে বেশি উচ্চে স্থাপন করা বিড়ম্বনা, কেননা সেই কৃত্রিম উচ্চতা কালের বিদ্রূপের লক্ষ্য হয় মাত্র। এই কারণে আমাদের দেশের অভিজাত বংশ তার মনোবৃত্তিতে সাধারণের সঙ্গে অত্যন্ত স্বতন্ত্র হতে পারে না। এ কথা সত্য এই স্বল্পকালীন ধন-সম্পদের আত্মসচেতনতা অনেক সময়েই দুঃসহ অহংকারের সঙ্গে আপনাকে জনসম্প্রদায় থেকে পৃথক রাখবার আড়ম্বর করে। এই হাস্যকর বক্ষস্ফীতি আমাদের বংশে অন্তত আমাদের কালে একেবারেই ছিল না। কাজেই আমরা কোনোদিন বড়োলোকের প্রহসন অভিনয় করি নি। অতএব আমার মনে যদি কোনো স্বভাবগত বিশেষত্বের ছাপ পড়ে থাকে তা

বিত্তপ্রাচুর্য কেন বিত্তসচ্ছলতারও নয়। তাকে বিশেষ পরিবারের পূর্বাপর সংস্কৃতির মধ্যে ফেলা যেতে পারে এবং এ রকম স্বাতন্ত্র্য হয়তো অন্য পরিবারেও কোনো বংশগত অভ্যাসবশত আত্মপ্রকাশ করে থাকে। বস্তুত এটা আকস্মিক। আশ্চর্য এই যে সাহিত্যে এই মধ্যবিত্ততার অভিমান সহসা অত্যন্ত মেতে উঠেছে। কিছুকাল পূর্বে "তরুণ" শব্দটা এই রকম ফণা তুলে ধরেছিল। আমাদের দেশে সাহিত্যে এই রকম জাতে ঠেলাঠেলি আরম্ভ হয়েছে হালে। আমি যখন মস্কৌ গিয়েছিলুম, চেকভের রচনা সম্বন্ধে আমার অনুকূল অভিরুচি ব্যক্ত করতে গিয়ে হঠাৎ ঠোক্কর খেয়ে দেখলুম, চেকভের লেখায় সাহিত্যের মেল বন্ধনে জাতিচ্যুতি দোষ ঘটেছে, সুতরাং তাঁর নাটক স্টেজের মঞ্চে পঙ্‌ক্তি পেল না। সাহিত্যে এই মনোভাব এত বেশি কৃত্রিম যে শুনতে পাই এখন আবার হাওয়া বদল হয়েছে। এক সময়ে মাসের পর মাস আমি পল্লীজীবনের গল্প রচনা করে এসেছি। আমার বিশ্বাস এর পূর্বে বাংলা সাহিত্যে পল্লীজীবনের চিত্র এমন ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ হয় নি। তখন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লেখকের অভাব ছিল না, তাঁরা প্রায় সকলেই প্রতাপ সিংহ বা প্রতাপাদিত্যের ধ্যানে নিবিষ্ট ছিলেন। আমার আশঙ্কা হয় এক সময়ে গল্পগুচ্ছ বুর্জোয়া লেখকের সংসর্গদোষে অসাহিত্য ব'লে অস্পৃশ্য হবে। এখনি যখন আমার লেখার শ্রেণী নির্ণয় করা হয় তখন এই লেখাগুলির উল্লেখমাত্র হয় না, যেন ওগুলির অস্তিত্বই নেই। জাতে ঠেলাঠেলি আমাদের রক্তের মধ্যে আছে তাই ভয় এই আগাছাটাকে উপড়ে ফেলা শক্ত হবে।

কিছুকাল থেকে আমি দুঃসহ রোগ-দুঃখ ভোগ করে আসছি সেইজন্য যদি বলে বসি যাঁরা আমার শুশ্রূষায় নিযুক্ত তাঁরাও মুখে কালো রঙ মেখে অস্বাস্থ্যের বিকৃত চেহারা ধারণ করে এলে তবেই সেটা আমার পক্ষে আরামের হতে পারে তা হলে মনোবিকারের আশঙ্কা কল্পনা করতে হবে। প্রকৃতির একটা নির্মল প্রসন্নতা আছে। ব্যক্তিগত জীবনে অবস্থার বিপ্লব ঘটে কিন্তু তাতে এই বিশ্বজনীন দানের মধ্যে বিকৃতি ঘটে না ; সেটা আমাদের সৌভাগ্য তাতে যদি আপত্তি করার একটা দল পাকাই তা হলে বলতে হয় যাঁরা নিঃস্ব তাঁদের জন্যে মরুভূমিতে উপনিবেশ স্থাপন করা উচিত নইলে তাঁদের মনের তুষ্টি অসম্ভব। নিঃস্ব শ্রেণীর পাঠকদের জন্য সাহিত্যেও কি মরু উপনিবেশ স্থাপন করতে হবে?

তোমার লেখা উপলক্ষ মাত্র করে আমি সাহিত্য বিচার সম্বন্ধে আমার মত ব্যক্ত করেছি, রোগজীর্ণ ক্লান্ত মনের অসংলগ্ন উক্তি। এ কথাও বলে রাখা দরকার এর অধিকাংশই আমি শ্রীমান সুধাকান্তকে মুখে মুখে বলে গিয়েছি। সুতরাং এ রকম ভাষণের দুর্বলতা ক্ষমার যোগ্য।

১০ আষাঢ় ১৩৪৮

প্রথম বিভাগ

চতুর্থ অধ্যায়

ঐতিহাসিক চিত্র

সূচনা

ঐতিহাসিক চিত্রের সূচনা লিখিবার জন্য সম্পাদক-দত্ত অধিকার পাইয়াছি, আর কোনো প্রকারের অধিকারের দাবি রাখি না। কিন্তু আমাদের দেশের সম্পাদক ও পাঠকবর্গ লেখকগণকে যেরূপ প্রচুর পরিমাণে প্রশ্রয় দিয়া থাকেন তাহাতে অনধিকার প্রবেশকে আর অপরাধ বলিয়া জ্ঞান হয় না।

এই ঐতিহাসিক পত্রে আমি যদি কিছু লিখিতে সাহস করি তবে তাহা সংক্ষিপ্ত সূচনাটুকু। কোনো শুভ অনুষ্ঠানের উৎসব উপলক্ষে ঢাকীকে মন্ত্রও পড়িতে হয় না, পরিবেশনও করিতে হয় না— সিংহদ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া সে কেবল আনন্দধ্বনি ঘোষণা করিতে থাকে। সে যদিচ কর্তাব্যক্তিদের মধ্যে কেহই নহে, কিন্তু সর্বাগ্রে উচ্চকলরবে কার্যারম্ভের সূচনা তাহারই হস্তে।

যাঁহারা কর্মকর্তা, গীতা তাঁহাদিগকে উপদেশ দিয়াছেন যে : কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন। অর্থাৎ কর্মেই তোমার অধিকার আছে, ফলে কদাচ নাই। আমরা কর্মকর্তা নহি। আমাদের একটা সুবিধা এই যে, কর্মে আমাদের অধিকার নাই, কিন্তু ফলে আছে। সম্পাদক-মহাশয় যে অনুষ্ঠান ও যেরূপ আয়োজন করিয়াছেন তাহার ফল বাংলার, এবং আশা করি অন্য দেশের, পাঠকমণ্ডলী চিরকাল ভোগ করিতে পারিবেন।

অদ্য 'ঐতিহাসিক চিত্রে'র শুভ জন্মদিনে আমরা যে আনন্দ করিতে উদ্যত হইয়াছি তাহা কেবলমাত্র সাহিত্যের উন্নতিসাধনের আশ্বাসে নহে। তাহার আরো একটি বিশেষ কারণ আছে।

পরের রচিত ইতিহাস নির্বিচারে আদ্যোপান্ত মুখস্থ করিয়া পণ্ডিত এবং পরীক্ষায় উচ্চ নম্বর রাখিয়া কৃতী হওয়া যাইতে পারে, কিন্তু স্বদেশের ইতিহাস নিজেরা সংগ্রহ এবং রচনা করিবার যে উদ্‌যোগ সেই উদ্‌যোগের ফল কেবল পাণ্ডিত্য নহে। তাহাতে আমাদের দেশের মানসিক বদ্ধ জলাশয়ে স্রোতের সঞ্চার করিয়া দেয়। সেই উদ্যমে, সেই চেষ্টায় আমাদের স্বাস্থ্য— আমাদের প্রাণ।

বঙ্গদর্শনের প্রথম অভ্যুদয় বাংলা দেশের মধ্যে একটি অভূতপূর্ব আনন্দ ও আশার সঞ্চার হইয়াছিল, একটি সুদূরব্যাপী চাঞ্চল্যে বাংলার পাঠক হৃদয় যেন কল্লোলিত হইয়া উঠিয়াছিল। সে আনন্দ স্বাধীন চেষ্টার আনন্দ। সাহিত্য যে আমাদের আপনাদের হইতে পারে, সেদিন তাহার ভালো রূপ প্রমাণ হইয়াছিল। আমরা সেদিন ইস্কুল হইতে, বিদেশী মাস্টারের শাসন হইতে, ছুটি পাইয়া ঘরের দিকে ফিরিয়াছিলাম।

বঙ্গদর্শন হইতে আমরা 'বিষবৃক্ষ', 'চন্দ্রশেখর', 'কমলাকান্তের দপ্তর' এবং বিবিধ ভোগ্য বস্তু পাইয়াছি, সে আমাদের পরম লাভ বটে। কিন্তু সকলের চেয়ে লাভের বিষয় সাহিত্যের সেই স্বাধীন চেষ্টা। সেই অবধি আজ পর্যন্ত সে চেষ্টার আর বিরাম হয় নাই। আমাদের সাহিত্যের ভাবী আশার পথ চিরদিনের জন্য উন্মুক্ত হইয়া গিয়াছে।

বঙ্গদর্শন আমাদের সাহিত্যপ্রাসাদের বড়ো সিংহদ্বারটা খুলিয়া দিয়াছিলেন। এখন আবার তাহার এক-একটি মহলের চাবি খুলিবার সময় আসিয়াছে। 'ঐতিহাসিক চিত্র' অদ্য 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' -নামক একটা প্রকাণ্ড রুদ্ধবাতায়ন রহস্যাবৃত হর্ম্যশ্রেণীর দ্বারদেশে দণ্ডায়মান।

সম্পাদক মহাশয় তাঁহার প্রস্তাবনাপত্রে জানাইয়াছেন— 'নানা ভাষায় লিখিত ভারতভ্রমণকাহিনী এবং ইতিহাসাদি প্রামাণ্য গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ, অনুসন্ধানলব্ধ নবাবিষ্কৃত ঐতিহাসিক তথ্য, আধুনিক ইতিহাসাদির সমালোচনা এবং বাঙালি রাজবংশ ও জমিদার বংশের পুরাতত্ত্ব প্রকাশিত করাই মুখ্য উদ্দেশ্য।'

এই তো প্রত্যক্ষ ফল, তাহার পর পরোক্ষ ফল সম্বন্ধে আশা করি যে, এই পত্র আমাদের দেশে ঐতিহাসিক স্বাধীন চেষ্টার প্রবর্তন করিবে। সেই চেষ্টাকে জন্ম দিতে না পারিলে 'ঐতিহাসিক চিত্র' দীর্ঘকাল আপন মাহাত্ম্য রক্ষা করিয়া চলিতে পারিবে না— সমস্ত দেশের সহকারিতা না পাইলে ক্রমে সংকীর্ণ ও শীর্ণ হইয়া লুপ্ত হইবে। সেই চেষ্টাকে জন্ম দিয়া যদি 'ঐতিহাসিক চিত্রে'র মৃত্যু হয়, তথাপি সে চিরকাল অমর হইয়া থাকিবে।

সমস্ত ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আশা করিতে পারি না, কিন্তু বাংলার প্রত্যেক জেলা যদি আপন স্থানীয় পুরাবৃত্ত সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করে, প্রত্যেক জমিদার যদি তাহার সহায়তা করেন এবং বাংলার রাজবংশের পুরাতন দপ্তরে যে-সকল ঐতিহাসিক তথ্য প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে 'ঐতিহাসিক চিত্র' তাহার মধ্যে প্রবেশাধিকার লাভ করিতে পারে, তবেই এই ত্রৈমাসিক পত্র সার্থকতা প্রাপ্ত হইবে।

এখন সংগ্রহ এবং সমালোচনা ইহার প্রধান কাজ। সমস্ত জনশ্রুতি, লিখিত এবং অলিখিত, তুচ্ছ এবং মহৎ, সত্য এবং মিথ্যা— এই পত্রভাণ্ডারে সংগ্রহ হইতে থাকিবে। যাহা তথ্য-হিসাবে মিথ্যা অথবা অতিরঞ্জিত, যাহা কেবল স্থানীয় বিশ্বাস-রূপে প্রচলিত, তাহার মধ্যেও অনেক ঐতিহাসিক সত্য পাওয়া যায়। কারণ, ইতিহাস কেবলমাত্র তথ্যের ইতিহাস নহে, তাহা মানবমনের ইতিহাস, বিশ্বাসের ইতিহাস। আমরা একান্ত আশা করিতেছি, এই সংগ্রহকার্যে 'ঐতিহাসিক চিত্র' সমস্ত দেশকে আপন সহায়তায় আকর্ষণ করিয়া আনিতে পারিবে।

অর্থব্যবহারশাস্ত্র শ্রমকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে— বন্ধ্য এবং অবন্ধ্য (pro-

ductive এবং unproductive)। বিলাসসামগ্রী যে শ্রমের দ্বারা উৎপন্ন তাহাকে বন্ধ্য বলা হয়; কারণ, ভোগেই তাহার শেষ, তাহা কোনোরূপে ফিরিয়া আসে না। আমরা আশা করিতেছি, 'ঐতিহাসিক চিত্র' যে শ্রমে প্রবৃত্ত হইতেছে তাহা বন্ধ্য হইবে না, কেবলমাত্র কৌতূহল পরিতৃপ্তিতেই তাহার অবসান নহে। তাহা দেশকে যাহা দান করিবে তাহার চতুর্গুণ প্রতিদান দেশের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইবে, একটি বীজ রোপণ করিয়া তাহা হইতে সহস্র শস্য লাভ করিতে থাকিবে।

আমাদের দেশ হইতে রূঢ় দ্রব্য বিলাতে গিয়া সেখানকার কারখানায় কারুপণ্যে পরিণত হইয়া এ দেশে বহুমূল্যে বিক্রীত হয়— তখন আমরা জানিতেও পারি না তাহার আদিম উপকরণ আমাদের ক্ষেত্র হইতেই সংগৃহীত। যখন দেশের কোনো মহাজন এইখানেই কারখানা খোলেন তখন সেটাকে আমাদের সমস্ত দেশের একটা সৌভাগ্যের কারণ বলিয়া জ্ঞান করি।

ভারত-ইতিহাসের আদিম উপকরণগুলি প্রায় সমস্তই এখানেই আছে; এখনো যে কত নূতন নূতন বাহির হইতে পারে তাহার আর সংখ্যা নাই। কিন্তু, কী বাণিজ্যে, কী সাহিত্যে, ভারতবর্ষ কি কেবল আদিম উপকরণেরই আকর হইয়া থাকিবে? বিদেশী আসিয়া নিজের চেষ্টায় তাহা সংগ্রহ করিয়া নিজের কারখানায় তাহাকে না চড়াইলে আমাদের কোনো কাজেই লাগিবে না?

'ঐতিহাসিক চিত্র' ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি স্বদেশী কারখানাস্বরূপ খোলা হইল। এখনো ইহার মূলধন বেশি জোগাড় হয় নাই, ইহার কল-বলও স্বল্প হইতে পারে, ইহার উৎপন্ন দ্রব্যও প্রথম প্রথম কিছু মোটা হওয়া অসম্ভব নহে, কিন্তু ইহার দ্বারা দেশের যে গভীর দৈন্য— যে মহৎ অভাব-মোচনের আশা করা যায় তাহা বিলাতের বস্তা বস্তা সূক্ষ্ম ও সুনির্মিত পণ্যের দ্বারা সম্ভবপর নহে।

৭৭

সুপ্রভাত

রুদ্র, তোমার দারুণ দীপ্তি
এসেছে দুয়ার ভেদিয়া;
বক্ষে বেজেছে বিদ্যুৎবাণ
স্বপ্নের জাল ছেদিয়া।।
ভাবিতেছিলাম উঠি কি না উঠি,
অন্ধ তামস গেছে কি না ছুটি,

রুদ্ধ নয়ন মেলি কি না মেলি
তন্দ্রাজড়িমা মাজিয়া।
এমন সময়ে, ঈশান, তোমার
বিষাণ উঠেছে বাজিয়া।
বাজে রে গরজি বাজে রে,
দগ্ধ মেঘের রন্ধ্রে রন্ধ্রে
দীপ্ত গগন মাঝে রে।
চমকি জাগিয়া পূর্ব ভুবন
রক্তবদন লাজে রে॥

ভৈরব, তুমি কী বেশে এসেছ!
ললাটে ফুঁসিছে নাগিনী;
রুদ্রবীণায় এই কি বাজিল
সুপ্রভাতের রাগিণী ?
মুগ্ধ কোকিল কই ডাকে ডালে ?
কই ফোটে ফুল বনের আড়ালে ?
বহুকাল পরে হঠাৎ যেন রে
অমানিশা গেল ফাটিয়া—
তোমার খড়্গ আঁধার-মহিষে
দুখানা করিল কাটিয়া।
ব্যথায় ভুবন ভরিছে—
ঝর ঝর করি রক্ত-আলোক
গগনে গগনে ঝরিছে।
কেহ-বা জাগিয়া উঠিছে কাঁপিয়া,
কেহ-বা স্বপনে ডরিছে॥

তোমার শ্মশানকিঙ্করদল
দীর্ঘ নিশায় ভুখারি।
শুষ্ক অধর লেহিয়া লেহিয়া
উঠিছে ফুকারি ফুকারি।
অতিথি তারা যে আমাদের ঘরে
করিছে নৃত্য প্রাঙ্গণ-'পরে,
খোলো খোলো দ্বার ওগো গৃহস্থ,

থেকো না থেকে না লুকায়ে—
যার যাহা আছে আনো বহি আনো,
সব দিতে হবে চুকায়ে।
ঘুমায়ো না আর কেহ রে।
হৃদয়পিণ্ড ছিন্ন করিয়া
ভাণ্ড ভরিয়া দেহো রে।
ওরে দীনপ্রাণ, কী মোহের লাগি
রেখেছিস মিছে স্নেহ রে॥

উদয়ের পথে শুনি কার বাণী,
'ভয় নাই, ওরে ভয় নাই—
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান
ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।'
হে রুদ্র, তব সংগীত আমি
কেমনে গাহিব কহি দাও স্বামী—
মরণনৃত্যে ছন্দ মিলায়ে
হৃদয় ডমরু বাজাব;
ভীষণ দুঃখে ডালি ভরে লয়ে
তোমার অর্ঘ্য সাজাব।
এসেছে প্রভাত এসেছে।
তিমিরান্তক শিবশঙ্কর
কী অট্টহাস হেসেছে!
যে জাগিল তার চিত্ত আজিকে
ভীম আনন্দে ভেসেছে॥

জীবন সঁপিয়া, জীবনেশ্বর,
পেতে হবে তব পরিচয়;
তোমার ডঙ্কা হবে যে বাজাতে
সকল শঙ্কা করি জয়।
ভালোই হয়েছে ঝঞ্ঝার বায়ে
প্রলয়ের জটা পড়েছে ছড়ায়ে,
ভালোই হয়েছে প্রভাত এসেছে
মেঘের সিংহবাহনে—
মিলনযজ্ঞে অগ্নি জ্বালাবে
বজ্রশিখার দাহনে।

তিমিররাত্রি পোহায়ে
মহাসম্পদ তোমারে লভিব
সব সম্পদ খোয়ায়ে—
মৃত্যুরে লব অমৃত করিয়া
তোমার চরণে ছোঁয়ায়ে

শান্তিনিকেতন
৮ বৈশাখ ১৩১৪

৭৮

ভূমিলক্ষ্মী

মাতার কাছে ছোটো ছেলে যেমন আবদার করে, মাটির কাছে আমরা তেমনি বরাবর আবদার করিয়া আসিয়াছি। কত হাজার বছর ধরিয়া এই মাটি আমাদের দাবি মিটাইয়া আসিয়াছে। আর যাহাই হউক আমরা কখনো অন্নের অভাব অনুভব করি নাই, কিন্তু আজকাল যেন আমাদের সেই অন্নের অভাব ঘটিয়াছে। মাটি আমাদের এখনকার দিনের সকল আবদার মিটাইতে পারিল না বলিয়া মাটির উপরে আমাদের অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছে।

কিছুকাল হইল বোলপুরের কাছে এক গ্রামে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। এক চাষী গৃহস্থের বাড়িতে যাইতেই সে আমাদিগকে বসিবার আসন দিল। নানা কথার পরে সে অনুরোধ করিল যে, অন্তত তাহার একটি ছেলেকে আমাদের বিদ্যালয়ে চাকরি দিতে হইবে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তোমার তো চাষের কাজ আছে, তবে অমন জোয়ান ছেলেকে সাত-আট টাকা মাহিনায় অন্য কাজে কেন পাঠাইতে চাও?' সে বলিল, 'হিসাব করিয়া দেখিয়াছি, চাষে আমাদের কুলায় না। একদিন ছিল যখন ইহাতেই আমাদের অভাব স্বচ্ছন্দে মিটিত, কিন্তু এখন সেদিন গিয়াছে।'

ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে চাষী ঠিকমতো করিয়া বুঝাইয়া বলিতে পারিল না। কিন্তু আসল কথা, একদিন এমন ছিল যখন খাদ্য যেখানে উৎপন্ন হইত সেইখানকার প্রয়োজনেই তাহার খরচ হইত। তখন দেশে রেলের রাস্তা খোলে নাই। গোরুর গাড়ি এবং নৌকার যোগে বেশি পরিমাণে ফসল বেশি দূরে সহজে যাইতে পারিত না। তার পরে পৃথিবীর দেশ-বিদেশের সঙ্গে আমাদের বাণিজ্যের সম্বন্ধ এমন বহুবিস্তৃত ছিল না, সুতরাং মাল চালানের পথও ছিল সংকীর্ণ, মাল কিনিবার লোকও ছিল অল্প। তাই মাটির কাছে আমাদের দাবি বেশি ছিল না, আর সেই দাবি মিটাইবার আয়োজনও

সহজ ছিল। তখন চাষ চলিত না এমন বিস্তর জমি দেশে পড়িয়া থাকিত। আমারই বয়সে দেখিয়াছি— একদিন যে জমি চাষীকে গছাইয়া দিলে সে সেটাকে অত্যাচার মনে করিত, এখন সেই জমি দাম দিয়া মেলে না। তখন দুর্ভিক্ষের দিনে চাষী আপন জমিজমা ফেলিয়া অনায়াসে চলিয়া যাইত, প্রজা পত্তন করা কঠিন হইত। এখন চাষী প্রাণপণে জমি আঁকড়িয়া থাকে, কেননা, জমির দাম বিস্তর বাড়িয়া গিয়াছে।

অথচ চাষী বলিতেছে, জমিতে তাহার অভাব মিটে না। তারা একটা মস্ত কারণ এই যে, চাষীর অভাব অনেক বাড়িয়া গেছে। ছাতা জুতা কাপড় আসবাব তাহার দ্বারের কাছে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, বুঝিয়াছে সেগুলি নইলে নয়। সেই সঙ্গে সঙ্গে দেশ-বিদেশের খরিদ্দার আসিয়া তাহার দ্বারে ঘা দিয়াছে। তাহার ফসল জাহাজ বোঝাই হইয়া সমুদ্রপারে চলিয়া যাইতেছে। তাই, দেশে চাষের জমি পড়িয়া থাকা অসম্ভব হইয়াছে, অথচ সমস্ত জমি চষিয়াও সমস্ত প্রয়োজন মিটিতেছে না।

জমিও পড়িয়া রহিল না, ফসলের দরও বাড়িয়া চলিল, অথচ সম্বৎসর দুইবেলা পেট ভরিবার মতো খাবার জোটে না, আর চাষী ঋণে ডুবিয়া থাকে, ইহার কারণ কী ভাবিয়া দেখিতে হইবে। এমন কেন হয়— যখনি দুর্বৎসর আসে অমনি দেখা যায় কাহারো ঘরে উদ্‌বৃত্ত কিছুই নাই। কেন এক ফসল নষ্ট হইলেই আর-এক ফসল না ওঠা পর্যন্ত হাহাকারের অন্ত থাকে না?

এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, যখন মাটির উপরে আমাদের দাবি সামান্য ছিল, যখন অল্প ফসল পাইলেই আমাদের যথেষ্ট হইত, তখনো যে নিয়মে চাষবাস চলিত এখনো সেই নিয়মেই চলিতেছে— প্রয়োজন অনেক বেশি হইয়াছে, অথচ প্রণালী সমানই আছে। জমি যখন বিস্তর পড়িয়া থাকিত তখন একই জমিতে প্রতি বৎসরে চাষ দিবার দরকার ছিল না, জমি বদল করিয়া জমির তেজ অক্ষুণ্ণ রাখা সহজ ছিল। এখন কোনো জমি পড়িয়া থাকিতে পায় না। অথচ চাষের প্রণালী যেমন ছিল তেমনিই আছে।

চাষের গোরু সম্বন্ধেও ঠিক এই কথাই খাটে। যখন দেশে পোড়ো জমির অভাব ছিল না, তখন চরিয়া খাইয়া গোরু সহজেই সুস্থ সবল থাকিত। আজ প্রায় সকল জমি চষিয়া ফেলা হইল; রাস্তার পাশে, আলের উপরে, যেটুকু ঘাস জন্মে সেইটুকু মাত্র গোরুর ভাগ্যে জোটে, অথচ তাহার আহারের বরাদ্দ পূর্বাপর প্রায় সমানই আছে। ইহাতে জমিও নিস্তেজ হইতেছে, গোরুও নিস্তেজ হইতেছে এবং গোরুর কাছ হইতে যে সার পাওয়া যায় তাহাও নিস্তেজ হইতেছে।

মনে করো কোনো গৃহস্থের যদি গৃহস্থালির প্রতিদিনের প্রয়োজনীয় চাল-ডালের বাঁধা বরাদ্দ অনেক দিন হইতে ঠিক সমানভাবে চলিয়া আসে, অথচ ইতিমধ্যে বৎসরে বৎসরে পরিবারের জনসংখ্যা বাড়িয়া চলে, তবে পূর্বে ঠাকুরদাদা এবং ঠাকরুণদিদি যেমন হৃষ্টপুষ্ট ছিলেন, তাঁহাদের নাতি-নাতনিদের তেমন চেহারা আর থাকিবে না,

ইহাদের হাড় বাহির হইয়া যাইবে, বাড়িবার মধ্যে লিভার পিলে বাড়িয়া উঠিবে। তখন দৈবকে কিংবা কলিকালকে দোষ দিলে চলিবে কেন? ভাঁড়ার হইতে চাল-ডাল আরো বেশি বাহির করিতে হইবে।

আমাদের চাষী বলে, মাটি হইতে বাপদাদার আমল ধরিয়া যাহা পাইয়া আসিয়াছি তাহার বেশি পাইব কী করিয়া? এ কথা চাষীর মুখে শোভা পায়, পূর্বপ্রথা অনুসরণ করিয়া চলাই তাহাদের শিক্ষা। কিন্তু এমন কথা বলিয়া আমরা নিষ্কৃতি পাইব না। এই মাটিকে এখনকার প্রয়োজন অনুসারে বেশি করিয়া ফলাইতে হইবে— নহিলে আধপেটা খাইয়া, জ্বরে অজীর্ণরোগে মরিতে কিংবা জীবন্মৃত হইয়া থাকিতে হইবে।

এই মাটির উপরে মন এবং বুদ্ধি খরচ করিলে এই মাটি হইতে যে আমাদের দেশের মোট চাষের ফসলের চেয়ে অনেক বেশি আদায় করা যায় তাহার অনেক দৃষ্টান্ত আছে। আজকাল চাষকে মূর্খের কাজ বলা চলে না, চাষের বিদ্যা এখন মস্ত বিদ্যা হইয়া উঠিয়াছে। বড়ো বড়ো কলেজে এই বিদ্যার আলোচনা চলিতেছে, সেই আলোচনার ফলে ফসলের এত উন্নতি হইতেছে যে তাহা আমরা কল্পনা করিতে পারি না।

তাই বলিতেছি, গ্রামটুকুকে ফসল জোগান দিতাম যে প্রণালীতে, সমস্ত পৃথিবীকে ফসল জোগান দিতে হইলে সে প্রণালী খাটিবে না। কেহ কেহ এমন কথা মনে করেন যে, আগেকার মতন ফসল নিজের প্রয়োজনের জন্যই খাটানো ভালো, বাহিরে চালান দেওয়া উচিত নহে। সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে ব্যবহার বন্ধ করিয়া, একঘরে হইয়া দুইবেলা দুই মুঠা ভাত বেশি করিয়া খাইয়া নিদ্রা দিলেই তো আমাদের চলিবে না। সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে দেনাপাওনা করিয়া তবে আমরা মানুষ হইতে পারিব। যে জাতি তাহা না করিবে বর্তমান কালে সে টিকিতে পারিবে না। আমাদের ধনধান্য, ধর্মকর্ম, দানধ্যান সমস্তই আজ বিশ্ব-পৃথিবীর সঙ্গে যোগসাধনের উপযোগী করিতেই হইবে; যাহা কেবলমাত্র আমাদের নিজের ঘরে নিজের গ্রামে চলিবে তাহা চলিবেই না। সমস্ত পৃথিবী আমাদের দ্বারে আসিয়া হাঁক দিয়াছে, অয়মহং ভোঃ! তাহাতে সাড়া না দিলে শাপ লাগিবে, কেহ আমাদিগকে বাঁচাইতে পারিবে না। প্রাচীনকালের গ্রাম্যতার গণ্ডির মধ্যে আর আমাদের ফিরিবার রাস্তা নাই।

তাই আমাদের দেশের চাষের ক্ষেত্রের উপরে সমস্ত পৃথিবীর জ্ঞানের আলো ফেলিবার দিন আসিয়াছে। আজ শুধু একলা চাষীর চাষ করিবার দিন নাই, আজ তাহার সঙ্গে বিজ্ঞানকে, বৈজ্ঞানিককে যোগ দিতে হইবে। আজ শুধু চাষীর লাঙলের ফলার সঙ্গে আমাদের দেশের মাটির সংযোগ যথেষ্ট নয়— সমস্ত দেশের বুদ্ধির সঙ্গে, বিদ্যার সঙ্গে, অধ্যবসায়ের সঙ্গে, তাহার সংযোগ হওয়া চাই। এই কারণে বীরভূম জেলা হইতে এই যে 'ভূমিলক্ষ্মী' কাগজখানি বাহির হইয়াছে ইহাতে উৎসাহ অনুভব করিতেছি। বস্তুত লক্ষ্মীর সঙ্গে সরস্বতীকে না মিলাইয়া দিলে আজকালকার দিনে ভূমিলক্ষ্মীর যথার্থ সাধনা হইতে পারিবে না। এইজন্য যাঁহারা এই পত্রিকার

উদ্যোগী তাঁহাদিগকে আমার অভিনন্দন জানাইতেছি এবং এই কামনা করিতেছি তাঁহাদের এই শুভ দৃষ্টান্ত বাংলা দেশের জেলায় জেলায় ব্যাপ্ত হইয়া দেশের কৃষিক্ষেত্র এবং চিত্রক্ষেত্রকে এককালে সফল করিয়া তুলুক।

আশ্বিন ১৩২৫

৭৯

'ধূমকেতু' পত্রিকা

আয় চলে আয়, রে ধূমকেতু,
আঁধারে বাঁধ্ অগ্নিসেতু,
দুর্দিনের এই দুর্গশিরে
উড়িয়ে দে তোর বিজয় কেতন।
অলক্ষণের তিলক রেখা
রাতের ভালে হোক্‌-না লেখা,
জাগিয়ে দে রে চমক্ মেরে'
আছে যারা অর্ধচেতন।

২৪ শ্রাবণ ১৩২৯

৮০

'লাঙ্গল' পত্রিকা

জাগো, জাগো বলরাম,
ধরো তব মরু-ভাঙা হল,
প্রাণ দাও, শক্তি দাও,
স্তব্ধ করো ব্যর্থ কোলাহল

[অন্য পাঠ, পরে 'স্ফুলিঙ্গে' গৃহীত]

ধর হাল, বলরাম,
আন তব মরু-ভাঙা হল
বল দাও ফল দাও
স্তব্ধ হোক ব্যর্থ কোলাহল।

৮১

উপায় : পত্রিকার প্রস্তাবনা

'উপায়' এই শব্দটি শুনলে প্রথমেই মনে হয় বাহিরের পন্থা। ছেলে পড়াশুনায় কাঁচা, পাস করে কী উপায়ে? নোট মুখস্থ করাও। মনে লোভ আছে, দ্বেষ আছে, শান্তি পাব কী উপায়ে? লোভীরা দ্বেষীরা একত্র মিলে লীগ অফ্ নেশন্‌স ফাঁদ্‌লে শান্তি পাওয়া যাবে।

আমাদের দেশে দুঃখ দৈন্য অপমানের প্রতিকার কী উপায়ে হবে এ-প্রশ্ন যখনই জেগে ওঠে তখন মনে এই প্রত্যাশা থাকে যে, পথ বাইরে। অন্নকষ্ট হয়েছে? আচ্ছা, ভালো করে চাষ করো। অর্থকষ্ট হয়েছে? দেশশুদ্ধ সকলে মিলে' চরকা চালাও। রোগে গ্রাম উজাড় হয়ে যাচ্ছে? এমন ডাক্তার খুঁজে বের করো যাঁহারা শহরে জীবিকার চেষ্টা ত্যাগ করে' গ্রামে গিয়ে চিকিৎসা করবেন।

কিন্তু আসল উপায় পথে নয়, পথে যে-মানুষ চলবে তার নিজের মধ্যে। যে-মানুষ চলতেই পারে না, পথ তাকে চালায় না। আমাদের দেশে যত-কিছু দুর্গতি আছে তার মূলগত কারণ হচ্ছে এখানে মানুষ মানুষের সঙ্গে মিলতে পারে না। রাস্তার ওপারে আগুন লাগলে এপারের লোক যে দেশে ঘড়া লুকিয়ে রাখতে ব্যস্ত হয়, পাছে সে ঘড়া নিয়ে টানাটানি করে, সে দেশের আগুন বাহিরের উপায়ে নিব্‌বে না, কেননা তার কপালে আগুন।

মালয় উপদ্বীপে গিয়ে দেখলুম, সেখানে চীন থেকে যে-সব দরিদ্র লোক এসেছিল তারা প্রায় সকলেই সংগতিশীল হয়ে উঠেছে— তারা কেউ হীনবৃত্তি নিয়ে দীনভাবে থাকে না। কেননা তারা পরস্পরের আনুকূল্য করে। ভারতীয় কুলির মধ্যে সেই পরস্পরের যোগ তো নেই-ই, বরঞ্চ তারা সুযোগ পেলেই পরস্পরকে শোষণ করতে থাকে। এই কারণে তারা পুরুষানুক্রমে কুলিই থেকে গেল।

দেশের সকল অভাব সকল অপমানের মূল প্রতিকার হচ্ছে পরস্পরের ঘনিষ্ঠভাবে মিলিত হওয়া। আমাদের সমাজসেবার মধ্যেই পরস্পরের ব্যবধানকে চিরন্তন ক'রে রাখা হয়েছে। এমন-কি, সেই ব্যবধানগুলিকে আমরা ধর্মানুশাসন ব'লেই গণ্য করি। এই কারণেই একদিকে যখন আমরা বলি আমরা সনাতন ধর্ম মানি, তখনই অন্যদিকে উপায়ের বেলা বলতে হয় চরকা চালাও। কিন্তু চরকার সুতোয় মানুষকে মেলাবে না। মানুষ না মিললে কোনো বাহ্য উপায়ে কোনো মহাবিপদ থেকে মানুষ ত্রাণ পাবে না। মানুষের সত্য হচ্ছে মানুষের মিলনে— যে-দেশে মানুষের বিচ্ছেদকেই ধর্ম ব'লে স্বীকার করে, সে দেশকে দুর্গতি থেকে কোনো উপায়ে কেউ রক্ষা করতে পারবে না।

উপায়, বৈশাখ ও শ্রাবণ ১৩৩১

৮২

বিচিত্রা

ছিলাম যবে মায়ের কোলে,
বাঁশি বাজানো শিখাবে ব'লে
চোরাই ক'রে এনেছ মোরে তুমি,
বিচিত্রা হে, বিচিত্রা,
যেখানে তব রঙের রঙ্গভূমি।
আকাশতলে এলায়ে কেশ
বাজালে বাঁশি চুপে,
সে মায়াপুরে স্বপ্নছবি
জাগিল কত রূপে;
লক্ষ্যহারা মিলিল তারা
রূপকথার বাটে,
পারায়ে গেল ধূলির সীমা।
তেপান্তরী মাঠে।

নারিকেলের ডালের আগে
দুপুরবেলা কাঁপন লাগে
ইশারা তারি লাগিত মোর প্রাণে,
বিচিত্রা, হে বিচিত্রা,
কী বলে তারা কে বলো তাহা জানে।
অর্থহারা সুরের দেশে
ফিরালে দিনে দিনে,
ঝলিত মনে অবাক বাণী,
শিশির যেন তৃণে।
প্রভাত-আলো উঠিত কেঁপে
পুলকে কাঁপা বুকে,
বারণহীন নাচিত হিয়া
কারণহীন সুখে।

জীবনধারা অকূলে ছোটে,
দুঃখে সুখে তুফান ওঠে,

আমারে নিয়ে দিয়েছে তাহে খেয়া,
বিচিত্রা, হে বিচিত্রা,
কালো গগনে ডেকেছে ঘন দেয়া।
প্রাণের সেই ঢেউয়ের তালে
বাজালে তুমি বীণ,
ব্যথায় মোর জাগায়ে নিয়ে
তারের রিনিরিন।
পালের 'পরে দিয়েছ বেগে
সুরের হাওয়া তুলে,
সহসা বেয়ে নিয়েছ তরী
অপূর্বেরি কূলে।

চৈত্রমাসে শুক্ল নিশা
জুঁহিবেলির গন্ধে মিশা;
জলের ধ্বনি তটের কোলে কোলে
বিচিত্রা, হে বিচিত্রা,
অনিদ্রারে আকুল করি তোলে।
যৌবনে সে উতল রাতে
করুণ কার চোখে
সোহিনী রাগে মিলাতে মিড়
চাঁদের ক্ষীণালোকে।
কাহার ভীরু হাসির 'পরে
মধুর দ্বিধা ভরি
শরমে-ছোঁওয়া নয়ন জল
কাঁপাতে থরথরি।

হঠাৎ কভু জাগিয়া উঠি
ছিন্ন করি ফেলেছ টুটি
নিশীথিনীর মৌন যবনিকা,
বিচিত্রা, হে বিচিত্রা,
হেনেছ তারে বজ্রানলশিখা।
গভীর রবে হাঁকিয়া গেছ,
'অলস থেকো না গো।'

নিবিড় রাতে দিয়েছ নাড়া,
বলেছ 'জাগো জাগো।'
বাসরঘরে নিবালে দীপ,
ঘুচালে ফুলহার,
ধূলি-আঁচল দুলায়ে ধরা
করিল হাহাকার।

বুকের শিরা ছিন্ন ক'রে
ভীষণ পূজা করেছি তোরে,
কখনো পূজা শোভন শতদলে,—
বিচিত্রা, হে বিচিত্রা,
হাসিতে কভু, কখনো আঁখিজলে।
ফসল যত উঠেছে ফলি
বক্ষ বিভেদিয়া
কণাকণায় তোমারি পায়
দিয়েছি নিবেদিয়া।
তবুও কেন এনেছ ডালি
দিনের অবসানে;
নিঃশেষিয়া নিবে কি ভরি
নিঃস্ব-করা দানে।

শান্তিনিকেতন
৭ বৈশাখ ১৩৩৪

পরিচয়

কল্যাণীয়েষু—

তোমার ত্রৈমাসিকের আসরে আমার কোনো একটি লেখার উদ্দেশে তোমার আমন্ত্রণ আছে। কোনো সাজসজ্জা না ক'রে এক-ছুটে গেলে যদি মানা না পায় তা হলে এই শুরু হল।

প্রথম যখন রামানন্দবাবু প্রদীপ ও পরে প্রবাসী বের করলেন তাঁর কৃতিত্ব ও সাহস দেখে মনে বিস্ময় লাগল। আকারে বড়ো, ছবিতে অলংকৃত, রচনায় বিচিত্র, এমন দামি জিনিস যে বাংলা দেশে চলতে পারে তা বিশ্বাস হয় নি। তা ছাড়া এর আগে বাংলা সাময়িক পত্রে সময়রক্ষা করে চলার বাঁধাবাঁধি ছিল না। সেকালে মধ্যাহ্নভোজনের নিমন্ত্রণ যেমন অপরাহ্ণ বা সায়াহ্নে যাত্রা শুরু করতে লজ্জিত হত না, মাসিকপত্র তেমনি ললাটে-মলাটে বৈশাখ মাসের তিলক কেটে অগ্রহায়ণ মাসে যখন অসংকোচে আসরে নামত সহিষ্ণু পাঠকের কাছে কোনো কৈফিয়তের দরকার হত না। পাঠকের ক্ষমাগুণের 'পরে নির্ভর করে এমনতর আটপৌরে ঢিলেমি করবার সুযোগ প্রবাসী-সম্পাদক স্বীকার করেন নি— নিজের মানরক্ষার খাতিরেই সময়রক্ষার স্খলন হতে দিলেন না। তিনি প্রমাণ করলেন বাংলা সাময়িক পত্রে এই প্রচুর ভোজ এবং নূতন ভদ্র চাল অচল হবে না। বস্তুত পাঠকদের এমন অভ্যাস জন্মে গেল যে আয়োজনে কম পড়লে বা আচরণে শৈথিল্য ঘটলে আর নিজগুণে তারা ত্রুটি মার্জনা করবে না যে, এতে সন্দেহ রইল না।

তার পর থেকে চলল এই ছাঁদেরই মাসিক পত্রের অনুকরণ। নূতনত্বের চেষ্টা কেবল পরিমাণবাহুল্যের দিকে, ফর্মা বৃদ্ধির ঘোড়দৌড়। আরো ছবি, আরো গল্প, আরো হাজার রকমের ইত্যাদি।

প্রবাসী-জাতীয় পত্রিকা দেশের একটা প্রয়োজন সিদ্ধি করেছে। জনসাধারণের চিত্তকে সাহিত্যের নানা উপকরণ দিয়ে তৃপ্ত করা এর ব্রত। এতে মনকে একেবারে জড়তায় জড়াতে দেয় না, নানা দিক থেকে মৃদু আঘাতে জাগিয়ে রাখে। এদিকে দেশে লেখক বেশি নেই, এবং অধিকাংশ পাঠক গভীর বিষয়ে মনকে নিবিষ্ট করতে নারাজ। উদ্‌বোধনের চেয়ে উত্তেজনা তারা স্বভাবত বেশি পছন্দ করে। তাই সাহিত্যের মাসিক মজলিশে মদ যদি-বা নাও থাকে অন্তত কড়া চুরুটের প্রচুর আমদানি চাই, সাহিত্যিক তা-পাশার চেয়ে ভারী রকমের আয়োজনে বৈঠকের রসভঙ্গ হয়।

সাধারণের সঙ্গে যদি কারবার করতে হয় তবে সাধারণের দাবি অজস্র পরিমাণেই মেটানো চাই। নইলে কাজ চলেই না। তাই লোকচিত্তরঞ্জনের ব্যবস্থা জগৎ জুড়েই হালকা হয়ে গেছে। যারা সেই হালকা দরের মন-ভোলানো মাল যথেষ্ট পরিমাণে ও

নিঃসংকোচে জোগাতে পারে তাদের সঙ্গেই আর সকলের প্রতিযোগিতা। হাঁড়ি চলা চাই যে। এ ব্যবসায়ে যারা আছে তাদের মনে উচ্চ সংকল্প থাকলেও নিজের অজ্ঞাতসারে আদর্শ নিচু হয়ে আসে। সাধারণের মন-জোগাবার আয়োজন চারি দিকে যতই বিস্তারিত হয় ততই অলস মনের শৌখিন ফরমাস বেড়ে ওঠে। বিপদ এই, তাদেরই বাহবার বাজার দর বেশি। উপযুক্ত লেখকের সংখ্যা কম অথচ লেখার পরিমাণ সীমা মানতে চায় না। অর্থাৎ ভোজে রবাহূত অতিথিসমাগমে পাত পাড়া বেড়েই চলেছে, অথচ দইয়ের হাঁড়ি সে-অনুপাতে টানলে বাড়ে না, তাতে জলের উপর নির্ভর করতেই হয়, আর সে-জলও সকল সময়ে বিশুদ্ধ হতে পারে না। যদি একজন থিয়েটারওয়ালা লোভ দেখায় যে দু টাকার টিকিটে রাত একটা পর্যন্ত অভিনয়ের পালা চালাবে, তা হলে তার চেয়েও দুঃসাহসিক রাত্রি দুটোর কমে বাতি নেবায় না। তবুও সময় বাড়ালে ভোগ্য বস্তুটাকে ফিকে না করা অসম্ভব— অথচ তাতে নেশার কমতি হলে মঞ্জুর হবে না। এর ফল হয় এই যে, মিতাচারী যে-মানুষ রাত এগারোটা পর্যন্ত ভালো জিনিসের রস ভোগ করে ভালো মানুষের মতো বাড়ি ফিরতে চায় তার আর উপায় নেই। এমন-কি, ক্রমে তারও অভ্যাস মাটি হওয়ার আশঙ্কা আছে।

মেন্‌কেন্‌ একজন নামজাদা মার্কিন লেখক, অল্পদিন হল তিনি একটা লেখায় বলছিলেন— হঠাৎ আর্থিক দুর্গতি ঘটায় আমেরিকায় সম্প্রতি পাঠক সংখ্যা কমে গেল, তাতে দায়ে পড়ে রচনার পরিমাণ কমে যাচ্ছে। তাঁর মতে এটাকে বলা যায় শাপে বর। চার দিক থেকে লেখা চাই লেখা চাই রবে উপযুক্ত পরিমাণ সময় নিয়ে লেখবার অবকাশ থাকে না। বইয়ের পাত ও নিজের গাঁঠ ভরাবার প্রলোভন যদি শান্ত হয় তা হলে লেখার উপরে নিষ্কামভাবে ষোলো আনা মন দেওয়া সহজ হবে। নইলে অত্যন্ত পসারগ্রস্ত ডাক্তার যেমন হাসপাতালে ঢুকে তাড়াতাড়ি একধার থেকে নাড়ি টিপে বাঁধা নিয়মে চলতি ওষুধের প্রেসক্রিপশন লিখে দিয়ে দ্রুত পদে মোটরে চড়ে বসেন— তেমনি বহু ফরমাসে আক্রান্ত লেখক বাঁধা খদ্দেরদের সাধারণ পছন্দ বাঁচিয়ে হু হু করে কলম চালিয়ে যান— ঘন ঘন নগদ-বিদায়ে তাঁদের ব্যাবসা চলে। এই নগদ-বিদায়ের বস্তা বস্তা লেখা কমে যায় লোভের তাগিদ কমলেই। এর থেকে বোঝা যায়, পাঠক-সাধারণের নিয়ত দাবির কর্ষণে সকল দেশেই সস্তা সাহিত্যের প্রচুর ফলন ফলছে, অর্থাৎ খেলো নবাবীর বাহুল্যে কাশ্মীরে ঝুঁটা শালের উৎপত্তি বিপত্তির মতোই হয়ে উঠল, যথেষ্ট সময় দিয়ে সেকেলে ভালো শাল রচনা সময়ে ও সামর্থ্যে এখন আর পোষায় না। সে-সব বড়ো দরের শিল্প যাবার দাখিল।

আমার বক্তব্য, সাহিত্যেই কী, ব্যবহার সামগ্রীতেই কী, অধিকাংশের সম্বলের দিকে তাকিয়ে এ কথা বলতেই হবে যে, সস্তা সামগ্রীর প্রয়োজন বহু পরিমাণে আছে। তাই ব'লে, আদর্শের দাবি, পরিমাণের মাপে যার বিচার করা চলে না, সে যদি স্তরে স্তরে চাপা পড়তে থাকে তা হলে তার চেয়ে শোকাবহ আর কিছুই হতে পারে না।

আদর্শরক্ষা করতে গেলে প্রয়াসের দরকার, সাধনা না হলে চলে না। বারোয়ারির আসরে দাঁড়িয়ে সাধনা অসম্ভব। সেই সাধনাপেক্ষী সাহিত্যের জন্য সময়ও চাই বড়ো; ক্ষেত্রও চাই উদার। এ-জায়গায় ভিড় জমাবার আশা নেই, কাজেই গুণজ্ঞের পরিতোষ ছাড়া অন্য পারিতোষিকের আকাঙ্ক্ষা বিসর্জন দিতেই হবে। সাধারণের খ্যাতি-নিন্দার চড়া নামা অনুসারে অর্থের দিকে সাহিত্যবাজারের এক্সচেঞ্জ রেট ওঠে নামে। সেদিকে দুর্যোগ ঘটলেও মনের শান্তি রক্ষা করা চাই। শান্তি থাকে না যদি অর্থের প্রয়োজন থাকে। শঙ্করাচার্যের উপদেশ মেনে অর্থকে অনর্থ বলে উড়িয়ে দিয়ে লক্ষ্মীর ভ্রূভঙ্গ উপেক্ষা করেও যদি সরস্বতীর ভজনা করবার ভরসা থাকে তবেই বিশুদ্ধভাবে অবিচলিত মনে সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধনায় নিবিষ্ট হওয়া সম্ভব হয়।

একদা আমাদের দেশে ব্রাহ্মণদের উপর দায়িত্ব ছিল ভারতবর্ষের ইতিহাসজাত শ্রেষ্ঠ আদর্শের বিশিষ্টতাকে বিশুদ্ধ রাখবেন তাঁরা। সেই উদ্দেশ্যে, জীবনযাত্রায় আড়ম্বরের বাহুল্য তাঁদের কমাতে হল। তাঁদের কাছ থেকে উজ্জ্বল বেশ বা আত্মঘোষণার বিচিত্র সমারোহ কেউ প্রত্যাশাই করত না। তাঁদের সম্মান নির্ভর করত তাঁদের সত্যের উপর, গভীর সংযম ও বাহুল্যবর্জিত সুরুচির উপর। অর্থাৎ পরিমাণ নিয়ে তাঁদের বিচার ছিল না, তাঁদের গৌরব ছিল আন্তরিক পরিপূর্ণতা নিয়ে। জনসাধারণের সম্মতি মেনে নিয়ে তাঁদের আদর্শ টিঁকে ছিল না, তাঁদের আদর্শকেই জনসাধারণে সবিনয়ে মেনে নিত। তার কারণ, সাধনার দ্বারাই তাঁরা সত্যের অধিকার পেয়েছিলেন। ভোগবাহুল্য-বর্জিত উপকরণ-বিরল জীবনযাত্রার জন্যে তাঁদের যে-পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন ছিল জনসাধারণ সেটা জুগিয়ে দেওয়া দ্বারাই নিজেকে সার্থক ও সম্মানিত জ্ঞান করত— সেজন্য কারো মন জুগিয়ে তাঁদের মাথা হেঁট করতে হত না। যখন থেকে ব্রাহ্মণ নিজের দায়িত্বরক্ষার কঠিন সাধনা ছেড়ে দিয়ে কেবল পৈতে দেখিয়ে সম্মান ও অর্থ আদায়ের সহজ পথ অবলম্বন করলেন তখন থেকে কী ঘটল এ-প্রসঙ্গে সে-আলোচনা অনাবশ্যক।

আমার বলবার কথা এই, সাধারণের মন না রেখে সাহিত্যের বিশিষ্টতা রাখবার দায়িত্ব কোনো-না-কোনো জায়গায় থাকা চাই। নইলে দেখতে দেখতে সাহিত্য অন্ত্যজবর্ণের রূপ ধরবেই। বিশিষ্ট সাহিত্যকে অবলম্বন করে একটি মাসিক পত্র প্রকাশের প্রস্তাব নিয়ে একদিন মণিলাল আমার কাছে এসেছিল। আমি জানতুম, এটা কঠিন কাজ— আমার অন্য কর্তব্যের উপর এটা চাপালে বোঝা দুঃসহ ভারী হবে তাই নিজে এ-দায় নিতে রাজি হলুম না। অথচ অত্যন্ত প্রয়োজন আছে এ কথা অনেকদিন ভেবেছি— তাই সংকল্পটাকে একেবারে নামঞ্জুর করতে পারলুম না। নৌকো ভাসাবার জন্যে প্রথম ধাক্কাটা দিতে এবং কিছুদিনের জন্যে লগি ঠেলতে রাজি হলুম। তখন বয়স এখনকার চেয়ে অল্প এবং সাহস এখনকার চেয়ে বেশি ছিল। প্রমথকে সম্পাদক করতে পরামর্শ দিয়েছিলুম। কেননা যদিও তিনি পড়াশুনো

করেছেন আমাদের চেয়ে অনেক বেশি, তবু সংকলনের দ্বারা ঝুলি ভর্তি করা মন তাঁর নয়। ভাবনা সম্বন্ধে তাঁর নিজের মনের একটা স্বকীয় প্রবর্তনা ও লেখবার সম্বন্ধে একটা স্বকীয় ছাঁদ আছে। সম্পাদকের এই গুণ থাকলে কাগজটা বেগবান হয়ে ওঠে। এই বেগ তাঁর সহযোগী লেখকদের মনকে ঠেলা দিয়ে তাঁদের চিত্তকে সতর্ক ও উদ্যমশীল করে রাখতে পারে।

মণিলালের সঙ্গে প্রথম শর্ত এই হল যে, যারা ওজন দরে বা গজের মাপে সাহিত্য-বিচার করে তাদের জন্যে এ-কাগজ হবে না। সব লেখাই পয়লা নম্বরের হওয়া অসম্ভব, দ্বিতীয় শ্রেণীতেও ভিড় হয় না, অতএব আয়তন ছোটো করতেই হবে। গল্প না দিলে মরণং ধ্রুবং, তবু বাড়াবাড়ি বর্জনীয়, অর্থাৎ গল্প স্বল্প হবে, এক গ্রাসে দুটো-চারটে চলবে না। ছবি দেওয়া নিষেধ, বিজ্ঞাপনের বোঝাও পরিত্যাজ্য, তার মানে, মুনফার লোভ থেকে দৃষ্টি যথাসম্ভব ফিরিয়ে আনা চাই। লোকসান জিনিসটা কারো পক্ষে প্রার্থনীয় নয়, তা হোক, ছোটো আয়তনের কাগজে ছোটো আয়তনের লোকসান সাংঘাতিক হবে না এই ভেবে মনটাকে বেপরোয়া এবং কলমটাকে নিঃসংকোচ রাখাই ভালো। মণিলাল রাজি হলেন, বললেন, এ-কাগজে ব্যাবসার ছোঁয়াচ একটুও লাগবে না। লক্ষ্মীদেবী সকৌতুকে হাসলেন কিন্তু ভ্রূকুটি করলেন না।

বিনয় রক্ষা করে সাবধানে কথা কওয়া শাস্ত্রবিহিত। আমরাই উঁচুদরের লেখার আদর্শ প্রবর্তন করবার জন্যে সংসারে এসেছি এই কথা সর্বদা মনে রেখে লেখকীয় উচ্চ বর্ণের ছুঁৎমার্গ অবলম্বন করে চলার ভঙ্গিটাকে ইংরেজিতে বলে হাই-ব্রাউয়িজম, উঁচ-কপালেগিরি। এটা ভালো নয়— তাই বলে নত-চক্ষু অতি-নম্র ছদ্ম বিনয়ের আত্মলাঘব ভঙ্গিটা মাটির মানুষের লক্ষণ বলে সাধারণে প্রশংসিত হলেও সেটাকে পরিহার করা চাই। আমাদের মধ্যে শক্তির পরিমাণ কার কত তা নিয়ে নিজের মনে বা পরের কানে কথা তুলতে গেলে অত্যুক্তি এসে পড়বে। কিন্তু এ কথা বলতে দোষ নেই, যে, যার যত শক্তি থাক্ তার উপযুক্ত প্রকাশের জন্যে বাইরের দাবিটা একটা মস্ত প্রেরণা। আকাশে আষাঢ়ের সজল মেঘ ফিরে ফিরে আসে অথচ পৃথিবীর হাওয়ায় রসের অভ্যর্থনা নেই— মেঘ অল্পস্বল্প জল ছিটিয়ে ছিটিয়ে চলে যায়, মাটি যথেষ্ট ভেজে না। দানের জল আষাঢ়ের কমণ্ডলুতে পুরো পরিমাণ আছে কিন্তু ধরার অঞ্জলি ঠিকমতো করে তুলে ধরা হয় নি বলে ঋতুর দানসত্র ব্যর্থ হয়ে গেল এমন ঘটনা বার বার ঘটে। সাহিত্যেও সে কথা খাটে। আমি মণিলালকে এই কথাটি বললুম, 'তুমি যে-কাগজ বের করবে তাতে পাঠকদের দেবার বরাদ্দটাই বড়ো কথা নয়, লেখকদের উপর দাবির কথাটা তার চেয়েও বড়ো কথা। সে-দাবি অর্থযোগে বা শব্দযোগে প্রবন্ধ চাওয়া নয়— কাগজের চরিত্রের মধ্যেই সে-দাবি থাকবে। সে-চরিত্র অলক্ষিতে লেখককে উদ্‌বুদ্ধ করে সাবধান করে ; লেখায় অপরিচ্ছন্নতা, শৈথিল্য, চিন্তার দৈন্য আপনিই সংকুচিত হয় ; অন্তত আপন উত্তরীয়টাকে ধোপ দিয়ে না আনলে মান

রক্ষা হয় না। তোমার পত্রিকার একটা চারিত্রবৈশিষ্ট্য থাকা চাই— অর্থাৎ অন্যের প্রতি নিজের ব্যবহারেও তার তপস্যা থাকবে, নিজের প্রতি অন্যের ব্যবহারকেও সে সৃষ্টি করে তুলবে।'

অবশেষে সবুজ পত্র বাহির হল। এই পত্রকে প্রতিষ্ঠিত ক'রে তোলবার জন্যে কিছুকাল সাধ্যমতো চেষ্টা করেছিলেম সে কথা তোমাদের জানা আছে। আশা ছিল ক্রমে আবার ভার লাঘব হবে এবং একদল নতুন লেখক নিজের শক্তিকে আবিষ্কার করে নতুন উদ্যমে একে এগিয়ে নিয়ে যাবে। দুজনে লগি ঠেলার জায়গায় পাঁচ-সাতজন দাঁড়ি জুটে গেলে তখন হাঁফ ছাড়ব।

এই অধ্যবসায়ে অন্তত একজন ওস্তাদ লেখকের সাড়া পাওয়া গেল। তখন তাঁর নাম ছিল অজানা, আশা করি, এখন তাঁর নাম জানে এমন লোক খুঁজলে মেলে। তিনি শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত। তিনি নিজের চিত্তের জোরে নিজের মতো করেই ভাবেন এবং স্বচ্ছন্দে সেটা স্বচ্ছ করে প্রকাশ করতে পারেন। তিনি নতুন কালের নতুন লেখক তাতে সন্দেহ নেই, সেইজন্যেই তাঁকে বাইরে নূতনত্বের ভেক ধারণ করতে হয় নি, চিন্তাশক্তির অন্তর্নিহিত সহজ নূতনত্ব নিয়েই তিনি নিশ্চিন্ত।

যাই হোক, ভার কমল না। সাময়িক কাগজের বাঁধা ফরমাস জুগিয়ে চলা সেকেলে ট্রামগাড়ির ঘোড়ার মতো দুঃখী জীবের কাজ। মন ছুটি চাইল, ক্লান্ত হয়ে শেষকালে জবাব দিলুম। বন্ধ হল চিত্রহীন ফর্মাবিরল সবুজ পত্র।

কিন্তু এ ক্ষেত্রে ফর্মা গণনা করে সবুজপত্রের আয়ু নির্ণয় কোরো না। সবুজপত্র বাংলা ভাষার মোড় ফিরিয়ে দিয়ে গেল। এজন্যে যে-সাহস যে-কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে তার সম্পূর্ণ গৌরব একা প্রমথনাথের। এর পূর্বে সাহিত্যে চলতি ভাষার প্রবেশ একেবারে ছিল না তা নয় কিন্তু সে ছিল খিড়কির রাস্তায় অন্দর মহলে। অবগুণ্ঠন খুলে ফেলে সদরের সভায় এখন সে যে প্রশস্ত আসন নিয়েছে সেটা আজকাল তকমা-পরা চোপদারেরও চোখে পড়ে না। এ নিয়ে তর্ক-বিতর্ক বিবাদ বিদ্রূপ যথেষ্ট হয়ে গেছে কিন্তু শুধু যুক্তিতর্কের দ্বারা এ-সব জিনিসের যথার্থ প্রমাণ হয় না। একবার যেমনি একে আত্মপ্রমাণের অবকাশ দেওয়া গেছে, অমনি আপন সহজ প্রাণশক্তির জোরেই সমস্ত বাঁধা আল ডিঙিয়ে আজ বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে সে আপন দখল কেবলই এগিয়ে নিয়ে চলেছে। তার কারণ, এটা জবর দখল নয়, এই দখলের দলিল ছিল তার নিজের স্বভাবের মধ্যেই; ফোর্ট উইলিয়মের পণ্ডিতেরা সংস্কৃত বেড়া তুলে দখল ঠেকিয়ে রেখেছিলেন।

যথার্থ স্বত্বাধিকারীকে প্রবল পক্ষ অনেকদিন যখন বঞ্চিত করেছে তখন তাকে দখল দেওয়াবার জন্যে যে-মানুষ কোমর বেঁধে সীমানার কাছে এসে দাঁড়ায় তার মাথা বাঁচানো শক্ত হয়, কারণ লোকে তাকেই বলে ডাকাত। প্রমথর পিঠে অনেক বাড়ি পড়েছে, কিন্তু অহিংসনীতি তাঁর নয়। মোটা লাঠির ঘা খেয়েছেন, চালিয়েছেন তীক্ষ্ণ

সড়কি। যাই হোক, বাংলা ভাষার হাওয়া যেই পুব দিকে মুখ ফেরাল অমনি তখন থেকে একটা নব বারিবর্ষণের পালা পড়েছে। শুনেছি তরুণেরা বঙ্গসাহিত্যে সম্প্রতি অনেক নূতন কীর্তি করেছেন বলে গৌরব করেন কিন্তু ভাষায় নূতন পথকে বাধামুক্ত করবার যে-উদ্যোগ প্রমথ করেছেন তার চেয়ে ইদানীং আর কী উদ্ভাবিত আমি জানি নে। এটা জানা আছে প্রমথকে বয়স খতিয়ে তরুণ বলবার জো নেই।

দুঃসাহসে ভর করে তুমি 'পরিচয়' ত্রৈমাসিক বের করেছ। এটিকে কী মূর্তি দিলে মন খুশি হবে সেইটি জানবার জন্যে তোমাকে চিঠি লিখতে বসেছিলুম। আমার মতো স্বভাব-কুঁড়ে মানুষ কেজো লোকের চেয়ে অনেক বেশি খেটে মরে, কিন্তু নিজেকে ভোলাবার জন্যে খাটুনিকে কুঁড়েমির মুখোস পরাতে হয়। তোমাকে যখন লিখতে বসলুম প্রথমটা মন পিছু হঠবার চেষ্টা করে বললে, 'বাস রে, আবার কলম ধরো কেন? আমি তাকে দিলাশা দিয়ে বললুম, 'ভয় নেই, একখানা চিঠিমাত্র।' মন তখন দুলকি গতিতে বকে গেল। তাকে লাগাম পরাতে গেলে দুর্ঘটনা ঘটত। কিছুকাল থেকে আমার এই দশা। বহুকালের স্বভাবদোষে নানারকমের চিন্তা অন্তরের ক্ষেত্রে চরে বেড়ায়। বেঁধে যদি তাদের চালাতে যাই তা হলেই বলগা দাঁতে কামড়িয়ে ধরে থেমে যাবার চেষ্টা করে। তখন জিন লাগাম ফেলে দিয়ে খালি পিঠে চড়ে পা দোলাতে দোলাতে মাঠে বাটে বনে বাদাড়ে দৌড় করিয়ে নিয়ে আসি— একেই বলে আমার চিঠি। এ হচ্ছে নিজের মনকে স্বচ্ছন্দে হাওয়া খাওয়ানো। একে চিঠি বলাই ভুল। যাকে লিখি সে লক্ষ্য নয়, সে উপলক্ষ মাত্র। কিন্তু উপলক্ষেরও দাম আছে, এরকম চিঠিও সবাইকে লেখা চলে না। ব্যক্তি-বিশেষের অন্দর দরজার ভিতর দিয়ে অবশেষে এ চিঠিগুলো পৌঁছয় গিয়ে সদরে। তার খোলা জানলায় বসে সে যদি ডাক দিয়ে না আনতে পারে তা হলে রাস্তা পাওয়া যায় না। রাস্তাটি পরিচিত রাস্তা হওয়া চাই। মানে এ নয় যে অনেকদিনের জানা রাস্তা, কিন্তু তার মধ্যে যেন একটি স্বভাবসিদ্ধ পরিচয় আছে, বাধা কম, বন্ধুত্ব থাক্ বা না থাক্, বন্ধুরতা নেই।

বোধ করি আমার কাছে একখানা প্রবন্ধ প্রত্যাশা করেছিলে। আজকাল সেই প্রত্যাশাকে অত্যন্ত ডরাই বলে এই পত্র। এর মধ্যে নিজের কথা অনেকখানি আছে কিন্তু সেটাও অবান্তর, সেই প্রসঙ্গে কিছু বলেছি যেটা প্রবন্ধে বলা চলত। অর্থাৎ কর্তব্যে অলস মনকে তার অজ্ঞাতসারে একটুখানি কর্তব্য করিয়ে নিয়েছি। ইতি—

৮৪

বঙ্গদর্শন

"UTTARAYAN"
Santiniketan, Bengal

বঙ্কিম কর্তৃক সম্পাদিত যে বঙ্গদর্শন একদা সাহিত্যের দিগন্ত উদ্ভাসিত করেছে বাঙালির অনবধানে কালক্রমে তার স্মৃতি অনুজ্জ্বল হয়ে আসবার আশঙ্কা ঘটেছিল। সেই অকৃতজ্ঞতার অপরাধ থেকে দেশকে বাঁচাবার জন্যে যাঁরা বঙ্কিমের এই কীর্তিকে পুনরায় স্বদেশের গোচর করতে প্রবৃত্ত হলেন অন্তরের সঙ্গে তাঁদের উদ্দেশ্যে সাধুবাদ নিবেদন করি।

২৬ বৈশাখ ১৩৪৬

৮৫

সংহতি

সংহতি পত্রিকার নাম সার্থক হোক এই আমি কামনা করি। মানুষের একলা হবার প্রবৃত্তিই হচ্ছে তার রিপু, সত্যভাবে মিলিত হবার সাধনাই কল্যাণ। এই দুই বিরোধ নিয়ে কুরুক্ষেত্র লড়াই মানুষের ইতিহাসে চলে আসছে। এখনো মানুষ শান্তিপর্বে এসে পৌঁছয় নি।

সংহতির মূল প্রবর্তনার ভিন্নতা অনুসারে তার প্রকাশের ভিন্নতা ঘটে। এই মূল প্রবর্তনা যদি রাষ্ট্রিকতা (politics) হয়, পররাষ্ট্রের প্রতিযোগিতায় স্বরাষ্ট্রকে শক্তিমান ও সম্পৎশালী ক'রে তোলবার চেষ্টা হয়, তবে তার দ্বারা যে সংহতি ঘটে সে হয় অহমিকার সংহতি। তার বাহ্যরূপে একটা মিলনের চেহারা দেখা যায় কিন্তু তার মূলতত্ত্ব মিলনতত্ত্ব নয়, প্রধানত সে হচ্ছে দ্বন্দ্ব। সেই বিরাট অহমিকার মেদস্ফীত আত্মম্ভরিতাকে অস্ত্রেশস্ত্রে রত্নালংকারে ভূষিত দেখে লুব্ধ মানুষ তার পূজায় প্রবৃত্ত হয়। এই পূজার প্রধান আয়োজন নরবলি।

সেই বলির মানুষ যে কেবলমাত্র পররাষ্ট্রের মানুষ তা নয়। আপন দেশের বিপুল সংখ্যক মানুষকে যন্ত্রের মধ্যে ফেলে খর্ব না করলে এই রাষ্ট্রিকতার পুষ্টি হয় না। তার

শক্তিমূর্তি লক্ষ লক্ষ মানুষকে কেটে ছেঁটে জুড়ে তেড়ে সৈনিক রূপে নিজের জয়রথ তৈরি করে, যে পর্যন্ত না এই রথে করেই তার শ্মশানযাত্রা ঘটে। তবে ধনমূর্তি লক্ষ লক্ষ মানুষকে পঙ্গু করে তাদের পিণ্ড পাকিয়ে নিজের জয়স্তম্ভকে অভ্রভেদী করে তুলতে থাকে, যে পর্যন্ত না এই স্তম্ভ বিদীর্ণ করে নৃসিংহ বেরিয়ে আসেন।

মানুষের ইতিহাসে এর আগে অনেক দুঃখ দুর্ঘটনা ঘটেছে। শক্তির লোভ ধনের লোভ চিরদিনই নররক্ত পিপাসার পরিচয় দেয়। তার স্বর্ণলঙ্কায় চিরদিনই দেবতাদের হাতে হাতকড়ি পড়েছে। তার দশমুণ্ড বিশহাত দশদিকে ধর্মকে উপেক্ষা করবার জন্য উদ্যত। তাই চিরদিনই তার স্বর্ণলঙ্কায় কোনো-না-কোনো সময়ে আগুনও লেগেছে।

কিন্তু বর্তমান যুগে বিজ্ঞানের সহায়তায় এই রিপু যে রকম কঠিন উপকরণে বিরাট আকারে আপনার গড় বেঁধেছে এমন কোনো দিন করে নি। এর তাড়কা রাক্ষসীর দল জগৎসুদ্ধ লোককে তাড়না করে অতিষ্ঠ করে তুলছে। অবশেষে আজ এই সংহতির চেলাদের মধ্যে কেউ কেউ কেঁদে বলছে, 'শান্তি চাই, শান্তি চাই।' কেননা এবারকার লঙ্কাকাণ্ড ত্রেতাযুগকে হারিয়ে দিয়েছে।

কিন্তু রিপুও পুষব শান্তিও পাব বিধাতার সঙ্গে এমনতর চাতুরিও চলে না। চোরাই মালে ঘর বোঝাই করে বিচারকের কাছে মাপ চাইব এমন দরবার তো মঞ্জুর হবে না। আগুনের পর আগুন লাগবে, যুদ্ধের পর যুদ্ধ বাধবে।

ইতিমধ্যে মানুষের ইতিহাসে অন্ধকার গুহার মধ্যে একটি উপেক্ষিত শক্তি গোপনে আপনার বেগ সঞ্চয় করছিল। পরোপজীবী হয়ে যে ব্যবস্থা আপনাকে পোষণ করে একদিন তার উপজীবিকাই তার পরম শত্রু হয়ে দাঁড়ায়। বর্তমান যুগের সভ্যতার মতো এমন দাসতন্ত্র সভ্যতা আর নেই। এই সভ্যতা উপকরণ বায়ুগ্রস্ত। এই উপকরণের অধিকাংশই তার পক্ষে বাহুল্য। অথচ একে তৈরি করতে, এর ভার বহন করতে, একে রক্ষা করতে বহু দাসের দরকার। তাদের না হলে এ সভ্যতার একদিনও চলে না। তার মানে হচ্ছে, এইখানেই এর সকলের চেয়ে বড়ো দুর্বলতা। তার বিপুল ঐশ্বর্যের দ্বারাতেই এতদিন তার এই দুর্বলতা ঢাকা পড়েছিল। ক্রমে ক্রমে এইটে প্রকাশ হয়ে পড়ছে।

যারা অত্যাবশ্যক তাদের অত্যাবশ্যকতাই তাদের ঐশ্বর্য। যতদিন এ কথা তারা না জানে ততদিন নিজের মূল্য বোঝে না বলেই তারা এত শস্তায় বিকিয়ে যায়। বর্বরের দেশে, শোনা যায়, সোনা, গজদন্ত শুধু পুঁতির মালার দরে বিকিয়ে গেছে। যখনই তারা বাজার দরের খবর পেয়েছে তখনই দামও চড়ে গেছে। তেমনি এতদিন য়ুরোপের রাষ্ট্রিক প্রতাপ দাসের কাঁধে চড়ে জগৎজয় করে বেড়িয়েছে। দাসের দল ভেবেছিল যারা তাদের চালাচ্ছিল তারাই চালাক। অতএব কাঁধ পেতে দিতেই হবে। ইদানীং তারা এই সহজ কথাটা আবিষ্কার করেছে যে তারা না চালালে উপরওয়ালারা অচল। তারা অত্যাবশ্যক অতএব বর্তমানের ঐশ্বর্য তাদেরই হাতে। এই আবিষ্কারের জোরে বর্তমান সভ্যতার বাহনের দল মাঝে মাঝে কাঁধ ঝাড়া দিতে আরম্ভ করেছে— আর

উপরে যারা বসে আছে তারা অত্যন্ত বিচলিত হয়ে উঠেছে, শক্তির যে-উপলব্ধি উপরে চড়ে বসেছিল সেই উপলব্ধিটা নীচে বাহনের মধ্যে প্রবেশ করেছে।

এই বাহনদের সংহতিই যে মানুষের সকল সংহতির চেয়ে বড়ো তা আমি মনে করি নে। কেননা এখানেও দ্বন্দ্বের প্রভাব। শক্তি উপরে বসেও নখদন্ত চালনা করে, নীচে নেমেও সে বৈষ্ণব হয়ে ওঠে না। আমেরিকা দক্ষিণ আফ্রিকায় অস্ট্রেলিয়ায় এশিয়াবাসীদের সঙ্গে পাশ্চাত্যদের যে অন্যায় বিরোধ দেখা যায়, তার মধ্যে কেবল যে ধনীদের হাত আছে তা নয়, ধনের বাহনদের হাতও আছে।

কিন্তু য়ুরোপে কর্মজীবীদের যে দল বেঁধে উঠছে তার মধ্যে একটি বড়ো কথা আছে। সে হচ্ছে এই যে, এই দল নেশনের বেড়াকে একদিন সম্পূর্ণ অতিক্রম করবে এমন আশা দেখা যাচ্ছে। কারণ ধনের রথযাত্রায় যে দড়িটা ধরে টান দিতে হচ্ছে সে দড়িটা সমস্ত পৃথিবীর উপর দিয়ে চলে গেছে, যারা টানছে তারা সকল দেশেরই মানুষ। এই দড়াটার ঐক্যেই তারা এক। তাই এই ঐক্যটাকে অবলম্বন করেই তারা সম্পূর্ণ আঁট বাঁধতে পারবে।

যদি এই আঁট বাঁধা সম্পূর্ণ হয় তা হলে পৃথিবীতে একদিন একটা অতি প্রচণ্ড শক্তির উদ্ভব হবে। এই দুঃসহ শক্তির প্রলোভনই সোভিয়েট সম্প্রদায়কে বিচলিত করেছিল। তারা তাড়াতাড়ি এইটেকে জাগ্রত এবং অধিকার করতে লোলুপ হয়ে উঠেছিল। এবং সকল লোলুপতারই যে লক্ষণ, নিষ্ঠুরতা ও জবরদস্তি— তা সেখানেও দেখা দিয়েছিল।

যাই হোক্, শক্তির লীলা সমাজের উপরের স্তরে আপনার ভাঙাগড়ার কাজ অনেকদিন ধরে করে এসেছে। এই শক্তি এবার নীচের স্তরে আপনার কাজ করবে বলে উদ্যোগ করছে। কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। এই স্তরে যখন তার আধিপত্য দেখা দেবে তখনই যে মানুষের সকল পাপ মোচন হবে, আর শক্তি তার শৃঙ্খল রচনার চিরকেলে ব্যাবসা ছেড়ে দিয়ে রাতারাতি মানুষের মুক্তি সাধনায় প্রবৃত্ত হবে এ কথা আমি বিশ্বাস করি নে। তবে এই কথা সত্য, যে, সুখ-দুঃখ ভালোমন্দের প্রবল সংঘাতের দ্বারাতেই শক্তি সৃষ্টিকার্যের প্রয়োজন সাধন করে— ভূমিকম্প-দৈত্যদের হাতুড়ি-পিটুনির চোটেই আজকের দিনের এই পৃথিবী তৈরি হয়ে উঠেছে। সমাজের নীচের তলার যে-উপকরণ ভাণ্ডারে এতদিন শক্তির কারখানাঘর বসে নি আজ সেখানে যদি বসে তা হলে মানুষ তাতে করে নিছক সুখ পাবে না, তাকে অনেক নতুন নতুন ব্যথা সইতে হবে। সৃষ্টিকার্যে এই ব্যথার দরকার আছে। অতএব তার জন্যে প্রস্তুত থাকাই ভালো।

পৃথিবীর সর্বত্রই মানুষের ইতিহাসের যে চেষ্টা আজ দেখতে পাচ্ছি, ভারত তার থেকে স্বতন্ত্র হয়ে থাকলে বঞ্চিত হবে। নূতন শক্তির যে-বিশ্বব্যাপী মন্দির তৈরি হচ্ছে তার একটি সিংহদ্বার রচনার ভার ভারতকেও নিতে হবে। এই রচনার কাজ যে আরম্ভ হয়েছে, সংহতি পত্রিকাখানি তারই একটি চিহ্ন।

রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাণী-সংবলিত আরো কয়েকটি পত্রিকা

উত্তরা ॥ বঙ্গলক্ষ্মী ॥ উদয়ন ॥ অভ্যুদয় ॥ বেতার জগৎ ॥ মৎস্যজীবী ॥ নিরুক্ত ॥ বিজ্ঞান পরিচয় ॥ পুষ্পপাত্র ॥ ছন্দা ॥ ভারত ॥ প্রচারক ॥ চৈতালী ॥ জয়শ্রী।

৮৬

উত্তরা

বঙ্গের দিগন্ত ছেয়ে বাণীর বাদল
বহে যায় শত স্রোতে রস-বন্যা বেগে ;
কভু বজ্রবহ্নি কভু স্নিগ্ধ অশ্রুজল
ধ্বনিছে সংগীতে ছন্দে তারি পুঞ্জমেঘে ;
বঙ্কিম শশাঙ্ককলা তারি ঘনজটা
চুম্বিয়া মঙ্গলমন্ত্রে রবে স্তরে স্তরে
সুন্দরের ইন্দ্রজাল ; কত রশ্মিছটা
প্রত্যুষে, দিনের অন্তে রাখে তারি পরে
আলোকের স্পর্শমণি। আজি পূর্ববায়ে
বঙ্গের অম্বর হতে দিকে দিগন্তরে
সহর্ষ বর্ষণ ধারা যাক-না ছড়ায়ে
প্রাণের আনন্দবেগে পশ্চিমে উত্তরে
দিল বঙ্গ-বীণাপাণি অতুলপ্রসাদ
চিত্ত-জাগরণী গানে নিত্য আশীর্বাদ।

৮৭

বঙ্গলক্ষ্মী

লক্ষ্মী, তুমি এসো এসো
আনো আনো আলো
দুঃখে সুখে ঘরে ঘরে
পুণ্যদীপ জ্বালো।
আনো শক্তি, আনো দীপ্তি,
আনো শান্তি, আনো তৃপ্তি,
আনো স্নিগ্ধ ভালোবাসা
আনো নিত্য ভালো॥

এসো শুভ লগ্ন বেয়ে, এসো হে কল্যাণী
শুভ সুপ্তি, শুভ জাগরণ দেহ আনি
দুঃখরাতে মাতৃবেশে
জেগে থাকে নির্নিমেষে।
আনন্দ উৎসব তব
শুভ্রহাসি ঢালো॥

৮৮

উদয়ন

আশীর্বাদ

ওঁ

শান্তিনিকেতন

যেন প্রসারিয়া উদয় রশ্মিজাল
বৈজয়ন্তী মেলে দিগন্তরাল
কলির কলুষে কালো মেঘ যত সব
আলোকের যেন না পরাভব ঘটায়
কুয়াশায় যেন ম্লান নাহি হয় ভাল।

৪ চৈত্র ১৩৩৯

৮৯

অভ্যুদয়

শত শত লোক চলে
শত শত পথে।
তারি মাঝে কোথা কোন্ রথে
সে আসিছে যার আজি নব অভ্যুদয়।

দিক্‌লক্ষ্মী গাহিল না জয়;
আজো রাজটিকা
ললাটে হল না তার লিখা।
নাই অস্ত্র, নাই সৈন্যদল,
অস্ফুট তাহার বাণী, কণ্ঠে নাহি বল।
সে কি নিজে জানে
আসিছে সে কী লাগিয়া,
আসে কোন্‌খানে।
যুগের প্রচ্ছন্ন আশা করিছে রচনা
তার অভ্যর্থনা
কোন্ ভবিষ্যতে—
কোন্ অলক্ষিত পথে
আসিতেছে অর্ঘ্যভার।
আকাশে ধ্বনিছে বারংবার—
"মুখ তোলো,
আবরণ খোলো,
হে বিজয়ী, হে নির্ভীক,
হে মহাপথিক—
তোমার চরণক্ষেপ পথে পথে দিকে দিকে
মুক্তির সংকেতচিহ্ন
যাক লিখে লিখে।"

বর্ষশেষ ১৩৩৯

৯০

বেতার জগৎ

ধরার আঙিনা হতে ঐ শোনো
উঠিল আকাশবাণী
অমর লোকের মহিমা দিল যে
মর্ত লোকেরে আনি।
সরস্বতীর আসন পাতিল
নীল গগনের মাঝে,

আলোক-বীণার সভামণ্ডলে
মানুষের বীণা বাজে।
সুরের প্রবাহ ধায় সুরলোকে
দূরকে সে নেয় জিনি
কবি-কল্পনা বহিয়া চলিল
অলখ সৌদামিনী।
ভাঙা-রথ ধায় পুবে পশ্চিমে
সূর্যরথের সাথে,
উধাও হইল মানব-চিত্ত
স্বর্গের সীমানাতে।

শান্তিনিকেতন
৫ অগস্ট ১৯৩৮

৯১

মৎস্যজীবি*

আপনাদের নূতন পত্রিকা মৎস্যজীবি সমাজে সাম্য ও কল্যাণময় ঐক্য বৃদ্ধি সঞ্চারিত করুক। দেশে নানা দৈন্য-বিরুদ্ধভাব দূর করিয়া দেশে মানবসভ্যতার চিরন্তন সত্যে দেশবাসীকে প্রতিষ্ঠিত করুক।

৯২

নিরুক্ত

তোমরা কয়েকজন মিলে নিরুক্ত প্রকাশ করতে উদ্যোগী হয়েছ এ সংবাদে সুখী হয়েছি। কিছুকাল থেকে ভাবের বিকৃতি, ছন্দের স্খলন ও ভাবের দুর্বোধ্য অসংলগ্নতা নিয়ে অকবির পথে কবিযশঃপ্রার্থীর সংখ্যা অবাধে বেড়ে চলেছে। সাহিত্যে এই সংক্রমতা এখনকার বাতাসকে অধিকার করেছে। সুতরাং বাহির থেকে কোনো প্রতিকার-চেষ্টা ব্যর্থ হবে। রুগ্‌ণ সাহিত্য হয় আপনিই আপনার সাংঘাতিকতাকে নিঃশেষ করে

* এই বানানেই মুদ্রিত— সম্পাদক

দেবে, নয়তো বিদেশী সাহিত্যের পালে যখন হাওয়া দেবে উল্টোদিকে তখন দেখাদেখি এরাও সেই দিকে পালের মুখ ফেরাবে। তোমাদের রচনায় তোমরা সাহিত্যের সুস্থ স্বরূপ প্রকাশ করতে থাকো। সেই দৃষ্টান্তের ফল যতটুকু হয় ততটুকুই ভালো মানুষ ফ্যাশানের তাড়ায় দীর্ঘকাল নিজেকে ব্যঙ্গ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়বেই। সেই দিনের জন্য অপেক্ষা করো এবং অবিচলিতচিত্তে আপন কর্তব্য করতে নিযুক্ত থাকো। আমার সময় ও শক্তি নিঃস্ব হয়ে এসেছে অতএব আমি এখন ছুটি নিতে চাই।

৯৩

বিজ্ঞান পরিচয়

প্রকৃতির সঙ্গে সত্য পরিচয় না থাকলে জীবনযাত্রায় মূঢ়তার দ্বার অবারিত থাকে। সকল প্রকার অন্ধ বিশ্বাস অবাধে সমাজের ভাবনা কল্পনা ও ক্রিয়াকলাপকে অধিকার করে বসে। প্রকৃতির সঙ্গে তার সত্য ব্যবহার ভ্রষ্ট হয়ে মানুষকে পদে পদে অকৃতার্থ করে দেয়।

আমাদের দেশের দুর্গতির দৃষ্টান্ত চারি দিকে পরিব্যাপ্ত। আমাদের অধিকাংশ পরাভবের মূল এই অজ্ঞানের মধ্যে, অথচ মোহাবিষ্ট মন তার যথার্থ কারণ বুঝতে পারে না। এইজন্য আমি মনে করি দেশকে বিজ্ঞান-শিক্ষায় অভিষিক্ত করে দেওয়া তার সফলতার সাধনের উদ্দেশে একটি মহৎ কর্তব্য। এই অধ্যবসায়ে বিজ্ঞান-পরিচয় দ্বৈমাসিক পত্রখানি যথেষ্ট সহায়তা করবে সন্দেহ নেই, আমি সর্বান্তঃকরণে তার প্রতিষ্ঠা কামনা করি।

২৮.৮.৪০

৯৪

পুষ্পপাত্র

বুদ্ধির আকাশ যবে সত্যে সমুজ্জ্বল
প্রেমরসে অভিষিক্ত হৃদয়ের ভূমি—
জীবন-তরুতে ফলে কল্যাণের ফল,
মাধুরীর পুষ্পগুচ্ছে উঠে সে কুসুমি।

৯৫

ছন্দা

কাগজের নৌকায়
অক্ষর ভাসায়ে
কোনোখানে কূল পাবে
মিথ্যা আশা এ।

৯৬

ভারত

ভারত নাম নিয়ে নূতনপত্র আজ দেখা দিল। এই কামনা করি এর নাম যেন সার্থক হয়; সমগ্র ভারত যেন এর দৃষ্টিকে অধিকার করে; যেখানে বিচ্ছেদ আছে সেখানেও যেন এ ধৈর্য রক্ষা করতে পারে; ভ্রাতার হাত থেকে আঘাত পেয়েও ক্ষমা করবার শক্তি যেন এর থাকে; কটু ভাষার দ্বারা ক্ষতবেদনাকে কোথাও যেন উত্তেজিত না করে; কলহপ্রিয় পাঠকের কদর্য রুচিকে যেন নিন্দারচনার দ্বারা প্রশ্রয় না দেয়। দেশের যাঁরা বরেণ্য তাঁদের অবমাননার দ্বারা সমস্ত দেশকে যেন বিশ্বসমক্ষে অপমানিত না করে। পত্রখানি এই ঔদার্যের এই সৌজন্যের আদর্শ সকল অবস্থায় যদি রক্ষা করতে পারে তা হলে দেশবিধাতার নিত্য আশীর্বাদ আপনার মধ্যেই সফল করতে পারবে।

১০।১১।৩৯

৯৭

প্রচারক

কঠিন পাথর কাটি
মূর্তিকর গড়িছে প্রতিমা
অসীমের রূপ দিক
জীবনের বাধাময় সীমা।

৯৮

চৈতালী

বসন্ত যে লেখা লেখে বনে বনান্তরে
নামুক তাহারি মন্ত্র লেখনীর 'পরে।

৯৯

জয়শ্রী

ওঁ

বিজয়িনী নাই তব ভয়,
দুঃখে ও বাধায় তব জয়।
অন্যায়ের অপমান
সম্মান করিবে দান,
জয়শ্রীর এই পরিচয়।

৩০ ফাল্গুন ১৩৩৮

দ্বিতীয় বিভাগ

[ইংরেজি]

1

Thirty Songs from The Panjab & Kashmir : Ratan Devī

Foreword

When I was given an opportunity of hearing Ratan Devî sing some Indian songs, I felt uneasy in my mind. I never could believe it possible for an Englishwoman to give us any music that could be hailed as Indian. I was almost certain that it was going to be something that defies all definitions, and that I was expected to sit listening to some of those contemptible tunes that a foreigner, without the power to discriminate and patience to learn, usually picks up in India.

I remembered the unlucky day in my early boyhood, when I was asked by some English ladies to sing. I happened to know a tune of a non-descript kind which had the reputation, with us, of being of Italisn origin, and I confidently selected that one in the hope of its being readily appreciated by my audience. It produced an outburst of merriment, quite unexpected in its irrepressible suddenness, and I was emphatically assured that it might be anything but Italian.

Since then, if asked to sing before Europeans, I boldly took my chance and dealt with Indian songs of unexceptionable character. The result used to be less disastrous, but hardly more satisfactory. So I came to the conclusion that mere tunes cannot stand by themselves, and unless given with some idea of the musical system to which they belong lack all their lustre and meaning. In recent times the attention of Europe has been drawn to all branches of Oriental arts, and I have witnessed the sight of Europeans listening to Indian music with deep interest. But all the same, it is always difficult to know if their appreciation is not altogether fantastic, and until you hear them sing or play, and thus come into the tough of their heart, you cannot realise their true feeling.

It is well-known fact that history is prone to repeat its jokes; and while I was dreading lest it should again be my turn to be the victim of its second perpetration of the one I was subjected to years ago, only with slight variations this time. Ratan Devî began by singing a few European folk-songs with the piano accompaniment. They were delightful, and I prayed in my mind that she should end the evening as she had begun, with the music familiar to her. But fortunately for me, my prayer was not granted.

Ratan Devî left her piano and sat on the floor, squatting down in Indian fashion, and took up he *tambura* on her lap. After the first few notes my misgivings were completely dispelled. The tunes she sang were not of the cheap kind that can easily adapt itself to the uninformed taste of any hasty foreign traveller, satisfying his shallow curiosity. They were Behāg, Kāndrā, Mālkaus,—sung with all their richness of details, depth of modulations and exquisite feeling. The times that she observed were the usual difficult ones in Indian music, the cadence of which is never too obvious or the division of beats too emphatic. Neither tunes nor times were the least modified to make them simpler or to suit then to the European training of the singer.

Though the music was immaculately Indian, yet Ratan Devî's voice was her own, and it could not possibly be mistaken for that of any Indian *ustād.* In our country the execution of a song is considered to be of minor importance. India goes to the extreme of almost holding with contempt any finesse in singing, and our master singers never take the least trouble to make their voice and manner attractive. They are not ashamed if their gestures are violent, their top notes cracked and their bass notes unnatural. They take it to be their sole function to display their perfect mastery over all the intricacies of times and tunes, forms and formalities of the classic traditions. Those of the audience who have the human weakness to demand something more, who are not content with the presentation of a music with its richness of forms and play of power, but whose senses have to be satisfied as well, are held to be beneath the notice of any self-respecting artists. They think it to be the duty of the hireling musicians of dancing parties to cater the inclement of fastidious dandies whose eyes and ears are apt to take offence at the least touch of roughness. Anyhow, the cultivation of the flawless perfection of the exterior has been severely neglected in India.

The ideal is otherwise in Europe. A stupendously vast amount of energy is constantly occupied in this country in perfecting outward details in everything, the least deviation from which takes away from the value of a thing much more than it deserves. Here the stage arrangement must be extravagantly perfect and the artist in the pride of the intrinsic merit of his art cannot afford to pay his respect to the public by appearing careless in the least detail of execution. As Europe is willing to pay a very high price for this, perhaps she has got her reward.

I at once realised this when I heard Ratan Devî sing. There was not a sing of effort in her beautiful voice, and not the least suggestion of the uncouthness we are accustomed to in our singers. The casket was as perfect as the gem.

Sometimes the meaning of a poem is better understood in a translation, not necessarily because it is more beautiful than the original, but as in the new setting the poem has to undergo a trial, it shines more brilliantly if it comes out triumphant. So ti seemed to me that in Ratan Devî's singing our song gained something in feeling and truth. Listening to her I felt more clearly than ever that out music is the music of cosmic emotion. It deals not primarily with the drama of the vicissitudes of human life. It does to give emphasis to the social enjoyment of men. In fact, in all our festivities the business of our music seems to me to bring to the heart of the crowded gathering the sense of the solitude and vastness that surround us on all sides. It is never its function to provide fuel for the flame of our gaiety, but to temper it and add to it a quality of depth and detachment. The truth of this becomes evident when one considers that *Sāhānā* is the *rāgiṅī* specially used for the occasion of wedding festivals. It is not at all gay or frolicsome, but almost sad in its solemnity. Our *rāgiṅī* of springtide and rains, of midnight and daybreak, have the profound pathos of the all-pervading intimacy, yet immense aloofness of Nature.

Ratan Devî sang an ā*lāp* in *Kāndrā*, and I forgot for a moment that I was in a London drawing-room. My mind got itself transported in the magnificence of an eastern night. with its darkness transparent, yet unfathomable, like the eyes of an Indian maiden, and I seemed to be standing alone in the depth of its stillness and stars.

2

Shantiniketan : W.W. Pearson

Introduction

The greatest teachers in ancient India, whose names are still remembered, were forest-dwellers. By the shady border of some sacred river or Himalayan lake they build their altar of fire, grazed their cattle, harvested wild rice and fruits for their food, lived with their wives and children in the bosom of primeval nature, mediated upon the

deepest problems of the soul, and made ti their object of life to grow in sympathy with all creation and in communion with the Supreme Being. There students flocked round them and had their lessons of immortal life in the atmosphere of truth, peace and freedom of the spirit.

Though in later ages circumstances changed and numerous kingdoms, great and small, flourished in wealth and power, and forests began to give way to towns with multiplication of luxuries in the homes of the rich, the highest ideals of civilization in our country ever remained the ideals of those forest sanctuaries. All our great classic poets in their epic verses and dramas looked back with reverence upon that golden daybreak of the awakenment of India's soul.

In the modern time my turn has also come to dream of that age towering above all ages of the subsequent history in the greatness of its simplicity and wisdom of pure life. While spending a great part of my youth in the riverside solitude of the sandbanks of the Padma, a time came when I woke up to the call of the spirit of my country and felt impelled to dedicate my life in furthering the purpose that lies in the heart of her history. I seemed choked for breath in the hideous nightmare of our present time, meaningless in its petty ambitions of poverty, and felt in me the struggle of my motherland for awakening i spiritual emancipation. Our endeavours after political agitation seemed to me unreal to the core and pitifully feeble in their utter helplessness. I felt that it is a blessing of providence that begging should be an unprofitable profession and that only to him who hath shall be given. I said to myself that we must seek for our own inheritance and with it buy our true place in the world.

Then came to me a vision of the fullness of the inner man which was attained in India in the solemn seclusion of her forests when the rest of the world was hardly awake. The truth became clear to me that India had cut her path and broadened it for ages, the path that leads to a life reaching beyond death, rising high above the idealisation of political selfishness and insatiable lust for accumulation of materials. The voice came to me in the Vedic tongue from the *ashrams*, the forest sanctuaries of the past, with the call—"Come to me as the rivers to the sea, as the days and nights to the completion of their annual cycle. Let our taking and imparting truth be full of the radiance of light. Let us never come into conflict with one another. Let our minds speed towards their supreme good."

My heart responded to that call and I determined to do what I could to bring the surface, for our daily use and purification, the stream of ideals that originated in the summit of our past, flowing underground in the depth of India's soil,—the ideal of simplicity of life, clarity of spiritual vision, purity of heart, harmony with the universe, and consciousness of the infinite personality in all creation.

I knew that the lessons of the modern schools and the tendencies of the present time were aggressively antagonistic to these ideals, but also I was certain that the ancient teachers of India were true when they said with a positive assurance : —"It is an absolute death to depart from this life without realising the Eternal Truth of life."

Thus the exclusiveness of my literary life burst its barriers, coming into touch with the deeper aspirations of my country lying hidden in her heart. I came to live in the Shantiniketan sanctuary founded by my father and there gradually gathered round me, under the shades of *śāl* trees, boys from distant homes.

This was the time when Satish Chandra Roy, the author of the following little story, felt attracted to me and to my ideas and devoted himself to building p of the ashram and serving the boys with living food from the fulness of his life. He was barely nineteen, but he was born with a luminosity of soul, In him the spirit of renunciation was a natural product of an extraordinary capacity for enjoyment of life. All his student days he had been struggling with poverty—and yet he cheerfully gave up all chances of worldly prospects when they were near at hand and took his place in the ashram because it was truly his by right. He would have needed no recommendation from me, but unfortunately he died young before he had time to fulfil his promise, leaving the record of his greatness only in the memory of his friends.

I cannot but conclude this preface of mine with an extract from my lecture about Shantiniketan where I have described his connection with the ashram.

"Fortunately for me, Satish Chandra Roy, a young student of great promise, who was getting ready for his B.A. degree. became attracted to my school and devoted his life to carry out my idea. He was barely nineteen but he had a wonderful soul, living in a world of ideas, keenly responsive to all that was beautiful and great in the realm of nature and of human mind. He was a poet who, if he had lived. would surely have taken his place among the immortals of the world-literature, but he died when he was twenty, thus offering his service to our school

only for the period of one short year. With him boys never felt that they were confined in the limits of a teaching class, they seemed to have their access to everywhere. They would go with him to the forest when in the spring the *sal* trees were in full blossom; and he would recite to them his favourite poems, frenzied with excitement. He used to read to them Shakespeare and even Browning—for he was a great lover of Browing— explaining to them in Bengali with his wonderful power of expression. He never had any feeling of distrust for the boys' capacity of understanding; he would talk and read to them about whatever was the subject in which he himself was interested. He knew that it was not all necessary for the boys to understand literally and accurately, but that their minds should be roused, and in this he was always successful. He was not like other teachers, a mere vehicle of text-books. He made his teaching personal, he himself was the source of it, and therefore it was made of life-stuff easily assimilable by living human nature. The real reason of his successes was his intense interest in life, in ideas, in everything around him, in the boys who came in contact with him. He had his inspiration not through the medium of books but through the direct communication of his sensitive mind with the world. The seasons had upon him the same effect as they had upon the plants. He seemed to feel in his blood the unseen messages of nature that are always travelling through space, floating in the air, shimmering in the leaves, tingling in the roots of the grass under the earth. The literature that he studied had not least smell of the library about it. He had the power to see ideas before him, as he could see his friends, with all the distinctness of form and subtlety of life."

3

The Bengali Book of English Verse : Theodore Douglas Dunn

Foreword

The following anthology has its greatest interest in being a self-recording evidence of the earliest response that Bengal gave to the touch of the West. I think we can safely assert that she is the only country in the Orient which has shown any distinct indication of being

thrilled by the voice of Europe as it came to her through literature. We are not concerned with a critical estimate of Bengal's earliest literary adventures in the perilous fields of a foreign tongue. But the important fact is this, that while there are other eastern countries captivated by the sight of immense power and prosperity which Europe presented to us, Bengal has been stirred by the force of new ideas breaking upon her from the western horizon. One of its earliest effects upto our students wås to rouse them into aggressive antagonism against all orthodox conventions, irrespective of their merits. It was a sudden self-assertion of life after its repression for ages. This shock, which roused Bengal, mainly came through literature, and a great part of her energy followed the same channel of literature for its expression.

The most memorable instance of the working of ideas in Bengal in the time of her early contact of mind with Europe, has been Rammohan Roy's message of life to India,—a life centering in the spiritual idea of the all-pervading oneness of God, as inculcated in the Upaniṣhads, and comprehending in its circumference all varieties of human activities from the moral down to he political. It was a call to move and fully to live, not from a blind love of movement, but as directed by an inner guidance coming from the heart of India's own wisdom.

Though the above instance does not directly touch the literary side of our life, yet I cite it to show that it was through her sensitiveness to ideas that Bengal has been deeply moved from the time of her first acquaintance with Europe. And ever since, the same formation of ideals has been going on through various stages of action and reaction. Those who have the talent and love for constructive work can show their productions in a palpable form and with a rapidity of results. But idea works in the depth of life, bringing about fundamental changes in the very soil and seeds, and sprouts forth from the unseen in its own time in a living creative form. Its early energies are engaged and seem wasted in work of destruction, in explosions of discontent in constant vacillation in choice, thus easily lending itself to the charge of volatility and indecision. But life has its side which is vigorously destructive and full of uncertainties and contradictions. The signs of perturbation so evident in Bengal, in her social and religious life, in her intellectual adjustments, only show that creative ideas are at work in the centre of her being. I trust I do not merely prove my patriotic bias by saying that, of all countries in the East, Bengal is most earnestly engaged

in the exploration of life's ideal. All the great personalities she has produced in the modern time have presented to us according to heir light, some ideal solution of life's inner problem. We are fully aware that this is not all that humanity requires, that there are other questions more immediately importunate which have to be answered if we must live ; and there are signs that we are beginning actively to recognise this important fact. But all the same we must confess, that whatever it may have cost us, we have dealt more with the ideas that move our soul by kindling our imagination than with acquiring and arranging materials to help us in our struggle for existence. This has led to an active conflict in Bengal between the Old and the New a constant shifting of her outlooks upon life and an unrest owing to her groping for something positive, by which she can win for good her own true place in the world.

Our present age of renaissance began its career with an exaggerated faith in the foreign and the external, to find out at last that life is a process of constant self-unfolding, whose impulse comes from the centre of its own being. In Bengal we meet with all the different stages of this development, and therefore, more than in other parts of India, it is here that love of imitation of the West runs to excess, pompously proud of its tawdriness and incongruity. On the other hand in Bengal have been originated all the recent movements for the seeking of truth that is our national heritage. The West, which at first drew us on to itself, has forcible flung us back upon a intense consciousness of our personality. The breath of inspiration, coming from the West, has kindled the original spark in us into a flame that lay smothered in the ashes of dead habits and rigidity of traditional forms. This has been illustrated by the course of our literature has taken, almost completely abandoning its earlier foreign bed, finding its natural channel in the mother tongue. The following collection of English poems written by Bengali authors also proves it, in which the earlier writings are timorously imitative, while the later ones boldly burn with their own fire, daring to challenge time's judgement with their claim of immortality. I believe foreign readers, while reading this book, will find much to think of in the fact that Bengal's response through literature to the call of the West is something unique in the history of the moden East. It has a future, for it is quickened with life, and it carries within itself a hope that one day it will become a great channel for communication of ideas between the adventurous West and the East of the immemorial tranquility.

4

The Web of Indian life : Sister Nivedita

Introduction

Indians, like all other peoples of the world. are naturally susceptible to flattery. But unfortunately they have been deprived of their share of it, even in wholesome measure, both by he Fates presiding at the making of their history as well as be the guests partaking of their salt. We have been declared inefficient in practical matters by our governors, foreign missionaries have created a vast literature proclaiming our moral obliquity, while casual visitors have expressed their opinion that we are particularly uninteresting to the intellectual mind of the West. Other peoples' estimate of our work is a great part of our world. and the most important other peoples in the present age being the Europeans, it has become tragic in its effects for us to be unable to evoke their appreciation. There was a time when India could touch the most sensitive part of Europe's mind by storming her imagination with a gorgeous vision of wealth. But cruel time has done its work and the golden illusion has vanished, leaving the ragged poverty of India open to public inspection, charitable for otherwise. Therefore epithets of a disparaging nature from the West find an easy target in India, bespattering her skin and piercing her vital parts. Epithets once given circulation die hard, for they have their breeding-places in our mental laziness and in our natural readiness to believe that whatever is different from ourselves must be offensive. Men can live through and die happy inspite of disparagement, if it comes from critics with whom they have no dealings. But unfortunately our critics not only have the power to give as a bad name, but also to hang us. They play the part of Providence over three hundred millions of aliens whose language they hardly know, and with whom their acquaintance is of the surface. Therefore the vast accumulation of calumny against India, continually growing and spreading over the earth, secretly and surely obstructs the element of heart from finding an entrance into our government.

One can never do justice from a mere sense of duty, to those for whom one lacks respect. And human beings, as we are, justice is not the chief thing that we clam from our rulers. We need sympathy

as well, in order to feel that we have human relationship with them and thus retain as much of our self-respect as may be possible.

For some time past a spirit of retaliation has taken possession of our literature and our social world. We have furiously begun to judge our judges, and he judgement comes from hearts sorely stricken with hopeless humiliation. And because our thoughts have an organs whose sound does not reach outside our country, or even the ears of our governors within its boundaries, their expression is growing in vehemence. The prejudice cultivated on the side of the powerful is no doubt dangerous for the weak, but it cannot be wise on the part of the strong to ignore that thorny crop grown on the opposite field. The upsetting of truth in the relationship of the ruler and the ruled can never be compensated by the power that lies in the grip of the mailed fist.

And this was the reason which made us deeply grateful to Sister Nivedita, that great-hearted Western woman, when she gave utterance to her criticism of Indian life. She had won her access to the inmost heart of our society by her supreme gift of sympathy. She did not come to us with the impertinent curiosity of a visitor, not did she elevate herself on a special high perch with the idea that a bird's eye view is truer than the human view because of its superior aloofness. She lived our life and came to know us by becoming one of ourselves. She became so intimately familiar with our people that she had the rare opportunity of observing us unawares. As a race we have our special limitations and imperfections, and for a foreigner it does not require a high degree of keen-sightedness to detect them. We know for certain that these defects did not escape Nivedita's observation, but she did not stop there to generalise, as most other foreigners do. And because she had a comprehensive mind and extraordinary insight of love she could see the creative ideals at work behind our social forms and discover our soul that has living connection with its past and is marching towards its fulfilment.

But Sister Nivedita, being an idealist, saw a great deal more than is usually seen by those foreigners who can only see things, but not truths. Therefore I have heard her being discredited by the authority of long experience, which is merely an experience of blindness carried through long years. And of these I have the same words to sa which I said to those foreign residents of Japan, whose long experience itself was like a film obscuring the freshness of their sight. making them conscious of only some outer details, specially where they irritated their minds. Instead of looking on the picture side of the canvas, if

they look on the blank side it will not give any more value to their view because of the prolonged period of their staring.

The mental sense, by the help of which we feel the spirit of a people, is like the sense of sight, or of touch—it is a natural gift. It finds its objects, not by analysis, but by direct apprehension. Those who have not this vision merely see events and facts, and not their inner association. Those who have no ear for music, hear sounds, but not the song. Therefore when, by reason of the mere lengthiness of their suffering, hey threaten to establish the fact of the tune to be a noise, one need not be anxious about the reputation of the music. Very often it is the mistakes which require a longer time to develop their tangles, while the right answer comes promptly.

It is a truism to say that shadows accompany light. What you feel as he truth of a people, has its numberless contradictions, just as the single fact of the roundness of the earth is contradicted by the innumerable facts of its hills and hollows. Facts can easily be arranged and heaped up into loads of contradiction : yet men having faith in the reality of ideals hold firmly that the vision of truth does not depend upon its dimension, but upon its vitality. And Sister Nivedita has uttered the vital truths about Indian life.

October 21, 1917

5

To The Nations : Paul Richard

Introduction

The peoples are living beings. They have their distinct personalities. Therefore the French and the Germans, who not only live in close neighbourhood, but also contain in themselves in a large measure a racial similarity, have their individual differences that cannot be overlooked.

But the nations are not living beings, they are organizations of power. Their physical and mental aspects are monotonously the same everywhere. Their differences are merely the differences in degree of

efficiency. When by some chance, through some cracks, the human personality sends up its own life shoots, the hard consistency of organization suffers, but the people finds its own manifestation. But where the subjugation of humanity by the machine is complete, there the Nation is triumphant. In modern world the fight is going on between the living spirit of the people and the methods of Nation organizing. It is like he struggle that went on in Central Asia, between man's cultivated area of habitation and the continual encroachment of desert sands, till the human region of life and beauty was choked out of existence. When the spread of the higher ideals of humanity is to held as important, the hardening system of national efficiency grows in strength, and at least for some limited period of time it proudly proves itself to be he fittest to survive.

But it is the survival of that part of man which is the least living. And this is the reason why dead monotony is the sign of the spread of the Nation. The modern towns which present the physiognomy of this dominance of the Nation are everywhere the same, from San Francisco to London, from London to Tokio,—they show no faces but merely masks.

The people, being living persons, must have their self-expression, and this leads to creations. These creations are literature, art, philosophy, social symbolism and ceremonials. They are different in different peoples, but they are not antagonistic. They are like different dishes in one common feast, adding richness to our enjoyment and understanding of truth. They are making the world of man fertile of life and variedly beautiful.

But the Nations do not create, they merely produce and destroy. Organizations of production are necessary—even the organizations of destruction may be so—but when actuated by greed and hatred they occupy the best part of world, crowding into a corner the living man who creates, then the harmony is lost and human history runs at a breakneck speed towards fatal catastrophe.

Humanity, where it is living, is guided by inner ideals, but where it is dead organization it is impervious to them. For this organizing endeavour has to growth, but merely augmentation. Therefore its building process is external and it does not fully respond to our inner moral guidance. In this building we can pile one stone brick upon another and cement them according to our latest scientific recipe. But its foundation is the living nature of man, which cannot suffer such dead weight to be indefinitely loaded upon its heart. Therefore at last,

some apparently slight cause makes it move and heave and he huge structure resting upon it sways and cracks. Once it begins to come down we do not know how to stop it. It looks irrational and evil in its sudden course of disruption and mere spouting of moral maxims or prudent advice is unable to prevent the force of moral gravitation in its action of restoring balance.

The ideal of the social man is unselfishness, but the ideal of the nation is selfishness. Therefore, selfishness in the individual is condemned, but in nation it is extolled. This leads to a hopeless moral blindness, confusing the religion of the people with the religion of the nation. Therefore we find men convinced of the superior claims of Christianity because Christian nations we are in possession of the greater part of the world. It is like supporting a thief's religion by quoting the amount of his stolen property. Nations celebrate their successful massacre of men by thanking God in their churches. They forget that Thugs also ascribed their success in manslaughter to the favour of their goddess. But in the case of the latter their goddess frankly represented the principle of destruction. It was this criminal tribe's own murderous instinct deified; the instinct, not of one individual, but of the whole community, therefore held sacred. In the same manner in modern churches, selfishness, hatred, vanity and greed in their collective aspect of national instincts do not scruple to share the homage paid to God.

We must admit that evils there are in human nature and inspite of our faith in moral laws and training in self-control they come out in individual cases of unrighteousness. But they carry on their foreheads their own brand of infamy, and their very successes add to their monstrosity.

All through man's history there will be some who will suffer and others who will cause suffering—and the conquest of evil will never be a fully accomplished fact but a continuous process in our civilization, like the process of burning in a flame.

All creation is the harmony of the contradiction between the eternal ideal of perfection and the infinite incompleteness of realization. So long as the positive ideal of goodness keeps step with the negative incompleteness of attainment, so long as there is no absolute separation between them, we need not be afraid of suffering and loss.

Therefore in former ages when some particular people became turbulent and tried to rob others of their human rights, hey sometimes achieved success in their adventures and sometimes failed, and it was

nothing more than that. But when this idea of the Nation, which has achieved universal acceptance in the present day, tries to pass off the cult of selfishness as a moral duty simply because that selfishness is gigantic in stature, then it not only commits depredations but attacks the very vitals of humanity. It unconsciously génerates in people's minds an attitude of defiance against moral law. For they are taught by repeated devices the lesson that the nation is greater than the people and yet this nation scatters to the winds every moral law that the people hold as sacred.

It has been said that a disease becomes most acutely critical when the brain is affected. For it is the brain which is constantly directing the siege against all disease forces. The spirit of national selfishness is that brain disease of a people, which, for the time being, shows itself in red eyes and clenched fists, in violence of talk and movements while all the time shattering its natural system of healing. It is the power of self-sacrifice, the moral faculty of sympathy and co-operation which is the guiding spirit of social vitality. Its function is to maintain a beneficent relation of harmony with its surroundings. But when it begins to ignore the moral law which is universal, and uses it only within the bounds of a narrow sphere, then its strength becomes like the strength of muscular convulsion, which not being a movement of harmonious health, hurts itself in the end.

What is worse, this moral aberration of peoples, decked with the showy title of patriotism, proudly walks abroad, passing itself off as a highly moral influence. Thus it has spread its inflammatory contagion all over the world, proclaiming its fever-flush to be the best sign of health. It is causing at the hearts of peoples, naturally inoffensive, a feeling of envy at not having their temperature as high as their delirious neighbours, and not being able to cause as much mischief as these others do, but merely having to suffer it.

I have often been asked by my Western friends how to cope with this evil which has attained such sinister strength and dimensions. In fact, I have often been blamed for merely giving warning but offering no alterative. Having been bred in the atmosphere of system-worship our mind has got into the habit of a superstitious reverence for system. Therefore when we suffer as a result of a particular system we believe that some other system will bring us better luck. We have forgotten tis simple truth that all systems produce evil sooner or later when the psychology which is at the root of them is wrong. The system which is national to-day may assume the shape of international to-morrow,

but so long as men have not forgotten their idolatry of the baser passions, so long as vanity and greed and jealousy can claim moral sacrifice from us when they assume bulkiness of dimensions, the new system will become a new instrument of suffering to man or at best will become ineffectual. And because we are trained to confound good system with moral goodness itself, every ruined system makes us distrustful of moral law.

Therefore, I do not put my faith in any new institution, but in the drainage of those stagnant moral pollutions which give rise to poisonous vapor. For this we are to look for individuals all over the world who must think clearly, feel nobly and act rightly and thus become the channels of universal moral truth. For this truth once introduced goes on with its own living creation, overcoming all hindrances. Our moral ideals do not work with chisels and hammers, but like living seeds in proper ground spread their roots in the soil and their branches in the sky without consulting architects for their plans. What is necessary is purity in thought, feeling and will, and the rest will follow.

This is the reason why, when I met Monsieur Richard in Japan, I became more reassured in my mind about the higher era of civilization than when I read about the big schemes which the politicians are formulating for ushering the age of peace into the world. It is not upon mere number or bulk that our salvation depends but upon the truth which can afford to look small. When gigantic forces of destruction were holding their orgies of fury I saw this solitary Frenchman, unknown to fame., ...face beaming with the lights of the new dawn and his voice vibrating with the message of new life, and I felt sure that the great To-morrow has already come though not registered in the Calendar of the statesman.

January 17, 1917

6

The Divine Songs of Zarathuṣtra : D. J. Irani

Introduction

The most important of all outstanding facts of Iranian history is the religious reform brought about by Zarathushtra. He was the first man we know who gave a definitely moral character and direction to religion, and at the same time preached the doctrine of monotheism, which offered an eternal foundation of reality to goodness as an ideal perception. All religions of the primitive type try to keep men bound with regulations of external observances. These, no doubt, have the hypnotic effect of vaguely suggesting a realm of right and wrong ; but the dimness of their light produces phanasms leaving me to aberrations. Zarathuṣtra was the greatest of all pioneer prophets who showed the path of freedom to men, the freedom of moral choice, the freedom from blind obedience to unmeaning injunctions, freedom from multiplicity of shrines which draw our worship away from the single minded chastity of devotion. To most of us it sounds like a truism to-day when we are told that the moral goodness of a deed comes from the goodness of intention. But it is a truth which once came to a man like a revelation of light in the darkness and has not yet reached all the obscure corners of humanity, there are men we still see around us who fearfully follow, hoping thereby to gain merit, the path of blind formalisms, which have no living moral source in the mind. This will make us understand the greatness of Zarathuṣtra. Though surrounded by believers in magical rites, he proclaimed in those dark days of unreason, that religion has its truth in its moral significance, not in external practices of imaginary value ; that it is to uphold man in his life of good thought, good words and god deeds.

The outer expression of truth reaches its white light of simplicity through its inner realisation. True simplicity is the physiognomy of perfection. In the primitive stage of spiritual growth when man is dimly aware of the mystery of the infinite in his life and the world, when he does not fully know the inward character of his relationship with this truth, his first feeling is either that of dread or of a greed of gain. This drives him into wild exaggeration in worship, into frenzied convulsion of ceremonialism. Buf in Zarathuṣtra's teachings which are best reflected in his Gathas we have hardly any mention of the ritualism

of worship. Conduct and its moral motives, such as Vohumano, Asha and Aramaiti, have received almost sole attention in them.

The Orthodox Persian form of worship in ancient Iran included animal sacrifices and offering of *haoma* to the *daevas*. That all this should be discountenanced by Zarathuṣtra not only shows his courage, but the strength of his realisation of the Supreme Being as Spirit. We are told that it has been mentioned by Plutarch : "Zarathuṣtra tought the Persians to sacrifice to Ahura Mazda 'vows and thanksgivings'." The distance between faith in the efficacy of bloodstained magical rites and the cultivation of moral and spiritual ideals as the true from of worship is immense. It is amazing to see how Zarathuṣtra was the first among men who crossed this distance with a certainty of realisation which imparted such a fervour of faith in his life and his words. The truth which filled his mind was not a thing borrowed from books or received from teachers. He did not came to it by following a prescribed path of tradition. It flashed upon him as an illumination of his entire life almost like a communication to his personal self, and he proclaimed the utmost immediacy of his knowledge in these words :

"When I conceived of Thee, O Mazada, as the very first and the last, as the most adorable one as the Father of Good Thought, as the Creator of Truth and Right, as the Lord Judge of our actions in life, then I made a place for Thee on my very eyes"—Yasna, 31–8 (Translation by D. J. Irani).

It was the direct stirring of his soul which made him say :

"Thus do I announce the greatest of all. I weave my songs of praise for Him through truth, helpful and beneficent to all that live. Let Ahura Mazda listen to them with his holy spirit, for the good Mind instructed me to adore him, by his wisdom let him teach me about what is best"—Yasna, 45–6.

The truth which is not reached through the analytical process of reasoning, and does not depend for proof on some corroboration of outward facts, or the prevalent faith and practice of the people—the truth, which comes like an inspiration out of context with its surroundings, brings with it an assurance that it has been sent from a divine source of wisdom ; that the individual who has received it is specially chosen and therefore has his responsibility as the messenger of God. Zarathuṣtra felt this sacredness of his mission and believed himself to be the direct medium of communication of divine truth.

So long as man deals with his God as the dispenser of benefits to the worshipper, who knows the secret of propitiating him, he tries

to keep him for his own self or for the tribe to which he belongs. But directly the moral or spiritual nature of God is apprehended, this knowledge is thrown open to all humanity ; and then the idea of God, which once gave unity only to a special people, transcends limitations of race and gathers together all human beings within one spiritual circle of union. Zarathuṣtra was the first prophet who emancipated religion from the exclusive narrowness of tribal God, the God of a chosen people, and offered it to universal ma. This is a great fact in the history of religion. The master said, when the enlightenment came to hem :

"Verily I believe Theẹ, O Ahura Mazda, to be the Supreme Benevolent Providence, when Sraosha came to me with Good Mind, when first I received and became wise with Thy words ! And though the task be difficult, though woe may come to me, I shall proclaim to all mankind Thy message, which Thou declarest to be best"—Yasna, 43–11, He prays to Mazda :

"This I ask Thee, tell me truly, O Ahura, the religion that is best for all mankind—the religion, based on truth, which should prosper all that is mine, the religion which establishes our actions in order and justice by the Divine Songs of perfect piety, which has, for its intelligent desire of desires, the desire for Thee, O Mazda !"—Yasna, 44–10.

With the undoubted assurance and hope of one who has got a direct vision of truth he speaks to the world.

"Hearken unto me, ye who come from far and near 1 Listen, for all I speak forth now ; ponder well over all things, weigh my words with care and clear thought, Never shall the false teacher destroy this world for a second time ; for his tongue stands mute, his creed exposed."—Yasna 45–1.

I think it can be said without doubt that such a high conception of religion, uttered in such a clear note of affirmation, with a sure conviction that it is a truth of the ultimate ideal of perfection which must be revealed to all humanity, even at the cost of martyrdom is unique in the history of religion belonging to such a remote dawn of civilisation.

There was a time when along with other Aryan peoples the Persians who worshipped the elemental gods of nature on whose favour they depended for the good things of life. But such a favour was not to be won by any moral duty performed or by any service of love. In fact, it was the crude beginning of the scientific spirit trying to unlock the hidden sources of power in nature. But through it all there

must have been some current of deeper desire which constantly contradicted the cult of power and indicated a world of inner good infinitely more precious than material gain. Its voice was not strong at first, nor was it heeded by the majority of the people, but its influence like the life within the seed, was silently working. Then comes the great teacher ; and in his life and mind the hidden fire of truth suddenly bursts out in a flame. The best in the people works for long obscure ages in hints and whisper till it finds its voice ; which can never again be silenced. For that voice becomes the voice of mankind ; no longer confined to a particular time or people. It works across intervals of silence and oblivion, depression and defeat, and comes out again and again with its conquering call. It is a call to the fighter—the fighter against untruth—against all that lures away man's spirit from its high mission of freedom into meshes of materialism. And Zarathustra's voice is still a living voice not a mere matter of academic interest for historical scholars who deal with the dead facts of the past. It is not a voice which is only to guide a small community of men in daily details of their life. For have we not seen that Zarathustra was the first of all teachers who, is his religious teachings, sent his words to all human races across the distance of space and time? He was not like a man who by some chance of fiction had lighted a lamp and knowing that it could not be shared by all, secured it with a miser's care for his own domestic use. But he was the watcher in the night, who stood on the lonely peak facing the Fast and broke out singing the poems of light to the sleeping world when the sun came out on the brim of horizon. He declared that the Sun of truth is for all, that its light is to unite the far and the near. Such a message always arouses the antagonism of those whose habits have become nocturnal, whose vested interest in the darkness. And there was a bitter fight in the life time of the Prophet between his followers and others who were addicted to the ceremonies that had tradition on their side and not truth.

We are told that "Zarathustra was descended from a kingly family" and also that the first converts to his doctrines were of ruling caste. But the priesthood, "the kavis and the karapans, often succeeded in bringing the rulers over to their side." So we find that, in this fight the princes of the land divided themselves into opposite parties, as we find in the Kurukshetra war. "With the princes have the kavis and the karapans united, in order to corrupt man by their evil deeds." Among the princes that stood against Zarathustra, as his enemies, the

mighty Bendva might be included, who is mentioned in Yasna, xi, x, 1-2. From the context we may surmise that he stood on the side of infidels. A family or a race of princely blood were probably the Grehma (Yasna-xxxii 12-14). Regarding them it is said that they having allied with the Kavis and Karapans, have established their power in order to over-power the Prophet and his partisans. In fact, the opposition between the pious and the impious, the believers and the unbelievers, seem very often to have led to open combat. The Prophet prays to Ahura that he may grant victory to his own men when both the armies rush together in combat, whereby they can cause defeat among the wicked, and procure for them strife and trouble.

There is evidence in our Indian legends that in ancient India also there have been fights between the representatives of the Orthodox faith and the Kshatriyas, who, owning to their own special vocation, had a comparative freedom of mind about the religion of external observances. The proofs are strong enough to lead us to believe that the monotheistic religious movement had its origin and principal support in the kingly caste of those days, though a great number of them fought to oppose it.

I have discussed in another place the growth in ancient India of the moral and spiritual element in her religion which had accompanied the Indian Aryan people from the time of Indo-Iranisn age, showing how the struggle with its antagonistic force has continued all through the history of India. I have shown how revolution which accompanied the teachings of Zarathustra, breaking out into severe fights, had its close analogy in the religious revolution in India whose ideals are still preserved in the Bhagavadgita.

It is interesting to note that the growth of the same ideal in the same race in different geographical situations has produced results that, inspite of their unity, have some aspect of difference. The Iranian, monotheism is more ethical while the Indian is more metaphysical in its character. Such a difference in their respective spiritual development was owing, no doubt, to the more active vigour of life in the old Persians and the contemplative quietude of mind in the Indians. This distinction in the latter arises in a great measure out of the climatic conditions of the great country, the easy fertility of the soil and the great stretch of plains in Northern India affording no constant obstacles in physical nature to be daily overcome by man, while the climate of Persia is more bracing and the surface of the soil more rugged.

The Zoroastrian ideal has accepted the challenge of the principle of evil and has enlisted itself in the fight on the side of Ahura Mazda, the great, the good, the wise. In India, although the ethical side is not absent, the emphasis has been more strongly laid on subject realisation through a stoical suppression of desire and the attainment of a perfect equanimity of mind by cultivating indifference to all causes of joy and sorrow. Here the idea, over which the minds of men brooded for ages, in an introspective intensity of silence was that man as a spiritual being had to realise the truth by breaking through his sheath of self. All the desires and feelings that limit his being are keeping him shut in from the region of spiritual freedom.

In man, the spirit of creation is waiting to find its ultimate release in an ineffable illumination of Truth. The aspiration of India is for attaining the infinite in the spirit of man. On the other hand, as I have said before, the ideal of Zoroastrian Persia is distinctly ethical. It sends its call to men to work together with the eternal spirit of Good in spreading and maintaining Kshatra, the Kingdom of Righteousness against all attack of evil. This ideal gives us our place as collaborators with God in distributing His blessing over the world.

Clear is this all to the man of wisdom as to the man who carefully thinks ; he who upholds Truth with all the might of his power, he who upholds Truth the utmost in his word and deed, he, indeed, is Thy most valued helper, O Mazda Ahura !"—Yasna, 31-22.

It is, in fact, of supreme moment to us that the human world is in an incessant state of war between that which will save us and that which will drag us into the abyss of disaster. Our one hope lives in the fact that Ahura Mazda is on our side if we choose the right course. The law of warfare is severe in its character, it allows no compromise. "None of your" says Zarathustra, "shall find the doctrine and precepts of the wicked ; because thereby he will bring grief and death in his house and village, in his land and people! No, grip your sword and cut them down !"—Yasna xxxi. 18.

Such a relentless attitude of fight reminds us of the Old Testament spirit. The active heroic aspect of this religion reflects the character of the people themselves, who later on spread their conquests for and wide and built up great empires by the might of their sword. They accepted this world in all seriousness. They had zent in life and confidence in their own strength. They belonged to Western half of Asia, and their great influence travelled through the neighbouring

civilisation of India and towards the Western Continent. Their ideal was the ideal of fighter. By the force of their will and deed of sacrifice they were to conquer *haurvatat,* welfare in this world and *amertat,* immortality in the other. This is the best ideal of the West, the great truth of fight. For paradise has to be gained through conquest. That sacred task is for the heroes, who are to take the right side in the battle and the right weapons.

7

The Philosophy of the Upaniṣads : S. Radhakrishnan

Foreword

Not being a scholar or a student of philosophy, I do not feel justified in writing a critical appreciation of a book dealing with the philosophy of the Upqaniṣads. What I venture to do is to express my satisfaction at the fact that my friend, Professor Radhakrishnan, has undertaken to explain the *spirit* of the Upaniṣad to English readers.

It is not enough that one should know the meaning of the words and the grammar of the Sanskrit texts in order to realise the deeper significance of the utterances that have come to us across centuries of vast changes, both of the inner as well as the external conditions of life. Once the language in which these were written was living, and therefore the words contained in them had their full context in the life of the people of that period, who spoke them, Divested of that vital atmosphere, a large part of the language of these great texts offers to us merely its philological structure and not life's subtle gesture which can express through suggestion all that is ineffable.

Suggestions can neither have fixed rules of grammar nor the rigid definition of the lexicon so easily available to the scholar. Suggestion has its unanalysable code which finds its depth of explanation in the living hearts of the people who use it. Code words philological treated appear childish, and one must know that all those experiences which are not realised through the path of reason, but immediately through an inner vision, must use some kind of code

word for their expression. All poetry is full of such words, and therefore poems of one language can never be properly translated into other languages, nay, not even re-spoken in the same language.

For an illustration let me refer to that stanza of Keats' "Ode to a Nightangle", which ends with the following lines :

The same that oft-times hath
Charmed magic casements, opening on the foam
Of perilous seas, in faery lands forlorn.

All these words have their synonymns in our Bengali language. But if through their help I try to understand these lines or express the idea contained a them, the result would be contemptible. Should I suffer from a sense of race superiority in our own people, and have a low opinion of English literature, I could do nothing better to support my case than literally to translate or to paraphrase in our own tongue all the best poems written in English.

Unfortunately, the Upaniṣads have met with such treatment in some parts of the West, and the result in typified disastrously in a book like Gough's *Philosophy of the Upaniṣads*. My experience of philosophical writings being extremely meagre, I may be wrong when I say that this is the only philosophical discussion about the Upaniṣads in English, but, at any rate, the lack of sympathy and respect displayed in it for these some of the most sacred words that have ever issued from the human mind, is amazing.

Though many of the symbolical expressions used in the Upaniṣads can hardly be understood to-day, or are sure to be wrongly interpreted, yet the messages contained in these, like some eternal source of light, still illumine and vitalise the religious mind of India. They are not associated with any particular religion, but they have the breadth of a universal soil that can supply with living sap all religious which have any spiritual ideal hidden at their core, or apparent in their fruit and foliage. Religions, which have their different standpoints, each claim them for their own support.

This has been possible because the Upaniṣads are based not upon theological reasoning, but on experience of spiritual life. And life is not dogmatic ; in it opposing forces are reconciled— ideas of nondualism and dualism, the infinite and the finite, do not exclude each other. Moreover, the Upaniṣads do not represent the spiritual experience of any one great individual, but a great age of enlightenment which has a complex and collective manifestation, like that of the starry world.

Different creeds may find their sustenance from them, but can never set sectarian boundaries round them; generations of men in our country, no mere students of philosophy, but seekers of life's fulfilment, may make living use of the texts, but can never exhaust them of their freshness of meaning.

For such men the Upaniṣad-ideas are not wholly abstract, like those belonging to the region of pure logic. They are concrete, like all truths realised through life. The idea of Brahma when judged from the view-point of intellect is an abstraction, but it is concretely real for those who have the direct vision to see it. Therefore the consciousness of the reality of Brahma has boldly been described to be as real as the consciousness of an *amlaka* fruit held in one's palm. And the Upaniṣad says :—

Yato vāco nivartante aprāpya manasā saha
Ānandam brahmaṇo vidvān na bibheti Kadācana.

From Him come back baffled both words and mind. But he who realises the joy of Brahma is free from fear.

Cannot the same thing be said about light itself to men who may bby some mischance live all through their life in an underground world cut off from the sun's rays? They must know that words can never describe to them what light is, and mind, through its reasoning faculty, can never even understand how one must have a direct vision to realise it intimately and be glad and free from fear.

We often hear the complaint that the Brahma of the Upaniṣads is described to us mostly as a bundle of negations. Are we not driven to take the same course ourselves when a blind man asks for a description of light? Have we not to say in such a case that light has neither sound, nor taste, nor form, nor weight, nor resistance, nor can it be known through any process of analysis? Of course it can be seen : but what is the use of saying this to one who has no eyes ? He may take that statement on trust without understanding in the least what it means, or may altogether disbelieve it, even suspecting in us some abnormality.

Does the truth of the fact that a blind man has missed the perfect development of what should be normal about his eyesight depend for its proof upon the fact that a large number of men are not blind ? The very first creature which suddenly groped into the possession of its eyesight had the right to assert that light was a reality. In the human world there may be very few who have their spiritual eyes open, but,

in spite of the numerical preponderance of those who cannot see, their want of vision must not be cited as an evidence of the negation of light.

In the Upaniṣads we find the note of certainty about the spiritual meaning of existence. In the very paradoxical nature of the assertion that we can never know Brahma, but can realise Him, there lies the strength of conviction that comes from personal experience. They aver that through our joy we know the reality that is infinite, for the test by which reality is apprehended is joy. Therefore in the Upaniṣads *Satyam* and *Ānandam* are one. Does not this idea harmonise with our everyday experience ?

The self of mine that limits my truth within myself confines me to a narrow idea of my own personality. When through some great experience I transcend this boundary I find joy. The negative fact of the vanishing of the fences of self has nothing in itself that is delightful. But my joy proves that the disappearance of self brings me into touch with a great positive truth whose nature is infinitude. My love makes me understand that I gain a great truth when I realise myself in others, and therefore I am glad. This has been thus expressed in the Iśopaniṣad :

Yas tu sarvāni bhūtāni ātmany evānupaśyati
Sarvabhūtesu cātmānaṃ tato na vijugupsate.

He who sees all creatures in himself, and himself in all creatures, no longer remains concealed.

His Truth is revealed in him when it comprehends Truth in others. And we know that in such a case we are ready for the utmost self-sacrifice through abundance of love.

It has been said by some that the element of personality has altogether been ignored in the Brahma of the Upaniṣads, and thus our own personality, according to them, finds no response in the Infinite Truth. But then, what is the meaning of the exclamation : "Vedāhametam puruṣam mahāntam". *I have known him who is the Supreme Person.* Did not the sage who pronounced it at the same time proclaim that we are all *Amrtasya Putrāh,* the sons of the Immortal ?

Elsewhere it has been declared : *Tam vedyam purusam veda yathā mā vo mṛtyuḥ parivyathāḥ. Know him, the Person who only is to be known, so that death may not grieve thee.* The meaning is obvious. We are afraid of death, because we are afraid of the absolute cessation

of our personality. Therefore, if we realise the Person as the ultimate reality which we know in everything that we know, we find our own personality in the bosom of the eternal.

There are numerous verses in the Upaniṣads which speak of immortality. I quote one of these :

Esa devo viśvakarmā mahātmā
Sadā janānām hṛdye sanniviṣṭaḥ
Hṛdā manīṣā manasābhiklpto
Ya etad vidur amṛtāste bhavanti.

This is the God who is the world-worker, the supreme soul, who always dwells in the heart of all men, those who know him through their mind, and the heart that is full of the certainty of knowledge, become immortal.

To realise with the heart and mind the divine being who dwells within us is to be assured of everlasting life. It is *mahātmā,* the great reality of the inner being, which is *viśvakarmā,* the world-worker, whose manifestation is in the outer work occupying all time and space.

Our own personality also consists of an inner truth which expresses itself in outer movements. When we realise, not merely through our intellect, but through our heart strong with the strength of its wisdom, that Mahātmā, the Infinite Person, dwells in the Person which is in me, we cross over the region of death. Death only concerns our limited self ; when the Person in us is realised in the Supreme Person, then the limits of our self lose for us their finality.

The question necessarily arises, what is the significance of this self of ours ? Is it nothing but an absolute bondage for us ?

If in our language the sentences were merely for expressing grammatical rules, then the using of such a language would be a slavery to fruitless pedantry. But, because language has for its ultimate object the expression of ideas, our mind gains its freedom through it, and the bondage of grammar itself is a help towards this freedom.

If this world were ruled only by some law of forces, then it would certainly have hurt our mind at every step and there would be nothing that could give us joy for its own sake. But the Upaniṣad says that from Ānandam, from an inner spirit of Bliss, have come out all things, and by it they are maintained. Therefore, in spite of contradictions, we have our joy in life, we have experiences that carry their final value for us.

It has been said that the Infinite Reality finds its revelation in *ānanda rūpam amrtam,* in the deathless form of joy. The supreme end of our personality also is to express itself in its creations. But works done through the compulsion of necessity, or some passion that blinds us and drags us on with its impetus, are fetters for our soul ; they do not express the wealth of the infinite in us, but merely our want or our weakness.

Our soul has its *ānandam,* its consciousness of the infinite, which is blissful. This seeks its expression in limits which, when they assume the harmony of forms and the balance of movements, constantly indicate the limitless. Such expression is freedom, freedom from the barrier of obscurity. Such a medium of limits we have in our self which is our medium of expression. It is for us to develop this into *ānanda-rūpam amrtam,* an embodiment of deathless joy, and only then the infinite in us can no longer remain obscured.

This self of ours can also be moulded to give expression to the personality of a business-man, or a fighting man, or a working man, but in these it does not reveal our supreme reality, and therefore we remain shut up in a prison of our own construction. Self finds its *ānanda-rūpam,* which is its freedom in revelation, when it reveals a truth that transcends self, like a lamp revealing light which goes far beyond its material limits, proclaiming its kinship with the sun. When our self is illuminated with the light of love, then the negative aspect of its separateness with others loses its finality, and then our relationship with others is no longer that of competion and conflict, but of sympathy and co-operation.

I feel strongly that this, for us, is the teaching of the Upaniṣads, and that this teaching is very much needed in the present age for those who boast of the freedom enjoyed by their nations, using that freedom for building up a dark world of spiritual blindness, where the passions of greed and hatred are allowed to roam unchecked, having for their allies deceitful diplomacy and a wide-spread propaganda of falsehood, where the soul remains caged and the self battens upon the decaying flesh of its victims.

8

India in Bondage : J. T. Sunderland

My Prayer for India
RABINDRANATH TAGORE

What is my longing, my dream, my prayer, *for my country, my beloved India ?*
I dream of her, I fervently pray for her,
That she may no longer be in BONDAGE TO STRANGERS ; But that she may be FREE!
FREE to follow her own HIGH IDEALS ;
FREE to accomplish her own IMPORTANT MISSION IN THE WORLD ;
FREE to fill her own GOD-GIVEN PLACE AMONG THE GREAT NATIONS!

9

Medieval Mysticism : Kshitimohan Sen

Foreword

Text books of Indian History, which we read, deal mostly with its external aspect. And in such a history foreigners play the most important part. They have fought battles, conquered the country and ruled it. We have accepted this pressure from the outside, though at times efforts were made to shake it off and have met with occasional success. But on the whole this aspect of India's history reveals to our eyes, in its successive chapters, the failures of her people.

But it will have to be admitted that the Indian *sādhanā* does not identify itself with politics. True it is that great kings and emperors arose in our country ; but their greatness has been quite their own. This sort of greatness owes nothing to the people who neither create it or participate in it with any pleasure. It developed along with one's individual power and dwindled with the same.

But India has a *sādhanā* of her own and it belongs to her innermost heart. Throughout all her political vicissitudes its stream has flowed on. A wonderful feature of this has been that it does not glide along any embankment of scriptural sanctions, and the influence of

scholasticism on it, if any, is very small. In fact, this *sādhanā* has mostly been unscriptural and not controlled by social laws of any kind. Its spring is within the innermost heart of the people whence it has gushed forth in its spontaneity and broken through the barriers of rules, prescriptive as well as proscriptive.

Most of the persons from whose heart this spring has come forth belong to the masses and whatever they have realised and expressed was 'not by means of intellect or much learning of the sacred lore' *(na medhayā na bahunā śrutena).*

If we could visualise the historical development of this sādhanā we should discover where the living history of India exists. Then we might know after what ideal India has moved on from one period of her history to another, and how far she has realised that ideal. The long course, which the stream of India's cherished ideal has followed through the ages, has been traced in these lectures in all its major and minor branches by my esteemed colleague and friend, Professor Kshitimohan Sen. We have seen how deeply true is this stream and how essentially it is India's own. The nature genius for *sādhanā* which is latent in the Indian people has been discovered in these lectures by Prof. Sen. The line of development, which its expression has taken amidst different internal and external obstacles, has been sketched in this work. We still expect to see at some future date a detailed history of its progressive movement. Unless we have this history, the true picture of India will remain only partially known to her children and such a partial knowledge might be very erroneous.

Santiniketan
27th December, 1929

10

Voiceless India : Gertrude Emerson

INTRODUCTION TO THE BRITISH EDITION

In her *Voiceless India,* Miss Emerson has amply proved that she has her own natural right of a sensitive mind to come to a people who happen to be foreign to her and in judging whom she has done herself justice. The bond of kinship that prevails within a community not only protects it from wanton cruelty and injustice from inside but is the natural nerve channel through which we directly feel our own race in its entirety. But the stranger from outside can easily be unjust, owing to the fact that he has not to pay for his conduct in his own feeling and be checked by that deeper sensibility which goes directly beyond the miscellany of facts into the heart of a living unity. And for the sake of his own benefit and others' safety he must bring with him his inner light of imagination, so that he many feel truth and not merely know facts. It is fully evident that Miss Emerson is gifted with this rare faculty, that she has realized a complete vision of an alien life by making it her own.

It is a very hard trial for a Western woman to have to spend long lonely months in an environment where most things conspire to hurt the modern taste and standard of living. The author of this book did not choose the comfortable method of picking up information from behind a lavish bureaucratic hospitality, under a revolving electric fan, and in an atmosphere of ready-made official opinions. For the materials of the present book she did not move about among the upper circle of the modern sophisticated India where communication was through her own language and tendencies of mind were not wholly unfamiliar to her. She boldly took it upon herself unaided to enter a region of our life, all but unexplored by the Western tourists, which had the one great advantage, in spite of its difficulties, that it offered no other path open to the writer but that of sharing the life of the people. In fact, in this adventure of hers she followed the examples of the true born travellers of the golden age of travelling when the pilgrims across the seas and mountains did not carry with them their own mental and physical habits—the barricading aloofness of their own race and culture.

And I can easily imagine what the author had to pay for her experience, not in money but in a part of her life itself. The constant toll that a pitiless climate exacts from our vitality for the barest. privilege of living, the mean tyrannies of the tropics that often cause desperate discomforts and, what is worse, a perpetual state of subconscious irritation in our mind, are enough provocation for a foreigner to make him unreasonably vengeful in his juegement and language. There is no sign of that in Miss Emerson's writings, not even of a temptation to be superciliously funny at any awkwardness of the simple village folk among whom she lived. These villages had no allurements of the romantic India, incomprehensibly mystic in her ritualism, or ineffably grand in her relics and ruins. The background of life they had was dull and drab, with no lurid fascination of vice so important for making its detailed descriptions gratifying to some readers in their search for a vicarious enjoyment under the cover of moral indignation. All this has given an opportunity to disclose the personality of the writer herself, not only through the intellectual sanity displayed in this book, but, what is more precious, in her depth of human sympathy.

She never idealised, not even for the sake of literary flourishes, any aspects of the village life to which she was so intimately close. She never minimised the primitive crudities of its features, things that were stupid, ungainly, superstitious, or even evil in their moral ugliness, but her narration, in spite of its unmitigated truth, never hurts, because all through it runs the gracious touch of the woman, the pure instinct of sympathy which, while it bares and handles the sores, is yet tender to them. And these unfortunate Indian villages, deserted by their own capable men, neglected with scant notice by their politicians, cruelly ignored by their government, dumbly suffering unspeakable miseries, putting all the blame upon their inexorable fate, bent down to the dust by the load of indignities, deprived of education, sanitary or medical help, living upon a pitifully meagre ration of food that has hardly any nutrition, and a scant supply of water full of microbic menace— they need a true woman's heart to give them voice, for they are like children in their utter helplessness disowned by their parents.

What Miss Emerson has discovered concerning the poverty of the Indian village, causing it to sink down under the weight of a land tax took heavy to be borne, has been openly acknowledged, to their credit, by a small band of Indian civilians who have been obliged to administer the system which they saw actually crushing the poor.

Sir William Hunter said many years ago : "The Government assessment does not leave enough food to the cultivator to support himself and his family throughout the year." Sir Henry Cotton and Sir William Wedderburn, both high officials, have confessed the same unpalatable truth. More recently still, Mr. C. J. O'Donnel, who held in his own day one of the chief administrative positions in the Government of India, has declared : "It makes little difference to three hundred million Indian peasants what the Simon Commission may recommend, but I feat that the *ryot* will remain 'the most pathetic figure in the British Empire'; for 'his masters have ever been unjust to him, and Christendom will have one more failure to its discredit'."

I feel personally grateful to Miss Emerson for the masterly picture she has drawn of our pathetic village life, so vivid and yet sober in its colour— the honest colour of truth; for I myself have spent some part of my youth in its neighbourhood and have made it my mission with all my inadequate individual resources to befriend them who are friendless, who are eternal tenants in an extortionate world having nothing of their won.

Swarthmore

11

Woodcuts : Ramendranath Chakravarty

[An appreciation]

I am glad to record my appreciation of the delightful woodcuts done by Ramendranath Chakravarty. They are sincere pieces of work showing a rare combination of strength and delicacy in their spirit and execution.

April 13, 1931

12

The Golden Book of Tagore : Ramananda Chatterjee (ed).

It is hard for me to say in a few faltering words how I feel when voices greet me from my own country and from across the seas carrying to me the assurance that I have pleased many and have helped some and thus offering me the best reward of my life.

Dec 27, 1931

13

Reconstruction and Education in Rural India : Prem Chand Lal

Introduction

Villages are like women. In their keeping is the cradle of the race. They are nearer to nature than towns, and are therefore in closer touch with the fountain of life. They have the atmosphere which possesses a natural power of healing. It is the function of the village, like that of woman, to provide people with their elemental needs, with food and joy, with the simple poetry of life, and with those ceremonies of beauty which the village spontaneously produces and in which she finds delight. But when constant strain is put upon her through the extortionate claim of ambition ; when her resources are exploited through the excessive stimulus of temptation, then she becomes poor in life and her mind becomes dull and uncreative. From her time-honoured position of the wedded partner of the city she is degraded to that of maidservant, while, in its turn, the city, in its intenseegotism and pride, remains unconscious of the devastation it constantly works upon the very source of its life and health and joy.

Cities there must be in man's civilization, just as in higher organisms there must be organized centres of life, such as the brain, heart or stomach. These never overwhelm the living wholeness of the body on the contrary, by a perfect federation of their functions,

they maintain its richness. But a tumour, round which the blood is congested, is the enemy of the whole body upon which it feeds as it swells. Our modern cities, in the same way, feed upon the whole social organism that runs through the villages; they continually drain away the life-stuff of the community, and slough off a huge amount of dead matter, while assuming a lurid counterfeit of prosperity. Thus, unlike a living heart, these cities imprison and kill the blood and create poison centres filled with the accumulation of death. When a very large body of men come together for the sake of some material purpose, then it is as a congestion and not a congregation. When men are close together and yet develop no intimate bond of human friendship there ensues moral putrefaction. Wherever in the world this modern civilization is spreading its dominion, the life principle of society, which is the principle of personal relationship, is injured at the root.

All this is the result of an almost complete substitution of true civilization by what the West calls Progress. I am never against progress; but when, for its sake, civilization is ready to sell its soul, then I choose to remain primitive in my material possessions, hoping to achieve my civilization in the realm of the spirit.

People, as a whole, do and must live in the village, for it is their natural habitation. But the professions depend upon their special appliances and environment, and therefore barricade themselves with particular purposes, shutting out the greater part of universal nature, which is the cradle of life. The city, in all civilizations, represents this professionalism—some concentrated purpose of the people. That is to say, people have their home in the village and their offices in the city.

We all know that the office is for serving and enriching the home, and not for banishing it into insignificance. But we also know that when, goaded by greed, the gambling spirit gets hold of a man, he is willing to rob his home of all its life and joy and to pour them into the hungry jaws of the office. For a time such a man may prosper, but his prosperity is gained at the cost of happiness. His wife may shine in a blaze of jewellery, rousing envy along the path of her economic triumph, but her spirit withers in secret, thristing for love and the simple delights of life.

Society encourages the professions only because they are of service to the people at large. They find their truth when they belong to the people. But the professions, because they get all power into their hands, begin to believe that people live to maintain them. Thus

we often see that a lawyer thrives by taking advantage of the weaknesses of his clients, their helpless dread of loss, their dishonest love of gain. The proportion between the help rendered and the reward demanded loses its legitimate limit when it is not guided by any standard of social ethics.

Such a moral perversion has reached its extreme length today in the relationship of the city and the village. The city, which is the professional aspect of society, has gradually come to believe that the village is its legitimate field for exploitation, that the village must all the cost of its own life maintain the city in all its brilliance of luxuries and excesses that its wealth must be magnified even though that should involve the bankruptcy of happiness.

True happiness is not at all expensive, because it depends upon that natural spring of beauty and life which is harmony of relationship. Ambition pursues its path of self-seeking by breaking this bond of harmony, cutting gaps, creating dissensions. It feels no hesitation in trampling under foot the harvest field, which is for all, in order to snatch away in haste the object of its craving. Today this ambition, wasteful and therefore disruptive of social life, has usurped the helm of society.

In India we had our family system, large and complex, each family a miniature society in itself. But its rapid decay in the present day clearly points out the nature and process of the principle of destruction which is at work in modern civilization. When life was simple and its needs normal, when selfish passions were under control, such a domestic system was perfectly natural and fully productive of happiness. The family resources were sufficient for all and the claims on them were never excessive on the part of one or more of its individual members. But such a group can never survive if the personal ambition of a single member begins separately to clamour for a great deal more than is necessary for him. When emulation in augmenting private possessions and the enjoyment of exclusive advantage runs ahead of the common good and general happiness, the bond of harmony, which is the bond of sustenance, must give way, and brothers must separate, nay, even become enemies.

When our wants are moderate, the rations we claim do not exhaust the common store of nature, and the pace of their restoration does not hopelessly fall behind that of our consumption of them. This moderation, moreover, leaves us leisure to cultivate happiness, the

happiness which is the artist soul of the human world, creating beauty of form and rhythm of life. But man today forgets that the divinity in him is revealed by the halo of his happiness.

The Germany of the period of Goethe was considered to be poor by the Germany of the period of Bismarck. Possibly the standard of civilization illumined by the mind of Plato, or by the life of the Emperor Asoka, is underrated by the proud children of modern times who compare it with the present age of progress, an age dominated by millionaries, diplomats and war-lords. Many things that are of common use today were absolutely lacking in those days. But are those who lived then to be pitied by the young boys of our time, who have more of the printing press, but less of the mind ?

I often imagine that the moon, being smaller in size than the earth, begat life on her soil earlier than was possible on that of her companion. Once, she too had her constant festival of colour, music, movement ; her storehouse was perpetually replenished with food for her children who were already there and who were to come. Then in course of time some race was born to her, gifted with a furious energy of intelligence, which began greedily to devour its surroundings. It produced beings who, because of the excess of their animal spirits, coupled with intellect, lacked the imagination to realize that the mere process of addition did not create fulfilment ; that acquisition because of its bigness did not produce happiness; that movement did not constitute progress merely because of its velocity; that progress could have meaning only in relation to some ideal of completeness. Through machinery of tremendous power they made such an addition to their natural capacity for gathering and holding that their career of plunder outstripped nature's power of recuperation. Their profitmakers created wants which were unnatural and dug big holes in the stored capital of nature, forcibly to extract provision for them. When they had reduced the limited store of material they waged furious wars among their different sections for the special allotment of the lion's share. In their scramble for the right of self-indulgence they laughed at moral law, and took it to be a sign of racial superiority to be ruthless in the satisfaction of their desires. They exhausted the water, cut down the trees, reduced the surface of the planet into a desert riddled with pits. They made its interior a rifled pocket, emptied of its valuables. At last one day, like a fruit whose pulp has been completely eaten

by insects which it sheltered, the moon became a lifeless shell, a universal grave for the voracious creatures who had consumed the world to which they were born.

My imaginary selenites behaved exactly in the way that human beings are behaving on this earth, fast exhausting the stores of sustenance, not because they must live their normal life, but because they strain their capacity to live to a pitch of monstrous excess. Mother Earth has enough for the healthy appetite of her children, and something extra for rare cases of abnormality; but she has not nearly enough for the sudden growth of a whole world of spoilt and pampered children.

Man has been digging holes into the very foundations, not only of his livelihood, but also of his life ; he is feeding upon his own body. The reckless wastage of humanity which ambition produces is now seen in the villages, where the light of life is being dimmed, the joy of existence dulled, the natural threads of social communion snapped, every day. It should be our mission to restore the full circulation of life's blood into these maltreated limbs of society; to bring to the villages health and knowledge ; wealth of space in which to live ; wealth of time in which to work and to rest and to enjoy ; respect which will give them dignity ; sympathy which will make them realize their kinship with the world of men instead of their present subservient position.

Streams, lakes and oceans are there on this earth. They exist not for the hoarding of water exclusively within their own areas. They send up the vapour which forms into clouds and helps towards a wider distribution of rain. Cities have their functions of maintaining wealth and knowledge in concentrated forms of opulence ; but this also should not be for their own sake ; they should be centres of irrigation ; they should gather in order to distribute; they should not magnify themselves, but should enrich the entire commonwealth. They should be like lamp-posts, and the light they support must transcend their own limits.

Such a relationship of mutual benefit between the city and the village can remain strong only so long as the spirit of co-operation and self-sacrifice is a living ideal in society. When some universal temptation overcomes this ideal, when some selfish passion gains ascendancy, then a gulf is formed which goes on widening between them ; then the mutual relationship of city and village becomes that of exploiter and victim. This is a form of perversity whereby the body politic becomes its own enemy and whose termination is death.

We have started in India, in connection with our Visva-Bharati, a work of village reconstruction, the mission of which is to retard this process of race suicide. If I were to try to give the details of our work they would look small. But we are not afraid of this appearance of smallness, for we have confidence in life. We know that if as a seed it represents the truth that is in us, it will overcome opposition and conquer space and time. According to us, the poverty problem is not the most important, the problem of unhappiness is the great problem. Wealth, which is the synonym for the production and collection of things, men can make use of ruthlessly. They can crush life our of the earth and flourish. But happiness, which may not compete with wealth in its list of materials, is final ; it is creative ; therefore it has its source or riches within itself.

Our object is to try to flood the choked bed of village life with the stream of happiness. For this the scholars, the poets, the musicians, the artists, have to collaborate, to offer their contributions. Otherwise they must live like parasites, sucking life from the people and giving nothing back to them. Such exploitation gradually exhausts the soil of life, which needs constant replenishing, by the return to it of life, through the completion of the cycle of receiving and giving back.

Most of us who try to deal with the poverty problem think of nothing but a greater intensive effort of production, forgetting that this only means a greater exhaustion of materials, as well as of humanity. This only means giving exaggerated opportunity for profit to a few, at the cost of the many. It is food which nourishes, not money ; it is fullness of life which makes one happy, not fullness of purse. Multiplying materials intensifies the inequality between those who have and those who have not, and this deals a fatal wound to the social system, through which the whole body is eventually bled to death.

14

The Li Sao : Ch U Yuan

Preface

Today most of the classical poets of China have passed through the narrow, tortuous passage of scholarship into the intimate assembly of living letters. They, like the ancient Chinese Art, have won their recognition from the creative minds of the West, offering to them a new source of inspiration in their transparent simplicity and directness. Undoubtedly, the time has come when some Chinese writers, to whom the spirit of their native language readily yields her subtle secrets, should gather the best fruits of their literature, not for the pigeonholes of archaeological classification, but for the universal feast of mind. Dr. Lim Boon Keng has helped in this cause by his translation of a work which had been written in an age when most of the recognized languages of the modern world remained dumb in the depth of a nebulous anonymity.

The verses of this poem carry in them a lament, political in character, which makes vivid to us the background of a great people's mind, whose best aspiration was for a building of stable basis of society founded upon the spirit of moral obligation. That the quest of a perfect social adjustment in righteousness was the most powerful and living impulse in the Chinese character has been proved by the philosophy that China has treasured most for the guidance of her life, a philosophy that China has treasured most for the guidance of her life, a philosophy which offers no stimulant of spiritual emotionalism, but is sanely practical, and sensitively mindful of the influence of human conduct upon its social surroundings, Ch U Yuan, the poet, whom Dr. Lim Boon Keng brings before us, shows this characteristic Chinese spirit in his verses which he wrote on the occasion of a suffering that in other lands rarely seeks any direct and sustained expression in poetry, a suffering so poignantly personal that ultimately drove him to suicide. The unique distinction which his verses reveal is in the blending in them of a lyrical note with musings which cannot have a didactic character. The readers are made to realize, even through the inevitable obscurity of a translation with its immobile form of a blank verse insensitive to lyrical modulations, the sorrow not merely moral in meaning but which sorely affected the poet's imagination at the shattering

of his vision of fulfillment. We feel through the whole poem the pervasive sadness of a day's end that has discovered the promise of its morning betrayed. The following verse has in it the sigh of a dying breeze in the twilight sending its farewell whisper across all the leaves of this book :

> Time flows, me seems, I cannot keep pace with it
> I fear it gives me not the years I need;
> At morn, I pluck magnolias on the hill;
> At eve, I pick the islet's evergreens.

S. S. Plancius, Singapore
August 18. 1927

15

Sakuntala : Lawrence Binyon [Kedarnath Dasgupta]

ITS INNER MEANING

[BY RABINDRANATH TAGORE]

> Would'st thou the young year's blossoms
> and the fruits of its decline,
> And all by which the soul is charmed,
> enraptured, feasted, fed,
> Would'st thou the Earth and Heaven itself
> in one sole name combine ?
> I name thee, O Sakuntala ! and all at
> once is said.

GOETHE.

Goethe, the master-poet of Europe, has summed up his criticism of *Sakuntala* in a single quatrain; he has not taken the poem to pieces. This quatrain seems to be a small thing like the flame of a candle, but it lights up the whole drama in an instant, and reveals its inner nature. In Goethe's words, *Sakuntala* blends together the young year's blossoms and the fruits of maturity ; it combines heaven and earth in one.

We are apt to pass over this eulogy lightly as a mere poetical outburst. We are apt to consider that it only means in effect that Goethe regarded *Sakuntala* as fine poetry. But it is not really so. His stanza breathes not the exaggeration of rapture, but the deliberate judgement of a true critic. There is a special point in his words. Goethe says expressly that *Sakuntala* contains the history of a development— the development of flower into fruit, of earth into heaven, of matter into spirit.

In truth there are two unions in *Sakuntala;* and the *motif* of the play is the progress from the earlier union of the first Act, with its earthly unstable beauty and romance, to the higher union in the heavenly hermitage of eternal bliss described in the last Act. This drama was meant not for dealing with a particular passion, not for developing a particular character, but for translating the whole subject from one world to another— to elevate love from the sphere of physical beauty to the eternal heaven of moral beauty.

With the greatest ease Kalidas has effected this junction of earth with heaven. His earth so naturally passes into heaven that we do not mark the boundary-line between the two. In the First Act the poet has not concealed the gross earthiness of the fall of Sakuntala ; he has clearly shown, in the conduct of the hero and heroine alike, how much desire contributed to that fall. He has fully painted all the blandishments, playfulness, and fluttering of the intoxicating sense of youth, the struggle between deep bashfulness and strong self-expression. This is a proof of the simplicity of Sakuntala ; she was not prepared beforehand for the outburst of passion which the occasion of Dushyanta's visit called forth. Hence she had not learned how to restrain herself, how to hide her feelings. Sakuntala had not known Cupid before ; hence her heart was bare of armour, and she could not distrust either the sentiment of love or the character of the lover. The daughter of the hermitage was off her guard, just as the deer there knew not fear.

Dushyanta's conquest of Sakuntala has been very naturally drawn. With equal ease has the poet shown the deeper purity of her character in spite of her fall— her unimpaired innate chastity. This is another proof of her simplicity.

The flower of the forest needs no servant to brush the dust of her petals. She stands bare ; dust settles on her ; but in spite of it she easily retains her own beautiful cleanliness. Dust did settle on Sakuntala,

but she was not even conscious of it. Like the simple wild deer, like the mountain spring, she stood forth pure in spite of mud.

Kalidas has let his hermitage-bred youthful heroine follow the unsuspecting path of Nature ; nowhere has he restrined her. And yet he has developed her into the model of a devoted wife, with her reserve, endurance of sorrow, and life of rigid spiritual discipline. At the beginning, we see her self-forgetful and obedient to Nature's impulse like the plants and flowers ; at the end we see her deeper feminine soul— sober, patient under ill, intent on austerities, strictly regulated by the sacred laws of piety. With matchless art Kalidas has placed his heroism at the meeting-point of action and calmness, of Nature and Law, of river and ocean, as it were. Her father was a hermit, but her mother was a nymph. Her birth was the outcome of interrupted austerities, but her nurture was in a hermitage, which is just the spot where nature and austerities, beauty and restraint are harmonised. There is none of the conventional bonds of society there, yet we have the harder regulations of religion. Her *gandharva* marriage, too, was of the same type ; it had the wildness of nature joined to the social tie of wedlock. The drama *Sakuntala* stands alone and unrivalled in all literature, because it depicts how Restraint can be harmonised with Freedom. All its joys and sorrows, unions and partings, proceed from the conflict of these two forces.

Sakuntala's simplicity is natural, that of Miranda is unnatural. The different circumstances under which the two were brought up account for this difference. Sakuntala's simplicity was not girt round with ignorance, as was the case with Miranda. We see in the First Act that Sakuntala's two companions did not let her remain unaware of the fact that she was in the first bloom of youth. She had learnt to be bashful. But all these things are external. Her simplicity, on the other hand, is more deeply seated, and so also is her purity. To the very end the poet shows that she had no experience of the outside world. Her simplicity is innate. True, she knew something of the world, because the hermitage did not stand altogether outside society; the rules of home life were observed here too. She was inexperienced though not ignorant of the outside world; but trustfulness was firmly enthorned in her heart. The simplicity which springs from such trustfulness had for a moment caused her fall, but it also redeemed her for ever. This trustfulness kept her constant to patience, forgiveness, and loving kindness, in spite of the cruellest breach of her confidence. Miranda's

simplicity was never subjected to such a fiery ordeal; it never clashed with knowledge of the world.

Our rebellious passions raise storms. In this drama Kalidas has extinguished the volcanic fire of tumultuous passion by means of the tears of the penitent heart. But he has not dwelt too long on the disease— he has just given a glimpse of it and then dropped the veil. The desertion of Sakuntala by the amorous Dushyanta, which in real life would have happened as the natural consequence of his character, is here brought about by the curse of Durvasa. Otherwise the desertion would have been so extremely cruel and pathetic as to destroy the peace and harmony of the whole play. But the poet has left a small rent in the veil through which we can get an idea of the royal sin. It is in the Fifth Act. Just before Sakuntala arrives at court and is repudiated by her husband, the poet nomentarily draws aside the curtain from the King's love affairs. A woman's voice is heard singing behind the scene :

O honey-bee! having sucked the mango-blossoms in your search for new honey, you have forgotten the recent loving welcome by the lotus!

This tear-stained song of a stricken heart in the royal household gives us a rude shock, especially as our heart was hitherto filled with Dushyanta's love-passages with Sakuntala. Only in the preceding Act we saw Sakuntala setting out for her husband's home in a very holy, sweet, and tender mood, carrying with herself the blessings of the hoary sage Kanwa and the good wishes of the whole forest world. And now a stain falls on the picture we had so hopefully formed of the home of love to which she was going.

When the jester asked, "What means this song?" Dushyanta smiled and said, "We desert our loves after a short spell of love-making, and therefore I have deserved this strong rebuke from Queen Hansapadika." This indication of the fickleness of royal love is not purposeless at the beginning of the Fifth Act. With masterly skill the poet here shows that what Durvasa's curse had brought about had its seeds in human nature.

In passing from the Fourth Act to the Fifth we suddenly enter a new atmosphere; from the ideal world of the hermitage we go fourth to the royal court with its hard hearts, crooked ways of love-making, difficulties of union. The beauteous dream of the hermitage is about to be broken. The two young hermits who are escorting Sakuntala,

at once feel that they have entered an altogether different world, "a house encircled by fire !" By such touches at the beginning of the Fifth Act, the poet prepares us for the repudiation of Sakuntala at its end, lest the blow should be too severe for us.

Then comes the repudiation. Sakuntala feels as if she had been suddenly struck with a thunderbolt. Like a deer stricken by a trusted hand, this daughter of the forest looks on in blank surprise, terror, and anguish. At one blow she is hurled away from the hermitage, both literal and metaphorical, in which she has so long lived. She loses her connection with the loving friends, the birds, beasts, and plants, and the beauty, peace, and purity of her former life. She now stands alone, shelterless. In one moment the music of the first four Acts is stilled !

O the deep silence and loneliness that then surround her ! She whose tender heart has made the whole world of the hermitage her own folk, today stands absolutely alone. She fills this vast vacuity with her mighty sorrow. With rare poetic insight Kalidas has declined to restore Sakuntala to Kanwa's hermitage. After the renunciation by Dushyanta it was impossible for her to live in harmony with that hermitage in the way she had done before... . She was no longer her former self; her relation with the universe had changed. Had she been placed again amidst her old surroundings, it would only have cruelly exhibited the utter inconsistency of the whole situation. A mighty silence was now needed, worthy of the mighty grief of the mourner. But the poet has not shown us the picture of Sakuntala in the new hermitage— parted from the friends of her girlhood, and nursing the grief of separation from her lover. The silence of the poet only deepens our sense of the silence and vacancy which here reigned round Sakuntala. Had the repudiated wife been taken back to Kanwa's home, that hemitage would have spoken. To our imagination its trees and creepers would have wept, the two girl friends would have mourned for Sakuntala, even if the poet had not said a word about it. But in the unfamiliar hermitage of Marichi, all is still and silent to us ; only we have before our mind's eye a picture of the world-abandoned Sakuntala's infinite sorrow, disciplined by penance, sedate, and resigned— seated like a recluse rapt in meditation.

Dushyanta is now consumed by remorse. This remorse is *tapasya.* So long as Sakuntala was not won by means of this repentance, there was no glory in winning her... . One sudden gust of youthful impulse had in a moment given her up to Dushyanta, but that was not the

true, the full winning of her. The best means of winning is by devotion, by *tapaysa.* What is easily gained is as easily lost. Therefore, the poet has made the two lovers undergo a long and austere *tapasya* that they may gain each other truly eternally. If Dushyanta had accepted Sakuntala when she was first brought to his court, she would have only occupied a corner of the royal household, and passed the rest of her life in neglect, gloom, uselessness.

It was a blessing in disguise for Sakuntala that Dushyanta abjured her with cruel sternness. When afterwards this cruelty reacted on himself, it prevented him from remaining indifferent to Sakuntala. His unceasing and intense grief fused his heart and welded Sakuntala with it. Never before had the King met with such an experience. Never before had he had the occassion and means of truly loving. Kings are unlucky in this respect; their desires are so easily satisfied that they never get what is to be gained by devotion alone. Fate now plunged Dushyanta into deep grief and thus made him worthy of true love— made him renounce the role of a rake.

Thus has Kalidas burnt away vice in the eternal fire of the sinner's heart ; he has not tried to conceal it from the outside. When the curtain drops in the last Act, we feel that all the evil has been destroyed as on a funeral pyre, and the peace born of a perfect and satisfactory fruition reigns in our hearts. Kalidas has internally cut right away the roots of the poison tree, which a sudden force from the outside had planted. He had made the physical union of Dushyanta and Sakuntala tread the path of sorrow, and thereby chastened and sublimated it into a moral union. Hence did Goethe rightly say that *Sakuntala* combines the blossoms of Spring with the fruits of Autumn, it combines Heaven and Earth. Truly in *Sakuntala* there is one Paradise Lost and another Paradise Regained.

The poet has shown how the union of Dushyanta and Sakuntala in the First Act as mere lovers is futile, while their union in the last Act as the parents of Bharata is a true union. The First Act is full of brilliancy and movement. We have there a hermit's daughter in the exuberance of youth, her two companions running over with playfulness, the newly flowering forest creeper, the bee intoxicated with perfume, the fascinated King peeping from behind the trees. From this Eden of bliss Sakuntala, the mere sweetheart of Dushyanta, is exiled in disgrace. But far different was the aspect of the other hermitage where Sakuntala, the mother of Bharata and the incarnation of goodness took

refuge. There no hermit girls water the trees, nor bedew the creepers with their loving sister-like looks, nor feed the young fawn with handfuls of paddy. There a single boy fills the loving bosom of the entire forest-world; he absorbs all the liveliness of the trees, creepers, flowers, and foliage. The matrons of the hermitage, in their loving anxiety, are fully taken up with the unruly boy. When Sakuntala appears, we see her clad in a dusty robe, face pale with austerities, doing the penance of a lorn wife, pure-souled. Her long penances have purged her of the evil of her first union with Dushyanta : she is now invested with the dignity of a matron, she is the image of motherhood, tender and good. Who can repudiate her now ?

The poet has shown here, as in *Kumara Sambhava,* that the Beauty that goes hand in hand with Moral Law is eternal, that the calm, controlled, and beneficent form of Love is its best form, that beauty is truly charming under restraint and decays quickly when it gets wild and unfettered. This ancient poet of India refuses to recognise Love as its own highest glory; he proclaims that Goodness is the final goal of Love. He teaches us that the Love of man and woman is not beautiful, not lasting, not fruitful, so long as it is selfcentered, so long as it does not beget Goodness, so long as it does not diffuse itself into society over son and daughter, guests and neighbours.

The two peculiar principles of India are the beneficent *tie of home life* on the one hand, and the *liberty of the soul* abstracted from the world on the other. In the world India is variously connected with many races and many creeds; she cannot reject any of them. But on the altar of devotion *(tapasya)* India sits alone. Kalidas has shown, both in *Sakuntala* and *Kumara Sambhava,* that there is a harmony between these two principles, an easy transition from the one to the other. In his hermitage a human boy plays with lion cubs, and the hermit spirit is reconciled with the spirit of the householder.

On the foundation of the hermitage of recluses Kalidas has built the home of the householder. He has rescued the relation of the sexes from the sway of lust and enthroned it on the holy and pure seat of ascerticism. In the sacred books of the Hindus the ordered relation of the sexes has been defined by strict injunctions and Laws. Kalidas has demonstrated *that* relation by means of the elements of Beauty. The Beauty that he adores is lit up by grace, modesty, and goodness; in its intensity it is true to one for ever; in its range it embraces the

whole universe. It is fulfilled by renunciation, gratified by sorrow, and rendered eternal by religion. In the midst of this beauty, the impetuous unruly love of man and woman has restrined itself and attained to a profound peace, like a wild torrent merged in the ocean of goodness. Therefore is such love higher and more wonderful than wild and untrained Passion.[1]

16

Glimpses of India : S. G. Thakur Singh

Foreword

VISVA-BHARATI
SANTINIKETAN, BENGAL

The representation of the landscapes, temple scenes and some striking aspect of the Indian cities done by Mr. S. G. Thakur Singh have given me pleasure and I recommend them to all lovers of beauty in nature and human works of art.

20th December, 1929

17

Thakore Sahib Shri Sir Daulat Singh of Limbdi : Elizabeth Sharpe

Foreword

It has been my happy privilege to know His Highness The Thakore Sahib of Limbdi during my visit to his State and I am glad to have this opportunity of recording here the admiration I cherish for him. Through my brief contacts with him I have been impressed with his deeply human personality having for its background the pervading dignity of a serene religious consciousness in which is combined the

1. This article was originally written by the author in Bengali and was translated into English by Professor Jadunath Sarkar.

worldly wisdom worthy of the guardian of people and the tradition of ancient India. I am glad to realise that Miss Sharp in her biographical sketch brings out this rare harmony of his character through a close understanding and a detailed treatment.

18

Twentyfive Linocuts : Rani Dey

I am glad to introduce to the public Miss Rani Dey, a student of the art department of Santiniketan.

She has real artistic talent as is evident in these into prints done by her showing genuine feeling for her subjects and natural skill in execution.

Feb. 1. 1932

19

Islam's Contribution to Science and Civilisation : Maulvi Abdul Karim

Foreword

One of the most patent sources of Hindu-Moslem conflict in India is that we know so little of each other. We live side by side and yet very often our worlds are entirely different. Such mental allofness has done immense mischief in the past and forebodes and evil future. It is only through a sympathetic understanding of each other's culture and social customs and conventions that we can create an atmosphere of peace and goodwill. With this end in view I started a few years ago a department of Islamic Culture in Visva-Bharati with the generous financial support of His Exalted Highness the Nizam. I am goad to say the experiment has been successful. But work of this sort must be elaborated a hundred fold. Individual educationists and scholars must also take it up and as such I heartily welcome the series of articles

from my distinguished countryman, Maulvi Abdul Karim, on Islam's contribution to Science and Civilisation. The writer has clothed his erudition in as simple a garb as possible and the book should have great popular appeal. It is with pleasure that I commend the book to my countrymen.

Uttarayan
Santiniketan, Bengal
August, 19, 1935

20

Hindu Scriptures : Nicol Macnicol (ed)

Foreword

That Religion, though not infrequently administered as opiate to the people, did not always originate is such, is often ignored by thinkers whose intellectual bias inclines them to purely economic interpretations of social phenomena. A publication therefore which is likely to provide an insight into the inspiration and development of one of the oldest of the living religions, should be welcomed by all intelligent and impartial readers.

Perhaps the most significant thing that strikes the reader as he goes through some of the Vedic Hymns collected here is that they read, not like so many commandments, enjoined by priests or prophets, which in the European mind are identified with Oriental religions, including Christianity, but as a poetic testament of a people's collective reaction to the wonder and awe of existence. A people of vigorous and unsophisticated imagination awakened at the very dawn of civilization to a sense of the inexhaustible mystery that is implicit in Life. It was a simple faith of theirs that attributed divinity to every element and force of Nature, but it was a brave and joyous one, in which fear of the gods was balanced by trust in them, in which the sense of mystery only gave enchantment to life, without weighing it

down with bafflement— the faith of a race unberdened with intellectual brooding on the conflicting diversity of the objective universe, though now and again illumined by such flashes of intuitive experience as 'Truth is one : (though) the wise call it by various names' (Ṛgveda 1, 164, 46).

It is this brooding on the meaning of existence that chiefly distinguishes the spirit of the Hymns from that of the Upanishads. The same wonder and poetry are there, but deepened and widened by the calm of meditation. Keener spiritual longing shifts the emphasis from the wonder of the outside universe to the significance of the self within. The quest for Reality rebukes the emotional exuberance of the early poet, and compels him inwards to explore the infinite depths of the Soul in which the central principle of creation is reflected.

The early authors were childlike in their reaction, fascinated by what they beheld and naively seeking to adjust to it their hopes and fears ; but as when children grow they gather an increasing awareness of their selves, the later authors sought more and more a centre of reference in their own consciousness, a subjective counterpart to the objective majesty that had so long held them enthralled in awe, an answer in their own being to the cosmic challenge of the visible universe.

A transcendental spirit of enquiry challenges the old gods, and their mechanical propitiation prescribed by the sacred texts. Says Narada : 'I know the Ṛgveda, the Yajur, the Sāma-veda with all these I know only the Mantras and the sacred books, I do not know the Self.'[1] The eternal, the unchanging, the one without a second, is proclaimed, for fear of whom fire burns, for fear of whom the sun shines, and for fear of whom the winds, the clouds, and death perform their offices. And if this Supreme Self is unknowable and incomprehensible, it is yet realizable through self-discipline and knowledge by the Self in man, for the two are ultimately one. Thus man is delivered from the fear of the Cosmic Forces and is made part of the Divine Will.

But the Upanishads, though they measured the highest reaches of the philosophic imagination of our people, were yet incomplete in

1. *Chhāndogya Upanishad, VII, i, 2, 3.*

their answer to the complex longing of the human soul. Their emphasis was too intellectual, and did not sufficiently explore the approach to Reality through love and devotion. Man can never be fully and wholly fulfilled through self-discipline and knowledge, though that self-discipline be superhuman and knowledge transcendental. A more human approach lies through love, which easily withdraws most of the obstacles that the Self interposes between the contemplator and the contemplated, though love too needs self-discipline for its disinterested expression.

This lesson was duly emphasized by the Bhagavadgītā, which finally expounded the harmony between diverse approaches to the Reality that is one, through knowledge, through love, through righteous and detached living, and developed the thesis that any means that helped the individual to rise above the demands of the ego to his identity with the Supreme Self that is in all being, were the truly legitimate means of that individual spiritual fulfilment. Thus was rounded up the entire range of Indian spiritual and philosophic speculation and practice, and were reconciled the paths of dispassionate contemplation of the Impersonal, of ecstatic devotion to the Personal, of disinterested living in the world of the actual. Sacrifice of desire and not of the object, renunciation of the Self, not of the world, were made the keynote of this harmony of spiritual endeavours.

Such, in brief, is the impression left on the mind of an Indian as he surveys the many many centuries that stretch between the Hymns of the Vedas and the arguments of the Bhagavadgītā.

21

When Peacocks Called : Hilda Seligman

Foreword

In an age of fratricide, aided by intellectual dehumanization in large areas of the world, it is difficult to restore the calm air so necessary for the realization of great human ideals. Hilda Seligman has chosen in her book to reveal the organization side of a great humanism which came with King Aśoka of India. My good thoughts go with the author

in her venture to present ancient India through its message which has a perennially modern significance.

Uttarayan, Santiniketan
Bengal

22

Preparation for Citizenship : Sophia Wadia

Foreword

I am glad the series of three Mysore University Extension Lectures which were delivered by Srimati Sophia Wadia in September 1937 are being published in book form. She has chosen for her subject a theme which is exercising the minds of all thinking people all over the world at the present time ; namely the true basis of Democracy which, as she rightly asserts in keeping with the eternal ideas of ancient India, is a spiritual principle. And her clarion call to the State and the Citizen to contribute co-operatively to bringing into being SELF-Rule, in which diversities of gifts and graces of the Spirit but enrich one another as well as the whole of humanity, is timely.

Santiniketan
December 14, 1940

23

A Primer of Modern Japanese Language : Tokuzo Saito

"Uttarayan"
Santiniketan, Bengal

I am glad to recommend the Japanese Primer by Mr. T. Saito, Instructor in Japanese language in the Calcutta University, to our people. So long our education has somehow enabled us to have communication of mind

with Europe. But the time is ripe when we must also have proper means for a closer cultural approach to Asia and this little book will help us to some extent towards this purpose.

Feb. 6, 1941

24

Sermon on the Mount : C. F. Andrews

Foreword

In the midst of the world's anguish this book will renew the message of undying peace and love to which the great friend of humanity, C. F. Andrews, bore testimony during his years of dedicated service. Andrews is no more with us, but his work lives in wide areas of mankind, and this book will help in our realisation of truth in a period of darkening horizons.

Andrews was very near to me and to India, where he will be remembered as Deenabandhu– the Friend of the Poor– a name lovingly given to him by my countrymen. It is difficult for me yet to write of him with detachment, and I would therefore quote the words that I addressed to members of Santiniketan during the memorial service that was held on 5th April, 1940, in the hope that these words will vonvey better than any prepared writing the tribute of friends who saw in the life of Andrews a noble embodiment of the Sermon on the Mount.

*The lifeless body of our beloved friend Charless andrews is at this hour being laid to rest in the all-devouring earth. We try to steel ourselves to endurance in this day of sorrow by the thought that death is not the final destiny of life, but we find as yet no consolation. Day after day, in the countless familiaries of sight and speech, love, the nectar of the gods, has filled our cup of life to brim. Our minds, imprisoned in the meterial, have grown accustomed to depend on the bodily senses as their channels of communication with each other. When these channels are suddenly blocked by death, the separation

* From this point to the end of the Foreword the translation of the text is by Marjorie Sykes, from the verbatim report of the address given in Bengali.

is felt as an intolerable grief. We have known Andrews for long years and in a rich variety of ways. Now we must accept out fate— never again will that dear human comradeship be possible. Yet our hearts grope yearningly for some assurance of hope and comfort in our loss.

When we separated from a man with whom our relationship touched only the necessary business of life, nothing remains behind. We accept the ending of that relationship as final. The gains and losses of material and secular chance are subject to the power of death. But the relationship of love, infinite, mysterious, is not subject to the limitations of such material intercourse, nor cabined and confined in the the life of the body. Such a rare companionship of soul existed between Andrews and me. Coming unsought, it was a gift of god beyond all price. No lesser explanation on the human plane will suffice to account for it. One day, as if from nowhere, from one who was till then a complete stranger to me, there was poured out upon me this generous gift of friendship. It rose like a river from the clear spring of this Christan Sadhu's devotion to God. In it there was no taint of selfishness, no stain of ambition, only a single-minded offering of the spirit to its Lord. The question in the *Kena Upanishad* came into my mind unbidden : *By whose grace was this soul sent to me, in what secret is rooted its life ?*

Rooted it was, I know, in a deeply sincere and all-embracing love of God. I should therefore like to tell you of the beginning of this friendship. At that time I was in London, and was invited to a meeting of Englishmen of letters at the house of the artist Rothenstein. The poet yeats was giving a recitation of some poems from the English translation of my "Gitanjali," and Andrews was present in the audience. After the reading was over I was returning to the house where I was staying, which was close at hand. I crossed at a leisurely pace the open stretch of Hampstead Health. The night was bathed in the loveliness of the moon. Andrews came and accompanied me. In the silence of the night his mind was filled with the thoughts of "Gitanjali." He was led on through his love of God, into a stirring of love towards me. Little did I dream that day of the friendship in which the streams of his life and mine were destined to be mingled to the end, in such deep intimacy, in such a fellowship of service.

He began to share in the work of Santiniketan. At that time this poor place of study was very ordinary indeed in outward appearance, and its reputation was very small. Yet, its external poverty notwith-

standing, he had faith in the spiritual purpose to which it was dedicated, he made it a part of the spiritual endeavour of his own life. What was not visible to the eye he saw by the insight of love. With his love for me he mingled a whole-hearted affection for Santiniketan. This, indeed, is characteristic of true strength of character, that it does not rest content with a mere outburst of emotion, but finds its own fulfilment in superhuman sacrifice for its ends. Andrews never amassed any wealth: his was a spirit freed from the lust of possession. Yet many were the times (how many, we can never know) when, coming to know of something the ashram lacked, he found, from some source, sufficient for our need. Over and over again he begged from others. Sometimes he begged in vain, yet in that begging he did not hesitate to humiliate that "self-respect" which is the world's ideal. And this, I think, was what attracted him with special force— that even through a weary time of poverty Santiniketan strove faithfully for the realisation of its inner vision.

So far I have spoken of the affection of Andrews towards myself, but the most unusual thing about him was his devoted love of India. The people of our country have accepted this love ; but have they realised fully the cost of it to him ? He was an Englishman, a graduate of Cambridge University. By language, customs, culture, by countless links, the ties of birth and blood bound him to England. Family associations were centered there. The India which became the object of his lifelong devotion was far removed in manners and customs from his own physical and intellectual traditions. In the realisation and acceptance of this complete exile he showed the moral strength and purity of his love. He did not pay his respects to India from a distance, with detached and calculating prudence : he threw in his lot without reserve, in gracious courtesy, with the ordinary folk of this land. The poor, the despised, those whose lives were spent in dirt and ugliness— it was these whose familiar life he shared, time and time again, naturally and without effort. We know that this manner of life made him very unpopular with many of the ruling class of his country, who believed that by it he was bringing the Government into contempt, and they became his bitter opponents ; yet the scorn of men of his own race did not trouble his mind. Knowing that the God of his adoration was the friend of those whom society despises, he drew support and confidence from Him in prayer. He rejoiced in the victory of his Christian faith over all obstacles whenever by his agency any man, Indian or foreign, was freed from the bonds of scorn. In this

connection it must also be said that he many times experienced unfriendliness and suspicion even from the people of our own land, and he bore this unmerited suffering undismayed as part of his religious service.

At the time when Andrews chose India as the field of his life work, political excitement and activity were at their height here. In such circumstances it can easily be understood how exceedingly difficult it would be for an Englishman still to maintain quiet relationship of intimate friendship with the people of this country. But he remained at his post quite naturally, with no doubt or misgiving in his heart. That in this stern test he should have held unswervingly to his life purpose is in itself a proof of his strength of soul.

I have thus had the privilege of knowing two aspects of the nature of my friend Andrews. One aspect was in his nearness to me, the very deep love with which he loved me. This genuine, unbounded love I believe to have been the highest blessing of my life. I was also a daily witness of the many expressions of his extraordinary love for India. I saw his endless kindness to the outcastes of this land. In sorrow or need they would call him, and he would hasten to their assisance, throwing all other work aside, regardless of his own convenience, ignoring his own ill-health. Because of this it was not possible to tie him down to any of our regularly organised work.

It would be a mistake to think that this generous love of his was confined within the narrow limits of India. His love for Indians was a part of that love of all humanity which he accepted as the Law of Christ. I remember seeing one illustration of this in his tenderness for the Kaffir aboriginals of South Africa, when the Indians there were endeavouring to keep the Kaffirs at a distance and treat them with contempt, and imitated the Europeans in demanding special privileges for themselves. Andrews could not tolerate this unjust spirit of aloofness, and therefore the Indians of South Africa once imagined him to be their enemy.

At the present time when a suicidal madness of destruction seizes our race, and in uncontrolled arrogance a torrent of blood sweeps away the landmarks of civilised human society, the one hope of the world is in an all-embracing universal charity. Through the very might of hostility arrayed against it there comes the inspiration of the God of the age. Andrews was the embodiment of that inspiration. Relationship between us and the English are rendered difficult and complex by their

attitude to the privileges of race and empire. An Englishman who in the magnanimity of his heart endeavours to approach us through this network of artificiality finds his way obstructed at every step. To keep an arrogant distance between themselves and us has become a chief element of their pride of race. The whole country has had to bear the intolerable weight of this indignity. Out of this English tradition Andrews brought to us his English manhood. He came to live with us in our joys and sorrows, our triumphs and misfortunes, identifying himself with a defeated and humiliated people. His attitude was absolutely free from any suspicion of that self-satisfied patronage which condescends from its own eminence to help the poor. In this I realised his rare gift of spontaneous universal friendship.

This, finally, is what, I would say to you who live in the ashram, in solemn confidence, at the very moment when his lifeless body is being committed to the dust— his noblest gift to us, and not only to us, but to all men, is a life which is transcendent over death itself, and dwells with us imperishably.

January, 1941

25

The Deliverance : Saratchandra Chatterjee

The early epoch of Bengali prose suggests its parallel in the beginning of the biological age on this earth when its animal creations were cumbersome in their gait, lacking in a rythm submissive to life. Though the time is not remote yet it seems to us belonging almost to a prehistoric period of evolution when Bengali prose painfully struggled on with its a dynamic grammar and vocabulary containing words that were mostly inert and colourless. Our own growing intimacy with the modern European mind and its manner of expression reacted upon our language giving it more and more freedom of movement and the pliancy in its functions. During a remarkably rapid course of self-discovery it has developed the courage to be able to cross the orthodox enclosure of a pseudoclassical form of literature rigid in its ceremonialism. This freedom has brought our fiction close to the

everyday life of the people, a large section of which was formerly shunned as untouchable in our domain of culture. The latest of the leaders who, through this path of liberation, has guided Bengali novels nearer to the spirit of modern world literature is SARAT CHANDRA CHATTERJI. He has imparted a new power to our language and his stories has shed the light of a fres vision upon the too familiar region of Bengal's heart, revealing the living significance of the obscure trifles in people's personality. He has achieved the best reward of a novelist : he has completely won the hearts of Bengali readers.

'Uttarayan'
Santiniketan, Bengal
March 1935

26

Behula : Sukhalata Rao

Introduction

Mrs. Sukhalata Rao has caught in the web of her story the spirit of the village epic of Bengal, Behula, which has sprung from the heart of our people and has lived in oral traditions and folk-lore, sung and performed by the local operatic troupes of this province. It gives us the picture of the ideal wife, her heroic sacrifice and conjures the atmosphere of home life in its humble majesty, touching simple hearts with the beauty and depth of its sentiments.

I feel sure that this English version of the story will find a large and appreciative audience.

প্রসঙ্গ-নির্দেশ

প্রথম বিভাগ : প্রথম অধ্যায়

১

অন্যের যে গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ-রচিত প্রথম ভূমিকাটি সংযুক্ত হয়, সেটি অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় -রচিত একটি ছোটো বই, নাম 'মেয়েলি ব্রত'। 'সাধনা' পত্রিকায় (এ পত্রিকায় অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় লিখতেনও) রবীন্দ্রনাথ একসময়ে 'মেয়েলি ছড়া' বিষয়ক প্রবন্ধ রচনা করে (আশ্বিন-কার্ত্তিক ১৩০১) বিষয়টির প্রতি পাঠক-সাধরণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। রবীন্দ্রনাথের উৎসাহে এবং নির্দেশে অঘোরনাথ এ-বিষয়ে আরো অগ্রসর হন। 'সাধনা' পত্রিকায় চতুর্থ বর্ষে (১৩০১-০২) তাঁর লেখা কয়েকটি মেয়েলি ব্রত-বিষয়ক রচনা পত্রস্থ হয়। পরে ১৩০৩ সালে তাঁর এই বই প্রস্তুত হলে লেখকের অনুরোধক্রমে রবীন্দ্রনাথ বইটির একটি ভূমিকা লিখে (৭ কার্তিক ১৩০৩) কার্সিয়াং থেকে পাঠিয়ে দেন। মুদ্রিত হয়ে বইটি প্রকাশিত হবার সময় গ্রন্থে সংযুক্ত হয়।

ভূমিকায় তিনি প্রসঙ্গক্রমে লেখনে—'সাধনা পত্রিকা সম্পাদনকালে আমি ছেলে ভুলাইবার ছড়া এবং মেয়েলি ব্রত সংগ্রহ ও প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত ছিলাম। ব্রতকথা সংগ্রহে অঘোরবাবু আমার প্রধান সহায় ছিলেন সেজন্য আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ আছি।' তিনি এ বিষয়ে দীনেন্দ্রকুমার রায়ের ভূমিকার কথাও কৃতজ্ঞ চিত্তে ভূমিকায় স্মরণ করেছিলেন।

অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পরিচয় একালের পাঠকের কাছে খুব একটা স্পষ্ট নয়। তাঁর জন্ম হয় বর্ধমান জেলার বাকল্‌সা গ্রামে ৩ মাঘ, ১২৬৮ বঙ্গাব্দে। মৃত্যু ১৬ মাঘ ১৩৩৯, ২৬ জানুয়ারি ১৯৩৩। রবীন্দ্রনাথের সমবয়স্ক এই মানুষটি আদিনিবাস ময়মনসিংহ জেলা ছেড়ে ব্যবসায়সূত্রে বীরভূম জেলার বোলপুরে আসেন। ব্রাহ্মধর্মের প্রতি অনুরক্ত অঘোরনাথ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ -কর্তৃক শান্তিনিকেতন আশ্রমের 'আশ্রমধারী' নিযুক্ত হন (১২৯৫ ব.)। প্রায় দশ বছর এখানে অতিবাহিত করে পরবর্তীজীবন ঐ জেলার নলহাটিতেই কাটিয়ে যান।

আখ্যাপত্র : মেয়েলি ব্রত। (স্ত্রী সমাজে প্রচলিত কতিপয় / বারব্রতের বিবরণ।) / 'ভক্ত চরিতামৃত' ও 'শ্রীহরিদাস ঠাকুর' / প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা / শ্রীঅঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় / সংকলিত। / কলিকাতা, / ১৪ নং ডফ্ ষ্ট্রীট হইতে / সুর এণ্ড কোম্পানী কর্ত্তৃক প্রকাশিত / ১৩০৩ / All Rights Reserved [মূল্য] / পাঁচ আনা। মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা আট আনা + ৬৮। বইটির অলংকরণ করেছিলেন দীনেন্দ্রকুমার রায়।

ভূমিকার প্রসঙ্গে অঘোরনাথ লেখেন— 'পরম শ্রদ্ধাস্পদ কবিবর শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের অভিপ্রায় ও উপদেশ অনুসারে এই গ্রন্থোল্লিখিত ব্রতের বিবরণগুলির অধিকাংশই ইতঃপূর্বে "সাধনা" পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। এক্ষণে তাঁহারই উপদেশমত ইহা পুস্তকাকারে মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল। তিনি অনুগ্রহপূর্বক এই গ্রন্থের ভূমিকাটি লিখিয়া দিয়া আমাকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।'

২

রবীন্দ্রনাথ তাঁর পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে অন্যের গ্রন্থে প্রথম ভূমিকা রচনার পর দ্বিতীয় যে বইটির জন্য একটি সুদীর্ঘ ভূমিকা রচনা করে দেন, সেটি দীনেশচন্দ্র সেনের (১৮৬৬-১৯৩৯) 'রামায়ণী কথা।'

দীনেশচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় বিশ শতকের সূচনায়। ১৮৯৬ খৃস্টাব্দে দীনেশচন্দ্রের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থ প্রকাশিত হলে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে চিঠি দেন। তাঁকে ১৩০৭ বঙ্গাব্দে ক্ষণিকা, কণিকা, কথা, কাহিনী প্রভৃতি কাব্যনিচয় উপহার দেন। দীনেশচন্দ্র কবির কাছে বসে নৌকাডুবি, চোখের বালির পাণ্ডুলিপি পাঠ শোনেন। তাঁর পুত্র অরুণ শান্তিনিকেতনে কবির প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ছিলেন। 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে'র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হলে কবি 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার শ্রাবণ ১৩০৯ সংখ্যায় তার দীর্ঘ সমালোচনা প্রকাশ করেন। অপরপক্ষে রবীন্দ্রনাথ দীনেশচন্দ্র-কৃত 'ক্ষণিকা'-র সমালোচনা পেয়ে যথেষ্ট আনন্দ পেয়েছিলেন। একসময়ে কবি দীনেশচন্দ্রকে 'বঙ্গদর্শন' (নবপর্যায়) সম্পাদনার ভার অর্পণ করতে চেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের প্রবর্তনাতেই দীনেশচন্দ্র 'ঘরের কথা ও যুগ সাহিত্য' নামে তাঁর আত্মজীবনী রচনা করেন।

'রামায়ণী কথা' প্রকাশিত হয় ১৩১০ বঙ্গাব্দে। এতে দশরথ, রামচন্দ্রাদি ৯টি রামায়ণ-বর্ণিত চরিত্র এবং একটি তৎ-সম্পর্কিত সামাজিক প্রসঙ্গের আলোচনা আছে। ১৩১০ বঙ্গাব্দে 'বঙ্গদর্শনে'র বিভিন্ন সংখ্যায় এগুলি পূর্বেই প্রত্রস্থ হয়েছিল। গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্বে দীনেশচন্দ্র এর একটি ভূমিকা রচনা করে দেবার জন্য রবীন্দ্রনাথকে অনুরোধ জানান। কবি অনুরোধ স্বীকার করেন এবং ভূমিকা রচনার পূর্বে নিবন্ধগুলি পুনরায় মনোযোগ সহকারে পাঠ করে পেন্সিলে-লেখা মন্তব্যসহ পাণ্ডুলিপি দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মারফতে দীনেশচন্দ্রের কাছে ফেরত পাঠান। রবীন্দ্রনাথের মতে— লক্ষ্মণ ভরত কৌশল্যা প্রবন্ধগুলির মধ্যে সর্বোত্তম হইয়াছে। [তাহার] পরে যথাক্রমে সীতা ও [রাম] এবং দশরথ ক্লাসের মধ্যে [সর্ব] নিম্নে।' (চিঠিপত্র ১০, পত্রসংখ্যা ১৫, পত্র রচনার তারিখ ২৮ আশ্বিন [১৩১০])। এই চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ আলোচিত-চরিত্রগুলির বিশ্লেষণ-বৈশিষ্ট্য বিষয়ে নিজের মতামত জানিয়েছেন এবং প্রসঙ্গক্রমে লিখেছেন— 'একটু সময় পাইলেই আমি ভূমিকা লিখিতে প্রবৃত্ত হইব।'

কয়েকদিন মাত্র পরে ২ কার্তিক ১৩১০ (পত্রসংখ্যা ১৬) তারিখের চিঠিতেও লিখেছেন— 'একটু নিশ্চিন্ত না হইলে ভূমিকা লেখায় হাত দিতে' পারছেন না। ২৪ কার্তিকেও ভূমিকা লিখে উঠতে পারেন নি— 'বোটে গিয়া আপনার ভূমিকা লিখিব। অগ্রহায়ণের আরম্ভেই বোটে যাইবার সংকল্প আছে। তাহার পূর্বে আপনার সঙ্গে দেখা হইবে।' (চিঠিপত্র ১০, পত্রসংখ্যা ১৭) শেষ পর্যন্ত ২০ পৌষ ১৩১০ নাগাদ ভূমিকা রচনা করে কবি সেটি লেখকের সমীপে পাঠিয়ে দিয়ে বোলপুর থেকে চিঠিতে [পত্রসংখ্যা ১৯] লিখেছেন।

ওঁ

বোলপুর

প্রিয়বরেষু,

শরীর অপটু। মনও বিদ্যালয়ের অর্থচিন্তায় উৎকণ্ঠিত। রামায়ণের ভূমিকা যথেষ্ট মনোযোগের সহিত লিখিতে পারি নাই। সে ক্ষমতা এখন নাই। কবে হইবে অপেক্ষা করিয়া থাকিলে আপনার ক্ষতি হইবে। অতএব অসময়ের ঐ সামান্য উপহারটুকু লইয়া আমাকে স্মরণে রাখিবেন। প্রাপ্তি সংবাদটুকু দিবেন।

ইতি ২০-এ পৌষ।

আপনার
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথ-কৃত এই ভূমিকা পরে তাঁর 'প্রাচীন সাহিত্য' গ্রন্থে 'রামায়ণ'-শীর্ষক প্রবন্ধরূপে সংকলিত হয়। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন [রবীন্দ্র-জীবনী, দ্বিতীয় খণ্ড (১৩৫৫ সং) পৃ. ১০৩]— 'অনুরোধের খাতিরে ভূমিকা লিখিলেন বটে, কিন্তু বিষয়টি কবির প্রিয় বলিয়া রচনাটি খুবই মনোজ্ঞ হইল।' রবীন্দ্রনাথ 'রামায়ণী কথা'র ভূমিকার শেষে লিখলেন— 'সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় যখন তাঁহার রামায়ণ চরিত্র-সমালোচনার একটি ভূমিকা লিখিয়া দিতে আমাকে অনুরোধ করেন, তখন আমার অস্বাস্থ্য ও অনবকাশ সত্ত্বেও তাঁহার কথা আমি অমান্য করিতে পারি নাই।...

'ভক্ত দীনেশচন্দ্র সেই পূজামন্দিরের প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া আরতি আরম্ভ করিয়াছেন। আমাকে হঠাৎ তিনি ঘন্টা নাড়িবার ভার দিলেন। একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া সেই কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আমি অধিক আড়ম্বর করিয়া তাঁহার পূজা আচ্ছন্ন করিতে কুণ্ঠিত।'

বক্তব্য দুটি বিচার করলে যে গূঢ় সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয় তাতে দেখা যাবে যে রামায়ণ কবির প্রিয়-প্রসঙ্গ হলেও ভূমিকায় চরিত্রগুলির সমালোচনা-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে

কবি প্রায় কিছুই বলেন নি। তা বরং বলেছেন পূর্বোল্লিখিত ১৫-সংখ্যক পত্রে। 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' বইটি সমালোচনায় যে আনন্দ কবি প্রকাশ করেছিলেন (দ্রষ্টব্য চিঠিপত্র ১০, পত্রসংখ্যা ৯)— সেই আনন্দ সম্ভবত 'রামায়ণী কথা'র ভূমিকা রচনায় অনুপস্থিত।

আখ্যাপত্র : রামায়ণী কথা / শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন বি, এ / প্রণীত। (দুইখানি হাফটোন ছবি এবং শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর -কৃত / ভূমিকার সহিত) / "যাবৎ স্থামন্তি গিরয়ঃ প্রচরিষ্ঠতি মহীতলে। / তাবদ্রামায়ণকথা লোকেষু প্রচরিষ্ঠতি।" / কলিকাতা / ২৫ নং রায় বাগান ষ্ট্রীট, ভারতমিহির যন্ত্রে, / সান্যাল এণ্ড কোম্পানী দ্বারা / মুদ্রিত ও প্রকাশিত। / ১৩১১ / মূল্য এক টাকা আট আনা মাত্র।

প্রসঙ্গত, পরবর্তীকালে উভয়ের মধ্যে সম্পর্কের কিছুটা হানি ঘটে। ১৯৩৬ খৃস্টাব্দে দীনেশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে তাঁর 'বৃহৎ বঙ্গ' (সেপ্টেম্বর ১৯৩৫) গ্রন্থের সমালোচনা করার অনুরোধ জানালে ৮ এপ্রিল ১৯৩৬ তারিখে শান্তিনিকেতন থেকে প্রায় তিরস্কারের ভঙ্গিতে রবীন্দ্রনাথ লেখেন (দ্রষ্টব্য চিঠিপত্র ১০, পত্রসংখ্যা ৪৫) :

ওঁ

শান্তিনিকেতন

সবিনয় নমস্কার সম্ভাষণ,

দীর্ঘকাল ব্যস্ত ছিলুম এবং স্বস্থানে ছিলুম না। ফিরে এসেছি, কিঞ্চিৎ অবকাশও পেয়েছি। আয়ু অল্পই অবশিষ্ট আছে, অবকাশও যে পরিমাণে দুর্লভ সেই পরিমাণেই স্পষ্ট নয়, এ অবকাশ স্বল্প পরিমাণেও নষ্ট করতে ইচ্ছা করি না। গ্রন্থ সমালোচনা আমার ব্যবসা নয়, কাজটা অপ্রিয়। অভিমত প্রকাশ করতে লেশমাত্র উৎসাহ প্রকাশ করিনে। এখন আমার একান্ত প্রয়োজন বিশ্রাম। বৃহত্তর বঙ্গ বইখানি অত্যন্ত বৃহৎ। ঐ রচনা বিচার করবার শক্তি আমার অল্প। অতএব স্তব্ধ থাকাই শ্রেয়। ইতি ৪।৪।৩৬

ভবদীয়

বাংলা ২০ চৈত্র ১৩৪২ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন— 'সতীশচন্দ্র সাধারণের কাছে পরিচিত নহে।' 'সতীশচন্দ্র রচনাবলী' সম্পাদনকালে তাঁর অকৃত্রিম সুহৃদ অজিতকুমার চক্রবর্তী ভূমিকাংশে লিখেছিলেন— '১২৮৮ সালের মাঘে সতীশচন্দ্র বরিশাল জিলার অন্তর্গত উজিরপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।... বি, এ. পরীক্ষার জন্য যখন প্রস্তুত হইতেছেন তখন কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ

ঠাকুর মহাশয়ের সঙ্গে ইঁহার পরিচয় ঘটে এবং কিয়ৎকালের মধ্যেই তিনি ভবিষ্যৎ সাংসারিক উন্নতির আশা জলাঞ্জলি দিয়া বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রমে জীবন উৎসর্গ করেন।... পশ্চিমে একবার ভ্রমণ করিতে গিয়া সতীশচন্দ্র বসন্ত রোগে আক্রান্ত হন এবং ১৩১০ সালের মাঘী পূর্ণিমার দিনে ২২ বৎসর বয়সে বোলপুরে প্রাণত্যাগ করেন।' (সতীশচন্দ্র সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য— বিশ্বভারতী পত্রিকা, মাঘ-চৈত্র ১৩৫০ সংখ্যা। এঁকে 'পদকল্পতরু'-সংকলকের সঙ্গে এক ব্যক্তি বলে ভাবার কারণ নেই)।

সতীশচন্দ্রের জীবৎকালে তাঁর কোনো বই মুদ্রিত হয় নি। তাঁর মৃত্যুর পর ১৩১১ বঙ্গাব্দে তাঁর রচিত 'গুরুদক্ষিণা প্রকাশিত হয় 'বোলপুর শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম গ্রন্থাবলী' সিরিজের গ্রন্থ হিসাবে। গ্রন্থ রচনার প্রেরণা ছিলেন রবীন্দ্রনাথ এবং অজিতকুমার চক্রবর্তী। বইটি প্রকাশিত হলে ১৩১১ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ সংখ্যা 'বঙ্গদর্শন'-এ রবীন্দ্রনাথ একটি অপূর্ব সমালোচনা লেখেন। সেটিই পরে 'গুরুদক্ষিণা'র পরবর্তী সংস্করণ সমূহের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে আসছে। এটিকেই আমরা গুরুদক্ষিণার ভূমিকা হিসাবে গ্রহণ করেছি। এই ভূমিকা রচনার জন্য কবির কাছে বাইরের কোনো তাগিদ আসে নি, অন্তরের স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ, অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা এই রচনায় বিধৃত হয়ে আছে। রবীন্দ্রনাথ এই পত্রাবলী বঙ্গদর্শন-এ প্রকাশ করেন নি। তবে সতীশচন্দ্র-রচনাবলীতে তা সংকলিত আছে।

'বঙ্গদর্শন'-এর ১৩১০ সালের চৈত্র সংখ্যায় 'পরলোকগত সতীশচন্দ্র রায়' শীর্ষক শ্রদ্ধাঞ্জলিতে এবং আমেরিকায় প্রদত্ত বিখ্যাত বক্তৃতা 'Personality' (1917)-এর My School অধ্যায়ে কবি সতীশচন্দ্র সম্পর্কে উচ্চ মতামত প্রকাশ করেন। প্রসঙ্গত, উইলিয়ম পিয়ার্সন গুরুদক্ষিণার অনুবাদকালে যে মন্তব্য করেন (He was a poet who would surely have taken place among the immortals of world-literature if he had been spared to live) এবং যে বই য়ুরোপের বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদিত হয়ে গেছে— তাতে সতীশচন্দ্র য়ুরোপীয় সাহিত্য-সমাজে বিশেষভাবে পরিচিত হয়ে গিয়েছিলেন (পিয়ার্সন-রচিত তাঁর *Shantiniketan–The Bolpur School of Rabindranath Tagore* বইয়ের জার্মান অনুবাদের আখ্যাপত্র এখানে উদ্ধার করি : SANTINIKETAN/TAGORES SKOLA/BOLPUR/AU/W. W. PEARSON/ OCH/SATISH CHANDRA ROY/JAMTE EN INLEDING/OCH AUSLUTNING /AU/RABINDRANATH TAGORE/STOCKHOLM/P.A. NOSTEDT & SONERS/FORLAG/)।

সতীশচন্দ্র তাঁর বিদ্যালয় জীবনেই 'গুরুদেবের স্বর্ণময়' কবিতার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। 'গুরুদেবের কবিতাই আমাকে ধরিয়াছিল। সেই স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে আজ উদয়াচলের ঘাটে আসিয়া ঠেকিয়াছি। রবির কিরণ প্রত্যক্ষভাবে আমার মর্মের ভিতর নামিয়া মধুভাণ্ডারটিকে পূর্ণ করিতেছে, দলগুলিকে বর্ণে পূর্ণ করিতেছে।' বস্তুত এই তরুণ, রবীন্দ্রনাথের কবিতার মধু আস্বাদন করেছিলেন বলেই 'গুরুদক্ষিণা'র ভূমিকাংশও মধুময় হয়ে উঠেছে।

গ্রন্থ প্রকাশের পূর্বেই মৃত্যু এসে হরণ করে নিয়ে গিয়েছিল সতীশচন্দ্রকে। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য এই মৃত্যুর মধ্যে 'অমরতাই' লক্ষ্য করেছিলেন— 'এই সমাপ্তির মধ্যে শেষ' দেখতে পান নি। সতীশকে হারিয়ে তিনি যেন পুনরায় তাঁকে 'লাভ' করেছেন।

ভূমিকা রচনা করতে গিয়ে কবি লিখেছেন— 'সতীশের জীবনের যে অংশটুকু আমি জানি সেই অংশের পরিচয় এবং গ্রন্থের আলোচনা, একই কথা। এই বুঝিয়া পাঠকগণ যখন 'গুরুদক্ষিণা' পাঠ করিবেন, তখনই তাঁহার এই গদ্যকাব্যটির সৌন্দর্য সম্পূর্ণরূপে ধারণা করিতে পারিবেন। গ্রন্থে যাহা আছে গ্রন্থই তাহার পরিচয় দিবে, গ্রন্থের বাহিরে যাহা ছিল তাহাই আমি বিবৃত করিলাম।' কারণ 'এই গ্রন্থটুকুকে সে শিল্পীর মতো রচনা করে নাই— এই আশ্রমের আকাশ, বাতাস, ছায়াও সতীশের সদ্যউদ্বোধিত প্রফুল্লনবীন হৃদয়ে মিলিয়া গানের মতো করিয়া ইহাকে ধ্বনিত করিয়া তুলিয়াছে।' আশ্রমের সৃষ্টিকর্তা সেই সহজ আনন্দটুকুকে ভূমিকাংশে উপহার দিয়ে সমালোচনার নামে মহৎজীবনের মহাকাব্য সংরচন করেছেন।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য রবীন্দ্রনাথের 'বিচিত্র প্রবন্ধ'-এর প্রথম সংস্করণে 'বন্ধুস্মৃতি' নামে এটি গৃহীত হলেও পরে পরিত্যক্ত হয়। আখ্যাপত্র : গুরুদক্ষিণা। / সতীশচন্দ্র রায় প্রণীত। / মজুমদার লাইব্রেরী হইতে / এস্. সি. মজুমদার কর্তৃক / প্রকাশিত। / কলিকাতা। / ২০ নং কর্নওয়ালিস্ ষ্ট্রীট দিনময়ী প্রেসে / শ্রীঅনুকুল চন্দ্র পারিহাল দ্বারা / মুদ্রিত। মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা [২] + ১/০ + ৩৪।

উইল পিয়ার্সনের *Shantiniketan : The Bolpur School of Rabindranath Tagore*-বইটিতে সংযুক্ত রবীন্দ্রনাথের ভূমিকাটি এই প্রসঙ্গে পঠিতব্য। পিয়ার্সন গুরুদক্ষিণার যে ইংরেজি অনুবাদ করেন তা 'The Gift to the Guru' নামে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের হাতে লেখা পত্রিকা *The Ashram*-এ (Aug 1914-Aug 1915) ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়।

৪

চট্টগ্রাম জেলার ভাটিখাইন গ্রামের কেদারনাথ দাশগুপ্ত (১৮৭৮-১৯৪২) স্বামী বিবেকানন্দের সংস্পর্শে এসে জাতীয় চেতনায় উদ্‌বুদ্ধ হন। তাঁর যৌবন ছিল স্বাদেশিকতার যজ্ঞে উৎসর্গীকৃত। মুন্সেফের সন্তান কেদারনাথ চট্টগ্রাম থেকে এসে 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' নামে স্বদেশী সামগ্রীর একটি দোকান খোলেন। স্বদেশবাসীকে দেশপ্রেমে উদ্‌বুদ্ধ করার মানসে তিনি 'ভাণ্ডার' নামে মাসিক পত্রিকা প্রকাশের ইচ্ছা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের শরণাপন্ন হন। 'বঙ্গদর্শনের সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ তাঁরই আগ্রহে 'ভাণ্ডার' পত্রিকার সম্পাদনা-ভার গ্রহণ করেন।

পরে তিনি বিদেশে যান এবং ব্যারিস্টারি পাস করেন। অবশ্য দেশে ফেরেন নি। বিদেশে থেকেই ভারতীয় সংস্কৃতি প্রচারে মনোনিবেশ করেন। তাঁরই প্রচেষ্টায় ইংলন্ড ও আমেরিকায় স্থাপিত Union of East and West সমিতি রবীন্দ্রনাথকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করে। নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয় কেদারনাথকে ডক্টরেট উপাধি দ্বারা সম্মানিত করে।

বঙ্গবাসীদের নানাভাবে লাঞ্ছিত করার জন্য ব্রিটিশ সরকার নানা সময়ে যে-সব সার্কুলার জারি করেছিলেন, কুখ্যাত কার্লাইল সার্কুলার তন্মধ্যে অন্যতম। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সারাদেশে বিক্ষোভের সমুদ্র উত্তাল হয়ে ওঠে। ছাত্রগণও প্রত্যক্ষভাবে এর সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে পড়েন। তাঁদেরকে দমন করার জন্য সরকার ২২ অক্টোবর ১৯০৫ তারিখে কার্লাইল সার্কুলার প্রকাশ করে ছাত্রগণকে রাজনৈতিক আন্দোলন যোগদান করতে নিষেধ করে। ২৪ অক্টোবর ইতিকর্তব্য নির্ধারণের জন্য ব্যারিস্টার আবদুল রসুলের সভাপতিত্বে 'ফিল্ড এণ্ড অ্যাকাডেমি' ভবনে অনুষ্ঠিত সভায় একটি 'জাতীয় বিদ্যালয়' স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ২৭ অক্টোবর পটলডাঙ্গার মল্লিক বাড়িতে রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে আর-একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। তিনি ডন সোসাইটির ছাত্রসভা প্রভৃতি বিভিন্ন সভাতে যোগদান করেন এবং তৎকালীন শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁর বিশিষ্ট মতামত ব্যক্ত করেন।

৫ কার্তিক ১৩১২ বঙ্গাব্দে কার্লাইল সার্কুলার প্রচারিত হবার পর থেকে ২৫ অগ্রহায়ণ ১৩১২ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত 'শিক্ষা সম্বন্ধে যে সকল সভা-সমিতি হইয়াছে' সেগুলির ধারাবাহিক বিবরণ কেদারনাথ দাশগুপ্তের এই 'শিক্ষার আন্দোলন' [আখ্যাপত্র : শিক্ষার আন্দোলন / (শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিত / ভূমিকা সহিত) / ভূমিকা সহিত) / কেদারনাথ দাশগুপ্ত কর্তৃক / প্রকাশিত)। পুস্তকের প্রথমাংশে লিপিবদ্ধ হয়েছে। এ ছাড়া এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আবদুল রসুল, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, বিপিনচন্দ্র পাল, কালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত প্রভৃতি চিন্তাবিদগণের বক্তব্যাদির 'মর্মপত্র' এই পুস্তকের দ্বিতীয়াংশে সহাহৃত হয়েছে।

এটি আসলে 'ভাণ্ডার' পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা (অগ্রহায়ণ ১৩১২) হিসাবে প্রচারিত হয়েছিল। এই গ্রন্থের ভূমিকা—'শিক্ষার আন্দোলনের ভূমিকা' রচনা করেন রবীন্দ্রনাথ।

প্রসঙ্গক্রমে নিবেদনযোগ্য যে পূর্বোল্লিখিত সভাগুলিতে কবির বক্তব্য এই ভূমিকার সঙ্গে পাঠ করলে শিক্ষা বিষয়ে জাতীয় আকাঙ্ক্ষা ও রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যকে সঠিক অনুধাবন করা সম্ভব হবে। ভূমিকা শেষে প্রতিশ্রুত মতামতগুলির জন্য রবীন্দ্র-রচনাবলী দ্বাদশ খণ্ডে দ্রষ্টব্য। রবীন্দ্র-রচনাবলী দ্বাদশ খণ্ডে 'শিক্ষার পরিশিষ্ট' অংশে এই ভূমিকা সংকলিত আছে।

৫

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৬৭-১৯৫৯) সম্পর্কে সবিশেষ জানানো হল এই বিভাগে দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৫০-সংখ্যক তথ্যপঞ্জীতে (পৃ ২৮২)। এখন শুধু 'সংস্কৃত-প্রবেশ' সম্পর্কে জ্ঞাতব্য তথ্যাদি নিবেদন করি। 'সংস্কৃত-প্রবেশ' একটি ভিন্নখণ্ডে পরিকল্পিত সংস্কৃত শিক্ষা বিষয়ক পুস্তক। তিনটি খণ্ডের আখ্যাপত্র যথাক্রমে নিম্নরূপ : ১) সংস্কৃত প্রবেশ / প্রথম ভাগ / শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত / ও / শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর / সম্পাদিত। / তৃতীয় সংস্করণ। / ব্রহ্মচর্যাশ্রম, শান্তিনিকেতন। / বোলপুর / সংবৎ ১৯৬৬। / মূল্য / ছয় আনা। / ২) সংস্কৃত প্রবেশ / দ্বিতীয় ভাগ / শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত / ও / শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর / সম্পাদিত। / দ্বিতীয় সংস্করণ। / ব্রহ্মচর্যাশ্রম, শান্তিনিকেতন। / বোলপুর। / সংবৎ ১৯৬৭ / মূল্য আট আনা। / ৩) সংস্কৃত প্রবেশ / তৃতীয় ভাগ / শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত / ও / শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর / সম্পাদিত। / দ্বিতীয় সংস্করণ। / ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম, শান্তিনিকেতন. / বোলপুর। / সংবৎ ১৯৬৭। / মূল্য আট আনা। /

প্রথম ভাগের প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্র ছিল : 'সংস্কৃত-প্রবেশ। / প্রথম ভাগ। / শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর / সম্পাদিত / ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম / শান্তিনিকেতন / বোলপুর। /'। উল্লেখ্য এই সংস্করণে হরিচরণের নাম ছিল না।

তিনটি ভাগের পৃষ্ঠাসংখ্যা ছিল যথাক্রমে ছয় আনা + ৭৯, আট আনা + ১২৬ এবং দুই আনা + ১০৬। উল্লিখিত সংস্করণগুলি বিশ্বভারতীর কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে আছে। লক্ষ্য করার বিষয় খণ্ডত্রয়ের সম্পাদকরূপে রবীন্দ্রনাথের নাম উল্লিখিত আছে। কাজেই এর প্রথম ভাগ সংযুক্ত ভূমিকাটি বস্তুতপক্ষে রবীন্দ্রনাথের সম্পাদকীয় ভূমিকা। কিন্তু যেহেতু বইটি হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'প্রণীত' সেজন্য এর সঙ্গে সংযুক্ত রবীন্দ্রভূমিকাকে অন্যের গ্রন্থে সংযুক্ত ভূমিকা হিসাবে গ্রহণ করেছি। প্রথম ভাগে সংযুক্ত 'রচয়িতার বিজ্ঞাপন'-এর অংশবিশেষ তুলে দিলে বক্তব্য আরো স্পষ্ট হবে।

রচয়িতার বিজ্ঞাপন

"ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সংস্কৃত ভাষার সহিত ব্যাকরণের সাধারণ জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি শিক্ষা দিবার অভিপ্রায়ে একখানি পুস্তক রচনা করিতে আরম্ভ করেন এবং কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া, আমাকে ঐ পুস্তক সমাপ্ত করিবার ভার অর্পণ করেন। তাঁহার প্রদর্শিত নিয়মানুসারেই 'সংস্কৃত প্রবেশ' রচিত হইয়াছে। ভাষা শিক্ষা ও ব্যাকরণ শিক্ষা উভয়কেই মুখ্য উদ্দেশ্য মনে করিয়া, ইহাতে ব্যাকরণের সহিত ভাষানুশীলনের প্রচুর অবসর প্রদত্ত হইয়াছে।"...

প্রথম সংস্করণের রচয়িতার বিজ্ঞাপনটি ভিন্নতর ছিল : 'আমাদের দেশের অল্পবয়স্ক শিশুগণের পাঠের উপযোগী তাদৃশ সরল সংস্কৃত পুস্তকের অভাবে, বালকগণের

সংস্কৃত শিক্ষার বড়ই অসুবিধা হইয়াছে। এইরূপ অসুবিধা কিঞ্চিৎ পরিমাণে দূর করিবার জন্য "সংস্কৃত প্রবেশ" রচিত হইয়াছে।'

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত প্রথম ভাগের তৃতীয় সংস্করণের কপিটি সম্ভবত হরিচরণ পরবর্তী সংস্করণের জন্য প্রস্তুত করতে বিভিন্ন স্থানে সংশোধন করেছিলেন। এর একটি চতুর্থ ভাগ রচনার ইচ্ছাও যে হরিচরণের ছিল 'রচয়িতার বিজ্ঞাপন' থেকে তা জানা যায়। সুবিধামতো স্থানে হরিচরণ 'ব্যাকরণ কৌমুদী'কে অনুসরণ করেছেন (দ্র. তৃতীয় ভাগ, দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা)।

রবীন্দ্রনাথ যে ভাষায় ভূমিকা রচনা করেছেন তাতে এটিকে একটি সম্পাদকীয় ভূমিকা মনে না-করাও যেতে পারে।

৬

বাংলার বিখ্যাত লোক-গল্পকার ও শিশু সাহিত্যিক দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের (১৮৭৭-১৯৫৭) জন্ম ঢাকা জেলার উলাইল গ্রামে। জমিদারির কাজে ময়মনসিংহ গিয়ে সেখানে এবং ঢাকার নিভৃত পল্লী অঞ্চলে দীর্ঘ দশ বছর ধরে 'কথা-সাহিত্য' সংগ্রহ, অনুসন্ধান ও গবেষণা আরম্ভ করেন। দীনেশচন্দ্র সেনের সহযোগিতায় এগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হতে থাকে। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'ঠাকুরমা'র ঝুলি' (১৩১৪) বালকদের উপযোগী রূপকথার অকৃত্রিম সংগ্রহগ্রন্থ।

এই ব্রত উদ্‌যাপনে তাঁকে আহ্বান জানিয়েছিলেন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ। মাতৃবক্ষোলগ্ন দক্ষিণারঞ্জনের শৈশব-শ্রুত যে রূপকথা 'বাঙ্গালার শ্যামপল্লীর কোণে কোণে' ছড়িয়েছিল— 'কয়েকটি পল্লীগ্রামের বৃদ্ধার মুখে' সেই আবার শোনা গল্পগুলি 'এক যুগের শ্রমের ভূমিতে... ফুলমন্দির'-রূপে তিনি রচনা করেছেন। নিজেই সযত্নে তাকে করেছেন চিত্রিত। প্রত্যাশা করেছেন, 'আমার মা'র মতন মা বাংলার ঘরে ঘরে আবার দেখিতে পাই।'

রবীন্দ্রনাথ যখন এই বইয়ের ভূমিকা লেখার অনুরোধ পান, তাঁর তখন আশঙ্কা হয়েছিল— এটি হয়তো 'ম্যাঞ্চেস্টারের কল হইতে তৈরী' হয়ে এসে থাকবে। কবি ভেবেছিলেন, নিখিল বঙ্গদেশের 'চিরপুরাতন গভীরতম স্নেহ হইতে' উৎসারিত যে রূপকথা— তা এই গ্রন্থে তিনি পাবেন না, সেজন্যে তাঁর 'বই খুলিতে ভয় হইতেছিল।' কিন্তু গ্রন্থটি পাঠ করে কৃতজ্ঞতা ও সোচ্ছ্বাস আনন্দে তাঁর চিত্ত পূর্ণ হয়ে ওঠে। ফলে এক অনবদ্য-অননুকরণীয় ভঙ্গিতে এর ভূমিকা রচনা করে শেষে প্রস্তাব করেছেন— 'এক্ষণে আমার প্রস্তাব এই যে, বাংলাদেশের আধুনিক দিদিমাদের জন্য অবিলম্বে একটা স্কুল খোলা হউক এবং দক্ষিণাবাবুর এই বইখানি অবলম্বন করিয়া শিশু-শয়ন-

রাজ্যে পুনর্বার তাঁহারা নিজেদের গৌরবের স্থান অধিকার করিয়া বিরাজ করিতে থাকুন।'

ভূমিকাটি রবীন্দ্রনাথ বোলপুর থেকে রচনা করেন ২০ ভাদ্র ১৩১৪ বঙ্গাব্দে।

৭

যোগীন্দ্রনাথ বসুর (১৮৫৭-১৯২৭) জন্ম ২৪ পরগনার ডায়মন্ডহারবার মহকুমার নিতাড়া গ্রামে। বি. এ. পরীক্ষায় পাস করে তিনি দেওঘরের স্কুলে প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন এবং সেখান থেকেই 'সুরভি' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা সম্পাদনা ও প্রকাশ করেন। এই পত্রিকায় কয়েকটি রচনা প্রকাশের কারণে তিনি রাজরোষে পড়েন এবং কর্মচ্যুত হয়ে দেওঘর থেকে বিতাড়িত হন।

দেওঘরে তাঁর সঙ্গে রাজনারায়ণ বসু পরিচিত হলে তাঁকে মধুসূদনের জীবনী রচনার ভার দেন। ফলে সুবিখ্যাত 'মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন-চরিত' রচিত হয় (১৩৩০ বঃ)। দেওঘর থেকে কলকাতা এসে পিতা কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের আহ্বানে প্রফুল্লনাথ ঠাকুরের গৃহশিক্ষক হন। তাঁর অন্যান্য রচনাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য অমরকীর্তি অথবা ফাদার দামিয়েনের জীবন-চরিত (১২৯৭ বঃ), অহল্যাবাই (১৩০২ বঃ), তুকারাম চরিত (১৩০৪), পৃথ্বীরাজ মহাকাব্য (১৩২২), শিবাজী মহাকাব্য (১৩২৫)।

এ-সব বই ছাড়াও তিনি অনেকগুলি বিদ্যালয়-পাঠ্য বই রচনা করেন। যেমন, সচিত্র কৃত্তিবাসের রামায়ণ। এটি প্রকাশিত হয় ১৩১৪ বঙ্গাব্দে। এর আখ্যাপত্রটি নিম্নরূপ :

সরল / কৃত্তিবাস / অর্থাৎ / কৃত্তিবাস-প্রণীত সপ্তকাণ্ড রামায়ণ। / মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন-চরিত প্রণেতা / শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু বি. এ. / সম্পাদিত। / অমৃত-মধুর এই সীতা-রাম-লীলা। / শুনিলে পাষাণ গলে, জলে ভাসে শিলা।। / ভট্টাচার্য এণ্ড সন্‌সন্, / ৬৫ নং কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা।

এই গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা রচনার তারিখ ৩০ শ্রাবণ ১৩১৪। গ্রন্থকার ভূমিকা লিখেছিলেন ২৭ ভাদ্র ১৩১৪ তারিখে। ভূমিকা থেকে জানা যায় যোগীন্দ্রনাথ এ ধরনের বই লিখছেন জেনে রবীন্দ্রনাথ নিজে রচনার পরিকল্পনা ত্যাগ করেন। এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৩১৫ সালে। পৃষ্ঠাসংখ্যা এক টাকা দুই আনা + ২৩২ + [৮]।

৮

মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় এবং চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় উভয়েই ছিলেন রবীন্দ্রনাথের স্নেহভাজন। মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৮৮-১৯২৯)-এর আদি নিবাস ছিল বিক্রমপুর। 'ভারতী' পত্রিকার সঙ্গে দীর্ঘদিন সংযুক্ত মণিলাল ছোটোদের বই মনে মনে, জাপানি ফানুস, চলছবি, ভূতুড়ে কাণ্ড লিখে সাহিত্য-সমাজে যথেষ্ট সমাদর পান। তিনি ছিলেন শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জামাতা।

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৭-১৯৩৮) জন্মেছিলেন মালদহ জেলার চাঁচল-এ। ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস-এ যোগদানের সূত্রে রবীন্দ্রনাথের নিকট সান্নিধ্যে আসেন। পরে 'ভারতী' পত্রিকায় সম্পাদনা সূত্রে যুক্ত হন। অবশ্য 'প্রবাসী' পত্রিকার সহ-সম্পাদক হিসাবেই তাঁর খ্যাতি সমধিক। সাহিত্যের প্রায় সব শাখাতেই তাঁর লেখনী সাফল্য অর্জন করেছিল। তাঁর 'রবি-রশ্মি' গ্রন্থের জন্য বাঙালি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর পত্রীয় যোগ একটি ইতিহাস রচনায় সমর্থ।

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় যৌথভাবে 'কাদম্বরী' বইটি সম্পাদনাপূর্বক প্রকাশ করেন (কাদম্বরী / পণ্ডিত তর্করত্ন প্রণীত / গ্রন্থ অবলম্বনে / শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় / ও / মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় / কর্তৃক / সংস্কৃত মূলানুযায়ী করিয়া প্রকাশিত) ১৩১৬ বঙ্গাব্দে। এই বইটিতে রবীন্দ্রনাথের যে ভূমিকাটি সংযুক্ত আছে তা রচনার একটি ভিন্নতর ইতিহাস আছে।

রবীন্দ্রনাথ এই রচনাটি লেখেন মূল গ্রন্থের জন্য নয়। চিত্রশিল্পী যামিনী গঙ্গোপাধ্যায়ের আঁকা একটি ছবি এর মূল উৎস। এই ছবিটি এবং রবীন্দ্রনাথের 'কাদম্বরী চিত্র' প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় 'প্রদীপ' পত্রিকার ১৩০৬ বঙ্গাব্দের মাঘ সংখ্যায়। উক্ত প্রবন্ধের শেষে রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গক্রমে লেখেন— 'বর্তমান সংখ্যক প্রদীপে যে চিত্রটি মুদ্রিত হইয়াছে সেই চিত্র অবলম্বন করিয়া কিছু লিখিতে অনুরুদ্ধ হইয়াছিলাম। ইহার মূল পটটি বর্ণতেলে অঙ্কিত, বিষয়টি কাদম্বরী হইতে গৃহীত এবং চিত্রকর আমার স্নেহাস্পদ তরুণবয়স্ক আত্মীয় শ্রীমান যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়।'

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় যখন এই বইটি প্রকাশ করেন তখন রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই রচনাটি কিছু পরিবর্তন করে তাঁদের 'কাদম্বরী' বইয়ের ভূমিকা হিসাবে ব্যবহারে অনুমতি দেন। এ বিষয়ে সম্পাদকদ্বয় নিবেদনে লেখেন : 'কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া তাঁহার 'কাদম্বরী চিত্র' নামক পরম উপাদেয় সন্দর্ভ স্বয়ং পরিবর্তিত করিয়া এই সংস্করণের ভূমিকাস্বরূপে ব্যবহার করিতে অনুমতি দিয়াছেন।' সেই কারণেই আমরাও এই গ্রন্থে এটিকে 'ভূমিকা' হিসাবেই গ্রহণ করেছি।

অবশ্য রবীন্দ্রনাথ মূলরচনার তেমন কোনো পরিবর্তন করেন নি। শেষাংশে যামিনীপ্রকাশের ছবি সম্পর্কে কবির মন্তব্যটুকু মাত্র বর্জন করেন। রবীন্দ্রনাথের 'প্রাচীন

সাহিত্য' গ্রন্থে সংকলিত 'কাদম্বরী চিত্র' (যেটি 'প্রদীপে'র হুবহু মুদ্রণ)-এর সঙ্গে বর্তমান পুস্তকে সংকলিত ভূমিকার তুলনা করলেই এই সহজ পার্থক্যটুকু ধরা পড়বে। 'প্রাচীন সাহিত্য' বইটি বিশ্বভারতী-প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনাবলীর পঞ্চম খণ্ডে সংকলিত আছে। 'কাদম্বরী' বইটির মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা [২] + ১ + ১৪৭ + ৯।

৯

শরৎকুমার রায় (১৮৭৮-১৯৩৫) মুখ্যত বরিশালের লোক। জন্ম এই জেলার তারাপাশা গ্রামে। বিশ শতকের সূচনায় এম. এ. পাস করে তিনি বিলাত যান। নাটোরের মহারাজার কলকাতার বাড়িতে মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শরৎকুমারের আলাপ করিয়ে দেন। আলাপের পর শরৎবাবুর অনুরোধে কবি স্বয়ং 'আমি চিনি গো চিনি তোমারে' ও অন্য দু-একটি গান গেয়ে শোনান। অশ্বিনীকুমার দত্তের এই স্বাদেশিক-শিষ্য পরে শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসাবে যোগ দেন। সতীশচন্দ্র রায়, শরৎকুমার রায়-এর সতীর্থ ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের উৎসাহে শরৎকুমার ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচনায় উৎসাহী হয়ে পড়েন। তাঁর ছাত্র সুধীরঞ্জন দাস তাঁর স্মৃতিকথা 'যা দেখেছি যা পেয়েছি' গ্রন্থে প্রসঙ্গক্রমে লিখেছেন— 'শরৎবাবু আমাদের শিখ ও মারাঠা ইতিহাসের গল্প শোনাতেন— সেই গল্পগুলিই পরে পুস্তকাকারে ছাপা হয়েছিল।'

'বরেন্দ্র-অনুসন্ধান সমিতি'র প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি, রজনীকান্ত সেনের হৃদয়ের কাছের ব্যক্তি শরৎকুমার বেশ-কয়েকটি জীবনী রচনা করে খ্যাত হন। এগুলির মধ্যে 'বুদ্ধের জীবনী ও বাণী' (১৩২১), ভারতীয় সাধক (১৩২১), বঙ্গগৌরব স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (১৩১৮), শিবাজী ও মারাঠাজাতি (১৩১৬), শিখগুরু ও শিখ জাতি (১৩১৭), বৌদ্ধভারত (১৩৩৮), মহাত্মা অশ্বিনীকুমার (১৩৩৩), রাজর্ষি রামমোহন ((১৩৪০) খুবই প্রসিদ্ধ। 'রবীন্দ্রস্মৃতি' নামক একটি ছোটো বই-এ তিনি তাঁর রবীন্দ্র-বিষয়ক স্মৃতিকথা লিখে গেছেন।

শরৎকুমারের ঐতিহাসিক গ্রন্থ দুটির নাম— 'শিবাজী ও মারাঠা জাতি' এবং 'শিখ গুরু ও শিখ জাতি'। প্রথমটির প্রকাশকাল ১৩১৬ এবং দ্বিতীয়টি প্রকাশিত হয় পর-বৎসর। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য বিশ্বভারতী-প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের 'ইতিহাস' (১৩৬৮) গ্রন্থের 'গ্রন্থপরিচয়' অংশে (পৃ ১৬৬, পঙ্‌ক্তি ১) 'শিবাজী ও মারাঠা জাতির প্রকাশকাল ভ্রমক্রমে ১৩১৫ বঙ্গাব্দ বলে উল্লিখিত হয়েছে। লেখক শরৎকুমার রায় মূল গ্রন্থের ভূমিকাই রচনা করেছিলেন 'বোলপুর' শান্তিনিকেতন থেকে '২৭ শ্রাবণ, ১৩১৬' তারিখে। দ্বিতীয় বইটির আখ্যাপত্র (দ্বিতীয় সংস্করণ) ছিল নিম্নরূপ : শিখ গুরু ও শিখ জাতি / শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিত ভূমিকা সংবলিত / শ্রীশরৎকুমার

রায় প্রণীত / দ্বিতীয় সংস্করণ / প্রকাশক / ইন্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড / এলাহাবাদ / ১৯২১ / মূল্য দেড় টাকা মাত্র।

গ্রন্থকার প্রথম বইটির সূচনায় জানিয়েছেন যে বইটি "মহামতি রাণাডের 'Rise of the Maratha Power' এবং কাপ্তান ডফের ইতিহাস অবলম্বনে এই ক্ষুদ্র পুস্তকটি রচিত হইয়াছে।"

কানিংহাম এবং ব্রেকলিফের শিখজাতি ও ধর্মবিষয়ক গ্রন্থাদি কবির পড়া ছিল। সে কারণে তাঁর আলোচনায় জাতীয় অভ্যুত্থান ও পতনে মানব ধর্মের মূল ভূমিকাটি বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছিল। কবির মতে 'ভারতবর্ষের যে ইতিহাস আমরা বিদ্যালয়ে পড়িয়া থাকি, তাহা রাজাদের জীবনবৃত্তান্ত দেশের ইতিবৃত্ত নহে।' এবং 'সমগ্র দেশের কোনো বিশেষ কালের ইতিহাসকে রক্ষা করিবার স্বতঃপ্রবৃত্ত চেষ্টা দেশের লোকের দ্বারা যদি ভারতবর্ষের কোথাও ঘটিয়া থাকে, তবে সে মহারাষ্ট্র দেশ। মহারাষ্ট্রের বখরগুলি তাহার নিদর্শন।'

এই ভূমিকাটি পরে রবীন্দ্রনাথের 'ইতিহাস' গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে 'শিবাজী ও মারাঠা জাতি' নামে।

১০

শরৎকুমার রায়ের 'শিখগুরু ও শিখ জাতি' বইটির ক-ঢ পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথ-লিখিত ভূমিকাটি মুদ্রিত ছিল। প্রকৃতপক্ষে এটি কবির অনুমতি অনুসারে এই বইয়ের ভূমিকা হিসাবে মুদ্রিত হয়েছে। কবি এটি এই বইয়ের ভূমিকা হিসাবে সচেতনভাবে রচনা করেন নি। গ্রন্থে সংযুক্ত হওয়ার অব্যবহিত পূর্বে প্রবন্ধটি প্রবাসী পত্রিকার চৈত্র ১৩১৬ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। তখন এর নাম ছিল 'শিবাজী ও গুরুগোবিন্দ সিংহ' (এই নামেই পরে রবীন্দ্রনাথের 'ইতিহাস' গ্রন্থে সংকলিত)। তবে উল্লেখ করার বিষয়, এই দীর্ঘ ভূমিকাটি প্রবাসী থেকে, গ্রন্থে ভূমিকা হিসাবে প্রদানের পূর্বে কবি শেষাংশের কিছু পরিবর্তন ঘটান।

এই ভূমিকার সূচনাতেই কবি লিখেছেন 'শিখ-ইতিহাসের সহিত মারাঠ-ইতিহাসের প্রধান প্রভেদ এই যে, যিনি মারাঠা-ইতিহাসের প্রথম ও প্রধান নায়ক সেই শিবাজী হিন্দুরাজ্য স্থাপনের উদ্দেশ্যকে মনের মধ্যে সুপরিস্ফুট করিয়া লইয়াই ইতিহাসের রঙ্গক্ষেত্রে মারাঠা জাতির অবতারণা করিয়াছিলেন ; তিনি দেশজয় শত্রুবিনাশ রাজ্যবিস্তার প্রভৃতি যাহা কিছু করিয়াছেন সমস্তই ভারতব্যাপী একটি বৃহৎ সংকল্পের অঙ্গ ছিল।' পক্ষান্তরে 'নানকের উপদেশে আকৃষ্ট হইয়া যাহারা তাঁহার নিকট ধর্মদীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিল তাহারাই শিখ বা শিষ্য বলিয়া গণ্য হইয়াছিল।'

প্রসঙ্গত যদুনাথ সরকার কবি-রচিত এই ভূমিকাটি অনুবাদ করে সেটি "The Rise and Fall of the Sikh Power" নামে *Modern Review* পত্রিকার April 1911 সংখ্যায় প্রকাশ করেন এবং স্বরচিত ইংরেজি *Shivaji* গ্রন্থে কবির মতকে সমর্থন করেন; বাংলা 'শিবাজী' গ্রন্থেও (প্রথম ওরিয়েন্ট লংম্যান সংস্করণ ১৯৭৩, পৃ. ২২১-২২) তিনি এই মতকে উদ্ধার করেছেন এই ভূমিকা থেকেই।

১১

তরুণ বয়সেই যাঁরা রবীন্দ্র-সাহিত্য ও রবীন্দ্র-ব্যক্তিত্বের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হন, অজিতকুমার চক্রবর্তী (১৮৮৬-১৯১৮) তাঁদের মধ্যে অন্যতম। বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি শান্তিনিকেতন আশ্রমে অধ্যাপক রূপে যোগ দেন এবং সাহিত্য ও সংস্কৃতির সকল ক্ষেত্রে ছাত্রদের মনকে উদ্‌বোধিত করে তোলেন। তিনি, বস্তুতপক্ষে, রবীন্দ্রভাবনার একজন সার্থক রূপকার ছিলেন।

রবীন্দ্র-সাহিত্যের ব্যাখ্যাতা অজিতকুমার বিখ্যাত দুটি বই 'রবীন্দ্রনাথ' (১৩১৯) ও 'কাব্য পরিক্রমা' (১৩২২)। রবীন্দ্রনাথের নিত্যসঙ্গলাভের মাধুর্য বই দুটিকে স্নিগ্ধ করে তুলেছে। তাঁর কৃত অনুবাদের মাধ্যমেই রবীন্দ্রনাথ বিদেশে সুধী সমাজে প্রথম পরিচিত হয়েছিলেন।

জীবনী-সাহিত্য রচনায় অজিতকুমারের কৃতিত্বও সুধী সমাজে স্বীকৃত। তাঁর সুখ্যাত 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর' (১৯১৬) ছাড়া কিশোর-বয়সীদের জন্য রচিত 'খৃষ্ট' বইটিও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ১৯১১ সালে প্রকাশিত এই বইটির আখ্যাপত্র ছিল নিম্নরূপ : শান্তিনিকেতন / খৃষ্ট / শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্তী / প্রণীত / ও / শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিত / ভূমিকা সম্বলিত / মূল্য চার আনা।

মূল বইটি ৩৩ পৃষ্ঠার। এর পূর্বে/০ থেকে ১।/০ পর্যন্ত অংশে রবীন্দ্র-রচিত ভূমিকাটি সন্নিবিষ্ট হয়েছে। যতদূর অবগত আছি, এই ভূমিকার মধ্য দিয়েই (যিশু চরিত) রবীন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম খৃস্ট সম্পর্কে তাঁর লিখিত মতামত ব্যক্ত করেছেন। এদিক থেকে ভূমিকাটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিশ্বভারতী-প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের 'খৃষ্ট' বইটি এ প্রসঙ্গে পঠিতব্য। বর্তমান ভূমিকাটিও এই গ্রন্থে 'যিশু চরিত' নামে সংকলিত হয়েছে।

নাটকীয় ভঙ্গিতে ভূমিকা-রচনা শুরু করে রবীন্দ্রনাথ কেন 'মহাত্মা যিশুর প্রতি আমরা অনেকদিন এইরূপ একটা বিশেষ ভাব পোষণ করিয়াছি' তার ব্যাখ্যা করেছেন। এবং শেষে লিখেছেন— 'এমনি করে মানবপুত্র পৃথিবীতে সকল মানুষকেই বড়ো করিয়া তুলিয়াছেন... অপমানের সংকোচ মানব সমাজ হইতে অপারিত করিয়াছে— ইহাকেই বলে মুক্তি দান করা।

১২

'মোরে তুমি জানো বন্ধু বলি'— লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের উদ্দেশে। সরযূবালা (১৮৮৯-১৯৪৯) আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের কন্যা। সরযূবালার বিবাহ হয়েছিল দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বসন্তরঞ্জনের সঙ্গে। বসন্তরঞ্জনের অকাল মৃত্যুতে শোকমগ্না সরযূবালার অনুপম গদ্যকাব্য 'বসন্তপ্রয়াণ' (আখ্যাপত্র : বসন্তপ্রয়াণ / শ্রীসরযূবালা দাশগুপ্তা প্রণীত। / (শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিত / ভূমিকা সম্বলিত) / All rights including right of / Translation reserved to the author / under copyright act./) তাঁর স্মরণকাব্য। গ্রন্থটি বৈধব্যের মানসিকতার এক মনস্তাত্ত্বিক প্রতিবিম্ব। 'বিশেষের পথে', 'বিশ্বের পথে' ও 'বিশ্বাতীতের পথে' শীর্ষক আদি-মধ্য-অন্ত্য— তিনটি লীলায় গ্রন্থটি গ্রথিত।

সরযূবালা পাণ্ডুলিপিটি রবীন্দ্রনাথের কাছে পাঠিয়েছিলেন ভূমিকা রচনার অনুরোধ সহ। শুরুতে কবির ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু বন্ধুত্বের অনুরোধ আছে। কবি ভূমিকা লিখতে বসলেন। সম্ভবত দীর্ঘতম ভূমিকা। ভূমিকা লেখা হল শান্তিনিকেতনে বসে ৮ চৈত্র ১৩২০ তারিখে।

প্রসঙ্গক্রমে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন— 'পাঠকদের কাছে এই গ্রন্থখানির পরিচয় করাইবার ভার আমার উপর পড়িয়াছে। এমন ভার লইতাম না।...

'খাতাখানি হাতে লইয়া পড়িতে বসিলাম।... পড়িতে পড়িতে মন নম্র হইয়া আসিল। বিচারকের আসন হইতে নীচে নামিয়া বসিতে হইল। ক্রমেই আর সন্দেহ রহিল না, যে, এ একটা নূতন সৃষ্টি বটে। এ ত একেবারেই শেখা কথা নহে। ...এই "বসন্তপ্রয়াণ" একেবারে আপনার সুরে আপনি প্রকাশ পাইয়াছে। আমাদের সাহিত্যে কিংবা অন্য কোনো সাহিত্যে অন্য কোনো বইয়ের সঙ্গে ইহাকে শ্রেণীবদ্ধ করিতে পারি না। ...স্বামীর দুঃসহ বিচ্ছেদ তাপে এই রচনার মধ্যে যেন স্ত্রী পুরুষের যুগল প্রকৃতি অবিচ্ছেদে একাত্ম হইয়া দেখা গিয়াছে। ...এই লেখাটি ত নিতান্ত শোকের বিলাপ নহে। ...সাহিত্য সভায় এই রচনাকে সম্মানের স্থান দিতেই হবে, ইহাকে উপেক্ষা করিবার যো নাই।'...

রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন (রবীন্দ্রজীবনী, দ্বিতীয় খণ্ড ১৩৫৫ সং পৃ ৪৫৫)— 'লেখার মধ্যে অসামান্য প্রতিভার পরিচয় ছিল বলিয়াই যে রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থের ভূমিকা লেখেন তাহা নহে, ব্রজেন্দ্রনাথের কন্যা বলিয়াও মমতাবশত এটি লেখেন বলিয়া আমাদের সন্দেহ হয় (৮ চৈত্র ১৩২০)। বলা বাহুল্য এই ধরনের ফরমাইশি রচনা প্রায়ই বন্ধুপ্রীতি প্রণোদিত।'

একমত হওয়া একটু মুশকিল। ফরমাইশি রচনা অবশ্যই, বন্ধুপ্রীতিও সক্রিয় ছিল। কিন্তু কেবল 'মমতাবশত' রচিত বলে সন্দেহ করার কারণ সম্ভবত অনুপস্থিত। মমতা যদি কিছু ছিল তা লেখিকার প্রতি নয়, লেখার প্রতি।

প্রসঙ্গক্রমে অন্য একটি তথ্য নিবেদনযোগ্য। ২৯ মে ১৯১৪ তারিখে (মুদ্রিত পত্রের প্রতিলিপি দ্রষ্টব্য, বিশ্বভারতী পত্রিকা, বর্ষ ২, সংখ্যা ২১) কেম্‌ব্রিজ থেকে ব্রজেন্দ্রনাথ শীল রবীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন ('বসন্তপ্রয়াণ' রচিত হওয়ার তিন বছর পর)— 'এবার জাহাজে Mr. Thompson-এর সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় হইল। বসন্তপ্রয়াণের সম্বন্ধে কথা হইলে তিনি আমার সহিত প্রথম পরিচ্ছেদটি পাঠ করেন ও অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে ইংরেজি অনুবাদ করিতে সম্মত হন। Marseilles-এ পঁহুছিবার মধ্যে প্রথম অংশের একরকম rough translation হইয়া যায়... Thompson সাহেবের অনুরোধে আমি Macmillan-দের নিকট পাঠাইয়াছি।

'Thompson সাহেব Macmillan-এর নিকট আপনার ভূমিকার কথা বলিতে তাঁহারা সেই ভূমিকাটি দেখিতে চান।

'আমি Macmillan-দের লিখিয়াছি যে ভূমিকাটি অত্যন্ত উপাদেয়। ভূমিকাতে গ্রন্থ সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন ; তাহাও লিখিয়াছি। কিন্তু জানাইয়াছি যে আপনার অনুমতি বিনা সে ভূমিকার translation ছাপাইতে চাহি না।...

'আপনার ভূমিকাটি এখনো অনুবাদ করি নাই। কলিকাতায় যাইয়া ভূমিকার (English translation) ছাপা সম্বন্ধে আপনার মত জিজ্ঞাসা করিব।... আমার নিজের মনের ভাব এই যে ভূমিকাটি আপনার মহত্ত্ব দেখাইতেছে, তাহা সাহিত্যিকদের মধ্যে অতুলনীয়। শুধু তাহা নয়। একজন জ্ঞানী ও বিবেচক ব্যক্তি (Professor of Philosophy) ভূমিকাটি পড়িয়া বলিয়াছিলেন— "এই ভূমিকা পড়িয়া রবিবাবুকে Worship করিতে হয়। এ ভূমিকা রবিবাবুর সাধনার পরিচয় দেয়। এমন একটা noble dignified calm আত্মপরিচয়— Which irresistably draws one's homage"

"আমারও এই feeling : কিন্তু এ বিষয়ে পরে আপনার সহিত আলোচনা করিব। আবশ্যক হইলে English translation-এ কোনো অংশ ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে।"...

রোদেনস্টাইনকে রবীন্দ্রনাথও সরযূবালা সম্পর্কে লেখেন— "She is a widow though very young, and she has written a book in Bengali which is a remarkable production, destined to take a very high place in our literature."—*Imperfect Encounter*– p.161. no.79. টমসন-অনূদিত রবীন্দ্রনাথের ভূমিকাসহ বইটির ইংরেজি অনুবাদ *The Passing of Spring* নামে প্রকাশিত হয়।

সরযূবালা-রচিত অন্যান্য গ্রন্থ 'দেবোত্তর', 'ত্রিবেণী-সঙ্গম', 'অন্নপূর্ণা' (একাঙ্ক নাটিকা), 'বিশ্বনাথ' ইত্যাদি। প্রসঙ্গত, বসন্তরঞ্জনের মৃত্যুর পর সরযূবালা দেশবন্ধুর বিপত্নীক ভগ্নীপতি শরৎচন্দ্র সেনকে বিবাহ করেন।

১৩

'প্রবাসী' পত্রিকার ১৩১৩ বঙ্গাব্দের কার্তিক সংখ্যায় 'সোনার তরী'র বিরুদ্ধে প্রথম অভিযোগ ঘোষণার পর থেকে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এবং রবীন্দ্রনাথকে ঘিরে নানা বিচিত্র বাদানুবাদ চলতে থাকে। সে প্রসঙ্গ এখানে পরিহার করছি। কবিকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও এই বাদ-বিতণ্ডায় লিপ্ত হতে হয়েছিল। অথচ রবীন্দ্রনাথই দ্বিজেন্দ্রলালকে বৃহত্তর পাঠক সমাজের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন।

বিতণ্ডার দিক ছাড়া একটা মাধুর্যের দিকও উভয়ের মধ্যে বর্তমান ছিল। সস্ত্রীক দ্বিজেন্দ্রলাল কবির শিলাইদহের কুঠিতে কাটিয়ে গেছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর 'বিরহ' প্রহসন কবিকে উৎসর্গ করে আনন্দ পেয়েছেন। বরিশালে আহূত প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশন উপলক্ষে সাহিত্য সম্মিলনীর সভাপতি পদে রবীন্দ্রনাথের নির্বাচনকে স্বাগত জানিয়ে তিনি লিখেছিলেন— '...এ কথা মুক্ত কণ্ঠেই আমি মানি যে, বর্তমান সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি সর্বাপেক্ষা যোগ্যতম ব্যক্তি এবং তাঁর প্রতিভার সঙ্গে এখন আর কাহারও তুলনা হইতে পারে না।' রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তির পূর্বেই দ্বিজেন্দ্রলাল 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার সূচনার তৎকালীন সরকারকে দোষারোপ করে লিখেছিলেন— 'আমাদের শাসন-কর্তারা যদি বঙ্গসাহিত্যের আদর জানিতেন তাহা হইলে... রবীন্দ্রনাথ আজ Knight (নাইট) উপাধিতে ভূষিত হইতেন।' অকালমৃত্যু দ্বিজেন্দ্রলালকে তাঁর ভবিষ্যদ্‌বাণীর রূপায়ণ দেখতে দেয় নি।

যে বরিশাল সাহিত্য সম্মেলনীর কথা এইমাত্র উল্লেখ করেছি তার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন দেবকুমার রায়চৌধুরী (১৮৮৬-১৯২৯)। এঁর পিতা রাখালচন্দ্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের একজন গুণগ্রাহী ভক্ত ছিলেন। এই সখ্যতাসূত্রে উভয় পরিবারের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। রাখালচন্দ্রের কন্যা সুশীলার সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র দিনেন্দ্রনাথের বিবাহ হয়। সেইসূত্রে দেবকুমার দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মাতুল।

১৩১৪ সালে লিখিত দেবকুমারের 'ব্যাধি ও প্রতিকার' গ্রন্থ পড়ে কবি খুশি হয়ে গ্রন্থকারকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। কবি নবীনচন্দ্র সেনও দেবকুমারের কবিতা সম্পর্কে খুব উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন।

রবীন্দ্র-স্নেহভাজন দেবকুমার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনচরিত 'দ্বিজেন্দ্রলাল' রচনা করেন ১৩২৪ বঙ্গাব্দে। দেবকুমারের ধারণা ছিল, 'দ্বিজেন্দ্রলালের দিব্য প্রতিভা ও দুর্লভ জীবন সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিতে পারেন, এমন শক্তিমান পুরুষ বঙ্গদেশে রবীন্দ্রনাথের তুল্য আর বড়ো বেশী' কেউ ছিলেন না। সে কারণে তিনি রবীন্দ্রনাথকে তাঁর রচিত জীবনীর একটি ভূমিকা রচনার অনুরোধ জানান। কবি তদুত্তরে একটি অতিসংক্ষিপ্ত ভূমিকা রচনা করে দেন।

প্রসঙ্গত দুটি স্বীকারোক্তি উদ্ধার করি। একটি রবীন্দ্রনাথের— দ্বিজেন্দ্রলালের পুত্র দিলীপকুমার রায়কে লেখা একটি চিঠির (জানুয়ারি ১৯২৭) অংশ— 'তোমার পিতাকে আমি শেষ পর্যন্ত শ্রদ্ধা করেছি।' অন্যটি দিলীপকুমার রায়ের একটি সাক্ষাৎকার ভিত্তিক উক্তি (দ্র. ২৫ জানুয়ারি, ১৯৭৬, আনন্দবাজার পত্রিকা)— 'আজ আমি বলছি ও-ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের কোনো অন্যায় হয় নি, অন্যায় করেছিলেন পিতৃদেব।'

১৪

রবীন্দ্রনাথের চেয়ে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (১৮৬৪-১৯১৯) বয়সে তিন বছরের ছোটো ছিলেন, কিন্তু উভয়ের মধ্যে একটা প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র রামেন্দ্রসুন্দর বি. এ. পরীক্ষায় বিজ্ঞানশাস্ত্রে অনার্স সহ প্রথম ও ১৮৮৭ সালে এম. এ. পরীক্ষায় বিজ্ঞানশাস্ত্রে সর্বোচ্চ স্থান লাভ করেন।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ-সূত্রে দুজনের নৈকট্য স্থাপিত হয়েছিল। ইংরেজ সরকার বঙ্গচ্ছেদ ঘোষণার ফলে বাংলার শিক্ষানীতি সংস্কার সম্বন্ধে যে কমিটি বসান— তার প্রতিচ্ছেদের প্রতিবাদকল্পে জেনারেল অ্যাসেমব্লি হলে যে প্রতিবাদ সভা আহূত হয় (মার্চ ১৯০৫) তাতে সভাপতিত্ব করেন রামেন্দ্রসুন্দর এবং রবীন্দ্রনাথ সেখানে উপস্থিত থেকে 'সফলতার সদুপায়' প্রবন্ধ পাঠ করে ভাষাবিচ্ছেদ প্রস্তাবের প্রতিবাদ করেন।

বঙ্গচ্ছেদ ঘোষণাকে উপলক্ষ করে রবীন্দ্রনাথ প্রস্তাবনা করেন 'রাখীবন্ধন' উৎসবের আর রামেন্দ্রসুন্দর প্রবর্তন করেন বাঙালির ঘরে ঘরে 'অরন্ধন' উৎসবের, রচনা করেন 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা'। রবীন্দ্রনাথ ১২ পৌষ ১৩২১ বঙ্গাব্দে লেখা একটি চিঠিতে প্রসঙ্গক্রমে রামেন্দ্রসুন্দরকে লেখেন— আপনার প্রতি আমার শ্রদ্ধা আছে বলিলে কম বলা হয়— আপনার প্রতি আমার প্রীতি গভীর। আমার মতে আচারে বিচারে যদি আপনাকে বেদনা দিয়া থাকি ক্ষমা করিবেন। বুদ্ধিতে বুদ্ধিতে মিল না হইলেও চলে, এমনটি না হইলে হয়ত মঙ্গলই হয়— কিন্তু হৃদয়ে হৃদয়ে মিলনের তো বাধা নাই।'...

এই শ্রদ্ধা এবং গভীর প্রীতিবশতই রবীন্দ্রনাথ আশুতোষ বাজপেয়ী-রচিত (আখ্যাপত্র : রামেন্দ্রসুন্দর / জীবন-কথা / শ্রীআশুতোষ বাজপেয়ী / গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্ /২০৩ / ১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা / চৈত্র—১৩৩০। /'রামেন্দ্রসুন্দর : জীবনকথা' গ্রন্থের ভূমিকাটি রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছিলেন, অনবকাশ সত্ত্বেও। রবীন্দ্রনাথ ভূমিকাটি লিখেছিলেন গ্রন্থপ্রকাশের প্রায় ৬ বছর আগে ২৮ ফাল্গুন ১৩২৪ তারিখে। গ্রন্থপ্রকাশে কেন এত বিলম্ব হয়েছিল জানি না। সচিত্র বইটির পৃষ্ঠা সংখ্যা (১৬) + ২ + ৩৮৫। মূল্য ছিল তিন টাকা।

আশুতোষ বাজপেয়ী কোনো প্রতিষ্ঠিত লেখক ছিলেন না। রামেন্দ্রসুন্দরকে তিনি প্রস্তাব দিয়েছিলেন একটি আত্মস্মৃতি রচনার জন্য। রামেন্দ্রসুন্দর রাজি না হলে রামেন্দ্রসুন্দরের একটি জীবনী রচনার জন্য তিনিই অগ্রসর হন এবং এই নাতিদীর্ঘ অথচ নির্ভরযোগ্য জীবনীটি লেখেন। প্রকাশযোগ্য যে, লেখক ছিলেন রামেন্দ্রসুন্দরের মামাতো ছোটো ভাই।

১৫

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের 'অত্যগ্রসর' অনুবর্তী রাখালদাস হালদারের পৌত্র এবং কন্যা শরৎকুমারীর পুত্র অসিতকুমার হলদার (১৮৯০-১৯৬৪) চিত্রবিদ্যায় অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন। 'নব্যবঙ্গীয় চিত্রকলা' প্রসারে অসিতকুমারের স্থান প্রথম সারির প্রথম দিকে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিল্পচর্চার প্রধান গুণ 'সৌকুমার্য' বলে উল্লেখ করেছিলেন।

শান্তিনিকেতন কলাভবনের ছাত্র অসিতকুমার উত্তর জীবনে জয়পুর ও লক্ষ্ণৌতে শিল্পবিদ্যাপীঠের উচ্চতম পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর আন্তরিক যোগের কিছু নিদর্শন অসিতকুমারের 'রবিতীর্থে' (১৩৬৫) গ্রন্থে লভ্য।

আচার্য নন্দলাল বসুর একযোগে তিনি অজন্তা গুহাচিত্রের অনুলিপির আয়োজনে অংশগ্রহণ করেন। অসিতকুমারের 'অজন্তা' (১৩২০) গ্রন্থে সেই বিচিত্র গুহাচিত্রের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বিবৃত হয়েছে। ১৯১৪ ও ১৯২১ খৃস্টাব্দে দু'বার বাগগুহা ও যোগীমারা গুহাচিত্রের অনুলেখ্য প্রস্তুতের ব্যাপারে অন্যান্য শিল্পীবৃন্দের মধ্যে অসিতকুমারও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এ-সবের অভিজ্ঞতার নিদর্শন 'বাগগুহা ও রামগড়' বইটি (আখ্যাপত্র : বাগগুহা / ও / রামগড় / শ্রীঅসিতকুমার হালদার / ইন্ডিয়ান প্রেস্ লিমিটেড্ / এলাহাবাদ / ১৩২৮)। বইটি 'পরম পূজনীয় শিল্পগুরু শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর'-কে 'প্রণামী' হিসাবে উৎসর্গীকৃত। বঙ্গসাহিত্য যখন সাধু ভাষা থেকে চলতি ভাষায় পদক্ষেপের ব্যাপারে কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত তখন 'অজন্তা'র আদর্শে এই বইটিও সুললিত চলতি ভাষায় লিখিত।

প্রভূত আনন্দের সঙ্গে কবি এই সচিত্র গ্রন্থের ভূমিকা "পরিচয়" নাম দিয়ে রচনা করেন ১৫ ভাদ্র ১৩২৮ তারিখে। কবিও এককালে স্বয়ং এই চিত্রাবলী দেখেছিলেন। দেখে তাঁর মনে হয়েছিল— 'তখন বৈরাগ্যের শক্তি বড়ে ছিল কেননা রাগ-অনুরাগের শক্তি সজীব ছিল। যারা জগৎকে জীবনকে পূর্ণভাবে গ্রহণ করতে জানে তারাই ত্যাগ করতে জানে।' সবশেষে কবি লিখেছেন— 'একটি কথা বলে আমার ভূমিকা শেষ করি— শ্রীমান অসিতকুমারের এই বইটি পড়ে আমরা খুশি হয়েছি। এর রচনা সরস, সরল এবং শিক্ষা ও প্রত্যক্ষবোধের দ্বারা উজ্জ্বল।'

১৬

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ-এর একদা সহ-সম্পাদক ও প্রখ্যাত 'জাহ্নবী' পত্রিকার সম্পাদক নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত (১৮৮২-১৯৪০) কবি রজনীকান্ত সেনের (১৮৬৫-১৯১০) মৃত্যুর প্রায় বারো বছর পরে 'মহাবিষুব সংক্রান্তি ১৩২৮' বঙ্গাব্দে 'কান্তকবি রজনীকান্ত' বইটি রচনা করেন। রোগ-শয্যায় শায়িত রজনীকান্ত স্বয়ং নলিনীরঞ্জনকে এই গ্রন্থ রচনার জন্য অনুরোধ করেন। নিবেদন অংশে গ্রন্থকার লিখেছেন—'রোগ-শয্যাশায়ী রজনীকান্ত তাঁহার জীবনচরিত লিখিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করেন।'

'বরেণ্য কবি পূজনীয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় যে কয়টি কথা লিখিয়া আমাকে আশীর্বাদ করিয়াছেন, তাঁহার সেই আশীর্বাদ' নলিনীরঞ্জন 'ভূমিকা রূপে' প্রকাশ করেছেন।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ নূতন গৃহে সংস্থাপিত হওয়ার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত একটি সভায় রজনীকান্তের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রথম পরিচয় হয় (২১ অগ্রহায়ণ ১৩১৫ বঙ্গাব্দ)। অনুষ্ঠানে রজনীকান্ত-গীত দুটি গান কবিকে আকর্ষণ করে এবং তিনি রজনীকান্তকে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানান। রজনীকান্ত পর দিন দীনেশচন্দ্র সেনকে নিয়ে সেখানে যান এবং কবি পুনরায় গান দুটি তাঁর কণ্ঠে শ্রবণ করেন।

এর পর রজনীকান্ত দুরারোগ্য ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হন। কবি তাঁকে মেডিকেল কলেজে দেখতে যান ২৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭ শনিবার। পরে তাঁকে একখানি চিঠিও লেখেন ১৬ আষাঢ় ১৩১৭ তারিখে। নীরব-কণ্ঠ কবিকে পত্র-মাধ্যমেই মনের কথা জানিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর চিঠিটি ছিল—

ওঁ

প্রীতিপূর্ণ নমস্কার নিবেদন—

সেদিন আপনার রোগশয্যার পার্শ্বে বসিয়া মানবাত্মার একটি জ্যোতির্ময় প্রকাশ দেখিয়াছি। শরীর তাহাকে আপনার সমস্ত অস্থিমাংস, স্নায়ু, পেশী দিয়া চারিদিকে বেষ্টন করিয়া ধরিয়াও কোনোমতে বন্দী করিতে পারিতেছে না, ইহাই আমি প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইলাম। মনে আছে, সেদিন আপনি আমার 'রাজা ও রানী' নাটক হইতে প্রসঙ্গক্রমে নিম্নলিখিত অংশটি উদ্ধৃত করিয়াছিলেন—

'এ-রাজ্যেতে
যত সৈন্য, যত দুর্গ, যত কারাগার,
যত লোহার শৃঙ্খল আছে, সব দিয়ে
পারে না কি বাঁধিয়া রাখিতে দৃঢ়বলে
ক্ষুদ্র এক নারীর হৃদয়! ...'

ঐ কথা হইতে আমার মনে হইতেছিল, সুখদুঃখ-বেদনায় পরিপূর্ণ এই সংসারের প্রভূত শক্তির দ্বারাও কি ছোটো এই মানুষটির আত্মাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিতেছে

না? শরীর হার মানিয়াছে, কিন্তু চিত্তকে পরাভূত করিতে পারে নাই, কণ্ঠ বিদীর্ণ হইয়াছে, কিন্তু সংগীতকে নিবৃত্ত করিতে পারে নাই, পৃথিবীর সমস্ত আরাম ও আশা ধূলিসাৎ হইয়াছে, কিন্তু ভূমার প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাসকে ম্লান করিতে পারে নাই। কাঠ যতই পুড়িতেছে, অগ্নি আরো তত বেশি করিয়াই জ্বলিতেছে। আত্মার এই মুক্তস্বরূপ দেখিবার সুযোগ কি সহজে ঘটে? মানুষের আত্মার সত্য প্রতিষ্ঠা যে কোথায়, তাহা যে অস্থিমাংস ও ক্ষুধাতৃষ্ণার মধ্যে নহে, তাহা সেদিন সুস্পষ্ট উপলব্ধি করিয়া আমি ধন্য হইয়াছি। সছিদ্র বাঁশির ভিতর হইতে পরিপূর্ণ সংগীতের আবির্ভাব যেরূপ, আপনার রোগক্ষতবেদনাপূর্ণ শরীরের অন্তরাল হইতে অপরাজিত আনন্দের প্রকাশও সেইরূপ আশ্চর্য!

যেদিন আপনার সহিত দেখা হইয়াছে, সেইদিনই আমি বোলপুরে চলিয়া আসিয়াছি। ইতিমধ্যে আবার যদি কলিকাতায় যাওয়া ঘটে, তবে নিশ্চয় দেখা হইবে। আপনি যে গানটি পাঠাইয়াছেন, তাহা শিরোধার্য করিয়া লইলাম। সিদ্ধিদাতা তো আপনার কিছুই অবশিষ্ট রাখেন নাই, সমস্তই তো তিনি নিজের হাতে লইয়াছেন— আপনার প্রাণ, আপনার গান, আপনার আনন্দ সমস্ত তো তাঁহাকেই অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে— অন্য সমস্ত আশ্রয় ও উপকরণ তো একেবারে তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে। ঈশ্বর যাঁহাকে রিক্ত করেন, তাঁহাকে কেমন গভীরভাবে পূর্ণ করিয়া থাকেন আজ আপনার জীবনসংগীতে তাহাই ধ্বনিত হইতেছে ও আপনার ভাষাসংগীত তাহারই প্রতিধ্বনি বহন করিতেছে। ইতি—

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পত্ররচনার তারিখ ১৬ আষাঢ় ১৩১৭। এর ঠিক দু'মাস পরে ২৮ ভাদ্র ১৩১৭ তারিখে কান্ত-কবির মৃত্যু হয়।

১৭

বিভূতিভূষণ গুপ্ত বাল্যকাল থেকেই শান্তিনিকেতনে পড়াশুনা করেন। পরে ১৯২০ খৃস্টাব্দ নাগাদ সুহৃৎকুমার মুখোপাধ্যায়, ভুবনেশ্বর নাগ, নরেন্দ্রনাথ নন্দী প্রভৃতির সমকালে বিভূতিভূষণ শান্তিনিকেতনে অধ্যাপক হিসাবে যোগ দেন। মধ্যে কিছুকাল নারীকল্যাণ সমিতিতে কাজ করেন। পুনরায় পাঠভবনের অধ্যাপক এবং পরে অধ্যক্ষ হিসাবে যুক্ত থাকেন।

বিভূতিভূষণ যে কবির স্নেহাস্পদ ছিলেন তার একটা পরোক্ষ প্রমাণ রবীন্দ্রনাথের 'ভানুসিংহের পত্রাবলী'তে (৫১-সংখ্যক পত্র, ১৮ ভাদ্র ১৩২৯) উদ্ধৃত আছে। কবি

প্রসঙ্গক্রমে লিখেছেন— 'রোজ দুপুরবেলা বিভূতি এসে একবার ক'রে আমার কাছ থেকে আগাগোড়া পাঠ নিয়ে যায়; ছোটো ছেলেরা যে রকম ক'রে পড়া মুখস্থ করে আমাকে তাই করতে হয়।'

'গল্পসল্প' গ্রন্থমালার ৬-সংখ্যক বই হিসাবে বিভূতিভূষণ গুপ্তের 'বেড়াল ঠাকুরঝি' (বেড়াল ঠাকুরঝি / বিভূতিভূষণ গুপ্ত / বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ / কলিকাতা) প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৩০ বঙ্গাব্দে। পৃষ্ঠাসংখ্যা [৫] + ৮২। এতে মোট কুড়িটি গল্প আছে। প্রথম গল্পের নামেই বইয়ের নামকরণ হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ভূমিকা লেখেন ১০ শ্রাবণ ১৩৩০ তারিখে। বইটির প্রচ্ছদ আঁকেন প্রভাস সেন এবং এটিকে চিত্রিত করেন অর্ধেন্দু-প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৮

অসহযোগ আন্দোলন তৎকালে বহু ছাত্রের জীবন নতুনভাবে নিয়ন্ত্রিত করেছিল। লক্ষ্মীশ্বর সিংহ্ও (১৯০৫-৭৮) সরকারি বিদ্যালয় পরিত্যাগ করে শ্রীনিকেতনে এলমহার্স্ট-প্রবর্তিত গ্রাম-সংগঠনকর্মে আত্মনিয়োগ করেন। কর্ম-অবকাশে তিনি সেখানকার এক জাপানি কারুদক্ষের কাছে কাঠের কাজ শিখতে আরম্ভ করেন। আগে থেকেই অবশ্য এই বিষয়ে তাঁর আগ্রহ ও অভিজ্ঞতা ছিল। এবার ভালো করে শিখে রবীন্দ্রনাথের আদেশে তিনি ছাত্রদের কাঠের কাজ শেখাবার জন্য নিযুক্ত হলেন। এ সময়ে তিনি 'কাঠের কাজ' (শান্তিনিকেতন প্রেসে মুদ্রিত সচিত্র ও ক্ষুদ্রাকৃতি এই বইটি ১৯২৫ সালে প্রথম প্রকাশিত হলেও ১৯৬৪ খৃস্টাব্দে ওরিয়েন্ট লংম্যান বইটির একটি পরিবর্ধিত সংস্করণ প্রকাশ করেন) নামে একখানি পুস্তক রচনা করেন। এ বিষয়ে বাংলা ভাষায় এর আগে কোনো বই ছিল না।

কবির সহযোগিতায় লক্ষ্মীশ্বর দু'বার সুইডেনে গিয়ে কাঠের কাজে প্রভূত দক্ষতা অর্জন করে আসেন। বিশ্বভারতী শিক্ষণ বিদ্যালয় ব্যতীত গান্ধীজী-প্রবর্তিত ওয়ার্ধা বিদ্যামন্দির ও সেবাগ্রাম নঈ তালিম ভবনের বি. টি. কলেজের বিভিন্ন দায়িত্বশীল পদে তিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে নিবেদনযোগ্য যে এস্‌পেরান্তো ভাষা আন্দোলনের তিনি একজন পুরোধা পুরুষ ছিলেন।

শিক্ষিত মানুষও যাতে কাঠের কাজ শিখতে পারেন সেই উদ্দেশ্য নিয়ে লক্ষ্মীশ্বরের এই বইটি রচিত। তিনি কবিকে বইটি পড়তে দেন এবং শান্তিনিকেতনে স্লয়েড্ পদ্ধতিতে কারুশিক্ষার প্রবর্তক কবি বইটি পড়ে খুশি হন, এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বইটির একটি নাতিদীর্ঘ ভূমিকা লিখে দেন ৯ অগ্রহায়ণ ১৩৩২ তারিখে। ভূমিকায় কবি আমাদের দেশে বুদ্ধিজীবী 'ভদ্রলোক' এবং শ্রমজীবী 'ছোটলোক'দের মধ্যে সমাজ-কৃত ব্যবধানকে তীব্র ভাষায় তিরস্কার করেছেন। লক্ষ্মীশ্বর স্পষ্টতই রাস্কিনের সমাজ মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। ভূমিকার ভাষায় তিরস্কারের তীব্রতা লক্ষণীয়।

১৯

শ্রীহট্ট জেলার বীরশ্রী গ্রামের সন্তান ব্রতচারী-খ্যাত গুরুসদয় দত্ত (১৮৮২-১৯৪১) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এফ. এ. পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং পরে আই. সি. এস. পরীক্ষায় সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন (১৯০৫)। পরের বছর তিনি প্রসিদ্ধ সিভিলিয়ান বি. দে-র চতুর্থ কন্যা সরোজনলিনীকে (১৮৮৭-১৯২৪) বিবাহ করেন। কর্মব্যপদেশে তাঁকে অবিভক্ত বঙ্গের বিভিন্ন জেলায় পরিভ্রমণ করতে হয়। উপযুক্ত সহধর্মিণী সরোজনলিনী স্বামীর সর্বপ্রকার কাজের সঙ্গী ছিলেন।

গুরুসদয় বীরভূম জেলার সমাহর্তার পদে আসীন থাকাকালে প্রায়ই শান্তিনিকেতনে যেতেন। সেই সূত্রে ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের সঙ্গে সরোজনলিনীর অন্তরঙ্গতা গড়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তিনি প্রথম পরিচিত হন এক চন্দ্রালোকিত সন্ধ্যায়। মৃদু আপত্তি সত্ত্বেও কবিকে সেদিন সরোজনলিনীর অনুরোধে দু-তিন খানি গান গাইতে হয়। তার মধ্যে একটি ছিল— 'আয় আয় রে পাগল, ভুলবি রে চল আপনাকে'। খালি গলায় গান— শুধু মৃদু করতালি দিয়ে কবি তালবাদ্য করে চলেছেন। এখানে থাকতেই তাঁরা দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং চার্লস ফ্রিয়ার অ্যান্ডরুজের সঙ্গেও পরিচিত হন। প্রকৃতপক্ষে সরোজনলিনীর জীবন তখন থেকেই রবীন্দ্রনাথের গান ও ভাষণমালার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে। জাপান বাসকালে একদা তিনি 'জনগণমন অধিনায়ক' শীর্ষক গানটি গেয়ে শোনান।

সরোজনলিনীর হয় মৃত্যু ১৯২৪ খৃস্টাব্দে। তাঁর স্মৃতিরক্ষার জন্য গুরুসদয় যে 'সরোজনলিনী নারী মঙ্গল সমিতি' স্থাপন করেন, তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ও হেমলতা ঠাকুর বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন।

সরোজনলিনীর মৃত্যুর কিছুকাল পরেই গুরুসদয় 'সরোজ-নলিনী' নামে স্ত্রীর একটি নাতিদীর্ঘ জীবনী গ্রন্থ প্রকাশ করেন (১৯২৬)। এর আখ্যাপত্রটি : সরোজ-নলিনী / সরোজনলিনী দত্ত, এম. বি. ই'র / সংক্ষিপ্ত জীবনী / তাঁহার স্বামী শ্রীগুরুসদয় দত্ত, আই. সি. এস্ / প্রণীত। (কবিবর রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা সম্বলিত) / প্রকাশক / দি বুক কোম্পানি, / ৪/৫এ, কলেজ স্কোয়ার। কলিকাতা। / মূল্য ।।০ আনা। / রবীন্দ্রনাথ এই বইটির ভূমিকা লেখেন ২০ অগ্রহায়ণ ১৩৩২ তারিখে। ১৯২৯ খৃস্টাব্দে এই গ্রন্থের ইংরেজি সংস্করণ প্রকাশিত হলে এর Introduction লেখেন C. F. Andrews। রবীন্দ্রনাথের ভূমিকাটিও অনূদিত হয়ে গ্রন্থে স্থান পায়। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণ ইংরেজি জীবনী *A Woman of India* প্রকাশিত হয় যথাক্রমে May 1919 এবং July 1929-এ। রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 'রবীন্দ্রজীবনী'র তৃতীয় খণ্ডে (১৯৫৯ সং, পৃষ্ঠা ২৩০) লিখেছেন— 'ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথ সরোজনলিনীর ইংরেজি জীবনী 'A Woman of India' (The Hogarth Press, London, 1928) গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়াছেন।' এই সংবাদ ঠিক নয়। প্রথমত,

বইটি ১৯২৯-এ প্রকাশিত। দ্বিতীয়ত, রবীন্দ্রনাথ ইংরেজি গ্রন্থের ভূমিকা লেখেন নি। তাঁর বাংলা ভূমিকাটিই অনূদিত হয় মাত্র ('From the Bengali Foreword by Rabindranath Tagore')। ইংরেজি গ্রন্থে আরো উল্লিখিত আছে— 'The Original Bengali edition of the life, with the Foreword from poet Rabindranath Tagore, was published in June, 1926.'

মানুষের মহৎ ও পূর্ণ জীবনের প্রতি যে শ্রদ্ধা তা কবির ভূমিকায় উদ্ভাসিত হয়েছে। ভূমিকাটি কবির হস্তলিপিচিত্র আকারে মুদ্রিত। 'নিবেদন' অংশে গুরুসদয় দত্ত (২৩ ডিসেম্বর ১৯২৫) লিখেছেন— 'কবিগুরু শ্রদ্ধেয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাঁহার অতুলনীয় ভাষায় বইখানির ভূমিকা লিখিয়া দিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।' ভূমিকায় কবি প্রসঙ্গক্রমে লেখেন— 'সরোজনলিনীর জীবনী পড়িয়া বুঝিলাম জীবনী-লেখক সত্যই ভাগ্যবান। কারণ এরূপ স্ত্রীকে মৃত্যুর মধ্যে হারাইয়াও হারানো সম্ভব নহে ... তাঁহার জীবনের মধ্যেই চিরদিন তিনি জীবিত থাকিবেন।'

২০

পাবনা জেলার হরিপুর গ্রামের বিখ্যাত চৌধুরী পরিবারের সন্তান প্রমথনাথ চৌধুরীর (১৮৬৮-১৯৪৬, পরে প্রমথ চৌধুরী) সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা ইন্দিরাদেবীর বিবাহ হলে উভয় পরিবারের পূর্বারব্ধ আত্মীয়তা আরো ঘনিষ্ঠ হয়। কিন্তু আত্মীয়তার অতিরিক্ত এক নিগূঢ় বন্ধনে রবীন্দ্র-প্রমথ আবদ্ধ ছিলেন। 'সবুজপত্র' পত্রিকা এই বন্ধন দৃঢ়ীকৃত করেছিল।

রবীন্দ্রযুগে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল প্রবন্ধকার প্রমথ চৌধুরীর 'রায়তের কথা' (বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহের বই, প্রকাশ ১০ আগস্ট ১৯২৬, ভূমিকা এক টাকা সাত আনা + পৃ. ৮০, বিশ্বভারতী- প্রকাশিত) প্রকাশিত হলে রবীন্দ্রনাথ এর দীর্ঘভূমিকা রচনা করেন এবং গ্রন্থকারের বক্তব্যের বিষয়ে তাঁর আশঙ্কার কথা ব্যক্ত করেছেন। রবীন্দ্র-সমালোচনার একটা বড়ো বৈশিষ্ট্য হল যে, তিনি বিরুদ্ধ সমালোচনাকালেও একটা মানদণ্ড মেনে চলতেন। ত্রুটি দেখাতে গিয়ে সমালোচক রবীন্দ্রনাথ কখনোই রূঢ় বা কঠোর হতে পারেন নি। কবির কথায়— 'যে সমালোচনার মধ্যে শান্তি নেই, যা কেবলমাত্র আঘাত দেয়, কেবলমাত্র অপরাধটুকুর প্রতিই সমস্ত চিত্ত নিবিষ্ট করে, আমি তাকে ঠিক মনে করি না। এরূপ সমালোচনার ভিতর একটা জিনিস আছে যা বস্তুত নিষ্ঠুরতা— এটা আমাকে পীড়ন করে। সাহিত্যিক অপরাধের বিচার সাহিত্যিকভাবেই হওয়া উচিত। অর্থাৎ রচনাকে তার সমগ্রতার দিক থেকে দেখতে হবে।'

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য— ভূমিকাটি প্রথমত ১৩৩৩ সনের আষাঢ়-সংখ্যা সবুজপত্রে প্রমথ চৌধুরীর টীকাসহ প্রকাশিত হয়ে পরে গ্রন্থভুক্ত হয়। প্রথমে 'রায়তের কথা' গ্রন্থকারের 'দু' ইয়ার কি' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৪ বৈশাখ ১৩৩৩ তারিখে লেখা

একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ প্রমথ চৌধুরীকে লিখেছিলেন, 'সময় অল্প, ক্লান্তিও প্রবল। তবুও 'রায়তের কথা' সম্বন্ধে লিখেছি। কাল রেজিষ্ট্রি ডাকে পাঠাব।' ১৯ বৈশাখের মধ্যে ঐ দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখে তিনি প্রমথ চৌধুরীকে পাঠিয়ে দেন। সবুজপত্রে যখন প্রকাশিত হয়, তখন কবি য়ুরোপে। পরে 'কালান্তর' গ্রন্থে প্রবন্ধটি সম্পাদিত হয়ে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আরো দ্রষ্টব্য সবুজপত্র, আশ্বিন ১৩৩৩, রবীন্দ্রনাথের চিঠি। 'মুখপত্র'-এ প্রমথ চৌধুরী লেখেন 'আমার লেখা "রায়তের কথা" যখন সবুজপত্রে প্রকাশিত হয়, তখন রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বিলেতে। এই কারণে সে প্রবন্ধটি তাঁর চোখে পড়ে নি। সম্প্রতি তিনি আমার অনুরোধে সেটি পড়েন। এ বিষয়ে তাঁর মতামত সম্বলিত একখানি পত্র আমাকে লেখেন। এ পত্র অবশ্য লেখা হয়েছে ছাপবার জন্য।

এ লেখা "টীকাসমেত" রায়তের কথার ভূমিকাস্বরূপ প্রকাশ করার অনুমতি রবীন্দ্রনাথ আমাকে দিয়াছেন।'

এর আখ্যাপত্র ছিল নিম্নরূপ : রায়তের কথা / শ্রীপ্রমথ চৌধুরী / (শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভূমিকা সম্বলিত) / উইক্‌লি নোট্‌স্‌ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্‌ / ৩ নং হেস্টিংস ষ্ট্রীট/কলিকাতা।

২১

সংগীতশিক্ষা শান্তিনিকেতনের জীবনের এক আবশ্যিক অঙ্গ। প্রথম যুগে দিনেন্দ্রনাথ আর অজিতকুমার চক্রবর্তীর হাতে এর গোড়াপত্তন। ১৯১২ খৃস্টাব্দে দুজন মুসলমান ওস্তাদ এখানে আসেন মার্গ সংগীত শিক্ষা দিতে। ১৯১৪ খৃস্টাব্দে এলেন মহারাষ্ট্রদেশীয় চিৎপাবন ব্রাহ্মণ ভীমরাও হসুরকর— গোয়ালিয়র গান্ধর্ব বিদ্যালয়ের ছাত্র— সংস্কৃত কাব্য সাহিত্যে সুপণ্ডিত। কাব্যতীর্থ ও সাংখ্যতীর্থ উপাধিভূষিত ভীমরাও শাস্ত্রী প্রসিদ্ধ বীণকার সঙ্গমেশ্বর শাস্ত্রীর কাছেও কিছুদিন বীণা শিক্ষা করেছিলেন।

সংগীত শিক্ষক ভীমরাও সংগীত শিক্ষাদানের সঙ্গে বিদ্যালয়ে সংস্কৃতের অধ্যাপনাও দক্ষতার সঙ্গে সম্পাদন করতেন। তাঁকে দেখেই দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেন—

বিশারদ নহেন গানে কেবল—
জ্ঞানেও দেন ডুব সাঁতার।
বেদান্ত সাংখ্য পাতঞ্জল
নখদরপণে তাঁর ॥

হিন্দি গান ছাড়া বীণা, মৃদঙ্গ এবং তবলা শেখানোর ভারও ছিল তাঁর উপর। দিনেন্দ্রনাথের পর তিনিই বিশ্বভারতী সংগীতভবনের অধ্যক্ষ হন (১৯২৩-২৭), পরে মহারাষ্ট্রে ফিরে যান।

তাঁর সংগীত বিষয়ক গ্রন্থাবলীর মধ্যে বাংলা অক্ষরে হিন্দি গানের দুটি— 'সংগীত দর্পণ' ও 'সঙ্গীত পরিচয়' উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া 'রাগশ্রেণী' (আখ্যাপত্র :

রাগশ্রেণী / শান্তিনিকেতন সংগীত বিভাগের অধ্যক্ষ / পণ্ডিত শ্রীভীমরাও শাস্ত্রী / কাব্যতীর্থ-সাংখ্যতীর্থ প্রণীত / শান্তিনিকেতন প্রেসে / রায় সাহেব জগদানন্দ রায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত / শান্তিনিকেতন; বীরভূম। / [সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত] / [মূল্য ১।।০ টাকা] /) নামে ভাতখণ্ডে-প্রবর্তিত রাগ-রাগিণীর পরিচয়সহ বইটি ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ এই বইয়ের জন্য একটি ছোটো ভূমিকা লিখে দেন। প্রসঙ্গত— দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই বইটি আদ্যোপান্ত দেখে দেন। বাকে এবং ইলিয়ট দম্পতি তাঁর গান শুনতেন। এ ছাড়া 'সংগীত গীতাঞ্জলি' নামে গীতাঞ্জলির সমস্ত গানের সঙ্গে আরো কিছু রবীন্দ্রনাথের গান যোগ করে তিনি অবাঙালিদের জন্য একটি গীতিসংকলন দেবনাগরী অক্ষরে প্রকাশ করেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁকে পণ্ডিতজী বলে সর্বদা সম্বোধন করতেন। তাঁর কণ্ঠে গীত 'আমার শেষ পারানির কড়ি' গানটি রেকর্ডে গ্রহণের সময় ভীমরাও বীণা বাজিয়েছিলেন এবং এস্রাজ বাজিয়েছিলেন ধীরেনকৃষ্ণ দেববর্মণ।

২২

পাবনা জেলার খলিলপুর ডাকঘরের অন্তর্গত মুরারিপুর গ্রামের অধিবাসী মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন (১৯০৪-৮৭) বাল্যকাল থেকেই সংগীত সংগ্রহে পরম আগ্রহী পুরুষ। রবীন্দ্রনাথের রচনাদি পাঠেই তাঁর এই আগ্রহের উৎপত্তি। তাঁর 'ধানের মঞ্জরী' গ্রন্থে তিনি লিখেছেন, 'আমি সর্বপ্রথম রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক লালন ফকীরের গান সংগ্রহ দেখিয়াই গ্রাম্য গানের প্রতি আকৃষ্ট হই।' রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বাউলগান সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রকাশ করলেও তখন অবধি 'লোক সাহিত্যে' বাউল বিষয়ে কিছু লেখেন নি বলে মনসুরউদ্দীনের ক্ষোভ ছিল। রবীন্দ্রনাথ ও ক্ষিতিমোহনের সঙ্গে তাঁর প্রায়ই বাউল-বিষয়ে আলোচনা হত। এই আলোচনার ফলে লিখিত 'পল্লীগান কেন ধ্বংস হল' প্রবন্ধটি তিনি ঢাকার 'জাগরণ' পত্রিকায় (অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৩৩৫) প্রকাশ করেন।

'হারামণি' গ্রন্থটি প্রকাশের ফলে এই ধরনের বাউল সংগ্রহের কথা রবীন্দ্রনাথ অবগত হন এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সানন্দে একটি মনোজ্ঞ আলোচনা ('আশীর্বাদ') লিখে দেন পৌষ সংক্রান্তি ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে। এটি 'প্রবাসী' পত্রিকার চৈত্র ১৩৩৪ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। প্রথম প্রকাশের (প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্র : 'হারামণি'/মৌলবী মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন এম. এ./কর্তৃক সংগৃহীত ও সম্পাদিত/প্রাপ্তিস্থান— প্রবাসী কার্যালয়/ ১২০/২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।/মূল্য পাঁচসিকা।/এটি পরে ঢাকা থেকে পুনর্মুদ্রিত হয় ১৩৪০ বঙ্গাব্দে।) কিছুদিন পরে বইটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও পুনঃপ্রকাশিত হয় (এই সংস্করণের আখ্যাপত্র : হারামণি/লোকসংগীত সংগ্রহ/ রাজসাহী কলেজের অধ্যাপক/মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন এম. এ./কর্তৃক সংগৃহীত ও সম্পাদিত/কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত/১৯৪২)।

২৮৪টি গীতসহ নতুন সংস্করণ প্রকাশের পূর্বে লেখক তাঁর গ্রন্থের আর-একটি নতুন ভূমিকা রচনার অনুরোধ জানান। কিন্তু কবির স্বাস্থ্য তখন ভেঙে পড়েছে। কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ লেখককে একটি চিঠিতে প্রবাসীতে প্রকাশিত ভূমিকাটি ব্যবহারের অনুমতি দেন :

VISVA BHARATI

Founder President
Rabindranath Tagore

SANTINIKETAN
Bengal, India
২৮/১/৪১

সবিনয় নিবেদন,

আমার পিতা আপনার চিঠিখানা আজ পেয়েছেন। তাঁর বর্তমান শারীরিক অবস্থায় নূতন ক'রে আপনার বইয়ের জন্য কোনো ভূমিকা লেখা তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে না। তাঁর এই অক্ষমতা দয়া করে ক্ষমা করবেন।

শ্রীযুক্ত অনিলবাবু আপনাকে আগেই জানিয়েছেন যে প্রবাসীতে প্রকাশিত আমার পিতার প্রবন্ধটি আপনার বইয়ের ভূমিকাস্বরূপ ব্যবহার করতে পারেন। ইতি—

নিবেদক
শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সেইমতো এই রচনাটিই ভূমিকা হিসাবে গৃহীত হয়ে গ্রন্থটি (কবির তিরোধানের পর) প্রকাশিত হয়। সাম্প্রদায়িক ভেদের ঊর্ধ্বে সাহিত্যের যে শাশ্বত প্রকাশ— ভূমিকায় কবি তারই উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন।

প্রসঙ্গত— রথীন্দ্রনাথের চিঠিতে যে, 'অনিলবাবু'র উল্লেখ আছে— তিনি অনিলকুমার চন্দ— কবির একদা ব্যক্তিগত সচিব। আর যেহেতু রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'আশীর্বাদ'-কেই ভূমিকা হিসাবে ব্যবহার করতে বলেছেন, সেজন্য এটিকে 'ভূমিকা' হিসাবেই আমরা গ্রহণ করেছি।

২৩

পণ্ডিচেরীর সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী (১৮৯১-১৯৫১) 'সবুজপত্র' পত্রিকার একজন তরুণ লেখক ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের 'ফাল্গুনী' ও 'লিপিকা'র ইঙ্গিত গ্রহণ করে রূপকথার অনিন্দ্য ঢঙ ও নিজের বৈশিষ্ট্য মিলিয়ে লেখা সুরেশচন্দ্রের 'নতুন রূপকথা ও একটি রূপক গল্প' (১৯২০) একটি সুপাঠ্য রচনা। রবীন্দ্রনাথ স্বাভাবিকভাবেই এই তরুণ লেখকের প্রতি স্নেহশীল ছিলেন। তিনি সুরেশচন্দ্রের 'সাকী' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের কবিতার প্রশংসা করতেন।

স্বনামখ্যাত দিলীপকুমার রায়ের কাছে রবীন্দ্রনাথ একদা সুরেশচন্দ্রের কবিতার প্রশংসা করলে দিলীপকুমার 'ইন্দ্রধনু'র পাণ্ডুলিপি কবিকে পাঠিয়ে দেন। 'ইন্দ্রধনু' পড়ে কবি যে 'আশীর্বচন' পাঠান— তাই এই কাব্যগ্রন্থের ভূমিকা-রূপে মুদ্রিত।

সুরেশচন্দ্রের 'সাকী' কাব্যগ্রন্থ থেকে কয়েকটি কবিতা 'ইন্দ্রধনু'তে 'নিবদ্ধ' হয়। কবিতাগুলি পর্যায়ক্রমে সন্নিবেশিত— 'কেননা তাহাতে পাঠকের কবির প্রতিভার ক্রমবিকাশ বুঝিবার সহায়তা হয়।' 'ইন্দ্রধনু' (আখ্যাপত্র : ইন্দ্রধনু/শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী/ গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্স, /২০৩/১/১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা/এক টাকা)। চব্বিশটি কবিতার ৭৯ পৃষ্ঠার একটি কবিতার বই। এর প্রথম কবিতা 'মরীচিকা' পণ্ডিচেরীতে ১৩২০ বঙ্গাব্দে রচিত ; শেষ কবিতাটি 'দ্বন্দ্ব'— কলিকাতায় বৈশাখ ১৩৩২-এ রচিত।

২৪

সন্তোষবিহারী বসু ছিলেন বর্ধমানের লোক, বীরভূম কৃষি বিভাগের কর্মী। বীরভূম এবং বাঁকুড়া উভয় জেলারই তিনি ছিলেন কৃষি আধিকারিক। শাহাবাদে ছিলেন কৃষি-পরিদর্শক পদে। বিহার এবং উড়িষ্যা সরকারের কৃষি দপ্তরেও কাজ করেছেন, কিছুদিন সেখানকার সমবায় আধিকারিক শিক্ষণ শ্রেণীর অধ্যাপকও ছিলেন। পরে বিশ্বভারতী-শ্রীনিকেতনের খামার, গো-পালন এবং মুরগি-পালন দপ্তরের অধ্যক্ষতাও করেছিলেন; আবার উদ্ভিদবিদ্যার অধ্যাপকও হয়েছিলেন। এই কৃষিবিৎ এবং শান্তিনিকেতনের ইতিহাসের অধ্যাপক ফণীন্দ্রনাথ বসুর যুগ্ম সম্পাদনায় 'ভূমিলক্ষ্মী' পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

কৃষিপ্রধান বাংলাদেশের কৃষি সমস্যা নিয়ে কবিকে বহুবার মননশীল প্রবন্ধ লিখতে দেখি। 'প্রবাসী' পত্রিকার পৌষ ১৩৩৫ সংখ্যায় (পৃ. ৪৩৮-৩৯) তিনি এ-বিষয়ে যে প্রবন্ধ রচনা করেন তাঁর নামই ছিল 'কৃষিবিৎ সন্তোষবিহারী বসু'। প্রবন্ধে তাঁরই প্রশংসা-প্রসঙ্গে সমগ্র কৃষি সমস্যা নিয়ে কবি আলোচনা করেন।

১৩৩৭ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে সন্তোষবিহারী-রচিত 'সরল কৃষিশিক্ষা' (আখ্যাপত্র : সমবায় গ্রন্থাবলী নং ২/সরল কৃষি শিক্ষা/শ্রীসন্তোষবিহারী বসু।/Superintendent of Agriculture— Farm, Dairy & Poultry— /and Professor of Botany, Visva-Bharati. Late District/Agricultural Officer, Birbhum, Bankura; Inspector of/Agriculture, Sahabad; Supernumerary Agriculturist, Bihar & Orissa; Sometime lecturer / in Agriculture, Co-operative Officers'/Training class, Bihar & Orissa, / & / Editor "Bhumilakshmi". / মূল্য ১।০ টাকা।) বইটি 'বঙ্গীয় সমবায় সংগঠন সমিতির পক্ষ' থেকে প্রকাশিত হয়। এই বইয়ের সূচনাতেই রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা 'মুখপত্র' সংযোজিত হয়। এর পরেই 'ভূমিকা' রচনা করেছেন যদুনাথ সরকার। তিনি তখন (তাঁর ভূমিকার তারিখ ১১ মার্চ ১৯৩০) 'ডেপুটি ডিরেক্টর অব্ এগ্রিকালচার' পদে আসীন। শেষে 'নিবেদন' লিখেছেন লেখক সন্তোষবিহারী ১লা বৈশাখ ১৩৩৭ তারিখে। দশ আনা + ১৮৬ পৃষ্ঠা সংবলিত এই বইয়ের 'নিবেদন' অংশে প্রসঙ্গক্রমে লেখক লিখেছেন— '... সেই বিশ্বকবি, যাঁহার কৃষিক্ষেত্রে বসিয়া

আজ নানান বিষয়ে গবেষণা করিতেছি, ও যিনি কৃপা করিয়া, এই পুস্তিকার মুখপত্র লিখিয়া দিয়াছেন, আজ তাঁহার শ্রীচরণে পতিত হইয়া এই পুস্তিকা বাহির করিতে সাহস করিলাম।'

সন্তোষবিহারী ৬ বছর অস্থায়ীভাবে শ্রীনিকেতনে ছিলেন। যদিও এটি 'মুখপত্র' এবং প্রবাসীর পূর্বোক্ত প্রবন্ধটিই 'মুখপত্র'-রূপে মুদ্রিত, সেজন্যে এটি ভূমিকা হিসেবে গৃহীত হয়েছে।

২৫

রবীন্দ্রনাথের একজন অন্তরঙ্গ ভক্ত দার্শনিক সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তের কন্যা মৈত্রেয়ী দেবী (১৯১৪-৯০) আপন নামেই খ্যাত। তাঁর 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' কবির শেষ জীবনের একটি পর্বের দলিল বিশেষ। শৈশবেই এঁর কাব্যশক্তি যথেষ্ট স্ফূর্তিলাভ করে।

লেখিকার ১৬ বছর বয়সের কাব্যগ্রন্থ 'উদিতা' (১৯২৯ খৃস্টাব্দে চক্রবর্তী, চ্যাটার্জি অ্যাণ্ড কোং দ্বারা প্রকাশিত, পৃ. ছয় আনা + ১৪৪) পিতা সুরেন্দ্রনাথের প্রশ্রয়ে মুদ্রিত হয়। কবি বালিকাকে স্নেহ করতেন, তাই পিতা ও কন্যার যৌথ আবেদনে ভূমিকা ('আশংসিকা') না লিখে পারেন নি। কবির ভূমিকায় প্রশংসা এবং তিরস্কার দুই-ই ছিল। 'উদিতা' প্রথম প্রকাশকালে তিরস্কারের অংশটুকু সুরেন্দ্রনাথের অনুরোধক্রমে কবি না ছাপাবার অনুমতি দিয়েছিলেন। ('ভূমিকা থেকে সেই অংশটুকু আমার পিতা কবিকে অনুরোধ করে বাদ করিয়ে নিয়েছিলেন'— ভূমিকা 'স্তবক')। কিছুকাল পরে প্রকাশিত লেখিকার 'স্তবক' (১৩৭০) কাব্যগ্রন্থে সেই অপ্রকাশিত অংশটুকু মুদ্রিত হয়েছে সমগ্র ভূমিকা সমেত। কবি চান নি 'উদিতা' প্রকাশিত হোক, চেয়েছিলেন তা পাণ্ডুলিপিতেই আবদ্ধ থাক্। কিন্তু পিতৃস্নেহ বারণ মানে নি। মৈত্রেয়ী দেবী স্বয়ং লিখেছেন— 'বালিকার কাব্যগ্রন্থের অতবড়ো ভূমিকা রচনা করা বিশ্বকবির স্নেহধারারই চিহ্ন, কিন্তু তিনি তখন ঐ গ্রন্থ প্রকাশে আগ্রহী ছিলেন না।' (দ্র. 'স্তবক' কাব্যগ্রন্থ)

প্রসঙ্গক্রমে 'উদিতা'র 'বর্জিত' ভূমিকার অংশবিশেষ এখানে আমরা উল্লেখ করছি :

'মৈত্রেয়ীর কাব্যগুলিকে এখনি সাহিত্যের প্রকাশ্য সভায় ভিড়ের মধ্যে উপস্থিত করা ভালো হলো কি না জানি নে। ... ষোল বছর বয়সের অভিমন্যুকে যুধিষ্ঠির সপ্তরথীব্যূহের মধ্যে পাঠিয়েছিলেন, এটি অবিবেচনার কাজ হয়েছিল তা সপ্রমাণ হয়েছে। আমার সেই কথাই মনে পড়ছে যখন দেখছি বাণ-বর্ষণ-মুখর সাহিত্য-ক্ষেত্রে বালিকার রচনাকে এগিয়ে দেওয়া হচ্ছে, সে রচনায় শক্তির লক্ষণ যতই থাক'। দ্রষ্টব্য, 'উদিতা' সংযোজন অংশ।

২৬

রবীন্দ্রনাথের হৃদয়ের বড়ো কাছের মানুষ যাঁরা ছিলেন, মোহিতচন্দ্র সেন তাঁদের অন্যতম। শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মবিদ্যালয়ের অধ্যাপক, রবীন্দ্রনাথের 'কাব্যগ্রন্থে'র সম্পাদক মোহিতচন্দ্রের কনিষ্ঠা কন্যা উমা সেন (১৯০৪-৩১) ১৩১১ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসে জন্মগ্রহণ করলে নবজাতিকার মঙ্গল প্রার্থনা করে মোহিতচন্দ্রকে রবীন্দ্রনাথ ১৭ ভাদ্র ১৩১১ তারিখে লিখেছিলেন— 'বন্ধু, শুভ ঘটনা উপলক্ষে আমার অভিনন্দন গ্রহণ করিবেন। ঈশ্বর প্রসূতি ও নবকুমারীকে নিরাময় করুন।' ১৯০৬ খৃস্টাব্দের ৯ জুন তারিখে দু'বছরের উমাকে রেখে মোহিতচন্দ্রের মৃত্যু হয়। উমার ডাকনাম বুলা। তাকে সঙ্গে নিয়ে মোহিতচন্দ্রের সহধর্মিণী সুশীলা সেন শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের অচিরস্থায়ী বালিকাবিভাগের তত্ত্বাবধানের কাজে নিযুক্ত হন। ইনিও সাহিত্যপ্রাণা মহিলা ছিলেন। সেকালে 'প্রকৃতি' নামক শিশুপাঠ্য পত্রিকায় তাঁর অনেক কবিতা গল্প প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল।

মায়ের এই সাহিত্যগুণের অধিকারী হয়েছিলেন তাঁর কন্যা উমাও (পরে গুপ্ত)। ইনি রবীন্দ্রনাথের একান্ত স্নেহভাজন হয়ে উঠেছিলেন। 'বাতায়ন' (আখ্যাপত্র : বাতায়ন/ উমাদেবী/১ বৈশাখ, ১৩৩৭।/শ্রীশিশিরকুমার গুপ্ত কর্তৃক/৫৫ নং/কেনাল ঈষ্ট রোড, বেলেঘাটা, কলিকাতা/হইতে প্রকাশিত/১৫ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা,/রায় এম, সি, সরকার বাহাদুর অ্যাণ্ড সন্স-এর পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।/মূল্য এক টাকা।) উমাদেবীর ৪০টি সমিল চতুর্দশপদীর (প্রতি পৃষ্ঠায় একটি করে কবিতা মুদ্রিত) সংগ্রহ। প্রকাশিত হয় ১৩৩৭-এর বৈশাখে। এর পর লেখিকা আর বেশিদিন জীবিত ছিলেন না।

'বাতায়ন' বইটির ভূমিকাটি সংক্ষিপ্ত। লেখিকা বইটির নাম দিয়েছিলেন 'ছায়াছবি'। সে নাম কবির মনঃপূত হয় নি, নামকরণ করেছিলেন 'বাতায়ন'।

প্রসঙ্গত, এই বুলা বা উমাই ছিলেন রবীন্দ্রনাথের প্রেতচর্চার অন্যতম মিডিয়াম।

২৭

আশৈশব কাশীতে শিক্ষালাভের পর ক্ষিতিমোহন সেন (১৮৮০-১৯৬০) যখন চম্বারাজ্যে শিক্ষাবিভাগে কর্মরত তখন রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে ১৯০৮ খৃস্টাব্দে শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয়ে অধ্যাপনাকার্যে যোগ দেন এবং বিশ্বভারতী বিদ্যাভবনের অধ্যক্ষরূপে কর্মজীবন সমাপ্ত করেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর সংযোগের ইতিহাস ভিন্ন প্রবন্ধ রচনার অপেক্ষা রাখে।

তরুণ বয়সেই ক্ষিতিমোহন ভারতীয় মধ্যযুগের ধর্মসাধনার প্রতি আকৃষ্ট হন। ১৮৯৫ সাল নাগাদ কাশীতে তিনি সাধু-সন্তদের সঙ্গে মেলা-মেশা করার সুযোগ পান। পরে 'বিশ্বভারতী আসর রচনা করিয়া' দিলে তিনি 'শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথের কাছে অশেষ

উৎসাহ ও সহায়তা পেয়ে সাহিত্য-সংগ্রহ ব্যাপারে নিযুক্ত হন।' তাঁর মনে হয়েছিল, '... যদি ভারতের মধ্যযুগের সাধনার প্রকৃত ইতিহাস জানিতে হয় তবে এই-সব সাধুদের কাছে মধ্যযুগের সাধনার বাণী তত্ত্ব ও ইতিহাস সংগ্রহ না করিলে আর কোনো গতি নাই।'

'সেই-সব বাণীর প্রতি' কবিগুরুর 'অনুরাগ ও উৎসাহ' গ্রন্থকারকে 'ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা' (আখ্যাপত্র : ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা/(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯২৯ খৃস্টাব্দের 'অধর মুখার্জি' লেক্‌চর)/[কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয় লিখিত ভূমিকা সহ]/শ্রীক্ষিতিমোহন সেন,/অধ্যাপক, বিদ্যাভবন, বিশ্বভারতী/কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে/প্রকাশিত/১৯৩০।) গ্রন্থরচনায় উৎসাহী করে তুলেছিল। দুটি বক্তৃতা সংবলিত ১২১ পৃষ্ঠার এই বইটিতে রবীন্দ্রনাথের 'লিখিত একটি ভূমিকা ... বক্তৃতা প্রারম্ভে আশীর্বাদের মতো সন্নিবিষ্ট' হয়েছে।

কবির ভূমিকা রচনার তারিখ ও স্থান—১২ পৌষ ১৩৩৬, শান্তিনিকেতন।

২৮

'কালিদাসের গল্প' বইয়ের (আখ্যাপত্র : কালিদাসের গল্প/শ্রীরঘুনাথ মল্লিক এম. এ./ বিরচিত/প্রবাসী প্রেস/১২০।২ আপার সার্কুলার রোড/কলিকাতা/১৩৩৮।) লেখক রঘুনাথ মল্লিক এম. এ. পড়তে গিয়ে 'ছেলেদের রঘুবংশ' নামে একটি বই লেখেন। এই প্রচেষ্টা থেকেই 'প্রাংশুলভ্য ফলে লোভাদুদ্বাহু' (নিবেদন) বামনের মতো তিনি এই বই লিখেছেন। 'তবে এই পুস্তকের ভূমিকায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ যখন বলিয়াছেন ইহাই "যথালাভ" তখন সাধারণেও ইহা পড়িয়া অন্তত যদি বলেন "যথালাভ" তাহা হইলেই আমার সকল পরিশ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।'

লেখকের (১৮৯৭-১৯৭৯) এই 'নিবেদন' অংশ থেকে আরো জানতে পেরেছি, তিনি ছিলেন 'মল্লিকস্ লজ'-এর অধিবাসী এবং তাঁর নিবেদন রচনার তারিখ জন্মাষ্টমী ১৮ ভাদ্র ১৩৩৮। তেরো আনা + ২৭৬ পৃষ্ঠার এই বইটিতে কুমারসম্ভব, রঘুবংশ, নলোদয়, মেঘদূত, বিক্রমোর্বশী, মালবিকাগ্নিমিত্র, অভিজ্ঞান-শকুন্তলা থেকে বিষয়ানুযায়ী একটি করে ছবি এঁকেছিলেন প্রখ্যাত শিল্পী ভবানীচরণ লাহা। এর একটি ইংরেজি অনুবাদও প্রকাশিত হয় *Stories from Kalidasa* নামে। অন্য বই 'কালিদাস প্রতিভা' তাঁকে পিএইচ. ডি. উপাধি এনে দেয়। এই সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত স্বাধীনতা সংগ্রামীও ছিলেন। কালিদাসের সমগ্র রচনা তিনি বাংলা ও ইংরেজিতে অনুবাদ করেন।

২৯

রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠা কন্যা মীরার সঙ্গে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজভুক্ত প্রিয়দর্শন যুবক নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের বিবাহ হয় ২৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৪ তারিখে। বিবাহের পর নগেন্দ্রনাথ শ্যালক রথীন্দ্রনাথের মতোই রবীন্দ্রনাথের আগ্রহে কৃষিবিদ্যা আয়ত্ত করার জন্য আমেরিকা যান। ফিরে এসে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি-অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করেন।

১৩৩৮ সালের আশ্বিন মাসে নগেন্দ্রনাথ 'জাতীয় ভিত্তি' (আখ্যাপত্র : জাতীয় ভিত্তি/(পল্লী-সংস্কার সমস্যার আলোচনা)/অধ্যাপক-শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়/(বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিত ভূমিকা সহ)/প্রকাশক প্রফুল্ল রায়/পি ৪৯, লেক্ রোড, কলিকাতা।/১৩৩৮) নামে পল্লীজীবনের সমস্যা বিষয়ক একটি উপাদেয় গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থে ৮টি প্রস্তাব আছে এবং গ্রন্থশেষে ১৯৪টি প্রশ্নসহ একটি সুদীর্ঘ প্রশ্নমালা ফর্মের (form) আকারে মুদ্রিত আছে— যার সদুত্তর পাওয়া গেলে গ্রাম-জীবন সম্পর্কে একটা ধারণা গড়ে ওঠে। এই-সব প্রশ্নে— ভৌগোলিক তথ্য, জনসংখ্যা, জমির অবস্থা ও ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়-সংক্রান্ত। গ্রন্থে নগেন্দ্রনাথ 'পশ্চিমের অনুকরণে এ দেশে... প্রতিনিধিমূলক শাসনপ্রথার প্রয়োগের ব্যর্থতা সম্বন্ধে আলোচনা করেন এবং পল্লীসমাজ বা গ্রামের সংঘশক্তির উপর রাষ্ট্রশাসনের পত্তন কেন' করতে হবে সে-বিষয়ে যুক্তিসহ আলোচনা করেন।

রবীন্দ্রনাথ এই গ্রন্থের যে ভূমিকা লিখে দেন সে প্রসঙ্গে গ্রন্থকর্তা ৯ আশ্বিন ১৩৩৮ তারিখে লিখিত 'নিবেদনে' বলেছেন— 'পরমপূজনীয় বিশ্ববরেণ্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বইখানির ভূমিকা লিখে আমাকে উৎসাহিত করেছেন, এজন্য আমি তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। ... রবীন্দ্রনাথ সমবায়ের যে আদর্শ উপস্থিত করেছেন, তার মূলে আছে শুভবুদ্ধি, খাঁটি স্বদেশপ্রীতি ও মনুষ্যত্বের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা।'

৩০

বঙ্গীয় সাহিত্যপাঠকগণের কাছে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর (১৮৫৩-১৯৩১) বিস্তারিত পরিচয় প্রদান অপ্রয়োজনীয়। 'চর্যাগীতিকোষে'র আবিষ্কারক, 'কাঞ্চনমালা ও বেনের মেয়ে' উপন্যাসের রচয়িতা এবং ভারতবিদ্যাচর্চার বহুতর নিবন্ধের লেখক হরপ্রসাদের নাম রবীন্দ্রনাথ প্রথম শুনেছিলেন ভারততত্ত্ববিদ্ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের কাছে। শোনা অবধি তিনি শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রতি সশ্রদ্ধ ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের বয়োজ্যেষ্ঠ এই মনীষী তাঁর প্রথম দিকের রচনাতেই রবীন্দ্রনাথকে অঙ্গীকার করেছিলেন। ঠাকুরবাড়িতে যে 'বিদ্বজ্জন-সমাগম' সভা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল

সেই সভায় নানা গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীও এসেছিলেন। তরুণ সাহিত্যিক হরপ্রসাদের 'বাল্মীকির জয়' রচনাটি ধারাবাহিকভাবে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় (পৌষ, মাঘ ও চৈত্র ১২৮৭) প্রকাশিত হওয়ার পর সেটি যখন গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় (১৭ ভাদ্র ১২৮৮) তখন 'বঙ্গদর্শন'-এর আশ্বিন ১২৮৮ সংখ্যায় (পৃ. ২৮) বইটির সমালোচনা প্রসঙ্গে নামহীন সমালোচক (বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং?) লেখেন— 'যাঁহারা বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বাল্মীকি-প্রতিভা' পড়িয়াছেন বা তাঁহার অভিনয় দেখিয়াছেন, তাঁহারা কবিতার জন্মবৃত্তান্ত কখনো ভুলিতে পারিবেন না। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এই পরিচ্ছেদে রবীন্দ্রবাবুর অনুগমন করিয়াছেন।' প্রসঙ্গত, বাল্মীকির জয় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশকালে রবীন্দ্রনাথের 'বাল্মীকি-প্রতিভা' প্রকাশিত হয় নি। কিন্তু 'বাল্মীকি-প্রতিভা' প্রকাশের (ফাল্গুন ১২৮৭) পর যখন হরপ্রসাদ গ্রন্থাকারে মুদ্রণের পূর্বে 'বাল্মীকির জয়' পরিবর্ধিত ও সংশোধিত করেন, তখন এই 'অনুগমন' ঘটেছিল।

আবার হরপ্রসাদের জীবনের অন্তে কবি ১ ডিসেম্বর ১৯৩২ তারিখে হরপ্রসাদের মৃত্যু সংবাদ শুনে ব্যথিত হন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে হরপ্রসাদের যে স্মৃতিবাসর অনুষ্ঠিত হয় (৬ ডিসেম্বর) রবীন্দ্রনাথ তাঁর শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে সেখানে একটি চিঠি পাঠান (দ্র. 'বিচিত্রা' পৌষ ১৩৩৮, পৃ. ৮৪৭)।

উল্লেখযোগ্য যে, এ সময়ে রবীন্দ্রনাথের জয়ন্তী উৎসবের আহ্বানলিপিতে হরপ্রসাদ স্বাক্ষর করেছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথের ৬০ বৎসর পূর্তির সময়ে সাহিত্য পরিষদ -প্রদত্ত অভিনন্দন বাণী পাঠ করেছিলেন হরপ্রসাদ।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ৭৫তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ভারত-তত্ত্ববিদ্‌দের কাছ থেকে লেখা সংগ্রহ করে যে 'হরপ্রসাদ-সংবর্দ্ধন লেখামালা'র প্রথম খণ্ড প্রকাশ করে, শাস্ত্রী মহাশয় তা দেখে গিয়েছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের (১৯৩২) পূর্বেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। এই লেখামালাটি সম্পাদনা করেন নরেন্দ্রনাথ লাহা এবং সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় যৌথভাবে। রবীন্দ্রনাথ এই দ্বিতীয় খণ্ডের জন্য যে মূল্যবান ভূমিকাটি রচনা করে দেন, তা হরপ্রসাদের জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মূল্যায়ন।

৩১

নোবেল প্রাইজ-প্রাপ্তি উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় (১৮৬৪-১৯২৪) তথা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যক্ষ সংযোগ ঘটে। জগত্তারিণী পদক গ্রহণোপলক্ষে সমাবর্তনে উপস্থিত হলে তাঁদের মধ্যে যোগাযোগ ঘনিষ্ঠতর হয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাভাষা পঠন-পাঠনকে কেন্দ্র করে উভয়ের যোগ আরো নিবিড় হয়। ১৯২৪ সালে, আশুতোষের মৃত্যুর অল্প কিছুদিন আগে, রবীন্দ্রনাথ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রিডারশিপ (বাংলায় এই প্রথম) বক্তৃতা প্রদানকালে আশুতোষের আরো

সংযোগে আসেন। জ্ঞান ও কর্মের ক্ষেত্রে, নানা বিভিন্নতা সত্ত্বেও উভয়ের মধ্যে আত্মিক যোগ সংস্থাপিত হয়েছিল। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য এই সম্পর্কের সেতুবন্ধন করেছিল।

আশুতোষের এই জাতীয় প্রীতির পরিচয় আছে তাঁর 'জাতীয় সাহিত্য' গ্রন্থে (রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় -প্রকাশিত ২য় সংস্করণের আখ্যাপত্র : জাতীয় সাহিত্য/স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়/কলিকাতা/১৯৩৬, প্রথম প্রকাশ ১৯৩২)। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সংক্ষিপ্ত অথচ সরল ভূমিকায় আশুতোষের প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। গ্রন্থে সংকলিত প্রবন্ধসমূহ— ভারতীয় সাহিত্যের ভবিষ্যৎ, কৃত্তিবাস, মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত, জাতীয় সাহিত্যের উন্নতি, বঙ্গসাহিত্যের ভবিষ্যৎ।

৩২

সাহিত্যের 'সাত সমুদ্রের নাবিক' প্রিয়নাথ সেন (১৮৫৪-১৯১৬) রবীন্দ্রনাথের চেয়ে ৬/৭ বছরের বড়ো ছিলেন। যৌবনের সূচনা থেকেই উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা সূচিত হয়। কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী যথার্থ-ই লিখেছেন— 'রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তাঁহার যে কি ধারণা, কতখানি দরদ তাহা লিখিয়া বোঝান শক্ত।... তাঁহার কত কিছু বলিতে বলিতে সেই স্বল্পভাষী গম্ভীরবেদী পুরুষ একেবারে উন্মত্ত হইয়া উঠিতেন।'

প্রিয়নাথ সেনের মৃত্যুর পর পুত্র প্রমোদনাথ সেন পিতার রচনাবলী একত্র করে 'প্রিয় পুষ্পাঞ্জলি' (সূচীপত্র— কাব্যকথা, মানসী, চিত্রাঙ্গদা, সনেট্ পঞ্চাশৎ, অলীকবাবু, রস্কিন্, গীদে মোপাসাঁ, স্বর্গীয় বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ফলিত জোতিষ, সুলোচনা, স্বপ্নপ্রয়াণ, এবং পরিশিষ্ট) নামে ১৩৪০ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে প্রকাশ করেন। কবি এই গ্রন্থের ভূমিকা রচনা করেন ২৯ আষাঢ় ১৩৪০ তারিখে শান্তিনিকেতন বাসকালে।

৩৩

ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় এবং চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের সম্পাদিত বাংলা কবিতার সংগ্রহ-গ্রন্থ 'বঙ্গবীণা' (আখ্যাপত্র : বঙ্গবীণা/শ্রীললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়/ও/শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়/প্রকাশক ইন্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড/এলাহাবাদ/১৯৩৪) বইটি উৎসর্গ করেন রবীন্দ্রনাথকেই। উৎসর্গ-পত্রে লেখা হয়েছিল— 'যাহার মোহন অঙ্গুলি স্পর্শে বঙ্গবীণার স্বর্ণতন্ত্রীতে সর্বাপেক্ষা সুমধুর ঝঙ্কার রণিত হইয়াছে, সেই কবিশ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথের করকমলে'। বইটিতে সংকলকদের ভূমিকায় লেখা হয়েছিল : 'কবীন্দ্র

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এই কাব্য-সঞ্চয়নের পরিচয় লিখিয়া দিয়া এই পুস্তককে গৌরবান্বিত করিয়াছেন।'... ফ + ৫৫৮ পৃষ্ঠার এই বৃহৎ সংকলন-পুস্তকে ২৯২টি কবিতা (রামাই পণ্ডিত থেকে বলেন্দ্রনাথ পর্যন্ত) সংকলিত হয়। ছবি এঁকেছিলেন অসিতকুমার হালদার এবং দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী।

ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় ছিলেন শান্তিনিকেতনের 'বড়মা' নামে খ্যাত হেমলতাদেবীর (দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র দ্বিপেন্দ্রনাথের দ্বিতীয়া পত্নী) পিতা। তিনি ছিলেন একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। ললিতমোহনের পিতা শ্যামলাল চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে রামমোহনের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধাপ্রসাদ রায়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা চন্দ্রজ্যোতি দেবীর বিবাহ হয়। ললিতমোহন দুই পুত্র মোহিনীমোহন এবং রমণীমোহনের সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দুই কন্যা সরোজাসুন্দরী এবং ঊষাবতীর বিবাহ হয়েছিল। অন্য পুত্র রজনীমোহন বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভগ্নী শিল্পী সুনয়নীদেবীর সঙ্গে।

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৭-১৯৩৮) আকৈশোর সাহিত্যচর্চা করে গেছেন। ইন্ডিয়ান প্রেস এবং ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউসের সঙ্গে কর্মসূত্রে যুক্ত থেকে তিনি অনতিকাল মধ্যে প্রকাশনা ও সম্পাদনার কাজে একটি নতুন রুচিবোধ সৃষ্টি করেন। ১৩১৬-৩১ পর্যন্ত প্রবাসী পত্রিকার সহ-সম্পাদকরূপে যুক্ত থাকেন। পরম রবীন্দ্রানুরাগী চারুচন্দ্র সুখ্যাত হয়ে আছেন তাঁর 'রবিরশ্মি' দুই খণ্ডের জন্য। এ ছাড়া কথাসাহিত্যেও তাঁর যথেষ্ট অধিকার ছিল।

লক্ষ্য করার বিষয়, রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভূমিকাকে 'পরিচয়' নাম দিয়েছেন। বিশ্বভারতী গ্রন্থাগারে এই বইয়ের যে কপি আছে, তা রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেছিলেন বলে অনুমান করি। তিনি যখন 'বাংলা কাব্য পরিচয়' (১৩৪৫) প্রকাশ করেন, তখন সম্ভবত এই বইটির সহায়তা গ্রহণ করেছিলেন।

৩৪

ক্ষিতিমোহনের একটি বইয়ের ভূমিকা সম্পর্কে আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। রবীন্দ্রনাথের একই লেখকের একাধিক বইয়ের ভূমিকা রচনার এটি একটি নিদর্শন।

পূর্ববর্তী গ্রন্থে (ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা) ভারতীয় সাধুসন্তদের প্রতি ক্ষিতিমোহনের আগ্রহের বিষয় জেনেছি। কবীর, দাদূ প্রভৃতি সন্তদিগের জীবন ও বাণীর সমাহার ক্ষিতিমোহনের অন্যতম সাহিত্যিক কর্তব্য ছিল। প্রধানত তাঁরই সূত্রে রবীন্দ্রনাথ এঁদের জীবন ও বাণীর সঙ্গে পরিচিত হয়ে বিভিন্ন প্রস্তাবে তাঁর মর্মব্যাখ্যা করেন। ক্ষিতিমোহনের সংগৃহীত কবীর বাণী সংগ্রহ অবলম্বনেই তিনি *One Hundred Poems of Kabir* সম্পাদনাপূর্বক প্রকাশ করেন।

ক্ষিতিমোহন-রচিত 'দাদূ' (আখ্যাপত্র : দাদূ/ক্ষিতিমোহন সেন/প্রথম সংস্করণ বৈশাখ ১৩৪২/মূল্য ৪/শান্তিনিকেতন প্রেস, শান্তিনিকেতন (বীরভূম)/প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত) এই ধরনের একটি সঞ্জীবনী। প্রায় পৌনে সাতশো পৃষ্ঠাব্যাপী এই বিশাল গ্রন্থের ১-১০ পৃষ্ঠার অংশে রবীন্দ্র-রচিত ভূমিকাটি মুদ্রিত হয়েছে। এখানে স্মরণযোগ্য যে ভূমিকাটি গ্রন্থে সংযুক্ত হবার আগে 'প্রবাসী' পত্রিকার ভাদ্র ১৩৩২ সংখ্যায় মুদ্রিত হয়েছিল 'মরমিয়া' নামে। বইটি ক্ষিতিমোহন রবীন্দ্রনাথকেই উৎসর্গ করেছিলেন।

ভূমিকায় কবি প্রসঙ্গক্রমে আশা করেছিলেন যে ক্ষিতিমোহন 'বাংলা ভাষার গুহা থেকে বাউলদের ... সুবর্ণরেখার বাণীধারাকে প্রকাশ করেন যার মধ্যে সোনার কণা লুকিয়ে আছে।' কবির মৃত্যুর পর সেই আশা পূরণ হয়েছিল। 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'র বিভিন্ন সংখ্যায় (শ্রাবণ-আশ্বিন, কার্তিক-পৌষ, মাঘ-চৈত্র ১৩৬২, শ্রাবণ-আশ্বিন, কার্তিক-পৌষ ১৩৫৭, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৫৮ এবং বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৬৩) ক্ষিতিমোহনের বাংলার বাউল বিষয়ক রচনাগুলি প্রকাশিত হয়।

৩৫

প্রেসিডেন্সি কলেজ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র স্বগুণখ্যাত কাজী আবদুল ওদুদ সাহেবের (১৮৯৬-১৯৭০) প্রথম কর্মজীবন অতিবাহিত ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজে; সমাপ্ত হয় কলকাতায় টেক্সট বুক কমিটির সেক্রেটারি হিসাবে। বি. এ. ক্লাসে সংস্কৃত ছিল তাঁর অন্যতম পাঠ্য বিষয়, উর্দু তিনি শিখেছিলেন পাঠক্রমের বাইরে। উদারচিত্ত এই মানুষটির প্রতি রবীন্দ্রনাথের গভীর আকর্ষণ ছিল। ইতিপূর্বে ওদুদ সাহেবের 'রবীন্দ্র-কাব্য পাঠের ভূমিকা' (১৯২৭) গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ায় তিনি কবির স্নেহদৃষ্টির সামীপ্য লাভ করেন।

১৯৩৫ খৃস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে প্রায় একমাস ধরে কবি উত্তর-পশ্চিম ভারত ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। এ সফরে তিনি হিন্দু-মুসলমানদের দুঃসহ ভেদবুদ্ধি লক্ষ্য করে পীড়িত হন এবং অমিয় চক্রবর্তীকে ৭.৩.১৯৩৫ (প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এই তারিখকে ২৭ মার্চ অনুমান করে একটি ভ্রমাত্মক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, দ্রষ্টব্য রবীন্দ্রজীবনী, ৪র্থ খণ্ড, ১৩১৭ সংস্করণ, পৃ. ৮) তারিখে লেখেন— 'পাঞ্জাবে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে যে বিচ্ছেদের ছবি দেখে এলুম তা অত্যন্ত দুশ্চিন্তাজনক এবং লজ্জাকররূপে অসভ্য। বাংলার অবস্থা তো জানোই— এখানে উভয় পক্ষের বিকৃত সম্বন্ধের ভিতর দিয়ে প্রায়ই যে-সব বীভৎস অত্যাচার ঘটচে তাতে কেবল অসহ্য দুঃখ পাচ্চি তা নয়, আমাদের মাথা হেঁট করে দিলে।' (চিঠিপত্র একাদশ খণ্ড)।

বিক্ষুব্ধ-চিত্ত কবি এ বিষয়ে শিক্ষিত মুসলমানদের মনোভাব জানার জন্য কাজী সাহেবকে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ ও তার প্রতিকার বিষয়ে একটি বক্তৃতা দানের

জন্য আমন্ত্রণ জানান। 'নিজাম বক্তৃতা' হিসাবে নির্দিষ্ট এই বক্তৃতা প্রদানের জন্য ওদুদ সাহেব ২৬, ২৭, ২৮ মার্চ ১৯৩৫ শান্তিনিকেতনে উপস্থিত থাকেন। বক্তৃতার তিনটি ভাগ— মুসলমাননের পরিচয়, দেশের জাগরণ এবং ব্যর্থতার প্রতিকার। কবি স্বয়ং উপস্থিত থেকে বক্তৃতা শুনতেন। পরে বক্তৃতাটি Visva-Bharati Studies Series-এর ৬-সংখ্যক গ্রন্থ হিসাবে প্রকাশিত হয়। ওদুদ সাহেব এই বিষয়টি পরে তাঁর 'বাংলার জাগরণ' ও 'শাশ্বত বঙ্গ' গ্রন্থদ্বয়েও আলোচনা করেন।

'হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ' নামে গ্রন্থটি (আখ্যাপত্র : Visva-Bharati Studies no. 6 / হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ / [বিশ্বভারতীতে প্রদত্ত নিজাম বক্তৃতা, ১৯৩৫]/ কাজী আবদুল ওদুদ/ লেক্‌চারার, ঢাকা ইন্টার মিডিয়েট কলেজ। / বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় / ২১০ নং কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট, কলিকাতা।) প্রকাশিত হলে কবি সানন্দে এই ভূমিকা রচনা করে দেন।

৩৬

১৩২২ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত 'ফাল্গুনী' নাটকটি তাঁর 'সকল গানের ভাণ্ডারী' দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে (১৮৮২-১৯৩৫) উৎসর্গ করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—'যাহারা ফাল্গুনীর ফল্গু নদীটিকে বৃদ্ধ কবির চিত্ত মরুর তলদেশ হইতে উপরে টানিয়া আনিয়াছে তাহাদের এবং সেই সঙ্গে সেই বালকদের সকল নাটের কাণ্ডারী আমার সকল গানের ভাণ্ডারী শ্রীমান দিনেন্দ্রনাথের হস্তে এই নাট্য কাব্যটিকে কবি বাউলের একতারার মতো সমর্পণ করিলাম।'

কবি এখন মধ্যপঞ্চাশ, ভ্রাতুষ্পুত্র দ্বিপেন্দ্রনাথের পুত্র দিনেন্দ্রনাথ চৌত্রিশ। এই দিনেন্দ্রনাথের পঞ্চাশৎ জন্মোৎসব উপলক্ষে কবি বলেছিলেন সেই একই সুরে :

রবির সম্পদ হত নিরর্থক, তুমি যদি তারে
না লইতে আপনার করি, যদি না দিতে সবারে।

দিনেন্দ্রনাথের যা-কিছু আনন্দ-সুখ রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে, আপনার সত্তা বিলোপ করে। এই দিনেন্দ্রনাথের মৃত্যু হয় ৫ শ্রাবণ ১৩৪২ তারিখে। কবি তখন শান্তিনিকেতনে বিচিত্র তপস্যায় মগ্ন। টেলিগ্রাম এল 'দিনু নেই'।

এই মৃত্যু স্বভাবতই কবিকে বেদনাহত করে। ৫ শ্রাবণ কবি মন্দিরে এক ভাষণদান কালে বলেন— '... আমার কবি-প্রকৃতিতে আমি যে দান করেছি, সেই গানের বাহন দিনেন্দ্র ... আশ্রমের ইতিহাসে তাঁর কথা ভুলবার নয়।' দিনেন্দ্রনাথ কবি-কৃত বিচিত্র সুরসম্ভার অবিকৃতভাবে ধরে রাখতে পারতেন অত্যাশ্চর্য নিপুণতায়। কবি সুর-সৃষ্টির পর মুহূর্তেই আপন সৃষ্ট সুরকে ততোধিক নিষ্ঠুরভাবে বিস্মৃত হয়ে যেতেন।

দিনেন্দ্রনাথেরও একটা কাব্যজীবন ছিল, সেটি বরাবর নেপথ্যে থেকে গেছে। ছোট্ট একটি বই 'বীণ' তিনি নাকি ছেলেবেলায় 'দুর্মতিবশতঃ' ছাপিয়েছিলেন। বড়ো

হয়ে তাই যখন তাঁর 'সুমতি' হয়েছিল, শান্তিনিকেতনে যত 'বীণ' ছিল— একত্রিত করে আগুন ধরিয়ে দেন। নির্মোহ, যশোবিমুখ এক নিবেদিত জীবন।

তাঁর মৃত্যুর পর কিছু কবিতা, গান, স্বরলিপি, দুটি প্রবন্ধ আর অন্যান্য কিছু রচনা নিয়ে 'দিনেন্দ্র-রচনাবলী' (আখ্যাপত্র : দিনেন্দ্ররচনাবলী/দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর/প্রণীত/মূল্য ১।।০ /[পর পৃষ্ঠায়] প্রকাশিকা— শ্রীকমলা দেবী ঠাকুরাণী; ৪ বকুলবাগান রো,/ভবানীপুর, কলিকাতা/১৩৪৩/প্রিন্টার— শ্রীফণিভূষণ রায়/প্রবর্তক প্রিন্টিং ওয়ার্কস/৬১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা) তাঁর স্ত্রী কমলাদেবী 'প্রকাশ করা উচিত কি অনুচিত' বুঝতে না পেরেই ছাপিয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ এই গ্রন্থের একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকা রচনা করেন ১ ভাদ্র ১৩৪৩ তারিখে। এতে তিনি কবিজীবনে দিনেন্দ্রনাথের স্থান ও তাঁর সাহিত্যগুণের সার কথাগুলিকে অনবদ্য ভাষায় বিবৃত করেন। ভূমিকাটিকে আমরা কবির কৃতজ্ঞচিত্তের উপহার বলে গ্রহণ করতে পারি।

৩৭

যোগীন্দ্রনাথ সরকার (১৮৬৬-১৯৩৭) -সম্পাদিত 'গল্প সঞ্চয়' (তৃতীয় সংস্করণের আখ্যাপত্র : ডিরেক্টর মহোদয় কর্তৃক প্রাইজ ও লাইব্রেরির জন্য অনুমোদিত/গল্প সঞ্চয়/পরিচয়-পত্র লিখিয়াছেন/রবীন্দ্রনাথ/সম্পাদক/যোগীন্দ্রনাথ সরকার/সিটি বুক সোসাইটি/৬৪ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা/তৃতীয় সংস্করণ তিন টাকা বারো আনা) প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৩৬ খৃস্টাব্দে। এই গল্প সংকলনে শরৎচন্দ্র, উপেন্দ্রকিশোর, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রমুখ ২৭জন লেখকের ২৮টি গল্প সংকলিত আছে। প্রত্যেক লেখকের একটি করে গল্প, কেবল রবীন্দ্রনাথের দুটি— ইচ্ছাপূরণ ও কাবুলিওয়ালা। প্রতিটি গল্পই সচিত্র। রবীন্দ্রনাথের সংক্ষিপ্ত ভূমিকাটি (পরিচয়পত্র) হস্তলিপির চিত্ররূপে মুদ্রিত।

শিশুসাহিত্যিক হিসাবে যোগীন্দ্রনাথের পরিচয় প্রদান বাহুল্যমাত্র। তাঁর 'হাসিখুশী' না পড়ে বড়ো হয়েছেন, এমন শিক্ষিত বয়স্ক মানুষ বঙ্গদেশে বিরল। ব্যক্তিগত পরিচয়ে তিনি প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের মাতুল এবং নলিনীরঞ্জন সরকারের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। এক পূজার পূর্বে তিনি শিশুদের হাতে তৎকালীন বাংলার শিশুসাহিত্যিকদের কয়েকটি রচনা তুলে দিতে চেয়েছিলেন। এই পরিকল্পনা জানিয়ে কবিকে অনুরোধ জানালে রবীন্দ্রনাথ প্রশান্তচন্দ্রের বরাহনগরের নবনির্মিত বাড়িতে বসে এই ভূমিকাটি লিখে দিয়েছিলেন।

৩৮

প্রিয়ম্বদা দেবী (১৮৭১-১৯৩৫) ছিলেন কবি প্রসন্নময়ী দেবীর কন্যা এবং হরিপুরের বিখ্যাত চৌধুরী পরিবারের দুর্গাদাস চৌধুরীর দৌহিত্রী। প্রমথ চৌধুরী ছিলেন প্রিয়ম্বদার মাতুল। জন্মদুঃখী প্রিয়ম্বদা পিতা, স্বামী এবং একমাত্র পুত্রকে অল্প বয়সে হারিয়ে এক উৎসর্গীকৃত জীবন নিয়ে সাহিত্যের নানা সেবায় নিজেকে যুক্ত করেন। রেণু, তারা, পত্রলেখা, অংশু প্রভৃতি কাব্যের লেখিকা প্রিয়ম্বদার 'চম্পা ও পাটল' নামক ক্ষুদ্র (৩৮ পৃষ্ঠার) কাব্যগ্রন্থটি তাঁর মৃত্যুর চার বছর পর ১৯৩৯ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য প্রিয়ম্বদার চারটি কবিতা রবীন্দ্রনাথের 'লেখন' কাব্যগ্রন্থে ভ্রমক্রমে স্থান পেয়ে যায়। প্রিয়ম্বদা কবির দৃষ্টি তার প্রতি আকৃষ্ট করলে কবি ভুল বুঝতে পারেন। তার আগে তিনি প্রিয়ম্বদার কবিতাগুলিকে যে নিজের কবিতা হিসাবেই গ্রহণ করেছিলেন অন্যের কবিতা বলে না চিনতে পেরে, তা থেকেই প্রমাণিত হয় প্রিয়ম্বদার কাব্যপ্রতিভা। কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (দেশ, সাহিত্য সংখ্যা ১৩৭৩, 'প্রসন্না, প্রিয়ভাষিণী', পৃ ১০৮) তাঁর কবিতাকে বলেছেন 'নম্র একটি শোকাঞ্জলি'। এই 'নম্রতা'ই রবীন্দ্রনাথকে প্রিয়ম্বদার 'চম্পা ও পাটল' কাব্যগ্রন্থের একটি অনাস্বাদিতপূর্ব সংক্ষিপ্ত ভূমিকা রচনায় উদ্‌বুদ্ধ করেছিল। ভূমিকাটি কবির হস্তাক্ষরে গ্রন্থে মুদ্রিত হয়েছে।

৩৯

প্রমথ চৌধুরীর (১৮৬৮-১৯৪৬) 'প্রাচীন হিন্দুস্থান' প্রবন্ধ সংগ্রহ 'লোকশিক্ষা' গ্রন্থমালার দ্বিতীয় গ্রন্থ (প্রথম গ্রন্থ রবীন্দ্রনাথের 'বিশ্বপরিচয়') হিসাবে প্রকাশিত হয় ১ জুলাই ১৯৩৯ তারিখে। দুই আনা + ১১৭ পৃষ্ঠার এই বইটিতে দুটি দীর্ঘ প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে—ভূ-বৃত্তান্ত এবং ইতিবৃত্তান্ত। বলা প্রয়োজন, প্রবন্ধ দুটি ইতোপূর্বে প্রকাশিত লেখকের 'নানাচর্চা' (১৯৩২) গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'ভারতবর্ষের জিওগ্রাফি' এবং 'অণু-হিন্দুস্থান' প্রবন্ধদ্বয়ের সংক্ষিপ্ত ও সংশোধিত রূপ।

৪০

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পশুপতি ভট্টাচার্যের (১৮৯১-১৯৭৮) প্রথম পরিচয় নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তির সমসাময়িক কালে। প্রমথ চৌধুরীর সহায়তায় তিনি কবির সঙ্গে পরিচিত হলে কবি তাঁকে তাঁর কাছে মাঝে মাঝে আসার নিমন্ত্রণ করেন। ডাক্তারি পাস করার পর কবির অনুরোধে দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁক গান শোনাতেন। 'একদিন তিনি কথায় কথায়

বললেন, ডাক্তারি বিদ্যায় যা তুমি শিখলে, বাংলায় সে-সব কথা লেখ না কেন? বহুদিন পর কবি আবার সেই অনুযোগ করলেন— 'তুমি বাংলায় কিছু লিখলে না হে?' কিছুকাল পরে ডা. পশুপতি ভট্টাচার্য বাংলায় চিকিৎসা-সম্পর্কিত কিছু প্রবন্ধ রচনা করে সাহস ভরে ডাকযোগে বোলপুরে কবির কাছে পাঠিয়ে দেন। পরে দেখা হলে কবি বলেন— 'এবার এগুলো ছাপিয়ে ফেল। ... বইখানার নাম দাও—'ভারতীয় ব্যাধি'। আমি তোমার বইয়ের ভূমিকা লিখে দেব।' তার কিছুদিন পরেই কবি উপযাচক হয়ে মস্ত বড়ো— (দ্রষ্টব্য, 'ডাক্তারের দুনিয়া'— পশুপতি ভট্টাচার্য) আটপৃষ্ঠাব্যাপী ভূমিকা লিখে পাঠিয়ে দেন। এটিই পশুপতি ভট্টাচার্যের 'ভারতীয় ব্যাধি ও আধুনিক চিকিৎসা' প্রথম খণ্ডের ভূমিকা (আখ্যাপত্র : ভারতীয় ব্যাধি/ও/আধুনিক চিকিৎসা/(প্রথম খণ্ড)/শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য ডি. টি. এম্/সংকলিত/প্রকাশক/দি বুক কোম্পানী লিমিটেড/ ৪/৩বি কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।) 'দুর্গাচরণ চক্রবর্তী রায় সাহেব'-কে উৎসর্গীকৃত এই বিশাল বইয়ের পৃষ্ঠা সংখ্যা দশ আনা + ছয় আনা + ১-৭২৭ + [২৬]। বইটির মুখপত্র লিখে দিয়েছিলেন স্বনামখ্যাত চিকিৎসক নীলরতন সরকার (১৮৬১-১৯৪৩)। লেখক তাঁর ভূমিকায় বহু ব্যক্তির কাছে তাঁর ঋণ স্বীকার প্রসঙ্গে লিখেছেন (২৫ এপ্রিল ১৯৩৬)— 'পূজনীয় রবীন্দ্রনাথ বহুদিন হইতে আমাকে উৎসাহ দিয়া আসিয়াছেন, এবং এ সম্বন্ধে প্রথম প্রেরণা তাঁহার নিকটেই পাইয়াছি।' ডা. বিধানচন্দ্র রায়ের সহকারী পশুপতিবাবুর অন্যান্য গ্রন্থ দেহরক্ষণা, ডাকের চিঠি, দুই নৌকা, পদব্রজ, অন্তগামী চাঁদ প্রভৃতি। তিনি অরবিন্দ-ভক্তও ছিলেন।

৪১

সুকুমার রায় (১৮৮৭-১৯২৩) সম্পর্কে বাঙালি পাঠককে সবিশেষ অবহিত করা নিষ্প্রয়োজন। ১৯১২ খৃস্টাব্দে বিলাত যাবার আগে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের যে-সব তরুণ সভ্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে তার মধ্যে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর পুত্র সুকুমার রায় (তাতাবাবু নামেই অধিক পরিচিত) তাঁদের মধ্যে অন্যতম। বিলাত বাসকালে এই ঘনিষ্ঠতা আরো বেড়ে ওঠে। ১৯১১ সালের অক্টোবর মাসে 'এরেবিয়া' জাহাজে চড়ে সুকুমার রায় বিদেশে যান এবং য়ুরোপের কয়েকটি দেশ ঘুরে শিক্ষান্তে ১৯১৩ খৃস্টাব্দের শেষে স্বদেশে ফিরে আসেন।

বোম্বাই থেকে বিদেশের উদ্দেশে রবীন্দ্রনাথের জাহাজ 'সিটি অব্ গ্লাসগো' রওনা হয় ২৭ মে ১৯১২ তারিখে। তখন সুকুমার রায় লন্ডনে বাস করছেন। সে সময়ে লন্ডন মিশনারি কলেজের (L.M.S.) জীববিদ্যার অধ্যাপক উইলিয়াম পিয়ার্সন সাহেবও ছুটি নিয়ে লন্ডনেই রয়েছেন। তিনি ভালো বাংলা জানতেন। প্রধানত তাঁর অনুরোধে সুকুমার রায় পিয়ার্সনের বাড়িতে অনুষ্ঠিত এক ঘরোয়া বৈঠকে বাংলা সাহিত্য বিষয়ে (পরে তাঁর 'বর্ণমালা তত্ত্ব ও বিবিধ প্রবন্ধ' গ্রন্থে সংকলিত) একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন।

ঠিক তার পাঁচ দিন আগে রবীন্দ্রনাথ লন্ডনে পৌঁচেছেন। ২১ জুন ১৯১২ তারিখে সুকুমার রায় ভগ্নী পুণ্যলতাকে লিখেছেন— 'পরশু দিন Mr. Pearson... তাঁর বাড়িতে আমাকে Bengali literature সম্বন্ধে একটা paper পড়বার নেমন্তন্ন করেছিলেন। ... সেখানে গিয়ে দেখি Mr. & Mrs. Arnold, Mr. & Mrs. Rothenstein, Dr. P. C. Roy প্রভৃতি অনেকে, তা ছাড়া কয়েকজন অচেনা সাহেব মেম উপস্থিত। শুধু তাই নয়, ঘরে ঢুকে দেখি রবিবাবু বসে রয়েছেন! বুঝতেই পারছিস আমার অবস্থা! যা হোক চোখ কান বুজে পড়েছিলাম। India office library থেকে বইটই এনে material যোগাড় করতে হয়েছিল। তা ছাড়া রবিবাবুর কয়েকটি কবিতা—'সুদূর', 'পরশপাথর', 'সন্ধ্যা', 'কুঁড়ির ভিতর কাঁদিছে গন্ধ' ইত্যাদি অনুবাদ করেছিলাম। ... Mr. Cranmer Byng. North brook [Society]র Secretary, আর Wisdom of the East Series এর Editor খুব খুশি। ... আমাকে ধরেছেন অনুবাদ করতে, তিনি publish করবেন।'

এর কিছুদিন পরে ইংলেন্ডের মেয়ো হাসপাতালে রবীন্দ্রনাথ যখন তাঁর অর্শ অপারেশন করান (জুলাই ১৯১৩) তখন সুকুমার রায় East and West Society-তে ২১ জুলাই ১৯১৩ তারিখে 'The Spirit of Rabindranath' শীর্ষক যে প্রবন্ধ পাঠ করেন, রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার সেটিকে বিদেশে 'ভারতীয়দের পক্ষ হইতে প্রথম পাবলিক ভাষণ বলে অনুমান করেন (দ্রষ্টব্য রবীন্দ্রজীবনী, দ্বিতীয় খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ ১৩৮৩, পৃ. ৪২২ পা. টী.)। সুকুমার রায় ২৫ জুলাই তারিখে ভগ্নী পুণ্যলতাকে আবার লেখেন— 'লোক মন্দ হয় নি। Quest কাগজের editor Mr. Mead, (যিনি এখানে রবিবাবুর lecture সব arrange করেছিলেন) তাঁর প্রবন্ধটা খুব পছন্দ হয়েছে, তিনি Quest কাগজে ছাপাচ্ছেন। ... রবিবাবু দু সপ্তাহ Nursing Home-এ ছিলেন। কয়েকদিন হল সেখান থেকে এসেছেন। তরশু দেখতে গিয়েছিলাম। ... বিলেতে রবিবাবুর খুবই নাম হয়েছে। এখানকার Poet Laureate R. Bridges তাঁর ছেলেকে রবিবাবুর সঙ্গে handshake করবার জন্য নিয়ে এসেছিলেন।' [দুটি চিঠিই রবীন্দ্রজীবনী দ্বিতীয় খণ্ড থেকে পুনরুদ্ধৃত]।

দেশে ফেরার পথে সুকুমার রায় জাহাজে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গ পেয়েছিলেন।

সুকুমার রায় দীর্ঘকাল অসুস্থতার পর মাত্র ৩৬ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করার আগে কবি তাঁকে কলকাতায় গিয়ে দেখে আসেন। মৃত্যুর পর শান্তিনিকেতনের মন্দিরে এক উপাসনায় (২৬ ভাদ্র ১৩৩০) রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'আমার পরম স্নেহভাজন যুবকবন্ধু সুকুমার রায়ের রোগশয্যার পাশে এসে যখন বসেছি এই কথাই বার বার আমার মনে হয়েছে ... অমৃতধামের তীর্থযাত্রায় তিনি আমাদের নেতা। আমি অনেক মৃত্যু দেখেছি। কিন্তু এই অল্প বয়স্ক যুবকটির মতো, অল্পকালের আয়ুটুকু নিয়ে মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে এমন নিষ্ঠার সঙ্গে অমৃতময় পুরুষকে অর্ঘ্যদান করতে প্রায় আর কাউকে দেখি নি। মৃত্যুর দ্বারের কাছে দাঁড়িয়ে অসীম জীবনের জয়গান তিনি গাইলেন; তাঁর রোগশয্যার পাশে বসে সেই গানের সুরটিতে আমার চিত্ত পূর্ণ হয়েছে।'

প্রসঙ্গত, মৃত্যুশয্যায় শায়িত সুকুমারকে কবি দুটি গান— 'আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, বিরহদহন লাগে' এবং 'দুঃখ এ নয়, সুখ নহে গো, গভীর শান্তি এ যে'— গেয়ে শুনিয়েছিলেন। শেষের গানটি কবি সুকুমার রায়ের অনুরোধে দুবার গেয়ে শোনান।

সুকুমার রায়ের 'পাগলা দাশু' তাঁর মৃত্যুর অনেক পরে (আখ্যাপত্র : পাগলা দাশু/সুকুমার রায়/এম সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স) ১৩৪৭ সালে প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথকে একটি ভূমিকা লিখে দিতে অনুরোধ জানালে তিনি কালিম্পং থেকে একটি সংক্ষিপ্ত অথচ অনুপম ভূমিকা লিখে পাঠিয়ে দেন। প্রথম সংস্করণে এটি মুদ্রিত হলেও পরবর্তী সিগনেট সংস্করণে এটি বর্জিত হয়।

৪২

স্বরচিত 'বিশ্বপরিচয়' গ্রন্থটি বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে উৎসর্গ করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গক্রমে লিখেছেন 'শ্রীমান প্রমথনাথ সেনগুপ্ত এম. এস্-সি. তোমারই ভূতপূর্ব ছাত্র। তিনি শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান-অধ্যাপক। বইখানি লেখবার ভার প্রথমে তাঁরই উপরেই দিয়েছিলাম। ক্রমশ সরে সরে ভারটা অনেকটা আমার উপরেই এসে পড়ল। তিনি না শুরু করলে আমি সমাধা করতে পারতুম না, তা ছাড়া অনভ্যস্ত পথে শেষ পর্যন্ত অব্যবসায়ীর সাহসে কুলোত না। তাঁর কাছ থেকে ভরসাও পেয়েছি সাহায্যও পেয়েছি।'

যাঁর অকুণ্ঠ সহযোগিতার কথা বলে তাকে গৌরবান্বিত করেছেন, সেই প্রমথনাথকে (১৯০৭-৮১) কবি ভার দিয়েছিলেন ভূগোল বিষয়ক একটি গ্রন্থ রচনা করতে। তার থেকেই সৃষ্টি 'পৃথ্বী-পরিচয়'-এর। গ্রন্থকারের নিবেদনে প্রমথনাথ তাই লিখেছেন—

'সহজ সরল ভাষায় বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু সকলের পক্ষে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে হবে ... এই হল আমার প্রতি তাঁর আদেশ। ... এই বইখানি আগাগোড়া পড়ে, দরকার মতো ভাষা ও তথ্যের পরিবর্তন করতে গুরুদেব অনেক কষ্ট স্বীকার করেছেন।'

লোকশিক্ষা গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত তৃতীয় গ্রন্থ হিসাবে এই ৭৭ পৃষ্ঠার বইটিতে ছয় পরিচ্ছেদে সংক্ষিপ্তাকারে ভূবিজ্ঞানের পরিচয় নিবদ্ধ রয়েছে। ভাদ্র ১৩৪৭ সনে প্রকাশিত এই বইটিও বিজ্ঞানতাপস সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে উৎসর্গীকৃত।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন, খড়গপুর আই. আই. টি., বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সময়ের অধ্যাপক ও কেন্দ্রীয় শিক্ষাদপ্তরের উচ্চপদস্থ আধিকারিক প্রমথনাথের অন্য দুটি বই 'নক্ষত্র পরিচয়' ও 'বিশ্বরহস্য'।

৪৩

নতুন আঙ্গিকে গল্পরচনা সব্যসাচী প্রমথ চৌধুরীর আর এক স্থায়ী কীর্তি। অবশ্য 'সাধনা' পত্রিকায় (অগ্রহায়ণ ১২৯৮) রবীন্দ্রনাথ প্রমথ চৌধুরীর 'ফরাসীস' উপন্যাসিকা 'ফুলদানী'র প্রশংসা করতে পারেন নি। কিন্তু 'সবুজপত্রে' তাঁর 'চার ইয়ারি কথা' প্রকাশিত হলে কবি লিখেছিলেন— 'তুমি যখন প্রথম গণ্ডী পেরিয়েছ তখন আর গল্প লেখায় তোমাকে ঠেকিয়ে রাখা যাবে না— এখন থেকে তোমার এই এক বহু হবার পথে চলল' (ফেব্রুয়ারি ১৯১৬)। কবির ভবিষ্যদ্‌বাণী সফল হয়েছিল।

চিঠিপত্র পঞ্চম খণ্ডে প্রমথ চৌধুরীকে লেখা চিঠিগুলিতে প্রমথ চৌধুরীর গল্পগুলি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ-কৃত 'দেশোচিত, কালোচিত এবং পুরুষোচিত', 'পালিশ করা ঝক্‌ঝকে, তীক্ষ্ণ', 'এর জাতই আলাদা', 'এ ধরনের লেখা আর কারো কলমে ফুটতে পারে না', 'আর কারো হাত দিয়ে বেরোবার জো নেই' ইত্যাদি নানা ইতস্তত মন্তব্যের সাক্ষাৎ পেয়ে থাকি।

'প্রমথ চৌধুরী-সংবর্ধনা সমিতি'র পক্ষে প্রিয়রঞ্জন সেনের সম্পাদনায় 'এ যাবৎকাল প্রকাশিত' প্রমথ চৌধুরীর গল্পগুলি একত্র করে প্রকাশিত হয় ভাদ্র ১৩৪৮ সালে। এই সংগ্রহ গ্রন্থের জন্যই কবি একটি মনোরম ভূমিকা লিখে দেন মৃত্যুর কিছুদিন মাত্র আগে 'কেননা গল্পসাহিত্যে তিনি ঐশ্বর্যদান করেছেন।' ইতোপূর্বে কবি প্রমথ চৌধুরীর দুটি বইয়ের ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন। এটি তৃতীয় ভূমিকা।

৪৪

আমরা রবীন্দ্র-রচিত ভূমিকা প্রথম পর্যায়ের আলোচনার প্রায় শেষে এসে পৌঁচেছি। রবীন্দ্র-অবনীন্দ্র সম্পর্ক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার লোভ সংবরণ করেছি, পাছে প্রসঙ্গের চেয়ে অনুষঙ্গ বড়ো হয়ে ওঠে।

রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণ ঘটে ৭ অগস্ট ১৯৪১, ২২ শ্রাবণ ১৩৪৮ জোড়াসাঁকোর পৈতৃক বাড়িতে। এর ঠিক দিন পঁচিশেক আগে ১৩ জুলাই ভূমিকা রচনা করলেন— অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৭১-১৯৫১) 'ঘরোয়া' বইটির জন্য। আরো আগে 'ঘরোয়া'র পাণ্ডুলিপি পড়ে দু'দিনের ব্যবধানে দু'খানি চিঠি লিখে গেছেন 'অবনকে'। রানী চন্দ যখন সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে ঘরোয়া লিখে কবিকে শুনিয়ে যেতেন— উচ্ছ্বসিত আনন্দে কবি যে-সব মন্তব্য করতেন— সেগুলি একত্রীকরণেও সেই 'ঘরোয়া'র অন্যতম ভূমিকা হয়ে যাবে। চিঠি দুটি উদ্ধৃত করি :

> অবন, কী চমৎকার— তোমার বিবরণ শুনতে শুনতে আমার মনের মধ্যে মরা গাঙে বান ডেকে উঠলো। বোধ হয় আজকের দিনে আর দ্বিতীয় কোনো লোক নেই যার স্মৃতি-চিত্রশালায় সেদিনকার যুগ এমন প্রতিভার আলোকে প্রাণে প্রদীপ্ত

হয়ে দেখা দিতে পারে— এ তো ঐতিহাসিক পাণ্ডিত্য নয়, এ যে সৃষ্টি— সাহিত্যে এ দুর্লভ। প্রাণের মধ্যে প্রাণ রক্ষিত হয়েছে— এমন সুযোগ দৈবাৎ ঘটে।

২৭ জুন, ১৯৪১ রবিকাকা।

দুই দিন পরে একই আনন্দের সকৃতজ্ঞ অভিব্যক্তি :

অবন, একদিন ছিল যখন জীবনের সকল বিভাগে প্রাণে পরিপূর্ণ ছিল তোমাদের রবিকাকা। তোমরাই তাকে অন্তরঙ্গভাবে এবং বিচিত্ররূপে নানা অবস্থায় দেখতে পেয়েছ। তোমাদের সোনার কাঠি ছুঁইয়ে আজ তাকে যদি না জাগিয়ে তুলতে, তবে তার অনেকখানি দেশের মন থেকে লুপ্ত হয়ে যেত। আজ যখন দিনান্তের শেষ আলোতে মুখ ফিরিয়ে দেশ আর ছবি একবার দেখে নিতে চায়— তখন তোমার লেখনী তাকে পথ নির্দেশ করে দিলে— এ আমার সৌভাগ্য। যে দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছি—সে দেশে পূর্ণ আসন থাকবে না— এই আশঙ্কা আমি অনুশোচনার বিষয় বলে মনে করি নে। অনেকবারই ভেবেছি, আমি আজন্ম নির্বাসিত— এ আমি বার বার মনে মনে স্বীকার নিয়েছি। আজ তুমি যে ছবি খাড়া করেছ সে অত্যন্ত সত্য, অত্যন্ত সজীব। দীর্ঘকালের অবমাননা সে দূর করে দিয়েছে— সেই নিরন্তন লাঞ্ছনা ও গ্লানির মধ্যে আজ যেন তুমি তার চার দিকে তোমার প্রতিভার মন্ত্রবলে এক দ্বীপ খাড়া করে দিয়েছ। তার মধ্যে শেষ আশ্রয় পেলুম।

২৯ জুন, ১৯৪১ তোমাদের রবিকাকা

এই দুটি চিঠির সঙ্গে 'ঘরোয়া'য় সংযুক্ত রবীন্দ্র-রচিত ভূমিকাটুকু পড়লে স্পষ্টত বোঝা যাবে যে চিঠি দুটি 'ঘরোয়া'র অন্তরঙ্গরূপের সংবর্ধনা ; ভূমিকাটি তার লেখকের উদ্দেশ্যে অভিনন্দন। 'চিত্রাঙ্গদা' কাব্যনাট্য অবনীন্দ্রনাথকে কবি উৎসর্গ করেন ১৫ শ্রাবণ ১২৯৯ তারিখে। এর ঠিক ৪৯ বছর পর কবি 'ঘরোয়া'র ভূমিকা লিখলেন। কালগত এই ব্যবধানের বিস্তারিত গ্রন্থিত ইতিহাস 'ঘরোয়া'।

৪৫

শ্যামকান্তের পত্রাবলী নামের মূল বইটি মারাঠিতে লেখা— 'শ্যামকান্তচী পত্রেঁ'। এর অর্থ শ্যামকান্তের পত্রাবলী। এর পরে বন্ধনীর মধ্যে লেখা ছিল— '(রিয়াসতকার গো. স. সরদেশাই যাঁচ্যা মুলার্চী নিবডক, পত্রেঁ)'— এর অর্থ : রিয়াসতকার গো. স. সরদেশাই-এর পুত্রের নির্বাচিত পত্রাবলী। ১৯৩৪ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত এই বইয়ের প্রকাশক ছিলেন— শ্রীপাদ রামচন্দ্র টিকেকর। টিলক রোড, পুনে-২। বিশ্বভারতীর

প্রাক্তন রবীন্দ্র-অধ্যাপক ও আমার অধ্যাপক ভবতোষ দত্ত গ্রন্থটি প্রসঙ্গে আমাকে লিখেছিলেন— 'গুজরাট [মহারাষ্ট্র] প্রদেশের শ্যামকান্ত সরদেশাই (১৮৯৯-১৯২৫) শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র। শ্যামকান্ত বিভিন্ন সময়ে তাঁর পিতাকে যে সমস্ত চিঠি লেখেন, তার সংকলন এই বই। বইটির প্রথম অংশের চিঠিগুলি শান্তিনিকেতন থেকে লেখা, শান্তিনিকেতনের অনেক ব্যক্তি ও ঘটনার পরিচয় চিঠিগুলিতে পাওয়া যায়। শ্যামকান্তের মৃত্যুর পর তাঁর পিতা এই চিঠিপত্রগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। মূল গ্রন্থ গুজরাটি [মারাঠি] ভাষায় লেখা।'

শ্যামকান্তের পিতা গোবিন্দ সখারাম দেশাই ছিলেন ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকারের বন্ধু। যদুনাথের উদ্যোগেই তিনি শ্যামকান্তকে শান্তিনিকেতনে পড়তে পাঠান (১৯১৩)।

৪৬

এখন আমরা রবীন্দ্রনাথের আর-একটি বাংলা ভূমিকার উল্লেখ করছি। কালানুক্রমিকতা এতে রক্ষিত হল না। কারণ যদিও ভূমিকাটি বাংলায় লেখা, কিন্তু বাংলা বইয়ের জন্য নয়। সেজন্যই একবারে শেষে উদ্ধৃত করেছি।

পুরোহিত হরিনারায়ণ শর্মার সম্পাদনায় কলকাতার রাজস্থান রিসার্চ সোসাইটি কর্তৃক যে 'সুন্দর গ্রন্থাবলী' (আখ্যাপত্র : ওঁ তৎসৎ/রাজস্থান-সাহিত্য-রত্ন-মালা— মণি-১/ সুন্দর-গ্রন্থাবলী/ [মহাত্মা কবিবর স্বামী শ্রীসুন্দরদাসজী রচিত / সমস্ত গ্রন্থ কা সংগ্রহ]/[প্রথম খণ্ড] / সম্পাদক / শ্রীহরিনারায়ণ শর্মা, বি. এ. বিদ্যাভূষণ / প্রকাশক,/ রাজস্থান রিসার্চ সোসাইটি / কলকাতা। / All Rights Reserved / প্রথমাবৃত্তি, মকরসংক্রান্তি ১৮৮৩ মূল্য ৩।।০) প্রকাশিত হয় (প্রকাশক রঘুনাথপ্রসাদ সিংহানিয়া)। এর প্রথম খণ্ডে (মুদ্রণ সংখ্যা ১৫০০ মাত্র) রবীন্দ্রনাথের ভূমিকাটি সংযুক্ত হয়েছে বাংলাভাষায়। পরে এর হিন্দি ভাষান্তর করা হয়েছে, কারণ এই গ্রন্থাবলীর দুটি খণ্ডই হিন্দি ভাষায় রচিত। এটির প্রকাশকাল ১৯৩৪ খৃস্টাব্দ।

প্রকাশক প্রসঙ্গক্রমে নিবেদন করেছেন— 'বড়ে হী হর্ষকা বিষয় হৈ কী হামারী প্রার্থনা পর বিশ্বকবি শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নে প্রাক্‌কথন লিখ দিয়া হৈ— জিসকে লিয়ে হম উনকে কৃতজ্ঞ হৈ ঔর আশা করতে হৈ কি বে রাজস্থানী সাহিত্য কো হীরো কা দিনো দিন ইসী প্রকার আদর করেংগে।'

হিন্দি ছাড়া অন্য ভারতীয় ভাষায় রচিত অন্য কোনো গ্রন্থের লেখক হিসাবে আমি রবীন্দ্রনাথকে অন্যত্র পাই নি।

প্রসঙ্গত এই ১৯৩৪-৩৫ খৃস্টাব্দেই শান্তিনিকেতনে 'হিন্দিভবন' স্থাপনের প্রথম প্রয়াস হয়। বহু হিন্দিভাষী ব্যক্তি এই উদ্যোগে আর্থিক সহায়তা দান করেন।

প্রথম বিভাগ : দ্বিতীয় অধ্যায়

এখন রবীন্দ্রনাথ যে-সব বইয়ের জন্য নানা অভিমত প্রকাশ করেছিলেন এবং গ্রন্থকারেরা যে অভিমতগুলি তাঁদের গ্রন্থ-ভূমিকা হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন (অধিকাংশ ক্ষেত্রে কবির অনুমতিসহ এবং তাঁর জীবৎকালেই) সেগুলি সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি নিবেদন করছি।

৪৭

অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৬১-১৯৩২) 'মেয়েলি ব্রত'-এর ভূমিকা রচনা দিয়ে রবীন্দ্রনাথ অন্যের গ্রন্থে ভূমিকা রচনার সূত্রপাত ঘটান। পশ্চিমবঙ্গের মতো পূর্ব-বঙ্গেও রবীন্দ্রনাথের প্রেরণায় মেয়েলি ব্রতকথা, ছেলে-ভুলানো ছড়ার সংগ্রহকার্য আরব্ধ হয়। 'আমাদের ভাষা এবং সমাজের ইতিহাস নির্ণয়ে ... ছড়াগুলি'র যে একটি বিশেষ ভূমিকা আছে পরমেশপ্রসন্ন রায় সংকলিত 'মেয়েলি ব্রতকথা'য় [আখ্যাপত্র : মেয়েলি ব্রতকথা/অর্থাৎ/পূর্ববঙ্গের যোষিৎ-প্রচলিত কতিপয়/ব্রতের বিবরণ/ শ্রীপরমেশপ্রসন্ন রায়, বি. এ. / সংকলিত / প্রকাশক শ্রীআশুতোষ ধর / আশুতোষ লাইব্রেরি / ৫০/১ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা / [All Rights Reserved] সেই ভূমিকা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। পশ্চিমবঙ্গে এ ধরনের উদ্যোগ আগেই শুরু হয়েছে লক্ষ্য করে লেখক পরমেশপ্রসন্ন এই গ্রন্থে পূর্ববঙ্গের বিশেষত ঢাকা অঞ্চলের ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ সমাজে প্রচলিত কতিপয় বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন ('মুখবন্ধে' গ্রন্থকারের উক্তি)।

'পূজনীয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের উৎসাহবাক্য শিরোধার্য' করে রচিত তেরোটি ব্রতকথার -সংকলন ১১৪ পৃষ্ঠার এই সচিত্র পুস্তকটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯০৮ খৃস্টাব্দে। গ্রন্থকার গ্রন্থপ্রকাশের আগে মুদ্রিত অংশ রবীন্দ্রনাথকে পাঠিয়ে দিলে তিনি যে অভিমত পাঠিয়ে দেন, তা লেখক তাঁর মুখবন্ধের মধ্যে প্রকাশ করেন। এ বিষয়ে 'মুখবন্ধে' গ্রন্থকার লেখেন— 'শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় কৃপাপূর্বক যে অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।' তিনি আরো লেখেন— 'অতঃপর, আমাদের অন্তঃপুরে বারব্রতাদি সম্বন্ধে যাঁহারা অযথা নিন্দাবাদ করেন, এই 'মুখবন্ধে' রবিবাবুর এবং ইউরোপীয় মহিলার মন্তব্য পাঠ করিয়া তাঁদের মধ্যে অন্তত দুই একজনেরও মুখ বন্ধ হইতে পারে, এরূপ আশা করা বোধ হয় নিতান্ত অসংগত হইবে না।' অযথা নিন্দাবাদ যে হত তার প্রমাণ রয়েছে 'ছিন্নপত্রাবলী'র ১৬৩-সংখ্যক পত্রে— 'কাল ব-র সঙ্গে 'মেয়েলি ছড়া' নিয়ে কথা হচ্ছিল। তিনি বলেছিলেন, এমন একটা তুচ্ছ উদ্দেশ্যবিহীন বিষয় নিয়ে আমি কেন সাধারণের কাছে বক্তৃতা দিতে

গেলুম তিনি বুঝতে পারেন নি।' গ্রন্থকারের 'মুখবন্ধে' যে ইউরোপীয় মহিলার কথা বলা হয়েছে, সে বিষয়ে দ্রষ্টব্য সিস্টার নিবেদিতার প্রবন্ধ 'The place of the Kindergarten in Indian Schools'—*The Modern Review*, August, 1908.

৪৮

বাঙাল যখন আসে মোর গৃহ দ্বারে
নূতন লেখার দাবি লয়ে বারে বারে,
আমি তারে হেঁকে বলি সরোষ গলায়—
শেষ দাঁড়ি টানিয়াছি কাব্যের কলায়।
মনে মনে হাসে, তবুও সে ফিরে ফিরে আসে!
তারপর একী! সকালে উঠিয়া দেখি
নির্লজ্জ লাইনগুলো যত
বাহির হইয়া আসে গুহা হতে নির্ঝরের মতো।
পশ্চিম-বঙ্গের কবি দেখিলাম মোর
বাঙালের মতো নেই জেদের অপ্রতিহত জোর।

—কবি লিখেছিলেন তাঁর বহু অপ্রকাশিত রচনার রক্ষক, 'গীতবিতান' প্রথম সংস্করণের সম্পাদক, বিশ্বভারতী 'সংস্কার-সমিতির'র নেতা, 'রবীন্দ্রপরিচয় সভা'র অন্যতম উদ্যোক্তা, কুমিল্লার 'অভয় আশ্রম'-আগত বিশ্বভারতী আশ্রমের কর্মী সুধীরচন্দ্র করের উদ্দেশ্যে।

১৩৩৪-এর পৌষ উৎসব সমাপ্ত হয়ে গেছে, কবি শান্তিনিকেতনে আছেন। এ-সময়ে সুধীরচন্দ্র শান্তিনিকেতনে এসে গ্রন্থাগারের কর্মী হিসাবে নিযুক্ত হয়েছেন। সাহসের উপর ভর করে সেই 'পূর্ববঙ্গীয়' কবিটি তাঁর লেখা কতগুলি কবিতা কবিকে দেখতে দিলেন। রবীন্দ্রনাথ 'পাণ্ডুলিপিটি আগাগোড়া পড়িয়া তাতে একটি মনোজ্ঞ অভিমত লিখিয়া দিলেন' ১৭ পৌষ ১৩৩৪ তারিখে। 'সুরধুনী' প্রকাশিত হয় ফাল্গুন ১৩৩৪ তারিখে।

৪৯

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত (১৮৮৩-১৯৬৫) শিশুদের জন্য 'শিশুভারতী' নামে যে জ্ঞানকোষ সম্পাদনা করেন কয়েকটি খণ্ডে, তার প্রথম খণ্ডটি প্রকাশিত হয় ১৩৩৯ বঙ্গাব্দে। কবি মাত্র একটি পঙ্‌ক্তিতে তাঁর আশীর্বচন বা অভিমত মাত্র প্রকাশ করেছিলেন।

৫০

অমিয়কুমার সেন যথার্থ বলেছেন— 'একলব্য গুরুকে দক্ষিণা দিয়েছিলেন, তাঁর ডান হাতের বুড়ো আঙ্গুলটি; আর আচার্য হরিচরণ (১৮৬৭-১৯৫৯) গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের কাছে উৎসর্গ করেছিলেন তাঁর চোখ দুটি।' ('সাহিত্য ও সংস্কৃতি' শারদীয় সংখ্যা ১৩৭৪)। দীর্ঘ একচল্লিশ বছরের সাধনায় গ্রন্থিত হয়েছিল তাঁর সুপরিচিত 'বঙ্গীয় শব্দকোষ'। রবীন্দ্রনাথের অনুজ্ঞায় তিনি ১৩১২ সনে শব্দকোষ রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন এবং শেষে দৃষ্টিহীন হয়ে পড়েন। তাঁর লেখা আত্মপরিচয় 'কবির কথা' ও 'রবীন্দ্রনাথের কথা' (সান্যাল অ্যাণ্ড কোম্পানি প্রকাশিত ; সম্প্রতি দুটি গ্রন্থ একত্রে 'রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ' নামে বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ থেকে প্রকাশিত হয়েছে, মাঘ ১৪০৬) পুস্তকে হরিচরণের শান্তিনিকেতন আগমন ও অন্যান্য কথা জানা যায়। শৈশবে তিনি 'বাল্মীকি প্রতিভা'র অভিনয় দেখেছেন। উপস্থিত থেকেছেন শান্তিনিকেতন উপাসনা গৃহের ভিত্তি স্থাপন ও মন্দির প্রতিষ্ঠার উৎসবে। পরে এই সংস্কৃতজ্ঞ কর্মচারীর শান্তিনিকেতনে অধ্যাপনার কাজে যোগদান সবই রবীন্দ্রকেন্দ্রিক ঘটনা।

তাঁর স্থায়ী-কীর্তির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ম্যাথু আর্নল্ডের 'শোহরাব রুস্তম' কাব্যগ্রন্থের পদ্যানুবাদ, 'বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র' কাব্যরচনা, 'অধ্যাত্ম রামায়ণে'র কাব্যানুবাদ, 'সংস্কৃত প্রবেশ' (পূর্বে উল্লিখিত) এবং অবশ্যই 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' সংকলন।

শান্তিনিকেতনে আসার (১৩০৯) তিন বছর পর 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' সংকলন আরব্ধ হয় রবীন্দ্রনাথের প্রেরণায়। রচনা সমাপ্ত হয়েছিল ১১ মাঘ ১৩৩০ সালে। একক চেষ্টায় এত বৃহৎ শব্দকোষ রচনার নিদর্শন সম্ভবত আর নেই। নানা উত্থান-পতন, আর্থিক দুর্গতি, মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর সাহায্য প্রভৃতি নিয়ে এর প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৩৪০ বঙ্গাব্দে। ১০৫টি ছোটো ছোটো খণ্ডে এর মুদ্রণ সমাপ্ত হয় ১৩৫৩ সালে। দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ এই সংকলনের নবতম সংস্করণ সাহিত্য অকাদেমি দিল্লি থেকে প্রকাশিত হয়েছে (১৩৪০-৫৩ বঙ্গাব্দ)। সম্পূর্ণ অভিধান রবীন্দ্রনাথ বা মণীন্দ্রচন্দ্র কেউ-ই দেখে যেতে পারেন নি। তবে প্রথম খণ্ড প্রকাশের আগে রবীন্দ্রনাথ একটি ক্ষুদ্র অভিমত এই বঙ্গীয় শব্দকোষের জন্য লিখে যান।

৫১

'ভারতবর্ষ' পত্রিকার সম্পাদক রায়বাহাদুর জলধর সেনের (১৮৬১-১৯৩৯) পঞ্চসপ্ততিতম জন্মতিথিতে বাংলার শ্রেষ্ঠ লেখক-লেখিকাগণের শ্রদ্ধা-নিবেদন ও নানা প্রতিষ্ঠানের সশ্রদ্ধ অভিনন্দনবাণী সংগ্রহ করে ব্রজমোহন দাশ এই 'জলধর-কথা' প্রকাশ করেন আশ্বিন ১৩৪১ বঙ্গাব্দে। ২৪০ পৃষ্ঠা-সমন্বিত এই বইয়ের আখ্যাপত্রটি ছিল

নিম্নরূপ : জলধর-কথা / সম্পাদক—শ্রীব্রজমোহন দাশ / গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সন্স্ /২০৩ / ৪/১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট / কলিকাতা।

রবীন্দ্রনাথের শুভেচ্ছাবাণীটি তাঁর হস্তাক্ষরে মুদ্রিত হয়েছে।

৫২

অমূল্যচরণ ঘোষ (১৮৬৯-১৯৪০) কাশীতে কাশীনরেশের ফরাসি পণ্ডিতের কাছে সংস্কৃত অধ্যয়ন করে 'বিদ্যাভূষণ' উপাধি প্রাপ্ত হন। গ্রীক, উর্দু, ফারসি, ল্যাটিন, ইটালিয়ান, ফরাসি, জার্মান প্রভৃতি ২৬টি ভাষায় অমূল্যচরণ 'বিশ্বকোষ'-এর প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড সম্পাদনাপূর্বক প্রকাশ করেন এবং 'বঙ্গীয় মহাকোষ' (১৩৪১-৪৭) নামক কোষগ্রন্থের তিনি ছিলেন প্রধান সম্পাদক। এই কোষগ্রন্থের প্রথম পর্ব প্রকাশিত হলে কবি একটি 'স্বস্তিবাচন' লিখে দিয়ে সম্পাদককে উৎসাহিত করেছিলেন।

৫৩

রাখালচন্দ্র সেনের (১৮৯৭-১৯৩৪) 'জন্ম' খুলনা জেলার এক অখ্যাত গ্রামে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের এম. এ. পরীক্ষায় (১৯১৯) সর্বোচ্চ স্থানের অধিকারী রাখালচন্দ্র একই বছরে I.C.S. পরীক্ষায় মনোনীত হন। দু'বছর অক্সফোর্ডে কাটিয়ে এসে ১৯২১ সালে নিযুক্ত হন সরকারি কাজে। এরপর ১৩ বছর যুক্তবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বিচারকের পদে বৃত ছিলেন। মাত্র সাঁইত্রিশ বছরের সীমিত জীবনে তাঁর সাহিত্যপ্রাণতার নিদর্শন সাতটি গল্পের (সহযাত্রী, সারথি, পিঞ্জরে, অমল, পাঞ্চভৌতিক, পরশ পাথর এবং শেষ খেয়া) সমাহার 'সপ্তপর্ণ' (আখ্যাপত্র : সপ্তপর্ণ /রাখালচন্দ্র সেন/বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়/২১০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা) প্রকাশিত হয় ১৩৪৪ সনের আশ্বিন মাসে।

লেখকের জীবিতকালে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নি। তাঁর মৃত্যুর তিন বছর পর বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় এই বই প্রকাশ করেন। অনুমান করি, বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষের অনুরোধক্রমে কবি এই ভূমিকাটি রচনা করেন। রবীন্দ্রনাথ ভ্রমক্রমে বইটির নাম উল্লেখ করেছেন সপ্তপর্ণী। প্রসঙ্গত, ভূমিকায় কবি যে 'সহযাত্রী' গল্পটি সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য প্রকাশ করেছেন— সেটি 'পরিচয়' পত্রিকায় পত্রস্থ হয়েছিল। অথচ রাখালচন্দ্র সেন সম্পর্কে সম্ভবত খুব কম মানুষই অবহিত আছেন।

৫৪

শ্যামানন্দ (ঘোষ?)-রচিত 'শ্রীরামকৃষ্ণ কাব্যলহরী' (প্রকাশক/স্বামী শ্যামানন্দ,/ রেঙ্গুন,/ বর্মা।/প্রিন্টার শ্রীশ্যামাচরণ বিশ্বাস,/বর্মা আর্ট প্রেস, লিমিটেড,/২১১-২১৩, ৩৮ নং ষ্ট্রীট,/ রেঙ্গুন বর্মা।) ১৯৩৮ খৃস্টাব্দে। এর একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় ২৭ জুন ১৯৪০ তারিখের 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় (পৃ. এক টাকা বারো আনা + ৬৩৭ পৃষ্ঠার বিশাল এই বইখানিতে 'শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের একমাত্র সন্তান শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দজীর আশীর্বাদপত্র' মুদ্রিত হয়েছে। স্বামী অভেদানন্দ লিখেছিলেন—

রামকৃষ্ণ বেদান্ত সমিতি
১৯বি, রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা,
২৪-৭-১৯০৮ ইং

স্নেহের শ্যামানন্দ,

তোমার প্রেরিত 'শ্রীরামকৃষ্ণ কাব্য লহরী' প্রথম খণ্ড পাইয়া প্রীত হইয়াছি। যুগাবতার ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের পুণ্যলীলা যতই প্রচারিত হইবে ততই জগতের মঙ্গল। এ বিষয়ে তোমার প্রচেষ্টা ফলবতী হউক, আমি আশীর্বাদ করিতেছি। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী
অভেদানন্দ

এর পরেই রবীন্দ্রনাথের অভিমত মুদ্রিত হয়েছে। 'অবতরণিকা' অংশে গ্রন্থকার প্রসঙ্গক্রমে লিখেছেন— 'এখানে আরো কৃতজ্ঞতার সহিত প্রকাশ করা উচিত যে, ব্রহ্ম-বঙ্গ-সাহিত্য সম্মিলনীর প্রধান সভাপতি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় স্থানে স্থানে আবৃত্তি ও পাঠ শ্রবণ করিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।' অনুমান করি, সুনীতিকুমারের মধ্যস্থতায় রবীন্দ্রনাথ এই অভিমত প্রকাশ করেন। 'গান্ধী হাসপাতাল' নামে পরিচিত রেঙ্গুনের বিখ্যাত রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের পরিচালক শ্যামানন্দের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ১৯২৭-এর অক্টোবরে রেঙ্গুনেই পরিচিত হন।

৫৫

রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৮৯২-১৯৮৬)-এর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কের ইতিহাস রচনা নিষ্প্রয়োজন। তাঁর 'জ্ঞানভারতী' বা সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষের প্রথম খণ্ডের জন্য একটি ক্ষুদ্র 'অভিমত' প্রদান করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। প্রভাতকুমার 'জ্ঞাপনী'তে লিখেছেন— 'কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ বহন করিয়া জ্ঞানভারতীর ১ম খণ্ড বাহির হইল।' নিবেদন অংশে, লিখেছেন— 'এই গ্রন্থ তাঁহার আশীষ বাণী পাইয়া ধন্য হইয়াছে।' বইটি ১৯৪০ খৃস্টাব্দের জুলাই মাসে ন্যাশনাল লিটারেচার কোম্পানি থেকে প্রকাশিত হয়। অভিমতটি রবীন্দ্র-হস্তাক্ষরে মুদ্রিত। পৃষ্ঠাসংখ্যা ছিল ১২ + ৪৭৯।

প্রসঙ্গত একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ কালিম্পং থেকে এই বইটির অগ্রগতি সম্পর্কে জানতে চেয়ে লিখেছিলেন— ... 'তোমার সেই চক্রপদ্ধতি (Cyclopaedia) রচনার কাজ কতদূর এগোলো? ওটা কাজে লাগবে।'...

৫৬

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের 'ঠাকুরদাদার ঝুলি' বইতে এটি ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু কোন্ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ এটি লিখেছিলেন তা যথাযথ জানতে পারি নি। এর আগে দক্ষিণারঞ্জন 'বঙ্গোপন্যাস্'-এ এটি ব্যবহার করেছিলেন। লোক-সাহিত্য-লোকে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের উদ্দেশ্যানুযায়ী 'বঙ্গোপন্যাস' প্রথম মুদ্রিত হয়েছিল ১৩১৬ বঙ্গাব্দে।

৫৭

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য (১৯০৯-৮৫) প্রধানত খ্যাতিমান হয়েছিলেন মঙ্গলকাব্য এবং লোকসাহিত্য বিষয়ে তাঁর উন্নতমানের গবেষণার জন্য। ১৯৩৯ খৃস্টাব্দে তাঁর 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস' নামক বৃহদাকার গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের কাছে বইটি পাঠিয়ে দিয়ে 'অভিমত' প্রার্থনা করলে কবি তাঁর সংক্ষিপ্ত অথচ মূল্যবান অভিমতটি পাঠিয়ে দেন। এ সম্পর্কে গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের (১৩৫৭ ব.) নিবেদনে আশুতোষ ভট্টাচার্য লিখেছেন— 'ইহার প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া যে ভাষায় এই অজ্ঞাত-পরিচয় গ্রন্থকারকে অভিনন্দন জানাইয়াছিলেন, তাহাই ইহার সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার বলিয়া মনে করি।'

৫৮

কিরণচন্দ্র দাস জীবিকার কারণে বর্মা-নিবাসী ছিলেন। এখানে তিনি নিদারুণ অসুস্থ হয়ে পড়েন। চিকিৎসকগণ হাল ছেড়ে দিলে তিনি Hay-র লেখা *Health Via Food* নামে একটি বই পড়ে নিজের চিকিৎসা নিজে করে রোগমুক্ত হন। পরে রেঙ্গুন Royal Lake দৌড় প্রতিযোগিতায় ৩৮ মিনিট ৭ সেকেন্ডের মধ্যে ৬ মাইল পথ হেঁটে অতিক্রম করার সামর্থ্য দেখান। এরই অভিজ্ঞতায় লিখিত হয় তাঁর 'পথ্যে পরমায়ু' (আখ্যাপত্র : পথ্যে পরমায়ু/শ্রীকিরণচন্দ্র দাস প্রণীত/মূল্য আড়াই টাকা) বইটি প্রকাশিত হয়। বইটির কোথাও প্রকাশকাল মুদ্রিত নেই। তবে এর মূল ভূমিকা যিনি লিখেছেন সেই জগবন্ধু চৌধুরীর ভূমিকার তারিখ ১৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৬।

এ-সময় রবীন্দ্রনাথ প্রয়াত। কাজেই এই 'অভিমত' বা কবিগুরু 'রবীন্দ্রনাথের বাণী' পূর্বেই রচিত। হয়তো কোনো পত্রিকায় মুদ্রিত হয়ে থাকবে। অথবা গ্রন্থকার পূর্বেই কোনো সূত্রে রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে এই ভূমিকাটি প্রার্থনা করে থাকবেন। কোনো কারণে হয়তো গ্রন্থ প্রকাশে বিলম্ব হয়েছিল। লেখক এ-বিষয়ে কোনো সূত্র আমাদের জ্ঞাপন করেন নি।

৫৯

কবি কিরণচাঁদ দরবেশের (১৮৭৮-১৯৪৩) প্রকৃত নাম কিরণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর শিষ্য এই নামেই পরে পরিচিত হন। 'মন্দির' (১৯১৫) ছাড়া এঁর অন্যান্য কাব্যগ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য— গানের খাতা, জপজী, নামব্রহ্ম, পূজাপদ্ধতি, সুখমণি, কাবেরী প্রভৃতি।

'মন্দির' বইটির মূল ভূমিকার লেখক ছিলেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। রবীন্দ্রনাথ এই ভূমিকাটি পড়েছিলেন আগেই এবং লেখকের অনুরোধে এর সঙ্গে কয়েকছত্র যোগ করে দেন। এই সংযোজন অংশ 'প্রশস্তি' নামে রামেন্দ্রসুন্দরের ভূমিকার সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে। এটিকে রবীন্দ্র-রচিত ভূমিকা বলে গ্রহণ করা সম্ভবত অনুচিত হবে। তবুও তথ্যের খাতিরে এটি এখানে সংযুক্ত করেছি। বইটির তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৩৩৬ সালে।

৬০

জগদীশচন্দ্র বসুকে (১৮৫৯-১৯৩৭) লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী 'চিঠিপত্র' ষষ্ঠ খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হয়ে মে ১৯৫৭ খৃস্টাব্দে বিশ্বভারতী-গ্রন্থালয় কর্তৃক প্রকাশিত হয়। অবলা বসু মহোদয়াকে লিখিত পত্রাবলীও এর অন্তর্ভুক্ত হয়।

এর অনেক আগেই রবীন্দ্রনাথকে লিখিত 'জগদীশচন্দ্র বসুর পত্রাবলী' 'প্রবাসী' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩ সংখ্যা থেকে পৌষ ১৩৩৩ সংখ্যা পর্যন্ত প্রকাশিত হয়। এই পত্রাবলী প্রকাশের সূচনায় 'প্রবাসী'র জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩ সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ-লিখিত 'পত্র-পরিচয়' 'জগদীশচন্দ্র বসুর পত্রাবলী'র ভূমিকা হিসাবে মুদ্রিত হয়। ভূমিকা রচনার তারিখ ২২ চৈত্র ১৩২২।

পরে এই 'পত্র পরিচয়' 'চিঠিপত্র' ষষ্ঠ খণ্ডের দ্বিতীয় পরিশিষ্টাংশেও পুনর্মুদ্রিত হয়েছে।

প্রথম বিভাগ : তৃতীয় অধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের মতামতসহ যে পূর্ণ চিঠিগুলি বিভিন্ন লেখকেরা তাঁদের গ্রন্থের আদিতে সংযুক্ত করেছিলেন অনেকটা ভূমিকার মতোই, সেগুলির বিষয়ে তথ্যাদি এই অধ্যায়ে বিন্যস্ত হল। এগুলিকে যথাযথ ভূমিকা বলা যায় না। কারণ এমন বহু বই রয়েছে, যেগুলিতে রবীন্দ্রনাথের মতামতসহ চিঠিগুলির পরে অন্যজনের লেখা পৃথক ভূমিকা সংযুক্ত হয়েছে। তবুও লেখকেরা রবীন্দ্রনাথের চিঠিগুলিকে প্রাথমিক ভূমিকা হিসাবেই গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন বলে অনুমান করি। গ্রন্থের সম্পূর্ণতার কারণেই এগুলিকে সংযুক্ত করা হয়েছে।

কিছু চিঠি রয়েছে, যেগুলি রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ গ্রন্থকারদেরই লিখেছিলেন। একটি চিঠি রয়েছে (ড. সুকুমার সেনের 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থে মুদ্রিত) যেটি অন্যজনকে লেখা, কিন্তু প্রসঙ্গটি মূল গ্রন্থকারের উদ্দেশ্যেই নিবেদিত।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'কাব্যসঞ্চয়ন'-এর প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৩০ খৃস্টাব্দে। এর দ্বিতীয় সংস্করণ (১৯৩৪) যখন প্রকাশিত হল তখন এর সূচনায় রবীন্দ্রনাথের 'পূরবী' কাব্যগ্রন্থের 'বর্ষার নবীন মেঘ এল ধরণীর পূর্বদ্বারে,/বাজাইল বজ্রভেরী' শিরোনামার 'সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত' নামক কবিতাটি মুদ্রিত হয়েছিল। এটি ১৩২৯ সালে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের শোকসভায় রবীন্দ্রনাথ পাঠ করেছিলেন। এটিকে তাই সংকলন করা হয় নি।

পূর্ববর্তী 'অভিমত সাধারণভাবে' পর্যায়ে আমরা যে-সব রবীন্দ্র-মত উদ্ধার করেছি, তার কোনো কোনোটি হয়তো পত্রাকারেই লিখিত। কিন্তু গ্রন্থে পূর্ণপত্র উদ্ধৃত হয় নি বলে একটিকে স্বতন্ত্র পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করেছি।

বিগত প্রায় কুড়ি বছরের অনুসন্ধানে আমি যে চিঠিগুলি পেয়েছি, তার অতিরিক্ত চিঠি যে থাকতে পারে না— এমন দাবি করছি না। তবে বাড়তি চিঠিপত্র পেলে বা ভূমিকার সন্ধান পেলে পরবর্তী সংস্করণে যুক্ত করা যাবে। এখন আমরা তথ্যাদি নিবেদন করছি।

৬১

স্নেহলতা সেনের (১৮৪৮-১৯১৬) পিতা বিহারীলাল গুপ্তকে রবীন্দ্রনাথ অগ্রজপ্রতিম ভাবতেন। তাঁর প্রথম ছোটো গল্প সংগ্রহ 'ছোটোগল্প' গ্রন্থখানি রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই 'পূজনীয় জ্যেষ্ঠ সোদরোপম'কে উৎসর্গ করেন।

স্নেহলতা সেনের বিবাহ-উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ 'সুখে থাকো আর সুখী করো সবে' গানটি লিখে পাঠিয়ে দেন। পরে স্নেহলতা নানাভাবে সপরিবারে শান্তিনিকেতন আশ্রমের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন— 'সম্প্রতি আশ্রমে একটি ছাত্রী নিবাস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীযুক্তা স্নেহলতা সেনগুপ্তা কিছুদিন হইতে আশ্রমে আসিয়া বাস করিতেছেন। এই বিদুষী মহিলা এই ছাত্রী নিবাসের বালিকাদের তত্ত্বাবধান করিতেছেন। তাহা ছাড়া তিনি ইংরাজি অধ্যাপনারও সহায়তা করিতেছেন'— শান্তিনিকেতন, সাল ১৩২৮।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে স্নেহলতার কন্যাসমা সম্পর্কের দলিল হিসাবে বেশ কয়েকটি চিঠি শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত আছে। আরো দ্রষ্টব্য, 'দেশ' সাহিত্য সংখ্যা ১৩৭২-এ পুলিনবিহারী সেনের প্রবন্ধ 'রবীন্দ্র প্রসঙ্গ'।

স্নেহলতা ও তাঁর ভগ্নী লতিকা ইংরেজিতে লেখিকারূপে পরিচিত ছিলেন। স্নেহলতা সেনের গল্প সংগ্রহ *Nehal the Musician* (১৯২৩) এবং লতিকা দেবীর *A Garland of Fancies* একদা সমাদৃত হয়েছিল। এ ছাড়া 'বিচিত্র গল্প' গ্রন্থের লেখিকা ছিলেন এই ভগিনীদ্বয়। তাঁরা তাঁদের 'বিচিত্র গল্প' এবং *A Garland of Fancies* একত্রিত করে 'যুগলাঞ্জলি' নাম দিয়ে তাঁদের পরলোকগতা মাতৃদেবীর স্মরণে (মৃত্যু ২৭ এপ্রিল ১৯০৩) নিবেদন করে প্রকাশ করেন (১৩১৩ ব.)। রবীন্দ্রনাথ এই বই পড়ে যে চিঠি লেখেন তা 'যুগলাঞ্জলি' গ্রন্থে মুদ্রিত আছে। অনেকে এটিকে ভূমিকা বলে ভুল করেছেন। রবীন্দ্রনাথ-লিখিত চিঠিখানিই (তারিখ ২১ আষাঢ় ১৩১২) গ্রন্থে ভূমিকার মর্যাদায় মুদ্রিত হয়েছে মাত্র।

বইটির আখ্যাপত্র : যুগলাঞ্জলি / বিচিত্র গল্প / শ্রীস্নেহলতা সেন রচিত / Garland of Fancies / শ্রীললিতা গুপ্ত রচিত /। মোট পৃষ্ঠাসংখ্যা ।।০ + ২৩৯, (vi) + ।।০

৬২

উমেশচন্দ্র মৈত্রের বইটির আখ্যাপত্র : 'রাক্ষস রহস্য / আত্মবোধ প্রণেতা / শ্রীউমেশচন্দ্র মৈত্র / প্রণীত / আতাইকুলা (রাজসাহী) হইতে গ্রন্থকার কর্তৃক / প্রকাশিত ১৩১৯ / মূল্য ছয় আনা / কাপড়ে বাঁধা দশ আনা।' পৃষ্ঠাসংখ্যা [২] গ্রন্থকারের নিবেদন দশ আনা + ভূমিকা— বিধুশেখর ভট্টাচার্য দশ আনা + ৯২ পৃষ্ঠা।

এই বইটির মূল অংশ রবীন্দ্রনাথের কাছে পাঠানো হয় তাঁর অভিমতের জন্য। বিধুশেখর শাস্ত্রী এর একটি বিস্তৃত ভূমিকা লিখে দেন ২৭ বৈশাখ ১৩১৯ তারিখে। তাঁর ভূমিকার শেষে রবীন্দ্রনাথের উল্লিখিত অভিমতটি মুদ্রিত হয়।

৬৩

কবি কান্তিচন্দ্র ঘোষ (১৮৮৬-১৯৪৮) ওমর খৈয়ামের 'রুবাই'-এর অনুবাদক হিসাবেই সুপরিচিত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর স্নেহপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। প্রমথ চৌধুরীর সবুজপত্রের সহকারী হিসাবে তাঁর প্রতিষ্ঠা সুবিদিত। বিচিত্রা, ভারতী, সবুজপত্র, প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয়েছিল। জীবনের শেষের দিকে তিনি শান্তিনিকেতনে স্ত্রী এটা ঘোষ-সহ বসবাস করতেন।

ফিটজেরাল্ডের অনুবাদ অবলম্বনে রচিত 'রোবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম' (১৯১৯) গ্রন্থ প্রকাশের আগেই কান্তিচন্দ্রের অনুবাদগুলির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ পরিচিত হয়েছিলেন। কান্তিচন্দ্রকে একটি চিঠি লিখে রবীন্দ্রনাথ তাঁর উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে কান্তিচন্দ্রের বইয়ের ভূমিকা লিখেছিলেন প্রমথ চৌধুরী। এ বিষয়ে কান্তিচন্দ্র নিজেই লিখেছেন— 'শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় আমাকে অনেক রকমে উৎসাহ এবং পরামর্শ দিয়ে সর্বোপরি গ্রন্থের সঙ্গে তাঁর অমূল্য ভূমিকাটি গেঁথে দিয়ে আমায় কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করেছেন।' রবীন্দ্রনাথের চিঠিটি 'রোবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম' গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ (১৯২১) থেকে মুদ্রিত হতে থাকে। সেজন্য অনেকেই এটিকে ভুল করে রবীন্দ্র-রচিত ভূমিকা বলে মনে করেন। তবুও এই 'অভিমত'টি আমরা প্রকাশ করলাম।

প্রসঙ্গত, প্রমথ চৌধুরীই কান্তিচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় করিয়ে দেন। 'তিনি আমার ওমর খৈয়ামের প্রুফ-শিটগুলি আগাগোড়া পড়লেন, জায়গায় জায়গায় সংশোধন করলেন এবং কতকগুলি বিশেষ উপদেশ দিলেন'— কান্তিচন্দ্র ঘোষ, রবীন্দ্রজয়ন্তী (১) বিচিত্রা, পৌষ ১৩৩৮।

৬৪

কবি বন্দে আলি মিঞা (১৯০৬-৭৯) জন্মেছিলেন পাবনা জেলার রাধানগর গ্রামে। চিত্রাঙ্কনে দক্ষ গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এই কবির সাহিত্যসেবা ও চিত্রাঙ্কন— দুই-ই ছিল অন্যতম জীবকা। ময়নামতীর চর, অনুভাগ, সুরলীলা, পদ্মানদীর চর, সোনালী স্বপন প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ ; অস্তাচল, নারী কলঙ্কময়ী প্রভৃতি উপন্যাস ও অনেক গল্প এবং নাটকের লেখক বন্দে আলি মিঞার 'ময়নামতীর চর' প্রকাশিত হয় ১৯৩২ খৃস্টাব্দে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই কাব্যগ্রন্থটিকে অভিনন্দন জানিয়ে যে চিঠি কবিকে দেন, সেটিই গ্রন্থে মুদ্রিত হয়েছে ভূমিকার আকারে।

৬৫

তুলসীদাস সেনের পিতা জগৎমোহন সেন কবি, শিল্পী, প্রবন্ধকার কথাসাহিত্যিক ও একজন শিক্ষব্রতী ছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে 'ব্যাকরণিকা' প্রকাশের অল্প পরেই (১৯৩৪) তাঁর মৃত্যু হয়। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর সাদর পরিচয় ছিল। তাঁর 'ব্যাকরণিকা'র বহুল প্রচার হয়। মাত্র কুড়ি বছরের মধ্যে (১৯৩৩-৫৩) এর দশটি সংস্করণ প্রচারিত হয়।

'ব্যাকরণিকা'র সব চেয়ে যে বৈশিষ্ট্যটি তুলসীদাস সেন গ্রন্থের মুখবন্ধে উল্লেখ করেছেন তা হল 'কবিগুরু কোনো পাঠ্য-পুস্তক সম্বন্ধে কোনো অভিমত দেন নাই। ব্যাকরণিকা সে সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিল।' তা ছাড়া বইটিতে দৃষ্টান্ত হিসাবে রবীন্দ্রনাথের বহু রচনা উৎকলিত হয়েছে— 'রবীন্দ্রনাথের রচনা বর্তমান যুগে বাংলা রচনার আদর্শ। সেজন্য তাঁহার রচনা হইতেই বহু দৃষ্টান্ত উৎকলিত হইয়াছে।'

রবীন্দ্রনাথ দ্রুততার সঙ্গে এই চিঠিটি লিখলেও এর মধ্যে খাঁটি বাংলা ব্যাকরণের আদর্শের ইঙ্গিত রয়েছে। চিঠিটি লেখক ভূমিকা হিসাবে ব্যবহার করেছেন।

৬৬

মমতা মিত্র (১৯২১-৯৩) সুলেখিকা ছিলেন। তাঁর পিতা কালীচরণ মিত্র উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় -সম্পাদিত 'বিচিত্রা' পত্রিকা-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। স্বামী অধ্যাপক মনোমোহন ঘোষ। মমতা মিত্র কয়েকখানি কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন। মৌন ও মুখর, গীতাংশুক, শুভদৃষ্টি, মণিময়ূখ প্রভৃতি তাঁর কাব্যগ্রন্থ। এর মধ্যে 'মৌন ও মুখর' প্রকাশিত

হয় ১৯৩৫ খৃস্টাব্দে। রবীন্দ্রনাথ কাব্যগ্রন্থটি পড়ে যে চিঠি দিয়েছিলেন (২৯ অগ্রহায়ণ ১৩৪১) সেটিকেই শিরোভূষণ করে বইটি প্রকাশিত। হিমাংশু দত্ত তাঁর কিছু কবিতায় সুরারোপ করেছিলেন, খ্যাতনামা শিল্পীদের কণ্ঠে গ্রামোফোন রেকর্ডে তা প্রকাশিত হয়েছিল।

৬৭

হিমাংশুভূষণ সরকার (জন্ম ১৯০৫) বহু ভাষাবিদ্‌ অধ্যাপক এবং পরে খড়গপুর কলেজের অধ্যক্ষ হন। তাঁর গবেষণাগ্রন্থ Indian Influence on the Literature of Java and Bali প্রকাশিত হয় ১৯৩৪ খৃস্টাব্দে। এর বাংলা ভাষান্তর 'দ্বীপময় ভারতের প্রাচীন সাহিত্য' প্রকাশিত হয় ১৯৭০ খৃস্টাব্দে। রবীন্দ্রনাথের চিঠিটি ইংরেজি বই পাঠের পর রচিত।

লেখক হিমাংশুভূষণ রবীন্দ্রনাথের এই চিঠিটি তাঁর বাংলা বইটির চতুর্থ প্রচ্ছদে মুদ্রণ করেছিলেন। ঠিক ভূমিকা হিসাবে ব্যবহৃত না হলেও রবীন্দ্রনাথের প্রশংসাপত্রটির মুদ্রণের উদ্দেশ্য ছিল সে প্রকারেরই।

৬৮

শিল্পী সাহিত্যিক প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর (১৯০৭-৬৫) ছিলেন রাজা প্রফুল্লনাথ ঠাকুরের পুত্র। আচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও স্বীয় মাতুল ভাস্কর হিরণ্ময় রায়চৌধুরীর কাছে তিনি শিল্প শিক্ষা করেন। সংস্কৃত সাহিত্য ও শাস্ত্রে তাঁর ছিল প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি। ১৩৫৫ সনে তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ-এর ধনাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন। কুমারসম্ভব, পুষ্পমেঘ, দশকুমার, কলাবিলাস, আনন্দ বৃন্দাবন, হর্ষচরিত প্রভৃতি অনুবাদ গ্রন্থ এবং জীবনী 'অবনীন্দ্রচরিতম্‌' তাঁকে বাংলা সাহিত্যে সুপরিচিত করেছে।

প্রবোধেন্দুনাথের অনুবাদ 'কাদম্বরী' দুটি খণ্ডে প্রকাশিত হয়। প্রথমে (১৯৩৭ ও ১৯৩৮), পরে একখণ্ডে মুদ্রিত হয় (১৩৪৪)। এই যুক্তখণ্ডে রবীন্দ্রনাথের দুটি চিঠি প্রায় 'ভূমিকা'র সম্মানে মুদ্রিত হয়। প্রথম চিঠি রচনার তারিখ ২৫ জানুয়ারি ১৯৩৬ এবং পরেরটি লিখিত হয় ২০ আষাঢ় ১৯৪৩ (জুলাই ১৯৩৬) তারিখে। এ ছাড়াও একাধিক পত্রে রবীন্দ্রনাথ প্রবোধেন্দুকে উৎসাহিত করেন। এ বিষয়ে তাঁর ভূমিকা 'নিবেদন' অংশের প্রাশঙ্গিক অংশ উদ্ধার করি।

"... পূজ্যপাদ মহাকবি শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পাণ্ডুলিপি পাঠের পর আমাকে যে পত্র দেন (২৪/১২/৩৬) তাতে লিখেছেন, 'শান্তিনিকেতন' / 'কাদম্বরী কথা সংস্কৃত

ভাষার সুগম্ভীর ধ্বনি সংগীতে ঘনসন্নিবিষ্টভাবে সংগ্রহিত, তরঙ্গিত ধ্বনিধারাই এর ভাবের বাহন। খাঁটি বাংলায় এর রস রক্ষা করে অনুবাদ করা আমি প্রায় অসাধ্য বলেই জানতেম। শ্রীমান প্রবোধেন্দু এই দুরূহ অধ্যবসায়ে যে পরিমাণে সিদ্ধিলাভ করেছেন তাতে আমি বিস্মিত হয়েছি। সাহিত্যে তাঁর এই প্রয়াস আদরণীয় হবে তাতে আমি সন্দেহ করি নে। কাদম্বরীর পূর্বভাগের শেষ অংশে নারী দেহের সৌকুমার্য বর্ণনায় যে অতিশয়োক্তি আছে, এবং তার অনতিপরেই অত্যন্ত অসংগতভাবে শুকসারীর যে বিবাদ বর্ণিত হয়েছে, সেই পংক্তিগুলি বর্জন করলে আমার মতে বাণভট্টের প্রতি সম্মান দেখানো হবে। লেখক ইচ্ছা করেন যদি তবে অনুবাদ অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্যে ঐ অংশগুলি পরিশিষ্টে দিতে পারেন। ইতি ২৪/১১/৩৬

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর'

"বলা বাহুল্য, বাণভট্টের দোষ-গুণ বিচার না করেই আমি মূলগ্রন্থে ঐ সকল অংশ সন্নিবিষ্ট করেছি।...

"এই কাদম্বরী কথার অনুবাদ করতে আমাকে প্রথম আদেশ দেন পিতামহ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁকে আমি প্রণাম করি।"

"আমার গুরুদেব শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর পাণ্ডুলিপি মার্জিত করে দিয়েছেন। তাঁকে আমি প্রণাম করি।..."

প্রবোধেন্দুনাথের 'কাদম্বরী' ১ম খণ্ডের ভূমিকা লিখেছিলেন প্রকৃতপক্ষে বিধুশেখর ভট্টাচার্য। তিনি এই ভূমিকায় প্রসঙ্গক্রমে লিখেছিলেন— 'বহুপূর্বে স্বর্গীয় পণ্ডিত তারাশঙ্কর এই কাদম্বরীর কেবল গল্পভাগ বাংলায় অনুবাদ করেন। বাংলা-পাঠকেরা ইহাতে কেবল তামার কঙ্কালমাত্র পাইয়াছিলেন। ইহার পরে শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও স্বর্গীয় মণিলালা গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় ঐ অনুবাদকেই অবলম্বন করিয়া ও তাহাতে মূলের কোনো কোনো বর্ণনার কিছু কিছু যোগ করিয়া তাহাকে নূতন আকারে গঠন করেন। ইহা মূল অনুবাদ হইতে নিশ্চয়ই উৎকৃষ্টতর হইয়াছে। কিন্তু ইহাকেও নানা গুণে সর্বতোভাবে অতিক্রম করিয়াছে শ্রীযুক্ত প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বর্তমান অনুবাদ।...

'... মূলকে অবলম্বন করিয়া যেন তিনি এক নবীন সৃষ্টি করিয়াছেন।... বঙ্গ সাহিত্যের ইহা অনুবাদ সম্পদ হইয়া থাকিবে।

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য'

৬৯

অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র রবীন্দ্রনাথের স্নেহের স্পর্শে ধন্য হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের চিঠিটি সুরেন্দ্রনাথের 'ব্রাউনিং পঞ্চাশিকা' সম্পর্কে লিখিত হলেও এই চিঠিখানি ছাপা হয়েছে তাঁর 'শতপর্ণী' কাব্যগ্রন্থের ভূমিকা হিসাবে। শতপর্ণী একটি কবিতার বই, বলা ভালো সনেট সংকলন। আষাঢ় ১৩৪৪ সালে এর প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় থেকে। রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষরে চিঠিটি মুদ্রিত।

'ব্রাউনিং পঞ্চাশিকা', রবার্ট ব্রাউনিঙের পঞ্চাশটি নির্বাচিত কবিতার অনুবাদ, প্রকাশ করেছিলেন গুরুদাশ চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স।

৭০

হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পঞ্চম কন্যা শোভনা। বিদুষী এই মহিলার সঙ্গে বিয়ে হয় ব্যরিস্টার নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের। বিয়ের পর শোভনা চলে গেলেন স্বামীর কর্মক্ষেত্রে। নগেন্দ্রনাথ ছিলেন সাহিত্যানুরাগী, মাইকেল মধুসূদনের অনুকরণে লিখেছিলেন 'যক্ষাঙ্গনা কাব্য'। তিনি স্ত্রীকে সাহিত্যচর্চায় উৎসাহ দিতে লাগলেন। ফলে স্ত্রী লিখলেন নানা লোকগল্প, অনুবাদ করলেন উপন্যাস এবং কয়েকটি ইংরেজি বই লিখলেন— *Indian Nature's Myth, Indian Fables and Folklore, The Orient Pearls* (১৯১৫) প্রভৃতি। বাংলাতে লিখেছিলেন কিছু ভ্রমণমূলক রচনা। হঠাৎ সন্ন্যাসরোগে তাঁর মৃত্যু হয়।

শোকার্ত পত্নীপ্রেমিক নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় লিখলেন একটি শোকগাথা 'প্রেমাঞ্জলি' (Love-offerings)। রবীন্দ্রনাথ একটি অভিনব ভূমিকা— মৃত শোভনার উদ্দেশে রচিত একটি কবিতা— রচনা করে দিলেন। 'প্রেমাঞ্জলি'র (১৩৪৫ আখ্যাপত্রে লেখা আছে 'পিতৃব্য বিশ্ববন্দ্য কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আশীর্বাণী সহ।' এমন ভূমিকা অন্যত্র দেখি না। শোভনাকে উদ্দেশ করে লিখিত এই আশীর্বাণীকে আমরা ভূমিকা বলে গণ্য করেছি। রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত এর পাণ্ডুলিপিতে ও অন্যত্র সংকলিত গ্রন্থে পাঠভেদ লক্ষ করা যায়।

৭১

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্রবধূ, দ্বিপেন্দ্রনাতের স্ত্রী হেমলতা দেবী ১৮৭৩-১৯৬৭) শান্তিনিকেতনে 'বড় মা' নামেই সুপরিচিত ছিলেন। ৬টি গল্প একত্র সংকলন করে তিনি

'দেহলি' নামে একটি ১৩৫ পৃষ্ঠার বই প্রকাশ করেন। এটি আশ্বিন ১৩৪৬ বঙ্গাব্দে বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ থেকে প্রকাশিত হয়। বইটির মুদ্রিতাংশ পড়ে রবীন্দ্রনাথ হেমলতা দেবীকে যে চিঠিটি লেখেন সেটিই 'শিরোভূষণ'-রূপে প্রকাশিত। একে ঠিক ভূমিকা বলা উচিত হবে না, যদিও ভূমিকারূপেই এটি ব্যবহৃত হয়েছে।

প্রসঙ্গত, পরবর্তী জীবনে 'সরোজনলিনী আশ্রম' 'নারীশিক্ষা সমিতি', 'হিরণ্ময়ী শিল্পাশ্রম' এবং 'ভারত শ্রীমহামণ্ডলে'র সঙ্গে সংযুক্ত হেমলতার একটা সাহিত্যিক জীবনও ছিল। 'শ্রীনিবাসের ভিটা' নাটিক, 'জ্যোতি', 'অকল্পিতা' ও 'আলোর পাখি' কাব্যগ্রন্থ এবং 'জল্পনা' নিবন্ধ গ্রন্থে তাঁর সাহিত্য পরিচয় ছড়িয়ে আছে। রবীন্দ্রস্নেহধন্যা হেমলতা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'লীলা' পুরস্কারেও সম্মানিত হয়েছিলেন।

৭২

শচীন্দ্রনাথ সেন (জন্ম ১৯০২) জন্মেছিলেন পালং-এ। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.এ., পি-এইচ. ডি. শচীন সেন ছিলেন রবীন্দ্রনাথের অনুরাগী মানুষ। তাঁর *The Political Thought of Tagore* রবীন্দ্রনাথকে তুষ্ট না করলেও 'রবীন্দ্রসাহিত্যের পরিচয়' বইটি (প্রকাশ আশ্বিন ১৩৪৬) পড়ে কবি খুশি হয়ে মংপু থেকে গ্রন্থকারকে একটি চিঠি দেন। সেই চিঠিটি কবির হস্তাক্ষরে 'রবীন্দ্রসাহিত্যের পরিচয়' গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণে (১৩৬২) লেখক ভূমিকা হিসাবে মুদ্রিত করেন। 'গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া কবিগুরু লেখকের নিকট যে পত্রখানি লিখিয়াছিলেন, তাহা এই সংস্করণের ভূমিকারূপে ছাপা হইল।'— তৃতীয় সংস্করণের (১৩৬২) নিবেদন।

তাঁর অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে আছে— প্রভাসের কথা, তপতী, এই তো জীবন, *The Tenure of Agricultural Land, The Birth of Pakistan, The Press and Democracy* ইত্যাদি।

৭৩

বাংলা সাহিত্য ও ভাষাতত্ত্ববিদ্ সুকুমার সেন (১৯০০-৯২) মননশীল মহলে একটি সুপরিচিত নাম। তাঁর রবীন্দ্রবিষয়ক গ্রন্থাদির মধ্যে পরিবেশ পরিজনে রবীন্দ্র বিকাশ, রবীন্দ্রের ইন্দ্রধনু, রবীন্দ্রনাথের গান উল্লেখযোগ্য। তাঁর সুখ্যাত 'বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস'-এর প্রথমাংশ গ্রন্থ-প্রকাশের পূর্বেই পাঠ করে রবীন্দ্রনাথ তাঁর অভিনন্দন তিনি সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে একটি চিঠি লিখে জ্ঞাপন করেন। এ বিষয়ে সুকুমার সেন তাঁর বইয়ের 'প্রথম সংস্করণের ভূমিকা'য় প্রসঙ্গক্রমে লিখেছিলেন— 'বইটির মুদ্রিত

কতক অংশ (৭৫২ পৃষ্ঠা পর্যন্ত) দেখিয়া রবীন্দ্রনাথ তাঁহার যে অভিমত শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে লিখিত পত্রে জানাইয়াছেন তাহা বহুমান্য শিরোভূষণ করিয়া এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইল।'

রবীন্দ্রনাথও ভূমিকা লেখেন নি, গ্রন্থকারও এটিকে ভূমিকা হিসাবে দাবি করেন নি। তবে অন্যজনকে লেখা চিঠিকে 'শিরোভূষণ' করে প্রকাশের এটিই একতম উদাহরণ।

৭৪

ডাক্তার পশুপতি ভট্টাচার্যের 'ভারতীয় ব্যাধি ও আধুনিক চিকিৎসা' গ্রন্থের আলোচনা আমরা আগেই করে এসেছি। এই বইটি কবির নিত্যসঙ্গী ছিল। লেখক লিখেছেন— 'কোনো রোগের চিকিৎসা করতে গিয়ে উনি প্রায়ই এই বইখানি খুলে পড়তেন।'

এই বইটি রচনার পর তাঁর সাহস আরো সঞ্চিত হয়। তিনি স্বাস্থ্য ও রাগ সম্পর্কে মাসিক পত্রাদিতে নানা নিবন্ধ লিখছেন লক্ষ্য করে কবি তাঁকে 'ফিজিওলটি'টা ধারাবাহিকভাবে লেখার পরামর্শ দেন। তখন পশুপতিবাবু খাদ্য এবং পরিপাকক্রিয়া সম্পর্কে লিখে সজনীকান্ত দাসের মারফত কবির কাছে পাঠিয়ে দিলেন। অসুস্থ অবস্থাতেই রবীন্দ্রনাথ লেখককে ডেকে পাঠিয়ে জানিয়ে দেন যে তাঁর লেখা বিশ্বভারতীর 'লোকশিক্ষা' গ্রন্থমালায় ছাপাবার মনস্থ করেছেন। পরে তাঁকে একটি চিঠি দেন ৬.১.৪১ তারিখে।

মৃত্যুপথযাত্রী কবির এই আশীর্বচনকে শিরোভূষণ করে ডাক্তার পশুপতি ভট্টাচার্যের 'আহার ও আহার্য' (সূচীপত্র— রসদ সংগ্রহ, হজম-প্রক্রিয়া, হজমের পর খাদ্যের পরিমাণ, প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট ও ফ্যাট, শাক-সবজি ও ফলমূল, দুধ ও দুগ্ধজখাদ্য, জল ও অন্যান্য পানীয়, খাদ্য বিচার, অবস্থা ভেদে খাদ্য। অনুক্রমণিকা— বৈজ্ঞানিক শব্দের ব্যাখ্যা) বইটি 'লোকশিক্ষা' গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত হয়ে ফাল্গুন ১৩৪৮ সালে প্রকাশিত হয়। পৃষ্ঠাসংখ্যা ১১০।

৭৫

কবি সমালোচক নন্দগোপাল সেনগুপ্ত (১৯১০-৮৮) বিশ্বভারতীতে অধ্যাপনা ও রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সচিব (১৯৩৬-৩৮) হিসাবে রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসেন। 'কাছের মানুষ রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে তার বিস্তারিত বর্ণনা আছে। 'অধিনায়ক রবীন্দ্রনাথ'— তাঁর আরো একটি রবীন্দ্রবিষয়ক গ্রন্থ।

১৯৩৬-৩৮ খৃস্টাব্দে তিনি যখন বিশ্বভারতীর অধ্যাপক তখন রবীন্দ্রনাথ তাঁকে 'প্রাচীন ও আধুনিক বাংলা সাহিত্যের গতি প্রকৃতি বোঝানোর জন্য' একটি ছোটো বই লিখতে 'হুকুম' করেন। লেখক লিখেছেন— 'তাঁর ইচ্ছাক্রমে প্রাচীন বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে পাঁচ-ছ-টি অধ্যায় অতি অল্প সময়ের মধ্যে লিখে ফেলি এবং পাণ্ডুলিপি তাঁর হাতে পৌঁছে দিই। তিনি পড়ে খুশি হন এবং কৌতুক করে বলেন, 'লোকশিক্ষা সংসদের পাঠ্য হল, স্বল্পাক্ষরদের জন্যে। তারা পড়ে পরিপাক করতে পারবে তো?'

দীর্ঘদিন পাণ্ডুলিপি পড়ে থাকার পর 'বন্ধুদের তাগিদে' লেখক এটি শেষ করেন এবং তাঁর দাবি এই বই— 'প্রাচীন ও আধুনিক বাংলা সাহিত্যের পরিচয়সূচক প্রথম বই।' শেষে লেখক 'লেখকের কথা'য় লিখেছেন— 'আর স্মরণ করছি বন্দনীয় কবিকে, যাঁর অভিমত বইয়ের পরবর্তী মুদ্রণে শিরোভূষণ রূপে ব্যবহারের অনুমতি আমার চাওয়া ছিল দীর্ঘকাল আগে।'

'বাংলা সাহিত্যের ভূমিকা' বইটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৪০ খৃস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে। কবি তখন জীবিত। পরে ১৯৫৮ খৃস্টাব্দে বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হলে কবির দীর্ঘ অভিমতটি গ্রন্থসূচনায় সংযুক্ত হয়। এই অভিমতে রবীন্দ্রনাথ নন্দগোপালের বইটি সম্পর্কে বিশেষ কোনো মন্তব্য করেন নি। কিন্তু 'ভূমিকা' লেখার অবকাশে বাংলা সাহিত্যের সমসাময়িক অভিভাবকহীন অবস্থা এবং তাঁর বিরুদ্ধে নানান অভিযোগ বিষয়ে কবির নিজস্ব মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের শুভেচ্ছা ও ভূমিকা নিয়ে বেশ-কয়েকটি পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করেছিল। বলা প্রয়োজন যে সবগুলিকেই, যাকে বলে সচেতনভাবে রচিত ভূমিকা, তা বলা যায় না। তবে প্রতিটি রচনা ভূমিকার মর্যাদায় পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সেজন্যেই আমরা এগুলিকে একত্র করে দিলাম।

৭৬

ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্র (১৮৬১-১৯৩০) 'ঐতিহাসিক চিত্র' নামে যে ত্রৈমাসিক পত্রিকাটি প্রকাশ করেন, তা প্রধানত রবীন্দ্রনাথেরই উৎসাহের ফলে। এর সূচনা লেখার ভার দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের উপর সম্পাদক মহোদয়। এ বিষয়ে অক্ষয়কুমার ১৩০৫ সালের একটি চিঠিতে লিখেছিলেন— 'আপনি ঐতিহাসিক চিত্রের সূচনা লিখিবার যোগ্যপাত্র বলিয়াই সে ভার আপনাকে দিয়াছি, এখন আর বলিতে পারিবেন না যে আমি সে গান গাহিতে শিখি নাই। আপনার প্রবন্ধ না পাইলে কার্যারম্ভ হইবে না, সুতরাং একটু চেষ্টা করিয়া যথাসম্ভব সত্বর হইবেন।'

অবশ্য রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এই পত্রিকার যোগ তৎকালের কোনো কোনো মহলে বিরূপ মন্তব্যের জন্ম দিয়েছিল। তাঁরা রটনা করেছিলেন এই পত্রিকা সম্ভবত ঠাকুরবাড়ির গৌরব ঘোষণার জন্যই প্রকাশিত হতে চলেছে— ৯ সেপ্টেম্বর ১৮৯৮ তারিখে লেখা একটি চিঠিতে অক্ষয়কুমার রবীন্দ্রনাথের কাছে এমন তথ্যই উদ্‌ঘাটিত করেছিলেন।

যাই হোক, রবীন্দ্রনাথের সূচনাসহ 'ঐতিহাসিক চিত্র' জানুয়ারি ১৮৯৯ তারিখে প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধটি ব্যতীত 'ঐতিহাসিক চিত্র' নামে পৃথক একটি প্রবন্ধ এই পত্রিকা-প্রকাশের সূত্রে তিনি রচনা করেন। সূচনায় লেখা হয়েছিল— "আমরা 'ঐতিহাসিক চিত্র' -নামক একখানি ঐতিহাসিক পত্রের মুদ্রিত প্রস্তাবনা প্রাপ্ত হইয়াছি। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের সম্পাদকতায় তাহা প্রকাশিত হইবে।" এই প্রবন্ধটি 'ভারতী' পত্রিকার ভাদ্র ১৩০৫ সংখ্যার 'প্রসঙ্গ কথা' আলোচনা বিভাগে পত্রস্থ হয় এবং পরে রবীন্দ্র-রচনাবলীর নবম খণ্ডে 'আধুনিক সাহিত্য' অংশে 'ঐতিহাসিক চিত্র' নামে প্রকাশিত হয়।

বর্তমান 'সূচনা' নামক ভূমিকাটি 'ঐতিহাসিক চিত্র' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় পত্রস্থ হয়। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় -সম্পাদিত ও রাজশাহী থেকে প্রকাশিত এই ত্রৈমাসিক পত্রিকার আয়ু ছিল মাত্র এক বছর। 'ইহা সাধারণত ভারতবর্ষের, এবং বিশেষত বঙ্গদেশের, পুরাতত্ত্বের উপকরণ সংকলনের জন্যই যথাসাধ্য যত্ন করিবে'— পত্রিকার এই ছিল উদ্দেশ্য। এই প্রসঙ্গে 'বঙ্গভাষার লেখক' গ্রন্থের (পৃ. ৭৪৬) আত্মকথায়

সম্পাদক বলেছেন— "রবীন্দ্রনাথ 'ভারতী' পত্রের সম্পাদন ভার গ্রহণ করেন [১৩০৫ সাল] তাঁহার সহায়তায় এবং তাঁহার প্রস্তাবে ঐতিহাসিক চিত্র নামক ত্রৈমাসিক পত্রের সম্পাদন ভার গ্রহণ করি। ঐ পত্র এক বৎসরের অধিক চলে নাই।"

৭৭

ব্রাহ্মসমাজ-সূত্রে রবীন্দ্রনাথ 'সঞ্জীবনী'-সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন। এঁর কন্যা ছিলেন কুমুদিনী মিত্র (১৮৮২-?, পরে বসু) কবির স্নেহাস্পদ পাত্রী। ১৩১৪ সালের শ্রাবণ মাসে তাঁর সম্পাদনায় 'সুপ্রভাত' নামে একটি মাসিক-পত্রিকা প্রকাশিত হয়। মহিলা-পরিচালিত ও নয় ব?র আয়ু-যুক্ত এই পত্রিকাটির স্থান ছিল অতি উচ্চে। এর 'কণ্ঠে' নিম্নোক্ত কবিতাটি শোভা পেত :

সত্য সেবা ব্রতে সিদ্ধিলাভ কর
নবশক্তি হৃদে ফুটিবে,
একতা মন্ত্রের মঙ্গল ডোরে
তন্দ্রা অলসতা ছুটিবে।

পত্রিকাটি প্রকাশের উদ্যোগ লগ্নে কুমুদিনীর অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ 'সুপ্রভাত' নামে একটি কবিতা ১৩১৪ সালে ৮ বৈশাখ রচনা করে পাঠিয়ে দেন। 'সুপ্রভাত'-এর প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত এই কবিতাটির সুপরিচিত পঙ্‌ক্তিগুলি স্মরণযোগ্য—

উদয়ের পথে শুনি কার বাণী
"ভয় নাই, ওরে ভয় নাই।
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান
ক্ষয় নাই, তার ক্ষয় নাই।"

'পূরবী'র প্রথম সংস্করণে (শ্রাবণ ১৩৩২) কবিতাটি গ্রন্থিত হলেও পরে এটি বর্জিত হয়। 'সঞ্চয়িতা'য় ও পরে রবীন্দ্র-রচনাবলীতে গৃহীত হয়েছে।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য— কুমুদিনী মিত্র -রচিত 'শিখের বলিদান' (১৩১৪) বইটি রবীন্দ্রনাথের ভালো লেগেছিল (দ্র. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রজীবনী, দ্বিতীয় খণ্ড চতুর্থ সংস্করণ ১৩৮৩, পৃ. ২০৮)।

৭৮

বিশ্বভারতী-শান্তিনিকেতন থেকে 'ভূমিলক্ষ্মী'-নামক একটি মাসিক পত্রিকার আত্মপ্রকাশ ঘটে আশ্বিন ১৩৩১ বঙ্গাব্দে। এর সম্পাদক ছিলেন ফণীন্দ্রনাথ বসু এবং সন্তোষবিহারী

বসু। ফণীন্দ্রনাথ বসু (১৮৯৮-১৯৩২) ছিলেন শান্তিনিকেতনের ইতিহাস-অধ্যাপক এবং সন্তোষবিহারী বসু ছিলেন শ্রীনিকেতনের কৃষিবিদ্।

সন্তোষবিহারী বসু বর্ধমানের লোক এবং বীরভূমের কৃষিবিভাগের কর্মী ছিলেন। বঙ্গীয় গভর্নমেন্টের সঙ্গে ব্যবস্থা করে তাঁকে শ্রীনিকেতনে নিয়ে আসা হয়। তাঁর চেষ্টাতে সেখানে কৃষির সবিশেষ-উন্নতি ঘটে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য কবির সস্নেহ দৃষ্টি ছিল তাঁর উপর। এর প্রমাণ আছে প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত (পৌষ ১৩৩৫, পৃ. ৪৩৮-৩৯) কবির 'কৃষিবিৎ সন্তোষবিহারী বসু' প্রবন্ধটির মধ্যে।

'ভূমিলক্ষ্মী' প্রকাশিত হবার সময় কবি সাগ্রহে প্রথম সংখ্যার প্রথম সম্পাদকদ্বয়ের হাতে তুলে দেন। এটিই 'ভূমিলক্ষ্মী' পত্রিকার ভূমিকা হিসাবে মুদ্রিত হয় এবং পরে রবীন্দ্রনাথের 'পল্লীপ্রকৃতি' গ্রন্থে গৃহীত হয়। এ বিষয়ে আরো জ্ঞাতব্য সুধীরচন্দ্র কর -রচিত 'প্রতিবেশী রবীন্দ্রনাথ' (মাসিক বসুমতী, ফাল্গুন ১৩৫৭) প্রবন্ধে। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধটি পূর্বেই রচিত হয়েছিল আশ্বিন ১৩২৫ তারিখে।

৭৯

বিপ্লবী কবি নজরুল ইসলাম (১৮৯৮-৭৬) -সম্পাদিত দুটি পত্রিকার কথার প্রাসঙ্গিক আলোচনা করছি এখন। চট্টগ্রাম জেলার হাফিজ্ মসূউদ নামে এক ব্যক্তি একটি বাংলা পত্রিকার প্রস্তাব মুজফ্ফর আহ্মদ ও নজরুল ইসলামের কাছে দিলে মাত্র আড়াইশো টাকার পুঁজি নিয়ে নজরুল নিজেই 'ধূমকেতু' নাম দিয়ে পত্রিকা প্রকাশের আয়োজন করেন। ঠিক হয় পত্রিকা সপ্তাহে দু'বার প্রকাশিত হবে। সপ্তম সংখ্যা পর্যন্ত এটি ৩নং কলেজ স্কোয়ার ও অষ্টম সংখ্যা থেকে ৭নং প্রতাপ চাটুজ্যে লেনের ঠিকানা থেকে প্রকাশিত হয়।

এর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১১ অগস্ট ১৯২২, ২৬ শ্রাবণ শুক্রবার ১৩২৯। ধূমকেতুর প্রথম সংখ্যা থেকে প্রতিটি সংখ্যার সম্পাদকীয় স্তম্ভের উপর রবীন্দ্রনাথের এই আশীর্বাণীটি তাঁর হস্তাক্ষরে মুদ্রিত হত। এটি কবি রচনা করেন ২৪ শ্রাবণ ১৩২৯ তারিখে। তারিখটি থেকে বোঝা যায়, রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাণী নজরুল আগেই চেয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে নজরুল নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়কে যা বলেছিলেন, 'কল্লোল যুগ' থেকে তা তুলে দিই— "নজরুল বললে, 'ধমুকেতু' নামে এক সাপ্তাহিক বের করছি। আপনি আসুন আমার সঙ্গে। আমি মহাকালের তৃতীয় নয়ন, আপনি ত্রিশূল। আসুন দেশের ঘুম ভাঙাই, ভয় ভাঙাই—

"নৃপেন উৎসাহে ফুটতে লাগল। বললে, এমন শুভকাজে দেবতার কাছে আশীর্বাদ ভিক্ষা করবেন না? তিনি কি চাইবেন মুখ তুলে? তবু নজরুল শেষ মুহূর্তে তাঁকে টেলিগ্রাম করে দিল। রবীন্দ্রনাথ কবে কাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন? শুধু নামে আর টেলিগ্রামেই তিনি বুঝতে পারলেন 'ধূমকেতু'র মর্মকথা কী। যৌবনকে 'চিরজীবী' আখ্যা

দিয়ে 'বলাকা'য় তিনি 'আধ-মরাদের ঘা মেরে' বাঁচাতে বলেছিলেন, সেটাতে রাজনীতি ছিল না, কিন্তু এবার 'ধূমকেতু'কে তিনি যা লিখে পাঠালেন তা স্পষ্ট রাজনীতি, প্রত্যক্ষ গণজাগরণের সংকেত।"

প্রসঙ্গত, নজরুলের বিখ্যাত কবিতা 'ধূমকেতু'ও এই প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

৮০

কাজী নজরুল ইসলাম -সম্পাদিত 'লাঙল' পত্রিকা প্রকাশিত হয় ৩৭ হ্যারিসন রোড (বর্তমান মহাত্মা গান্ধী রোড) থেকে ২৪ ডিসেম্বর ১৯২৫ তারিখে। এর প্রথম সংখ্যায় নজরুলের সুখ্যাত 'সাম্যবাদী' কবিতাটি পত্রস্থ হয়।

এ সময়েই তিনি পরিচিত হন সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে। তাঁকে নজরুল ভার দিলেন রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে 'লাঙলে'র জন্য আশীর্বচন সংগ্রহ করে আনতে। একদিন সকালবেলায় সৌম্যেন্দ্রনাথ সেই আর্জি পেশ করলেন রবীন্দ্রনাথের কাছে। রবীন্দ্রনাথ তখনই পঙ্‌ক্তি দুটি রচনা করে দিলেন। লাঙলের পরবর্তী সংখ্যা থেকে এর প্রচ্ছদে রবীন্দ্রনাথের এই 'আশীর্বচন'টি মুদ্রিত হতে থাকে ভূমিকার স্মরণীয় সম্মানে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বসন্ত' নাটিকাটি কারাগারে আবদ্ধ নজরুলকে উৎসর্গ করেন।

৮১

'ভূমিলক্ষ্মী' পত্রিকা যে সময়ে প্রকাশিত হয় প্রায় সেই সময়েই বর্ধমান সমবায় বিভাগ থেকে 'উপায়' নামে একটি মাসিক পত্র প্রকাশিত হয়। এর ভূমিকাস্বরূপ কিছু লিখে দেবার জন্য অনুরোধ নিয়ে কবির কাছে আসেন বর্ধমান জেলার তৎকালীন কৃষি-অধ্যক্ষ হিরণকুমার বসাক। কবির অনুরোধে রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় সেটি কবির কাছ থেকে সংগ্রহ করে পাঠিয়ে দেন। এটি-ই 'উপায়' পত্রিকার 'প্রস্তাবনা' হিসাবে বৈশাখ-শ্রাবণ ১৩৩১ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এ বিষয়ে আরো জ্ঞাতব্য প্রসাবী অগ্রহায়ণ ১৩৩১, পৃ. ২৩৭।

৮২

১৩৩৪ সালের আষাঢ় মাসে উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের (১৮৮১-১৯৬০) সম্পাদকতায় 'বিচিত্রা' প্রকাশিত হয়। বৈশাখ মাসেই এই সংবাদ প্রকাশিত হয়। উপেন্দ্রনাথকে

সহযোগিতা করেন অমলচন্দ্র হোম এবং কান্তিচন্দ্র ঘোষ। চারু রায়-কৃত প্রচ্ছদে জমকালো হয়ে 'বিচিত্র' আত্মপ্রকাশ করে। প্রথমেই 'নটরাজ' রচনা-নিরত রবীন্দ্রনাথের ছবি এবং পরেই রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষরে 'চিচিত্রা' কবিতা নিয়ে প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়।

'বিচিত্রা' কবিতাটি রচনা করেন কবি ১৩৩৪ তারিখে। অনুমান করা যায় অমল হোমের অনুরোধেই কবি 'ভূমিকা'স্বরূপ কবিতাটি লিখে দেন। পরে 'পরিশেষ' কাব্যগ্রন্থে সংযুক্ত হয়। 'চিত্রা' ও 'বিচিত্রা' কবিতা ছাড়াও বস্তুত সমগ্র সংখ্যাটিই রবীন্দ্র-রচিত। কারণ ৬৪ পৃষ্ঠাব্যাপী 'নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা'— এর পরেই বিচিত্রিত হয়ে মুদ্রিত হয়।

৮৩

'পরিচয়' পত্রিকা প্রকাশিত হয় শ্রাবণ ১৩৩৮ বঙ্গাব্দে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের (১৯০১-৬০) সম্পাদনায়। এর সূচনায় রবীন্দ্রনাথকে সংযুক্ত করার ইচ্ছা সংগঠকদের সম্ভবত ছিল না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথই উদ্যোগী হয়ে 'পরিচয়'-এর প্রকাশকে স্বাগত জানান। পরে এর লেখকগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাকে সারগর্ভ করে তোলেন। এ বিষয়ে কর্ণাধারদের অন্যতম হিরণকুমার সান্যাল লিখেছেন ('পরিচয়-এর কুড়ি বছর ও অন্যান্য স্মৃতিচিত্র', পৃ. ৩৫-৩৭) 'প্রথম সংখ্যা বের হবার আগে সংকল্প করা হয়েছিল যে রবীন্দ্রনাথের কাছে লেখার জন্য হাত পাতা হবে না। কিন্তু রবীন্দ্র-বর্জিত প্রথম সংখ্যা ছেপে রবীন্দ্রনাথ যখন আমাদের উৎসাহ দিলেন, তখন আমরা বুঝলাম যে পরিচয় সম্পূর্ণ স্বকীয় শক্তিতে সমুখ, অতএব রবীন্দ্রনাথের কাছে লেখা দাবি করতে আর কোনো দ্বিধার কারণ থাকতে পারে না। এই দাবি রবীন্দ্রনাথ পূর্ণ করলেন পত্রিকা সম্বন্ধে সম্পাদককে একটি চিঠি লিখে। 'পত্রিকা' নামে দ্বিতীয় সংখ্যার গোড়াতে এই চিঠি ছাপা হয়েছিল।'

আমরা যদিও রবীন্দ্রনাথের সেই পত্র-প্রবন্ধটি এখানে উদ্ধৃত করেছি তবুও এক হিসাবে হয়তো একে ভূমিকা বলা চলে না। তবে 'পরিচয়'-গোষ্ঠী একে ভূমিকারই সম্মান দিয়ে এসেছেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য এই দ্বিতীয় সংখ্যাতে রবীন্দ্রনাথের আরো একটি রচনা পত্রস্থ হয়েছিল। এই দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হয় কার্তিক ১৩৩৮ বঙ্গাব্দে।

৮৪

বঙ্কিমচন্দ্র-সম্পাদিত বঙ্গদর্শন পত্রিকার আত্মপ্রকাশ ঘটে ১২৭৯ বঙ্গাব্দে। কালক্রমে পত্রিকার প্রচার বন্ধ হয়ে গেলেও এর অভাব উত্তরকালে পাঠকেরা অনুভব করেছেন লক্ষ্য করে ন্যাশনাল লিটারেচার কোম্পানি নামক এক অভিজাত প্রকাশক এর হুবহু

পুনর্মুদ্রণে উদ্যোগী হন। তাঁরা রবীন্দ্রনাথের কাছে এ বিষয়ে অভিমত প্রার্থনা করলে রবীন্দ্রনাথ তাঁর শুভেচ্ছা এইভাবে ব্যক্ত করেন। রবীন্দ্রনাথের শুভেচ্ছাবাণীটি প্রকাশকেরা গ্রন্থের শিরোভূষণ হিসাবে ব্যবহার করেন।

পুনর্মুদ্রণ সংস্করণের প্রকাশ আরম্ভ হয় ১৩৪৬ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে। দ্বিতীয় খণ্ডের পুনর্মুদ্রণ ঘটে জ্যৈষ্ঠ মাসে। রবীন্দ্রনাথের আশীর্বচনটি পুনর্মুদ্রিত সংস্করণের কেবল মাত্র দ্বিতীয় খণ্ডে মুদ্রিত হয়ে সংযুক্ত হয়েছে কবির হস্তাক্ষর লিপিতে।

৮৫

'সংহতি' ছিল বাংলা দেশে শ্রমজীবীদের জন্য 'প্রথমতম মুখপত্র, প্রথমতম মাসিক পত্রিকা।' অবশ্য শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ই 'ভারতের শ্রমজীবী' পত্রিকা প্রকাশ করে শ্রমজীবীদের জন্য ভাবনা চিন্তা করেছিলেন বহু আগেই। 'সংহতি' নতুন করে গণশক্তিকে সংহত করার কাজে লেগেছিল 'লাঙল', 'গণবাণী' বা 'গণশক্তি' প্রকাশের অনেক আগেই।

বিপিনচন্দ্র পালের পুত্র জ্ঞানাঞ্জন পালের (১৮৯৬-১৯৭৯) সম্পাদনায় পত্রিকাটি প্রকাশিত হয় ১৩৩০ সালে। অন্যতর সম্পাদক ছিলেন মুরলীধর বসু। এর পরিকল্পক-প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন জিতেন্দ্রনাথ গুপ্ত। তাঁর প্রস্তাব বিপিনচন্দ্র সমর্থন করে পত্রিকার নামকরণ করেন 'সংহতি'।

এর প্রথম সংখ্যার সূচনায় কামিনী রায়ের কবিতা 'নিদ্রিত দেবতা জাগো' প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধ লেখেন বিপিনচন্দ্র পাল ও কাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়। এর ছাপানো নকল, পত্রিকা প্রকাশের আগেই (ডামি), পাঠানো হয় রবীন্দ্রনাথ ও ব্রজেন্দ্রনাথ শীলকে। ব্রজেন্দ্রনাথ টেলিগ্রাফে যে আশীর্বাণী পাঠান তার বাংলা অনুবাদ ছাপানো হয় পত্রিকার প্রচ্ছদে। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত 'কল্লোলযুগে' লিখেছেন (ষষ্ঠপ্রকাশ ১৩৮৭ পৃ. ২৫)— 'আর রবীন্দ্রনাথ? এক পরমাশ্চর্য সন্ধ্যায় পরম অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁর এক অপূর্ব প্রবন্ধ এসে পৌঁছল। সেই প্রবন্ধ ছাপা হল জ্যৈষ্ঠের সংখ্যাতে।' সেটিকেই পত্রিকাটিতে ভূমিকা হিসেবে করা ব্যবহার হয়। পত্রিকাটি মাত্র দু-বছর জীবিত ছিল।

রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ-সংবলিত কয়েকটি পত্রিকা সম্পর্কে কিছু তথ্য :

৮৬

উত্তরা : ১৯২৫ সালের চৈত্রমাসে লক্ষ্ণৌ-এ প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে অতুলপ্রসাদ সেন প্রবাসী বাঙালিদের জন্য একটি পত্রিকা প্রকাশের প্রস্তাব দেন তারই ফলে ১৩৩২

সালের অগ্রহায়ণ মাসে অতুলপ্রসাদ সেন ও রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় (সহ-সম্পাদক সুরেশ চক্রবর্তীই পরবর্তীকালে পূর্ণ সম্পাদক হন) প্রকাশিত হয় মাসিক পত্রিকা 'উত্তরা'। রবীন্দ্রনাথ অতুলপ্রসাদের এই মানসকন্যাকে আশীর্বাদ করে যে কবিতাটি পাঠান সেটি পত্রিকার প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় কবির হস্তাক্ষরে মুদ্রিত হয়।

এই কবিতাটি পরে 'পরিশেষ' কাব্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

৮৭

বঙ্গলক্ষ্মী : গুরুসদয় দত্তের স্ত্রী সরোজনলিনী দত্তের স্মৃতিরক্ষার্থে প্রতিষ্ঠিত মহিলা-সমিতির মুখপত্র 'বঙ্গলক্ষ্মী' মহিলা-ত্রৈমাসিক পত্রিকাটি কুমুদিনী বসুর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় ১৩৩২ সালের অগ্রহায়ণ মাসে। এর দ্বিতীয় সংখ্যায় কবির হস্তাক্ষরে কবির এই আশিস্‌বাণীটি মুদ্রিত হয়।

৮৮

উদয়ন : অনিলকুমার দে-র সম্পাদনায় সুচিত্রত মাসিকত্র 'উদয়ন' পত্রিকার প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় বৈশাখ ১৩৪০ সালে। প্রথম সংখ্যাতেই রবীন্দ্রনাথের চিত্র ও আশীর্বাণী মুদ্রিত হয়। এ ছাড়া বঙ্কিমচন্দ্রের চিত্র ও বঙ্কিম-তর্পণও প্রথম সংখ্যাতেই পত্রস্থ হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাণী কবির হস্তাক্ষরেই মুদ্রিত হয়।

এই কাব্যবাণীটি কোনো গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয় নি।

৮৯

অভ্যুদয় : ১৩৩৯ সালে রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে আত্মপ্রকাশ করে 'অভ্যুদয়' মাসিক পত্রিকা। সম্পাদক সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় এই প্রসঙ্গে লেখেন— 'আজ ২৫শে বৈশাখ। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন— ইতিহাসের চিরস্মরণীয় ঘটনা। অভ্যুদয় তাহার জন্মদিনে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের অমৃতনিষ্যন্দী লেখনীর অমোঘ আশীর্বাদ মস্তকে বহন করিয়া প্রকাশিত হইল। অভ্যুদয়-এর জন্মকথা কবির অমর বাণীতে মূর্ত হইয়া রহিল।

প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় কবির হস্তাক্ষরে মুদ্রিত এই কবিতাটি সমগ্রত 'বীথিকা' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এটি পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যাতেও মুদ্রিত হয়। প্রথম সংখ্যা পাঠ করে রবীন্দ্রনাথ সম্পাদককে চিঠিতে লেখেন—

কল্যাণীয়েষু

অভ্যুদয়ের প্রথম সংখ্যা পেয়ে আনন্দ লাভ করলুম। তোমাদের উদার উদ্দেশ্য সার্থক হোক এবং পাঠক সমাজে অভ্যুদয় প্রতিষ্ঠালাভ করুক এই কামনা করি।

৩০ বৈশাখ ১৩৪০

ইতি— শুভাকাঙক্ষী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৯০

বেতারজগৎ : ১৯৩৮ সালের ১৬ অগস্ট অল ইন্ডিয়া রেডিয়োর কলকাতা কেন্দ্রের শর্টওয়েভ ট্রান্সমিটারের উদ্‌বোধন উপলক্ষে এর মুখপত্র 'বেতার জগৎ'-এর একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশকালে এর তৎকালীন সম্পাদক নলিনীকান্ত সরকার রবীন্দ্রনাথের কাছে আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন। প্রথমে অসম্মত হলেও পরে একটি চিঠিতে শিরোনামহীন একটি কবিতা লিখে সুধাকান্ত রায় চৌধুরীর মাধ্যমে পাঠিয়ে দেন এবং সেটি কবির হস্তাক্ষরে বেতার জগতের বিশেষ সংখ্যাটিতে (১৬-৩১ অগস্ট ১৯৩৮) কবির একটি অনতিস্পষ্ট প্রতিকৃতির উপর মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয়।

কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের 'স্ফুলিঙ্গ' এবং রবীন্দ্র-রচনাবলী একত্রিংশ খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত।

৯১

মৎস্যজীবী : ১৩৪০ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে জ্যোতিষচন্দ্র বিশ্বাস ও অবিনাশচন্দ্র দাশের সম্পাদনায় এই পত্রিকাটি মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের মুখপত্র হিসাবে মুদ্রিত হলে রবীন্দ্রনাথের আশীসলিপিটি কবির হস্তাক্ষরে মুদ্রিত হয়।

এ ছাড়া পত্রাকারে মহাত্মা গান্ধীর আশীর্বাদ এবং রবীন্দ্রনাথ ('এই-সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে দিতে হবে ভাষা' শীর্ষক ও সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'শূদ্র' কবিতার তিনটি চরণ ('শূদ্র মহান গুরু' ইত্যাদি) উদ্ধৃত হয়েছিল।

৯২

নিরুক্ত : বাংলা লিটল ম্যাগাজিনের অন্যতম পথিকৃৎ 'নিরুক্ত' ১৩৪৭ সালের আশ্বিন মাসে প্রেমেন্দ্র মিত্র ও সঞ্জয় ভট্টাচার্য -সম্পাদিত হয়ে প্রকাশিত হয়। প্রেমেন্দ্র মিত্র

এই উপলক্ষে কবির কাছে শুভেচ্ছা প্রার্থনা করলে কবি ২২ অগস্ট ১৯৪০ সালে এই কবিতাটি লিখে পাঠিয়ে দিলে প্রথম সংখ্যাতেই এটি মুদ্রিত হয়।

৯৩

বিজ্ঞান পরিচয় : ঢাকা থেকে ১৯৪১ সালের জানুয়ারি মাসে সর্বাণীসহায় গুহ সরকার -সম্পাদিত এই পত্রিকার জন্য কবি আশীর্বাদ লিপি পাঠিয়ে দিলে এটি প্রথম সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠাতেই মুদ্রিত হয়। এটি কবির জীবৎকালের একেবারে শেষের দিকে রচিত।

৯৪

পুষ্পপাত্র : এই পত্রিকাটি ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র মিত্র ও চারুচন্দ্র মিত্র -কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে ১৩৩৩ সালে প্রকাশিত হয়। পত্রিকার প্রথম বর্ষে রবীন্দ্রনাথের শুভেচ্ছা বাণীটি 'নববর্ষে রবীন্দ্রনাথ আশীর্বাদ' নামে ছাপা হয়।

পরে এটি 'স্ফুলিঙ্গ' কাব্যগ্রন্থে সংকলিত হয়।

৯৫

ছন্দা : এর সম্পাদক ছিলেন হেমেন্দ্রকুমার রায়। ১৩৪৩ সালে রবীন্দ্রনাথ করঞ্জাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাধ্যমে যে শুভেচ্ছা-বাণীটি পাঠিয়ে দেন তা এর পত্রিকাটির ৩২ সংখ্যায় মুদ্রিত হয়। এটি কোথাও গৃহীত হয় নি।

৯৬

ভারত : সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রখ্যাত নেতা ও জাতীয় কংগ্রেসের তেনা দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের এবং সমাজসেবী ডা. কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়ের পুত্র প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৮৯-১৯৭৩) -সম্পাদিত 'ভারত' পত্রিকাটি ২৫ কার্তিক ১৩৪৬ বঙ্গাব্দে দৈনিক আকারে প্রকাশিত হয়। প্রকাশকালে রবীন্দ্রনাথ এই ভূমিকাটি লিখে দেন এবং তা পত্রিকার প্রথম সংখ্যাতেই কবির হস্তাক্ষরে মুদ্রিত হয়। ১৯৪২ খৃস্টাব্দে 'ভারত-ছাড়ো' আন্দোলন কালে এই পত্রিকাটি ব্রিটিশ সরকার বাজেয়াপ্ত করে।

এ কারণে পত্রিকাটির কোনো সংখ্যা এখন সুলভ নয়। জাতীয় গ্রন্থাগারে এর কোনো খণ্ড নেই। এই দুষ্প্রাপ্য ভূমিকাটি 'রবীন্দ্রভবনে' রক্ষিত কাগজপত্র থেকে বর্তমান সম্পাদক কর্তৃক সংগৃহীত হয়েছে।

৯৭

প্রচারক : অতুলানন্দ রায় -সম্পাদিত প্রচারক পত্রকা ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের ৩০ শ্রাবণ প্রাকাশিত হয়। এর প্রথম পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথের এই শুভেচ্ছা লিপিটি শিরোনামহীন হয়েই মুদ্রিত হয়েছিল।

প্রসঙ্গত পত্রিকাটিতে মহাত্মা গান্ধী ও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের শুভেচ্ছা বাণীও মুদ্রিত হয়।

৯৮

চৈতালী : ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসে ছোটোদের মাসিক পত্রিকা চৈতালী বিভূতিভূষণ চৌধুরী -সম্পাদিত হয়ে প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের একটি চিত্রসহ এই কাব্যকণিকাটি রঙিন প্রচ্ছদে মুদ্রিত হয়।

কবির হস্তাক্ষরে মুদ্রিত এই কবিতাটি পরে 'স্ফুলিঙ্গ'-এ সংকলিত হয়েছে।

৯৯

জয়শ্রী : ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে 'মেয়েদের মধ্যে দেশাত্মবোধ ও শঙ্কাহীন দেশসেবার ভাব জাগ্রত করবার উদ্দেশ্য নিয়ে' জয়শ্রী পত্রিকার আবির্ভাব ঘটে। সম্পাদিক লীলা রায় (১৯৯০-৭০) রবীন্দ্রনাথকে পত্রিকাটির একটি নামকরণ করে দিতে বললে কবি পত্রিকার নামকরণ করেন 'জয়শ্রী'। সম্পাদিক একটি আশীর্বাণীও প্রার্থনা করেন। কবি তাই এই আশীর্বাণীটি পাঠিয়ে দেন। এটি পত্রিকার চৈত্র ১৩৩৮ সংখ্যায় পত্রস্থ হয়।

এগুলি ছাড়া 'প্রবাসী' পত্রিকার প্রথম প্রকাশকাল (১৩০৮) রবীন্দ্রনাথ 'প্রবাসী' নামে একটি কবিতা লেখেন। তবে এটি কোনো শুভেচ্ছাবাণী ছিল না। পরে এর রজতজয়ন্তী সংখ্যা প্রকাশকালে তিনি একটি কাব্যাশিস্ পাঠিয়ে দেন। সেটি একটি বিখ্যাত কবিতা— 'পরবাসী, চলে এসো ঘরে/অনুকূল সমীরণ-ভরে/...' ইত্যাদি। ১৩৩২ সালের চৈত্র মাসে লেখা এই কবিতাটি পত্রিকার বৈশাখ ১৩৩৩ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। পরে 'পরিশেষ' কাব্যগ্রন্থে গৃহীত।

সংক্ষিপ্তাকারে গীতবিতান-এ গান হিসাবেও এটি গৃহীত হয়েছে।

দ্বিতীয় বিভাগ : তৃতীয় অধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ বেশ-কয়েকটি অ-ভারতীয় ভাষায় রচিত বইয়ের ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন। এই গ্রন্থকারেরা পৃথিবীর নানা প্রান্তের নানা ভাষা-ভাষী। কেউ ইংরেজ, কেউ জাপানি, কেউ-বা অন্য দেশের অধিবাসী। এদেশেরও অনেকেই ইংরেজি ভাষায় বই লিখেছেন। রবীন্দ্রনাথ-রচিত ইংরেজি ভূমিকা-সংবলিত সেই বইগুলি সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক টীকা এখানে মুদ্রিত হল।

১

রবীন্দ্রনাথ প্রথম যে ইংরেজি বইয়ের ভূমিকা লেখেন তা একটি সংগীত-সম্পর্কিত গ্রন্থে এবং সেটি ১৯১৩ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত। ১৯১২ খৃস্টাব্দের ১৬ জুন রবীন্দ্রনাথ পুত্র ও পুত্রবধূসহ লন্ডনে পৌঁছান। এখানে থাকার সময় একদিন প্রখ্যাত শিল্পী আনন্দ কেন্টিশ কুমারস্বামী তাঁকে বিশেষ সংগীত শোনার জন্য নিমন্ত্রণপত্র পাঠান। কবি নিমন্ত্রণরক্ষা করতে গিয়ে রতন দেবী নামে জনৈক ইংরেজ সংগীত-শিল্পীর গান শুনে মোহিত হন। এ প্রসঙ্গে 'পথের সঞ্চয়' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন (রবীন্দ্র-রচনাবলী, ষড়বিংশ খণ্ড, পৃ. ৫৫২)— "একদিন ডাক্তার কুমারস্বামীর এক নিমন্ত্রণপত্রে পড়িলাম, তিনি আমাকে রতন দেবীর গান শুনাইবেন। রতন দেবী কে বুঝিতে পারিলাম না; ভাবিলাম কোনো ভারতবর্ষীয় মহিলা হইবেন। দেখিলাম তিনি ইংরেজ মেয়ে, যেখানে নিমন্ত্রিত হইয়াছি সেখানকার তিনি গৃহস্বামিনী।

"মেজের উপর বসিয়া কোলে তম্বুরা লইয়া তিনি গান ধরিলেন। আমি আশ্চর্য হইয়া গেলাম। এ তো 'হিলিমিলি পনিয়া' নহে; রীতিমতো আলাপ করিয়া তিনি কানাড়া মালকোষ বেহাগ ধরিলেন। তাহাতে সমস্ত দুরূহ মীড় এবং তান লাগাইলেন, হাতের ইঙ্গিতে তাল দিতে লাগিলে; বিলাতি সম্মার্জনী বুলাইয়া আমাদের সংগীত হইতে তাহার ভারতবর্ষীয়ত্ব বারো-আনা পরিমাণ কষিয়া তুলিয়া ফেলিলেন না। আমাদের ওস্তাদের সঙ্গে প্রভেদ এই যে ইঁহার কণ্ঠস্বরে কোথাও যেন কোনো বাধা নাই, শরীরের মুদ্রায় বা গলার সুরে কোনো কষ্টকর প্রয়াসের লক্ষণ দেখা গেল না। গানের মূর্তি একেবারে অক্ষুণ্ণ অক্লান্ত হইয়া দেখা দিতে লাগিল।

"এ দেশে এই যাঁহারা ভারতবর্ষীয় সংগীতের আলোচনায় প্রবৃত্ত আছেন, ইঁহারা যে কেবল কৌতূহল চরিতার্থ করিতেছেন তাহা নহে; ইঁহারা ইহার মধ্যে একটা অপূর্ব সৌন্দর্য দেখিতে পাইয়াছেন— সেই রসটিকে গ্রহণ করিবার জন্য, এমন-কি, সম্ভবত আপনাদের সংগীতের অঙ্গীভূত করিয়া লইবার ইঁহারা উৎসুক হইয়াছেন। ইঁহাদের সংখ্যা এখনো নিতান্তই অল্প সন্দেহ নাই, কিন্তু আগুন একটা কোণেও যদি লাগে তবে আপনার তেজে চার দিকে ছড়াইয়া পড়ে।"

এই রতন দেবী (Alice, Ratan Devi) *Thirty Songs from Punjab and Kashmir* নামে একটি স্বরলিপিসহ পুস্তক রচনা করেন। তরন দেবীর জন্য বইটি ভূমিকাসহ অনুবাদ করেন তাঁর স্বামী আনন্দ কুমারস্বামী। রবীন্দ্রনাথ বইটির একটি Foreword লিখে দেন। ২৬ ভাদ্র ১৩১৯ তারিখে অজিতকুমার চক্রবর্তীকে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন— 'কুমারস্বামীর ইংরেজ স্ত্রী কতকগুলি ভারতবর্ষীয় গান শিখেছেন, সেগুলি নোটেশন করে ছাপাচ্ছেন, কুমারস্বামী তার লম্বা ভূমিকা লিখেছেন ; আমাকে তার একটি ছোটো মুখবন্ধ করে দেবার জন্যে ধরেছেন, সেইটে আমাকে লিখ্‌তে হল।' বইটির আখ্যাপত্র ছিল এইরূপ : Thirty songs from the Punjab and Kashmir : Recorded by Ratan Devi with Introduction and Translation by Ananda K. Coomaraswamy and a foreword by Rabindranath Tagore.

বইটির মাত্র ৪৫০ কপি দামি কাগজে ছাপানো হয়েছিল লন্ডনের Old Bourne Press থেকে এবং প্রকাশিত হয়েছিল Feb. 1913-এ। viii + 76 পৃষ্ঠার এই সচিত্র বইটির বিক্রয়ের দায়িত্বে ছিলেন Messrs, Luzac, 46 Great Russel Street এবং Nevello & Co. Ltd. 160 Wardour Street, London। দুষ্প্রাপ্য এই বইটি 'Narada'-কে উৎসর্গীকৃত। রবীন্দ্রনাথের মুগ্ধতা ভূমিকার সর্বত্র সঞ্চারিত।

২

উইলিয়াম উইলি পিয়ার্সন (১৮৮১-১৯২৪) রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে লন্ডনে পরিচিত হন ১৯১২ খৃস্টাব্দে। তখনই তিনি শান্তিনিকেতনে আসতে চাইলে তাঁর হীন স্বাস্থ্যের জন্য তাঁর মা আসতে দিতে চান নি। পরে কবির আশ্বাসে সম্মতি দেন। অ্যান্ডরুজ সাহেব তখন দিল্লিতে। তাঁর মধ্যস্থতায় দিল্লি এসে সেখানে বিখ্যাত ধনী লালা সুলতান সিং -এর গৃহশিক্ষক হন পিয়ার্সন। ১৯১২ খৃস্টাব্দের শেষে তিনি তখন শান্তিনিকেতনে আসেন, তখন রবীন্দ্রনাথ বিদেশে। তাই আশ্রমের কাজে যোগ দেবার আগে তিনি ও অ্যান্ডরুজ গান্ধীজির সত্যাগ্রহের সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য দক্ষিণ আফ্রিকায় যান। এপ্রিল ১৯১৪তে তাঁরা শান্তিনিকেতনে যোগ দেন।

১৯১৬ খৃস্টাব্দের মে মাসে তাঁরা ও মুকুল দে কবির সঙ্গে জাপানে যান। ভাষণ তৈরি, ভ্রমণ-সূচি নির্ধারণ ইত্যাদির ব্যাপারে পিয়ার্সন কবিকে সাহায্য করতেন। অনেক পরে ১৯২০ খৃস্টাব্দে আবার তিনি রবীন্দ্রনাথের বিদেশ-ভ্রমণের সঙ্গী হন। ১৯২১-এ পুনশ্চ শান্তিনিকেতনে ফিরে আসেন। ১৯২৪ খৃস্টাব্দে বায়ু পরিবর্তনের জন্য ইতালি গেলে এই রবীন্দ্র-অনুধ্যায়ীর ট্রেন থেকে পড়ে গিয়ে (২৪.৯.১৯২৪) মৃত্যু হয়। শেষ বাণী ছিল—'My one and only love— India.'.

গোরা উপন্যাসের অনুবাদক পিয়ার্সনকে প্রীতিবশত রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থ উৎসর্গ করে লিখেছিলেন : উইলি পিয়ার্সন বন্ধুবরেষু এবং 'আপনারে তুমি সহজে ভুলিয়া থাক, আমরা তোমারে ভুলিতে পারি না তাই,' কবিতাটি।

আলোচিত বইটি ১৯১৬ খৃস্টাব্দে জাপান প্রবাসে রচিত। সে-বৎসরই Macmillan কোম্পানি বইটি প্রকাশ করেন। পরে বইটির বহু সংস্করণ প্রকাশিত হয়। পিয়ার্সন-রচিত *Shantiniketan : The Bolpur School of Rabindranath Tagore* (1917) বইটির প্রধান অংশ প্রকৃতপক্ষে সতীশচন্দ্র-রচিত গুরুদক্ষিণা (১৯০৪) বইটির অনুবাদ। এই অনুবাদের সঙ্গে তিনি তাঁর শান্তিনিকেতন বাসের অভিজ্ঞতা ও শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় ও রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শ সম্বন্ধে একটি দীর্ঘ অধ্যায় যুক্ত করেছেন। বইটি চিত্রিত করেছিলেন শিল্পী মুকুল দে।

মূল ইংরেজি গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের Introduction সংযুক্ত হয়েছিল। এ ছাড়া জাপানে প্রদত্ত তাঁর দুটি ভাষণ—Paradise এবং Parting— সংযুক্ত হয়। ১৯২১ সালে স্টকহোলম্ থেকে যে অনুবাদ প্রকাশিত হয় তার আখ্যাপত্র ছিল : Shantiniketan / Tagores Skola I Blpur / Au / W W. Pearson / Och / Satish Chandra Roy / Jamte En Inlepning / Och Auslutning / Au / Rabindranath Tagore / (Emblem) / Stockholm / p.a. Norstedt Soners / Forlag.

৩

থিওডোর ডগ্‌লাস ডান তাঁর কাব্য-সংকলনের নাম দিয়েছিলেন *The Bengali Book of English Verse* (আখ্যাপত্র : The Bengali Book / of / English Verse / selected and arranged / by / Theodore Dougles Dunn / with a foreword / by / Sir Rabindranath Tagore / Longmans, Green, And Co. / Hornby Road, Bombay / 6 Old Court House Street, Calcutta / 167 Mount Road, Madres / London and New York / 1918)। XXVII + 119 পৃষ্ঠার বইটিতে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা বিন্যস্ত ছিল XI-XIV পৃষ্ঠায়। কলকাতার ইউনাইটেড সার্ভিস ক্লাবে অবস্থানের সময় ডান-এর ভূমিকা লেখেন ডিসেম্বর ১৯১৮ তারিখে।

যে-সব বাঙালি কবি ইংরেজি ভাষায় কবিতা রচনা করেন, তাঁদের কবিতা সংকলন করে বিদেশী পাঠকদের কাছে এই কবিতাগুলি পরিচিত করে দেবার উদ্দেশ্য নিয়েই এই গ্রন্থের প্রকাশ।

৪

ভগিনী নিবেদিতা (১৮৬৭-১৯১১) বিগত শতকের শেষের দিকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বিবিধ সূত্রে পরিচিত হয়েছিলেন। নিবেদিতার ভাষায়— 'You are so dear to my friend Dr. Bose that I cd. not help you sd. be my friend too?' নিবেদিতা-প্রয়াণের অব্যবহিত পরে প্রবাসী পত্রিকায় (অগ্রহায়ণ, ১৩১৮) 'নিবেদিতা' সম্পর্কিত রবীন্দ্রনাথের রচনাটি (পরে গ্রন্থে সংকলিত) নিবেদিতার অন্তর্জীবনের শ্রেষ্ঠ পরিচায়ক।

নিবেদিতার সঙ্গে গভীরভাবে ঘনিষ্ঠ ছিলেন পূর্বোক্ত Dr. Bose অর্থাৎ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু (১৮৫৯-১৯৩৭)। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'তাঁর কাব্যে ও রচনায় উৎসাহদাত্রীরূপে মূল্যবান সহায় তিনি পেয়েছিলেন ভগিনী নিবেদিতাকে। জগদীশচন্দ্রের জীবনের ইতিহাসে এই মহনীয়া নারীর নাম সম্মানের সঙ্গে রক্ষার যোগ্য।'

১৯০৪ খৃস্টাব্দের যে মাসে নিবেদিতার *Web of India Life* বইটি প্রকাশিত হয়। এর কিছুদিন পর জগদীশচন্দ্র নিবেদিতার বইটির একটি ভূমিকা লিখে দেবার জন্য অনুরোধ করেন। কবি অবশ্য কোনো উৎসাহবোধ করেন নি। এমন-কি, ভূমিকা রচনার কিছুদিন পূর্বেও (চিঠিপত্র ষষ্ঠ খণ্ড, ২৯-সংখ্যক পত্র, পৃ. ৬৭) জগদীশচন্দ্রকে তিনি লিখেছিলেন (অক্টোবর ১৯১৭)— 'নিবেদিতার বইয়ের সেই ভূমিকা লেখার মতো মনের সচেষ্টতা নেই।'

যাই হোক, শেষ অবধি রবীন্দ্রনাথ বইটির একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন (২১ অক্টোবর ১৯১৭) এবং সেটি গ্রন্থের ১৯১৮ সালের জুলাই মাসে প্রকাশিত নব-সংস্করণের প্রথম সংযুক্ত হয়। এই গ্রন্থে নিবেদিতা যা বলতে চেয়েছেন, গ্রন্থের প্রকাশকের ভাষায় তা বিবৃত করি— এই গ্রন্থে নিবেদিতা 'has given us a picture of the Indian woman in her role as mother and wife and as the feeder and sustainer of the national culture and traditions; the author then enters into a study of national epics, the caste system, and various other aspects of indian life and ideal.'

প্রসঙ্গক্রমে নিবেদনযোগ্য যে ১৯০১ খৃস্টাব্দে নিবেদিতা লন্ডন বাসকালে রমেশচন্দ্র দত্তের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সূত্রে এই বইয়ের পত্তন করেন এবং পরে ১৯০৩ খৃস্টাব্দ থেকে বিপিনচন্দ্র পাল-সম্পাদিত 'নিউ ইন্ডিয়া'তে বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন। এগুলিই Web of Indian Life-এ সংকলিত।

৫

পল রিশার (Paul Richard) একজন ফরাসি ভাবুক। তাঁর ও তাঁর স্ত্রী মীরা রিশার-এর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় হয়। ১৯১৬ খৃস্টাব্দে জাপানে— রবীন্দ্রনাথ যখন আমেরিকা থেকে ফিরে আসছিলেন। মধ্যস্থতায় ছিলেন উইলি পিয়ার্সন। শান্তিনিকেতনে তখন ফরাসি ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা চলছে। হিরাজি ভাই পোস্তনজি সরিনওয়ালা নামক জনৈক পার্সি ভদ্রলোক এখানে তখন ফরাসি ভাষা শেখাচ্ছিলেন। তিনি চলে গেলে রবীন্দ্রনাথের অনুরোধে পল রিশার শান্তিনিকেতনে ফরাসি ভাষার অধ্যাপনায় বৃত হন সম্ভবত ১৯২১ খৃস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে। তিনি মাসখানেক মাত্র শান্তিনিকেতনে ছিলেন। এখান থেকে তিনি পণ্ডিচেরি আশ্রমে চলে যান। এঁর স্ত্রী মীরা রিশারই পরবর্তীকালে পণ্ডিচেরি অরবিন্দ আশ্রমের Mother নামে পরিচিত হন।

শান্তিনিকেতনে আসার আগেই পল রিশানেরর *To the Nations* বইটি ১৯১৭ খৃস্টাব্দে আত্মপ্রকাশ করে ফরাসি ভাষায়। এর একটি ইংরেজি ভাষান্তর প্রকাশিত হয় ১৯১৯ খৃস্টাব্দে। রবীন্দ্র-সুহৃদ পিয়ার্সন রবীন্দ্রনাথকে এই ইংরেজি সংস্করণের একটি ভূমিকা লিখে দিতে বললে কবি সে অনুরোধ রক্ষা করেন। কবি ভূমিকা রচনা করেন সান্‌ফ্রান্‌সিসকোতে।

ইংরেজি সংস্করণের আখ্যাপত্র : 'To The Nations / From the French of / Paul Richard / With an introduction by Rabindranath Tagore / Madras / Ganesh & Co./1919। VII-XV+78 পৃষ্ঠাব্যাপী বইটিতে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা ছিল দীর্ঘ। বইটি দুটি বিভাগে (Part One and Two)। প্রত্যেকটিতে ৬টি করে মোট ১২টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত। এগুলি হল— Falsity of Yesterday, The Illusion of To-day, The Relations of To-morrow, The Day of the Captives, The Great Eve, The Dawn, The Law of the Peoples, The Ideal of the Peoples, Progress of the Peoples, The Charter of Nations, The Peace of World এবং The Consciousness of Humanity.

৬

D. J. Irani-রচিত এই বইটি ১৯২৪ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। প্রকাশ করেছিলেন George Allen & Unwin Limited। ৭৯ পৃষ্ঠাব্যাপী এই বই-এর রবীন্দ্রনাথ-রচিত ভূমিকাটি ৫-১৪ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হয়েছিল। ভিন্ন দেশীয় ধর্ম ও তাঁর সাংগীতিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অধিকার আমাদের চিত্তে গভীর শ্রদ্ধা ও বিস্ময় উদ্রেক করে। বইটির আখ্যাপত্র ছিল এইরূপ :

The Divine Song / of Zarathustra / By / D. J. / Irani / With an / Introduction / By / Rabindranath Tagore / London. George Allen & Unwin Ltd / Ruskin House, 40 Museum Street, W.C.I. / New Yrok % The Macmillan Company.

D. J. Irani বইটি ছাপার আগে রবীন্দ্রনাথকে পাণ্ডুলিপি টাইপ করে কপি পাঠিয়ে দেন ১৯২১ খৃস্টাব্দে। তারই ভিত্তিতে কবি এই ভূমিকা লিখে দেন।

৭

সর্বেপল্লী রাধাকৃষ্ণন ভারতের রাষ্ট্রপতি ছিলেন— এই রাজনৈতিক পরিচয়ের চেয়ে বিশ্বে তাঁর বৃহৎ পরিচয় দার্শনিক হিসাবেই। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর সংযোগও মুখ্যত দর্শন ভাবনার সূত্রেই। তাঁর 'Contemporary Philosophy'-তে 'বলাকা' কাব্যের মূলসূত্র অপূর্বভাবে ব্যাখ্যাত।

কলকাতায় ভারতীয় দর্শন সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ (১৩৩২)। উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন রাধাকৃষ্ণন। তিনি ও তাঁর সহযোগিগণই রবীন্দ্রনাথকে এ কাজের উপযুক্ত বিবেচনা করেছিলেন।

১৯১৮ খৃস্টাব্দে *The Philosophy of Rabindranath* বই লিখে রাধাকৃষ্ণন দার্শনিক হিসাবেই যশোলাভ করেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র ৩০ এবং মাদ্রাজে অধ্যাপনারত। ১৯২১-৪১ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন-অধ্যাপকরূপে যখন কর্মরত ছিলেন তখন ১৯২৯ খৃস্টাব্দে হিবার্ট বক্তৃতার জন্য আমন্ত্রিত হন। ১৯৩০ খৃস্টাব্দে নিযুক্ত হন অক্সফোর্ডের ম্যানচেস্টার কলেজের তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের অধ্যাপক। এ সময়ে রবীন্দ্রনাথও য়ুরোপ ভ্রমণে গেলে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে উভয়েই বক্তৃতার জন্য আহূত হন। রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতার বিষয় ছিল The Religion of Man (পরের বছর ম্যাকমিলান কর্তৃক প্রকাশিত)।

অনেকদিন পরে ১৯৩৮ খৃস্টাব্দে শ্রীনিকেতনের বৃক্ষরোপণ উৎসবের সময়ে বিশেষভাবে আমন্ত্রিত রাধাকৃষ্ণন যে বক্তৃতা দেন তাতে পরিতুষ্ট রবীন্দ্রনাথ রাধাকৃষ্ণনকে ধন্যবাদ দিয়ে বলেন— 'My only claim is that of an artist who is amply rewarded if he is assured by visitor like yourself, whose praise is precious that he has been able to please you' (*Visva-Bharati News*, September, 1938, p. 21)

১৯৪০ খৃস্টাব্দে শান্তিনিকেতনের সিংহসদনে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিগণ যখন বিশেষ এক সমাবর্তন আহ্বান করে রবীন্দ্রনাথকে 'ডক্টর অব লিটারেচার' উপাধি প্রদান করেন তখন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরূপে সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন ভারতের তৎকালীন ফেডারেল কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার মরিস গয়্যার এবং সর্বেপল্লী রাধাকৃষ্ণন।

রাধাকৃষ্ণনের *Philosophy of Upanisads* বইটি ১৯২৪ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত হলে রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘ ভূমিকা রচনা করে দেন। আখ্যাপত্র : The Philosophy / Of The Upanisads / By / S. Radhakrishnan / with A Foreword By / Rabindranath Tagore / and An Introduction By / Edmond Holmes / Author of "The Creed of Buddha", Etc. / London . George Allen & Unwin Ltd. / Ruskin House, 40 Museum Street, W.C.I. / New York : The Macmillan Company, পৃষ্ঠা XV + 143.

৮

ইন্ডিয়া ইন্‌ফরমেশন বুরো অব্ আমরিকার প্রাক্তন সভাপতি ও নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত *Young India*-র সম্পাদক ভারতপ্রেমী জ্যাবেজ টি সান্ডারল্যান্ড ১৯১৯ খৃস্টাব্দে তাঁর সুখ্যাত বই *India in Bondage* নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশ করেন। রবীন্দ্রনাথ এই বইটির জন্য একটি ছোটো ইংরেজি কবিতা লিখে দেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য ১৯১৯ খৃস্টাব্দে কবি কানাডা ও আমেরিকা পরিভ্রমণ করেন।

সান্ডারল্যান্ডের বইটিতে ফ্রন্টিসপিসে রবীন্দ্রনাথের যে ছবি মুদ্রিত হয়েছে তাঁর নীচে লেখা আছে— 'Most eminent Poet of Modern India and one of the most eminent of the modern World. Distinguished also as novelist, philosophical thinker, educator adn social and regligious reformer. Recipient of the Nobel Prize for Literature.

উৎসর্গ (Dedication) পৃষ্ঠার অপর পৃষ্ঠার রবীন্দ্রনাথের 'My Prayer for India' কবিতাটি মুদ্রিত আছে। সান্ডারল্যান্ড বইটিতে যে ভূমিকা লিখেছেন তাতে অবশ্য কোথাও এই কবিতাটিকে ভূমিকা বা 'মুখপত্র' হিসেবে উল্লেখ করেন নি, তবুও সমগ্র বইটির নির্যাস এই কবিতাতে বিধৃত আছে বলে এটিকে ভূমিকা শ্রেণীর রচনা হিসাবে আমাদের গ্রহণ করতে অসুবিধা হবার কথা নয়।

রবীন্দ্রনাথের কবিতার পরেই হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক উইলিয়াম জেমস রচিত Great Crime শীর্ষক রচনাটি মুদ্রিত আছে। শেষে এমার্সন-রচিত ৪ পঙ্‌ক্তি কবিতা। বইটির আখ্যাপত্র নিম্নরূপ :

India in Bondage / Her Right to Freedom and a Place / Among the Great Nations / By / Jabez T. Sunderland, M.A.D.D. / Former President of the India Information Bureau of America and / Editor of Young India (New York). Twice Special Commissioner / and Lecturer to India. Author of "India, America and / World Brotherhood," "Causes of Famine in

India" / etc. etc. / "No nation is good enough to rule another nation." / Abraham Lincoln / New York /Lewis Copeland Company /MCM MXIM/. এর ভারতীয় সংস্করণ (১৯২৮) প্রকাশিত হওয়া মাত্র তদানীন্তন ব্রিটিশ সরকার এটিকে 'Suppress' করেন।

প্রসঙ্গত নিবেদনযোগ্য রবীন্দ্রনাথের রচনাটি এই বইয়ের জন্য লিখিত নয়। *New Statesman* পত্রিকায় ক্যাথরিন মেয়োর 'মাদার ইন্ডিয়া' গ্রন্থের যে সমালোচনা প্রকাশিত হয়, তা অসত্যভাষণে পূর্ণ ছিল। রবীন্দ্রনাথ তার প্রতিবাদ করে যে চিঠিটি 'ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান' পত্রিকায় পাঠান, সেটিই প্রকারান্তরে সান্ডারল্যান্ড তাঁর বইয়ে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তখন জীবিত। তাঁর অনুমতি নিশ্চয়ই গ্রহণ করা হয়েছিল ভূমিকায় রচনাটি ব্যবহারের বিষয়ে। সে কারণেই আমরা এটিকে আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করেছি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য ১৯২৮ খৃস্টাব্দে ভারতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন R. Chatterjee অর্থাৎ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। এটি প্রবাসী প্রেস থেকে ছাপা হয়। বইয়ের শেষে সান্ডারল্যান্ড সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের যে মন্তব্য ছাপা হয়, তা আমরা এখানে উল্লেখ করছি :

The Rev. Dr. Sunderland became personally known to me during his visits to India and my visits to America and won from the first my deep regard. I have greatly admired his courage, earnestness and sincerity in taking up in this book the cause of the Indian people, who are still in subjection under British Rule. Such a knight- errant on behalf of those who have been rendered defenceless, makes the name of the West still respected in India inspite of that domination from the West which has robbed her of freedom and left behind a rankling sense of injustice. The facts which the Rev. Dr. Sunderland has set in his book are impressive. They corroborate the great saying of Abraham Lincoln, which he quotes on the title page "No nation is good enough to rule another nation". Let me express my gratitude to the author for his chivalry in devoting so many years of his life to the cause of Indian freedom. His love of humanity, which knows no geographical boundaries or racial differences, should be a lesson to all of us who seek to share his ideals and carry on his work.

৯

ক্ষিতিমোহন সেন -এর প্রাসঙ্গিক পরিচয় আমরা পূর্বেই তাঁর বাংলা বই দুটি প্রসঙ্গে নিবেদন করেছি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর যে ইংরেজি বইয়ের জন্য একটি ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন, সেটি হল তাঁর *Medieval Mysticism of India* বইটি। প্রথমে বইটির

আখ্যপত্রের পরিচয় দিই : Medieval Mysticism / of India / by Kshitimohan Sen / with a foreword by / Rabindranath Tagore / Authorised Translation / from the Bengali / by / Manmohan Ghosh / Luzac & Co. / 46 Great Russel Street / London / 1930, বইটির মোট পৃষ্ঠাসংখ্যা iii+xxxi+241.

বইটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত 'অধরচন্দ্র মুখার্জি' বক্তৃতামালা, যেটি বাংলায় প্রদত্ত হয়েছিল, তার মনোমোহন ঘোষ কৃত অনুবাদ। মূল রচনাটি ১৩৩৭ সালে 'মধ্যযুগে ভারতীয় সাধনার ধারা' নামে প্রকাশিত হয়েছিল এবং তাতে সংযুক্ত রবীন্দ্রনাথের ভূমিকার কথা আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি।

এই ইংরেজি ভূমিকা সম্পর্কে নতুন কোনো কথা বলার নেই, কারণ এটি পূর্বোক্ত বাংলা ভূমিকারই হুবহু ইংরেজি অনুবাদ মাত্র। বাংলা ভূমিকা ১২ পৌষ ১৩৩৭ এবং ইংরেজি ভূমিকা ২৭ ডিসেম্বর ১৯২৯ একই তারিখ। অনূদিত Preface-এ ক্ষিতিমোহন প্রসঙ্গক্রমে লিখেছিলেন (১৪ জানুয়ারি ১৯৩০)—

Last but not the least I am to acknowledge my deep debt of gratitude to Rabindranath Tagore who possesses a great reverence for the sadhaks of Medieval India as well as a rare power of appreciation and enjoyment of their deep and sublime saying...I am glad that his blessings in the shape of a Foreword from his pen have adorned these pages.

১০

শ্রীমতী গারট্রুড এমার্সন মুখ্যত *Asia* পত্রিকার সম্পাদকের দপ্তরে চাকুরিরতা ছিলেন ভারতবর্ষে এসে এদেশের গ্রামীণ জীবন সম্পর্কে সরেজমিনে জানবার জন্য তিনি বলরামপুরের (উত্তরপ্রদেশ) মহারাজার আতিথ্যে প্রায় একবছর অতিবাহিত করেন এবং মহারাজার অধীনস্থ একটি গণ্ডগ্রাম Pachperwa-তে বসবাস করেন। উত্তর ভারতের পঞ্চবটী -সমন্বিত এই গ্রামটিকে তিনি অন্তরঙ্গভাবে দেখতে দেখতে ভালোবেসে ফেলেন এবং মাসের পর মাস যা দেখতে পান তা দিনপঞ্জীর আকারে লিপিবদ্ধ করেন।

Asia পত্রিকায় তাঁর এই অভিজ্ঞতার কোনো কোনো অংশ পুস্তকাকারে প্রকাশের আগেই পত্রস্থ হয়। রবীন্দ্রনাথের নিকট সান্নিধ্যেও তিনি আসেন। তিনটি বিভাগে ও আঠারোটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত হয়ে তাঁর অভিজ্ঞতার স্মরণচিহ্ন *The Voiceless India* প্রকাশিত হয় আমেরিকা থেকে প্রথম ১৯৩০ খৃস্টাব্দে। এর ১৪ বছর পরে ১৯৪৪ সালে দ্বিতীয় আমেরিকান সংস্করণ প্রকাশিত হলেও প্রথম প্রকাশের পরের বছরেই ১৯৩১ খৃস্টাব্দে বইটির প্রথম ব্রিটিশ সংস্করণ প্রকাশিত হয়। প্রথম ভারতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৪৬ খৃস্টাব্দে।

সংশোধিত আমেরিকান সংস্করণের ভূমিকা লেখেন প্রখ্যাত লেখিকা পার্ল এস্. বাক্। রবীন্দ্রনাথ ভূমিকা লেখেন ব্রিটিশ সংস্করণের জন্য 'Swarthmore' এ বসে। শেষ ভারতীয় সংস্করণে দুজনেরই ভূমিকা গৃহীত হয়েছে এবং তার আখ্যাপত্রটি নিম্নপ্রকারের : Vioceless / India / Gertrude Emerson Sen / Revised Edition / With Introductions By / Pearl S. Buck / Rabindranath Tagore / Illustrated / Indian Publishers—Benares।

১-৩৫২+৮ পৃষ্ঠা -সমন্বিত এই সচিত্র বইয়ের ভূমিকা রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলেছেন W.W. Hunter-এর *Rural Bengal*-এর পর এমন চমৎকার বই আর লেখা হয় নি। রবীন্দ্রনাথের ভূমিকাটি একই সঙ্গে *Modern Review* পত্রিকার May 1931 সংখ্যাতেও প্রকাশিত হয়। প্রসঙ্গত, লেখিকা শ্রীমতী এমার্সনের অন্য দুটি উল্লেখযোগ্য বই হল —*The Pageant of India History* (Vol. I, 1948) এবং *The Story of Early Indian Civilization* (1944)।

১১

রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর (১৯০২-৫৫) পিতা শীতলচন্দ্র চক্রবর্তী (বিদ্যানিধি) আগরতলার উমাকান্ত অ্যাকাডেমির শিক্ষক ছিলেন। ১৯১৯ সালে রবীন্দ্রনাথ আগরতলা গেলে তিনি কবিকে সংবর্ধিত করেন। পুত্র রমেন্দ্রনাথ কলকাতার আর্ট স্কুল ও শান্তিনিকেতনের কলাভবনের ছাত্র ছিলেন এবং নন্দলালের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। প্রথমদিকে পৌরাণিক বিষয়ে ছবি আঁকলেও কাঠে চিত্র খোদাই-এর কাজে অচিরে দক্ষতা অর্জন করেন। পরে ফরাসি মহিলাশিল্পী আন্দ্রে কার্পেলের কাছে শান্তিনিকেতনে উড্‌কাটের কাজে পারদর্শিতা লাভ করেন। বস্তুত উড্‌কাট, রঙিন উড্‌কাট, উড-এনগ্রেভিং-এর কাজে তিনিই ভারতে পথিকৃৎ ছিলেন। অন্ধ্রপ্রদেশের জাতীয় কলাশালায় শিল্প-শিক্ষকতার চাকরি করার পর কলকাতার সরকারি আর্ট স্কুলে সহকারী প্রধান শিক্ষকরূপে যোগ দেন। বিদেশে ভ্রমণ করেন ও বিদেশে প্রদর্শনীও করেন। ১৯৪৮ সালে সরকারি আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষপদে উন্নীত হন।

তাঁর *Woodcuts* বইটির একটি 'appreciation' লিখে দেন রবীন্দ্রনাথ।

১২

রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিতম জন্মদিবস যাতে উপযুক্ত মর্যাদায় উদ্‌যাপিত হয়, সেই প্রস্তাব নিয়ে মনীষী রমাঁ রোলাঁ ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৩০ তারিখে প্রবাসী-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে (১৮৬৫-১৯৪১) একটি চিঠি লেখেন তাতে তিনি রবীন্দ্রানুরাগীদের

কাছ থেকে 'a bunch of their spiritual fruits and flowers' নিয়ে একটি গ্রন্থ প্রকাশের প্রস্তাব দেন। সেইমতো মহাত্মা গান্ধী, জগদীশচন্দ্র বসু, অধ্যাপক আইনস্টাইন প্রমুখ মনীষীগণ বিশ্বব্যাপী আবেদন প্রচার করেন এবং একটি *The Golden Book of Tagore*-এর পরিকল্পনা করেন। একটি সমিতি গঠিত হল চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, নন্দলাল বসু, রাজশেখর বসু, অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী, কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, নীরদচন্দ্র চৌধুরী, অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, অমল হোম, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ ও কালিদাস নাগকে নিয়ে। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এর সভাপতি এবং *The Golden Book of Tagore*-এর সম্পাদক নির্বাচিত হন। ২০৭ জন মনীষীর শ্রদ্ধার্ঘ্য-সম্মলিত হয়ে ১৯৩১ খৃস্টাব্দের ডিসেম্বর বইটি প্রকাশিত হয়। ৩৭৬ পৃষ্ঠার বইটির মাত্র ১৫০০ কপি ছাপা হয়েছিল। বিশ্বের প্রায় সব ভাষা-ভাষীদের মূল রচনা ও তৎসহ তার ইংরেজি অনুবাদসহ বইটি প্রকাশিত হয়।

উল্লেখযোগ্য যে কবি কামিনী রায় -রচিত 'কবি-রবি' একমাত্র বাংলা রচনা যা এতে গৃহীত হয়। বইটির আখ্যাপত্র : The Golden Book fo Tagore / A Homage to Rabindranath Tagore / From India and the World / In Celebration of his Seventieth Birthday / Edited By Ramananda Chatterjee / Published By The Golden Book Committee / Calcutta 1931.

এতে রবীন্দ্রনাথকে সূচনায় কিছু লিখে দিতে বলা হলে কবি সসংকোচে তাঁর বক্তব্য অতি সংক্ষেপে লিখে দেন। কবির সেই বক্তব্যকে শিরোভূষণ করে xx পৃষ্ঠার পর (কবির হাতের লেখায়) বইটির মূল রচনাংশ মুদ্রিত হয়। একে ভূমিকা হয়তো বলা যাবে না। তবে শুভেচ্ছাবাণী নিশ্চয়ই বলা যায়।

১৩

প্রেমচাঁদ লাল ছিলেন শ্রীনিকেতনের সচিব। ১৯২৯ খৃস্টাব্দে তিনি য়ুরোপে যান এবং সেখান থেকে 'ডক্টর' উপাধি-ভূষিত হয়ে ফিরে আসেন (১৯৩২)। ১৯২২ সালে তিনি শ্রীনিকেতনে যোগ দিয়েছিলেন। ১৪ বছর কর্মরত থাকার পর তিনি জুলাই ১৯৩৬-এ কাজ ছেড়ে চলে যান।

১৯২৪ সালের জুলাই মাসে শান্তিনিকেতনের উপকণ্ঠে 'শিক্ষাসত্র' নামে যে প্রতিষ্ঠান স্থাপতি হয় তার আদর্শের সঙ্গে শ্রীনিকেতনের গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিল। প্রেমচাঁদ লাল তাঁর এই বইটিতে শিক্ষাসত্রের গোড়ার ইতিহাস বর্ণনা করেন। প্রেমচাঁদ এই নূতন প্রতিষ্ঠানের ভার গ্রহণ করেছিলেন বলে তাঁরক পক্ষে গ্রাম গঠনের এই অনবদ্য ইতিবৃত্তটি রচনা করা সম্ভবপর হয়েছিল।

বইটির নামের পর আখ্যাপত্রটি এই রকম ছিল : In the light of Programme / carried at Sriniketan / The Institute of Rural reconstruction / Founded by / Rabindranath Tagore. বইটির প্রকাশক ছিলেন লন্ডনের George Allen & Unwin Ltd. ২৬২ পৃষ্ঠার এই বইটিতে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা ছিল ১৫-২১ পৃষ্ঠা ধ'রে।

১৪

খৃস্টপূর্ব চতুর্থ-তৃতীয় শতকের চীনা কবি চু-য়ু য়ুয়ান -রচিত 'দি লি সাও' গাথাকাব্যের ইংরেজি অনুবাদের সঠিক সংস্করণ প্রকাশ করেন অ্যাময় বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি লিম্ বুন কেং সাংহাই থেকে ১৯৩৫ খৃস্টাব্দে। বইটির আখ্যাপত্র থেকে এ-বিষয়ে বিশদ জানা যাবে।

The Li Sao / An Elergy of Encountering Sorrows / By / Ch U Yuan / Of the State of Ch U (circa 338-88 B.C. / Translated Into English verse with Introduction, / Notes, Commentaries, And Vocabulary / Lim Boon Keng / President of the University of Amoy / With an Introductory note By / H. E. Sir Hugh Clifford / and prefaces By / Professor H. A. Giles, LL.D. / Dr. Rabindranath Tagore / Dr. Chen Huan-Chang / The Commercial Press, Limited / Shanghai, China / 1935.

বইটি ১৯৩৫ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত হলেও রবীন্দ্রনাথের কাছে এর পাণ্ডুলিপি দেখানো হয়েছিল সম্ভবত ১৯২৭ খৃস্টাব্দেই। ১৯২৭ খৃস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ বৃহত্তর ভারত ভ্রমণে যান। অনুবাদক সিঙাপুরে কবির অবস্থানকালে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এ প্রসঙ্গে 'রবীন্দ্রসংগমে দ্বীপময় ভারত ও শ্যামদেশ' গ্রন্থে (২য় সংস্করণ ১৯৬৪, পৃ. ৮৫-৮৬) লিখেছেন যে— লি সাও কাব্যের অনুবাদক পূর্ব পরিচিত ডাক্তার লিম্-বুন-কেন 'কবিকে অনুরোধ জানালেন যে তিনি যদি তাঁর এই অনুবাদটি পড়ে তার একটি ভূমিকা লিখে দেন। বলা বাহুল্য, কবি আনন্দে স্বীকার করলেন। ডাক্তার লিম্ পরে এই তর্জমা কবিকে পিনাঙ্-এ ডাকে পাঠিয়ে দেন। কবি ভূমিকা লিখে দিয়েছেন।' জাহাজে বসে ১৮ আগস্ট ১৯২৭ তারিখে কবি ভূমিকাটি লেখেন।

১৫

লরেন্স বিনিময় (১৮৬৯-১৯৪৩) কালিদাসের শকুন্তলার একটি বিশ্বাসযোগ্য অনুবাদ করেন। এই অনুবাদ অবলম্বনে কেদারনাথ দাশগুপ্ত মঞ্চোপযোগী একটি নাট্যরূপ দেন। ভারতের সংস্কৃতি ও সাহিত্য প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি ১৯১০ খৃস্টাব্দে লন্ডনে যে Union

of East and West সমিতি গঠন করেন তারই উদ্যোগে তিনি ১৯১৯ খৃস্টাব্দে শকুন্তলার নাট্যরূপ দেন। এটি পরের বছর ১৯২০ খৃস্টাব্দে মুদ্রিত হয় এবং পরপর ১৯৩৭, ১৯৪৪, ১৯৪৫, ১৯৪৭ ও ১৯৫৩ সালে এর পুনর্মুদ্রণগুলি প্রাকাশিত হতে থাকে। ১৯৫৩ সালে মুদ্রিত গ্রন্থটির প্রচ্ছদ ছিল নিম্নরূপ : Kalidasa / Sakuntala / By / Lawrence Binyon. আখ্যাপত্র : Sakuntala / By Kalidasa, Prepared for the English stage by / Kedarnath Das Gupta in / a new version written by / Lawrence Binyon / with an introductory Essay / By / Rabindranath Tagore / Macmillan and Co. Limited / Bombay Calcutta Madras London / 1953.

ভূপেন্দ্রনাথ দত্তকে উৎসর্গীকৃত এই গ্রন্থটিতে সংযুক্ত ভূমিকাটি অবশ্য রবীন্দ্রনাথ সরাসরি এই বইটির জন্য লেখেন নি। এটি তাঁর বিখ্যাত শকুন্তলা প্রবন্ধের আদর্শ যদুনাথ সরকার -কৃত ইংরেজি অনুবাদ। আচার্য যদুনাথ (১৮৭০-১৯৫৮) এটি অনুবাদান্তে 'Sakuntala : Its Inner Meaning' নামে *Modern Review* পত্রিকার ফেব্রুয়ারি ১৯১১ মাসে (পৃ. ১৭১-৭৫) প্রকাশ করেন। নাট্যরূপকার কেদারনাথ এই অনুবাদটিই রবীন্দ্রনাথের অনুমতিক্রমে তাঁর অনুবাদ গ্রন্থের ভূমিকা হিসাবে ব্যবহার করেন।

অনুবাদগ্রন্থটির একটি পরিচায়িকাও তিনি লেখেন। আমরা সেটি অতঃপর এখানে প্রকাশ করলাম।

KALIDASA

Kalidasa, the greatest of Indian poets, belonged to the post-Vedic Period of Sanskrit literature. Owing to the absence of chronology in the history of the Ancient Hindus it was not possible, until recently, to fix his dates with any exactness. According to tradition he was one of the nine illustrious men of genius ("the nine gems") who adorned the court of Vikramaditya in B.C. Another legend represents him as Matri Gupta, King of Kashmir. Scholars have differed widely in the dates to which they have asigned his activity. Professors Lassen and Weber place him in the second century after Christ. According to Professor Max Müller and Dr. Bhandarkar he lived in the early part of the sixth century A.D. However, the date of Kalidasa has recently been conclusively settled by Dr. T. Bloch and Pandit Ramavatara Sharma. Working independently of each other in Europe and in India, they arrived at the same result. They have succeeded in proving from evidence, internal and external, that he flourished during the reign of Chandra Gupta II.—Vikramaditya—and of his son Kumara Gupta in the fourth century A.D. These dates have been officially accepted in India.

Kalidasa has written three plays : *Sakuntala, Vikramorvasi,* and *Malavikagnimitra*; two epics, *Raghuvamsa.* and *Kumara Sambhava*; one lyrical poem, *Meghaduta*; and one descriptive poem, *Ritusamhara.* Many other works, including an astronomical treatise, are said to have been written by him, but it is possible that later writers, more concerned for their poetry than for their own personal fame, assimilated their work to his.

There is no authentic life-history of Kalidasa, but there are many legends to which no historical value can be attached, not much information can be gathered from his writing, as he rarely made personal allusions.

But what matters when Kalidasa was born or where he lived ? He is of all countries and of all ages, and his work is the inheritance of mankind.

K. N. D. G.

১৬

এম. জি. ঠাকুর সিং (১৮৯৪-১৯৭৬) অমৃতসরের নিকটবর্তী ভেরকা গ্রামে ১৮৯৪ খৃস্টাব্দের ১৫ সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। ছাত্রাবস্থাতেই বাড়ি থেকে মুম্বই পালিয়ে গিয়ে শিল্পী মহম্মদ আলমের কাছে চিত্রবিদ্যা শেখেন। ছবি এঁকে জীবিকা অর্জনের জন্য ১৯১৮ সালে কলকাতায় এসে অবনীন্দ্রনাথ ও যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়ের সান্নিধ্যে আসেন। হেমেন্দ্রনাথ মজুমদারের চিত্রকলার প্রতি আসক্ত হয়ে শিল্পীর সঙ্গে তিনি পরিচয় করেন। দীর্ঘ সতেরো বছর তিনি কলকাতায় ছিলেন। তাঁর 'আফটার বাথ' নারীর চিত্র ১৯২৪ সালে লন্ডনের ওয়েম্বলিতে অনুষ্ঠিত এক প্রদর্শনীতে দ্বিতীয় পুরস্কারে ভূষিত হয়। সিমলা, বোম্বাই, কলকাতার নানা প্রদর্শনীতে তাঁর চিত্র প্রদর্শিত হয়। বহু বিখ্যাত ব্যক্তির সংগ্রহে তাঁর চিত্ররাজি রক্ষিত আছে। তাঁর চিত্রসংগ্রহ তিনটি খণ্ডে সংকলিত হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকা লেখেন যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়, তৃতীয় খণ্ডের ভূমিকা লেখেন রবীন্দ্রনাথ।

এর আখ্যাপত্রটি নিম্নরূপ : *Glimpses of India* / A Unique Collection of Landscapes / And / Archetectural Beauties / By / S. G. Thakur Singh / With Preface by / Dr. James H. Cousins, D. Litt. / And / Foreword / By / Rabindranath Tagore / Revised edition of Twentyfive Masterpieces / Published by / Thakur Singh School of Arts / Amritsar (India) / (All rights strictly reserved by the Publisher).

রয়্যাল সাইজের এই বইটিতে কোনো প্রকাশকাল মুদ্রিত নেই। প্রতিটি ছবির বাম পৃষ্ঠায় তার পরিচিতি আছে। প্রতিটি ছবিই কোনো-না-কোনো ব্যক্তির সংগ্রহে রক্ষিত আছে। Preface-লেখক James H. Cousins তখন মাদ্রাজের কলাক্ষেত্রের ভাইস-প্রেসিডেন্ট ছিলেন।

বইটিতে নিকোলাস রোয়েরিক প্রসঙ্গক্রমে লিখেছিলেন : 'S. G. Thakur Singh loves his great Motherland. He travels and depicts various aspects of Indian life. From realistic studies he turns to landscapes full of harmony in colours. We should be grateful to the Artist who gives us the beauty of India'.

'Artists Note'-এ প্রসঙ্গক্রমে ঠাকুর সিং লেখেন : 'My deep gratitude to Gurudev Rabindranath Tagore, Dr. James H. Cousins and others who have taken the trouble to express their appreciation of this collection of my paintings.'

শিল্পী বইটি রবীন্দ্রভবনে উপহার দিয়েছেন ২ অক্টোবর ১৯৫২ তারিখে। প্রসঙ্গত, Oxford University Press থেকে প্রকাশিত G. H. Rooke -অনূদিত *The Meghaduta of Kalidasa* (1935) গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের একটি 'Introductory Poem' আছে। মূল বাংলা কবিতা 'চৈতালি' কাব্যগ্রন্থের 'ঋতুসংহার' ও 'মেঘদূত' কবিতাদ্বয় থেকে তাঁর নিজের অনুবাদ। আমরা নিচে সেই অনুবাদ সমগ্রত তুলে দিলাম :

INTRODUCTORY POEM

(translated from his original Bengali by the Poet)

At youth's coronation, Kālidāsa, you took your seat,
Your beloved by your side, in Love's primal paradise.
Earth spread its emerald-green carpet beneath your feet,
The sky held over your heads its canopy gold-embroidered;
The seasons danced round you,
Carrying their wine cupts of varied allurements,
The whole universe yielded itself to your loneliness of delight,
Leaving no trace of human sorrows and sufferings
In the immense solitude of your bridal chamber.

* * *

Suddenly God's curse descended from on high,
Hurling its thunderbolt of separation

Upon the boundless detachment of youth's egotism.
The seasons' ministry in a moment was stopped
When the veil was wrenched from love's isolation,
And on the tear-misted sky appeared the pageantry
Of the rainy world of June,
Across which journeyed the sad notes of your bereaved heart
Towards a distant dream.

১৭

লিম্বডি কাথিওয়াড়ের সন্নিকটে পশ্চিম ভারতের একটি রাষ্ট্র। এর রাজপরিবারের একটি পরম্পরা ছিল। ঠাকুর সিং সাহেবের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল। তাঁর জীবনী-লেখিকা এলিজাবেথ শার্পের সঙ্গেও কবির পত্র মারফত যোগাযোগ ছিল। ১৯৩১ সালে তাঁর এই জীবনীটি প্রকাশের আগে লেখিকা কবিকে একটি ভূমিকা লিখে দিতে অনুরোধ জানালে কবি এই ভূমিকাটি লিখে দেন। বইটি প্রকাশের পর লেখিকা বইয়ের সাদা পুস্তানিতে To the beloved Poet / Elizabeth Sharpe কথা কয়টি লিখে কবিকে উপহার দেন।

বইটির আখ্যাপত্র : Thakore Sahib Shri / Sir Daulat Singh / of Limbdi, Kathiawar / A Biography / By / Elizabeth Sharpe / Author of "Shri Krishna and the Bhagbad Gita" / "Shiva", "The Flame of God", Etc. / London / John Murray, Albemarle Street, W. / সচিত্র বইটির পৃষ্ঠাসংখ্যা xii + ১৮৮।

লেখিকার অন্যান্য বইয়ের মধ্যে রয়েছে— *Tantric Doctrine of Immaculate Conception; Sri Krishna and the Bhagavat Gita* (1924); *Siva, or the Past of India* (1930) ইত্যাদি। গ্রন্থটি প্রকাশের পর শ্রীমতী শার্প ৬ মার্চ ১৯৩১ তারিখে Sri Krishna Nivas, Limbdi থেকে কবিকে প্রসঙ্গক্রমে লেখেন : 'May is rather hot for you in Limbdi : but his Highness the Thakore Sahib who sends his love and namaskar says that he will arrange with the Maharaja of Porbandar to put up there as long as you please during your tour'.

উত্তরে কবি প্রসঙ্গত লিখেছিলেন—'My esteemed friend the Thakore Shahib for whom you know I entertain great regards.'

মিস্ শার্পের সঙ্গে কবির ১৯৪০ সালেও যোগাযোগ ছিল

বইটি প্রকাশের পর ১২.৩.১৯৩১ তারিখে *Christian World,* London পত্রিকা সমালোচনা প্রসঙ্গে লেখেন—"Always a picturesque race, the Indian princes

have become more real and interesting to the British Public bby reason of the vital and useful part they played in the Round Table conference. This short biography of the Thakore Sahib, one of the most respected of the Hindu Princes, gives us an instructive picture of the life of an Eastern potentate with Westernized India of to-day. The ruler of Limbdi evidently embodies the highest ideals of Hindu religion and citizenship.

১৮

রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য রানী চন্দ জন্মগ্রহণ (১৯১২-৯৭) করেন বর্তমান বাংলাদেশের ঢাকার আকিয়াধল গ্রামে। পিতা পুলিশ অফিসার কবি কুলচন্দ্র দে। মাতা পূর্ণশশী দেবীও ছবি আঁকতেন। সহোদর মুকুল দে বিখ্যাত চিত্রশিল্পী। বিবাহের আগেই রানী দে (পরে চন্দ) চিত্রাঙ্কনে গভীর পারদর্শিতা দেখান। ১৯৩৩ সালে তাঁর বিবাহ হয় রবীন্দ্রনাথের পৌরোহিত্যে কবির একান্তসচিব অনিলকুমার চন্দের সঙ্গে। শান্তিনিকেতনের কলাভবনের ছাত্রী রানী দে পরবর্তীকালে 'গুরুদেব', 'হিমাদ্রি' 'আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ', 'পূর্ণকুম্ভ', 'জেনানা ফাটক' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা এবং অবনীন্দ্রনাথের সহযোগে 'ঘরোয়া' ও 'জোড়াসাঁকোর ধারে' রচনার সূত্রে চিরখ্যাত হয়ে আছেন। প্রাক্‌বিবাহ জীবনে তাঁর চিত্র-রচনার সাক্ষ্য বহন করেছে তাঁর *Twentyfive Linocuts* বইটি। দুষ্প্রাপ্য এই বইটি প্রকাশ করেন সহোদর মুকুল দে।

এর আখ্যাপত্রটি ছিল নিম্নরূপ : Twentyfive Linocuts / By / Rani Dey / Published by / M. Dey / 28 Chowranghee, Calcutta.

বইটি বহু অনুসন্ধানের পর আমাকে দেখার সুযোগ করে দিয়াছেন লেখিকার পুত্র অভিজিৎ চন্দ। আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

১৯

আবদুল করিম মৌলবীর (১৮৬৩-১৯৪৩) জন্ম হয়েছিল বর্তমান বাংলাদেশের শ্রীহট্টে। কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে অনার্সসহ বি.এ. পাস করে (১৮৮৬) তিনি কিছুদিন কলকাতার আলিয়া মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করেন। পরে তিনি প্রথমে বিদ্যালয় সমূহের সরকারী পরিদর্শক এবং পরে বিভাগীয় পরিদর্শকের পদে উন্নীত হন।

বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে অন্যতম প্রথম পাঠ্য পুস্তক রচয়িতা আবদুল করিমের বিখ্যাত বই 'ভারতবর্ষে মুসলমান রাজত্বের ইতিবৃত্ত' (১৮৯৮) দীর্ঘকাল বিদ্যালয় সমূহে পাঠ্য ছিল। শ্রীহট্ট ছাত্র সম্মেলন (১৯১৯), কলকাতা প্রেসিডেন্সি মুসলিম লীগ সম্মেলন

(১৯৩০), সুরমা উপত্যকা রাষ্ট্রীয় সমিতি (১৯২০) ও কলকাতায় নিখিল ভারত মুসলিম লীগ কনফারেন্সের অভ্যর্থনা সমিতির (১৯২৮) সভাপতি আবদুল করিম কাউন্সিল অব স্টেটে বাংলার অন্যতম প্রতিনিধি ছিলেন। সেজন্য এবং আবদুল করিম, সাহিত্য বিশারদ (১৮৭১-১৯৫৩) থেকে নিজেকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করার জন্য তিনি নামের শেষে B.A. এবং M.L.C. লিখতেন।

দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রদের বহু বৃত্তিদানকারী করিম সাহেব মুসলমান ছাত্রদের শিক্ষার জন্য ৫০ হাজার টাকার দুটি বাড়ি দান করেন। অবসর গ্রহণের পর বাকি জীবন কলকাতায় যাপন করলেও রাঁচিতে তাঁর মৃত্যু হয়।

রবীন্দ্রনাথ তাঁকে স্নেহ করতেন। কাজী আবদুল ওদুদের মতো তাঁর এই ছোটো বই *Islam's Contribution to Science & Civilisation*-এ তিনি একটি ভূমিকা লিখে দিয়ে লেখককে উৎসাহিত করেন। ভূমিকা রচনার তারিখ ১৯ অগস্ট ১৯৩৫। বইয়ের প্রকাশকালও ১৯৩৫। আখ্যাপত্র নিম্নরূপ :

Islam's Contribution / To / Science & Civilisation / By / Maulavi Abdul Karim, B.A., M.L.C. / President Muhammadan Educational conference, Bengal / Honorary Fellow of the University of Calcutta / President, Bengal Presidency Muslim League / Inspector of Schools, Bengal, (Retired) / Member, Bengal Legislative Council / Ex-member, Council of State / Calcutta / 1935 / All rights reserved।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য রবীন্দ্রনাথ করিম সাহেবের 'ভারতবর্ষে মুঘল রাজত্বের ইতিহাসে'র একটি চমৎকার সমালোচনা লিখেছিলেন। তাঁর 'আধুনিক সাহিত্য' গ্রন্থে সমালোচনাটি সংকলিত আছে।

২০

তিনটি অধ্যায়ে ঋগ্বেদের ৩০ টি মন্ত্র, ৫টি প্রধান উপনিষদ, এবং বার্নেটের বিখ্যাত ভগবদ্গীতার অনুবাদকে অবলম্বন করে প্রখ্যাত পণ্ডিত নিকল ম্যাকনিকল তাঁর *Hindu Scriptures* প্রকাশ করেন। এ বিষয়ে তিনি ম্যাক্সমুলারের *Sacred Books of the East*-এর সাহায্য গ্রহণ করেন। দশটি 'Lesson' সমন্বিত xxiv+287 পৃষ্ঠার এই বইটি ১৯৩৮ খৃস্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। এর শেষ মুদ্রণের তারিখ ১৯৪৮।

বইটির আখ্যাপত্র : Hindu Scriptures / Hymns From the Rigveda / Five Upanishads / The Bhagavadgita / Edited By Nicol Macnicol / London J. M. Dent & Sons Ltd. / New York : E. P. Dūtton & Co. Inc.

২১

হিলডা সেলিগম্যান একজন ইংরেজি মহিলা লেখক। ভারতবর্ষের মৌর্যরাজবংশের কাহিনী অবলম্বন করে একটি ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করেন। এটির নাম *When Peacocks Called* (আখ্যাপত্র : Hilda Seligman / When / Peacocks Called / London / John lane the Bodley Head)। এটি প্রকাশিত হয় ১৯৪০ খৃস্টাব্দে। লেখিকা রবীন্দ্রনাথকে বইটির একটি ভূমিকা লিখে দিতে অনুরোধ করলে কবি একটি ক্ষুদ্র ভূমিকা রচনা করে দেন। ঘোরতর যুদ্ধবিগ্রহের মধ্যেও অশোক যে মহৎ মানবিক আদর্শ স্থাপনে সমর্থ হয়েছিলেন, সেই মনুষ্যত্বের কথাই এখানে ব্যক্ত হয়েছে।

লেখিকা স্বয়ং মুদ্রিত একখণ্ড বই ২৮ নভেম্বর ১৯৪০ তারিখে রবীন্দ্রনাথকে উপহার দিয়ে নিজের হাতে লিখে দিয়েছিলেন—

To

Rabindranath Tagore

May I take this opportunity of thanking you once again. Your beautiful foreword will I know carry my book further than any one else's words could have done.

Sd / Hilda M. Seligman

এ ছাড়া প্রসঙ্গক্রমে ২৯৬ পৃষ্ঠার এই বইটিতে 'Author's Note'-এ আরো লিখেছিলেন—'I should like to take this opportunity to express my gratitude to Sir Rabindranath Tagore for breathing the voice of India into my story'......

বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে রবীন্দ্রনাথকে উপহৃত বইটি রক্ষিত আছে।

২২

সোফিয়া ওয়াদিয়া তাঁর সমাজ সেবামূলক ভূমিকা এবং বিশিষ্ট রাজনৈতিক চিন্তাধারার জন্য খ্যাত। ভারতে P.EN.-এর সম্পাদক ছিলেন। *The Aryan Path* পত্রিকারও তিনি সম্পাদক ছিলেন। আমেরিকাজাত এই মহিলা ফ্রান্স, ইংল্যান্ড ও আমেরিকায় শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে ভারতেই বসবাস করতে থাকেন। তিনি বিশ্বভ্রাতৃত্বেও বিশ্বাসী ছিলেন। ১৯৩৭ খৃস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয় -কর্তৃক তিনটি এক্সটেনশন বক্তৃতা দেবার জন্য আহূত হন এবং গণতন্ত্র, রাষ্ট্র এবং নাগরিকতা বিষয়ে মূল্যবান বক্তৃতা দেন।

সেই বক্তৃতাগুলিই পরে ১৯৪০ খৃস্টাব্দে একত্র সংগৃহীত হয়ে *Preparation for Citizenship* নামে প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ পূর্বেই বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত

ছিলেন এবং সেজন্য সংক্ষিপ্ত হলেও গ্রন্থকারকে উৎসাহ দিয়ে একটি সময়োচিত ভূমিকা লিখে দেন। রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা রচনার তারিখ ১৪ ডিসেম্বর ১৯৪০। এই বয়সেও তাঁর মনের সচেতনতা এই ভূমিকায় প্রকাশিত।

২৩

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জাপানি ভাষার Instructor ছিলেন টোকুজো সাইতো (Tokuzo Saito)। তিনি জাপানি ভাষা শিক্ষার্থীদের জন্য একটি প্রবেশক বই রচনা করেন এবং তাঁর উদ্দিষ্ট পাঠক্রমকে ৬টি বিভাগে বিন্যস্ত করেন। বইটি Nippon Trading Agency (১৩৫, ক্যানিং স্ট্রীট, কলিকাতা) থেকে লেখক-কর্তৃক প্রকাশিত হয়। এক টাকা দামের ছোটো এই বইটির পৃষ্ঠাসংখ্যা ছিল ১২+৭০ এবং এর আখ্যাপত্র ছিল নিম্নরূপ :

A Primer / Of / Modern Japanese Language / By / Tokuzo Saito / Instructor of Japanese Language in the Calcutta University / an Introduction By Dr. Rabindranath Tagore.

প্রচ্ছদ এঁকে দিয়েছিলেন শিল্পী নন্দলাল বসু। লেখক শান্তিনিকেতনে বহুবার এসেছিলেন এবং কৃতজ্ঞতাবশত শান্তিনিকেতনের স্মৃতির উদ্দেশে বই উৎসর্গ করে লিখেছিলেন—

Dedicated to the everlasting memory of / Santiniketan

Santiniketan

The memory shall live for ever
Of a place so small, yet great;
Where bonds of friendship ne'er sever,
And the motto is to co-operate.
She's the pride and glory of Asia,
A joy of the glorious East
Where all are ever welcome—
'A "Paradise" to say the least.

প্রধানত রবীন্দ্রনাথের দ্বারা উৎসাহিত হয়েই লেখক এই বইটি লিখেছেন। নিজের ভূমিকার প্রসঙ্গক্রমে লিখেছেন—'I am deeply grateful to Dr. Tagore for his noble preface expressed in such befitting term'. লেখকের ভূমিকার তারিখ ১২.২.১৯৪১। রবীন্দ্রনাথ এর ছয় দিন আগে বইটির জন্য একটি সংক্ষিপ্ত প্রশংসাপত্র লিখে দিয়েছিলেন।

২৪

চার্লস ফ্রিয়ার অ্যান্ডরুজ (১৮৬১-১৯৪০)-এর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক নিয়ে বিশাল গ্রন্থ রচিত হতে পারে, বস্তুত হয়েছেও। ১৯১২ খৃস্টাব্দে বিলেতে ইংরেজি গীতাঞ্জলি থেকে কবিতা পাঠের আসরে প্রথম সাক্ষাৎ। এর দু-বছর পরে ১৯১৪ খৃস্টাব্দে আফ্রিকার ডারবান শহরে পরিচিত হন মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে। তার পর থেকেই 'দীনবন্ধু' অ্যান্ডরুজ ভারতবন্ধু অ্যান্ডরুজ হয়ে যান।

অ্যান্ডরুজ শান্তিনিকেতনে প্রথম আসেন ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯১৩ খৃস্টাব্দে, রবীন্দ্রনাথ তখন বিদেশে। সেবারে ফিরে গেলেও ১৯১৪ খৃস্টাব্দের ১৫ এপ্রিল তিনি শান্তিনিকেতনে পাকাপাকিভাবে যোগ দেন। আম্রকুঞ্জের এক সভায় 'প্রতীচীর তীর্থ হতে প্রাণরসধার' কবিতা রচনা করেন রবীন্দ্রনাথ তাঁকে অভ্যর্থনা জানান, পরে তাঁর 'উৎসর্গ' কাব্যখণ্ড অ্যান্ডরুজকে উৎসর্গ করেন।

তাঁর বাকি ছত্রিশ বছরের জীবন অ্যান্ডরুজ উৎসর্গ করেন রবীন্দ্রনাথ, শান্তিনিকেতন, মহাত্মা গান্ধী ও ভারতবর্ষের উদ্দেশে। ভারতবর্ষ ও অন্যান্য বিষয়ে তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। বহুবার রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণ সঙ্গী হয়েছেন। তাঁকে লেখা পত্রাবলী *Letters to a Friend* গ্রন্থে গৃহীত হয়েছে।

এতখানি পারস্পরিক সমঝোতা থাকা সত্ত্বেও অ্যান্ডরুজ খৃস্টপ্রীতি কখনো অবসিত হয় নি। *The Sermon on the Mount* পুস্তকের Introduction Note-এ Agatha Harrison (London, Feb 1942) প্রসঙ্গক্রমে লিখেছেন যে অ্যান্ডরুজ ভেবেছিলেন বিলেতে অবস্থানকালে তিনি *Life of Christ* লিখবেন। তাঁর বন্ধু ও প্রকাশক Sir Stanley ও Mr. Philip Unwin-এর অনুরোধ সত্ত্বেও এই বই লেখা হয়ে ওঠে নি। একজন হিন্দু ভারতীয় তাঁকে লিখেছিলেন—'I want you to write in simple English the story of the Life of Christ... that most important thing you can do... You are the only man who can write this book, for you have lived like Him all these thirty years in India...'

১৯৪০-এ অ্যান্ডরুজের মৃত্যুর পর এই বইয়ের পাণ্ডুলিপি তাঁর শান্তিনিকেতনের লেখার টেবিলে পাওয়া যায়। আগাথা হ্যারিসন আরো লিখেছেন—'The Foreword, written by his friend, the late Rabindranath Tagore, is surely the finest tribute ever paid by an Indian to an Englishman. C. F. Andrews did not write his 'Life of Christ'; he lived it.

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর মাত্র কিছুদিন আগেই অ্যান্ডরুজের মৃত্যু হয়। রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুর কিছুদিন আগেই, জানুয়ারি ১৯৪১ তারিখে গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিটি দেখে একটি চমৎকার ভূমিকা লেখেন। আসলে এটি রবীন্দ্রনাথের বাংলা রচনার মার্জরি সাইকস্-কৃত ইংরেজি অনুবাদ।

বইটির আখ্যাপত্র নিম্নরূপ : The Sermon On the Mount / By / C. F. Andrews / with a Foreword by / Rabindranath Tagore / and an introductory note by / Agatha Harrison / "...a real Englishman a real / Christian and true man". / Rabindra Tagore / London / George Allen & Unwin Ltd. 40 Museum Street.

xix-175 পৃষ্ঠা -সংবলিত এই বই Great Britian-এ মুদ্রিত। প্রথম প্রকাশের (July 1942) অব্যবহিত পরেই Sept 1942-এ এর দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হয়। তৃতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত 1949-এ। দশটি অধ্যায়ে সমাপ্ত এই বইটি অ্যান্ডরুজের বহু বইয়ের মধ্যে অনেকে শ্রেষ্ঠ রচনা বলে সম্মানিত করেন।

২৫

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮) এবং রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক বিষয়ে কিছু অবতারণা করা এখানে নিষ্প্রয়োজন। শরৎচন্দ্রের 'নিষ্কৃতি'র অনুবাদ করেছিলেন দিলীপকুমার রায়। তিনি চেয়েছিলেন গ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথের লিখিত ভূমিকা-সংযুক্ত হোক।—'আমি নিষ্কৃতি অনুবাদ শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে দীর্ঘপত্রে সব জানিয়ে শেষে অনুরোধ করি গল্পটির একটি প্রাক্‌কথন (foreword) লিখে আমাকে পাঠাতে।... তিনি এর পরে ব্যস্ত হয়ে শরৎদার প্রতিভার প্রশস্তি ক'রে লেখেন 'নিষ্কৃতি'র একটি নাতিদীর্ঘ প্রাক্‌কথন। 'শরৎচন্দ্র এই প্রস্তাবে আশঙ্কা করেছিলেন—'রবীন্দ্রনাথ আমাকে ইনট্রোডিউস করে দিতে চাইবেন বলে ভরসা করি নে। আমার প্রতি তিনি প্রসন্ন হন। ...আমার প্রতি তাঁর বিমুখতার অবধি নেই। সুতরাং এ চেষ্টা করা নিরর্থক।' (দিলীপকুমার রায়কে লেখা ৩ মাঘ ১৩৪১ তারিখের পত্রের অংশবিশেষ)।

নিরর্থক প্রমাণিত হয়েছিল শরৎচন্দ্রের আশঙ্কা। রবীন্দ্রনাথ একটি ভূমিকা অবশ্যই লিখে দিয়েছিলেন। যাঁরা রবীন্দ্র-শরৎচন্দ্রের সম্পর্কে কালিমা লেপনে উৎসুক, তাঁরা বাংলা সাহিত্যে ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্রের স্থান রবীন্দ্রনাথ কোথায় নিরূপণ করেছিলেন—এ ভূমিকাটি থেকে তা জেনে নিতে পারবেন। রবীন্দ্রনাথের এই প্রশস্তি খুব কম লোকের চোখেই পড়ে।

অবশ্য নিষ্কৃতি বা তার অনুবাদ 'Deliverence' (আখ্যাপত্র : The Deliverence / June / 1944 / Nalanda Publications) সম্পর্কে কবি বিশেষ কিছু মন্তব্য করেন নি। এখানে একটি তথ্য সংকলিত হওয়া প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই 'Preface' লেখেন Uttarayan, / Santiniketan, Bengal থেকে মার্চ ১৯৩৫-এ। 'Deliverence' প্রকাশিত হয় ১৯৪৪ সালের জুন মাসে। কবির ভূমিকা রচনার এতদিন পর কেন অনুবাদ-পুস্তকটি

প্রকাশিত হল, বোঝা যায় না। প্রসঙ্গত, অনুবাদটি শ্রীঅরবিন্দের খুব ভালো লেগেছিল। তিনি এই অনুবাদটির পাণ্ডুলিপি ইতস্তত দেখেও দিয়েছিলেন। দিলীপকুমার তাঁর নিবেদনাংশে এ কথা জানিয়েছেন।

২৬

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী জ্যেষ্ঠা কন্যা সুখলতা (১৮৮৬-১৯৬৯) ওড়িশার ভক্তকবি মধুসূদন রাও-এর পুত্র ডাঃ জয়ন্ত রাও-এর সঙ্গে বিবাহ-সূত্রে সুখলতা রাও নামেই সমধিক পরিচিত। শিশু সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর একটি বিশিষ্ট স্থান নির্দিষ্ট হয়ে আছে।

সহোদর সুকুমার রায়-এর মতো সুখলতাও রবীন্দ্রস্নেহধন্য ছিলেন। বস্তুত, তাঁদের এই দুই ভাই-বোনের ডাক নাম তাতা ও হাসি দেওয়া হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের 'রাজর্ষি' কিশোর উপন্যাসের তাতা ও হাসির নামানুসারে।

সুখলতা তাঁর নানা বাংলা রচনার সঙ্গে ইংরেজি রচনার চর্চা করে গেছেন। এ সংবাদ অনেকেরই অজানা। *New steps, Living lights* প্রভৃতি বই ছাড়া 'আলোক' নামে একটি ইংরেজি-বাংলা দ্বিভাষিক পত্রিকাও কিছুদিন সম্পাদনা করেছিলেন। সুখ্যাত মনসামঙ্গলের কাহিনী অবলম্বনে তিনি vi+34 পৃষ্ঠার একটি বই লেখেন *Behula* নাম দিয়ে প্রধানত কিশোরদের পাঠের উদ্দেশ্যে। U. Ray & Sons-মুদ্রিত ছবি এবং কুন্তলীন প্রেসে মুদ্রিত অক্ষরাংশ সমন্বিত বইটির দাম ছিল ৩৷৷০। তবে ঠিক কত খৃস্টাব্দে এটি মুদ্রিত হয়, তা জানতে পারি নি। এর আখ্যাপত্রটি ছিল এই ধরনের : Behula / An Indian Myth / Written and illustrated / By / Sukhalata Rao / U. Ray & Sons / 117 Bowbazar St. Calcutta.

উল্লেখ করা প্রয়োজন সুখলতা চিত্রবিদ্যায় সুনিপুণা ছিলেন এবং নিজের বইয়ের ছবি নিজেই আঁকতেন। এই বইটিতেও তাঁর আঁকা বারোটি চমৎকার ছবি সংযুক্ত হয়েছে। সম্ভবত অনুরোধবশতই রবীন্দ্রনাথ বইটির একটি সংক্ষিপ্ত অথচ প্রাসঙ্গিক ভূমিকা লিখে দেন।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

যাঁদের প্রত্যক্ষ সহায়তা ছাড়া এই গ্রন্থ প্রকাশ সম্পূর্ণ হত না, তাঁদের কাছে আমার ঋণ সোচ্চারে ঘোষণা করি। আমার স্ত্রী সুব্রতা ও কন্যাদ্বয় সুতনুকা ও সুবর্ণা আমার গবেষণা কর্মরথের তিন সারথি। এ ছাড়াও অনাথনাথ দাস, অভিজিৎ চন্দ, অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, অরবিন্দ মিত্র, আদিত্য ওহদেদার, আশিস হাজরা, গীতা চট্টোপাধ্যায়, গৌতম ভট্টাচার্য, জগদিন্দ্র ভৌমিক, দিলীপকুমার সিংহ, দেবপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়, পুলিনবিহারী সেন, প্রণবকুমার মিত্র, প্রশান্তকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রশান্ত কুমার পাল, বিশ্বনাথ রায়, ভবতোষ দত্ত, সনৎকুমার চট্টোপাধ্যায়, সন্দীপ দত্ত, সুব্রত চক্রবর্তী, সুমিতা চক্রবর্তী, স্বপন মজুমদার— এঁদের সহযোগিতা ছাড়া এই গ্রন্থ সম্পাদনা করা সম্ভব হত না। কিছু প্রতিষ্ঠানের কাছেও আমি বিশেষভাবে ঋণী। যেমন বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, বিশ্বভারতী রবীন্দ্রভবন, জাতীয় গ্রন্থাগার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার, রামমোহন লাইব্রেরি, বড় বয়েজ ক্লাব। তাঁদের কাছে আমার বিনম্র কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি। আরো তথ্য সরবরাহ করে পাঠকবর্গ আমাকে সমৃদ্ধ করবেন— এই প্রত্যাশা রাখি।

বারিদবরণ ঘোষ